অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

দশম খণ্ড

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-৭৩

Achintya Kumar Rachanavali (Vol. X)
(Collected writings of Achintya Kumar Sen Gupta)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৬৪

নিরঞ্জন চক্রবর্তী
সম্পাদিত

প্রকাশক ঃ
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক ঃ
শ[illegible]েন্দু রায়
[illegible]া প্রেস
৩২এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪

সূচীপত্র

নীল আকাশ ॥ কাব্যগ্রন্থ ॥ ১—৫২ পৃষ্ঠা

আজন্ম-সুরভি । কাব্যগ্রন্থ । ৫৩—৯৪ পৃষ্ঠা

নীল আকাশ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
প্রীতিভাজনেষু

সৈন্য ও সন্ন্যাসী

এসেছে সংস্কৃত সূর্য প্রদ্যোতিত মার্জিত আকাশ :
মাঠে আর আল নাই, মুছে গেছে স্তরপঙক্তিভেদ,
শোণিতে প্রস্বেদে ক্লেদে লিখিলাম যেই ইতিহাস
ধরিত্রীর ভাগ্যে তাহা অমৃত-নিস্যন্দ-আয়ুর্বেদ।

পিধানে নিরুদ্ধ অসি, পরিবর্তে ভূতলে লাঙল—
নিঃসহ সংগ্রামশেষে শ্লথতনু পেয়েছি বিশ্রাম,
ফলেছে পর্যাপ্ত শস্য বলস্ফূর্ত শ্যামল স্নেহল
ধরণীরে মনে হয় স্বপ্নময় সুখস্বর্গধাম।

মিটেছে খাদ্যের ক্ষুধা, নির্বাপিত বস্তুর জিগীষা,
ক্লেশহীন সর্বপ্রাপ্তি, দেশহীন ব্যাপ্ত অবিদ্বেষ—
তবু সেই দীপ্ত চন্দ্র, আকাশ-আকীর্ণ শতভিষা,
তবু সেই দিগন্তের ক্ষীণ প্রান্তে অনন্ত নির্দেশ।

তবুও অপ্রাপ্যা তুমি, কি আশ্চর্য, তবুও অধরা,
তবুও তেমনি দূরে, মূলেস্থূলে দাঁড়াবেনা আসি,
তবুও তোমার লাগি দুই আঁখি যামিনীজাগরা—
সৈন্য আমি, যুদ্ধজয়ে পুনর্বার হয়েছি সন্ন্যাসী॥

১৩৪৯

ধারাবাহ

কত নব ভাব কত না নবীন ভাষা,
তবু নতুনের শেষ হয় না তো আসা।
চলে যায় লোক থামে না পদধ্বনি
আগতের মাঝে ফের শুনি আগমনী।।

১৩৪৯

পরিপূরক

দুর্গ গড়ি, একদিন পাবো ব'লে গৃহ,
যুদ্ধ করি, হব ব'লে অপগতস্পৃহ।
আজিকে রক্তের স্বাদ,
চমৎকার কী উৎসাদ !
একদিন হব ব'লে নিশ্চেষ্ট নিরীহ।

জ্বলিবে যে একদিন তৃপ্ত প্রাণশিখা
তারি তরে খুঁড়িতেছে শ্মশানে পরিখা।
ছাড়ি এ কঠিন মাটি
যাব ফের পুষ্পবাটি,
শয়নে চন্দনচন্দ্র, আকাশে বরিখা।

হলচল-হলাহল ফেনল ধূমল
প্রতিরোধে কেন গড়ি দীর্ঘ জনবল ?
কেননা জনতা ছাড়ি
হব ফের একচারী
করিব আবার স্বীয় স্বপ্নেরে সম্বল।

তরবার খরধার, সৈনিক কৃষক,
গড়িব সে অস্ত্রমুখে হলের ফলক।
আজি সব ম্রিয়মাণ
সেদিন আসিবে ধান,
আকাশে অপরিমাণ নীল বলাহক।

আজি যদি চক্ষে তব নাহি থাকে নেশা,
লজ্জা নাই, আজি তুমি নহ মোর এষা।
আজি আর নহ তুমি
রাঙা ফুল মরশুমি
অযাগ্রাসঙ্গিনী আজ নক্ষত্র অশ্লেষা।

দাঁড়ালে আমার পাশে, হাতে নিলে অসি,
তিমিরবিদারবিভা বিভূষা উষসী।

আজিকে কটির রেখা
নির্বাপিতমদলেখা,
বক্ষে নহে চেলাঞ্চল, দুর্ভেদ্য আয়সী।

কেননা আসিবে ফের কুসুমসময়
তারি তরে সূচীপত্রে বিলয়-প্রলয়।
একদা নতুন নভে
আমাদেরো ভোর হবে,
রাত্রির মর্যাদাবাহী নব সূর্যোদয়॥

১৩৪৯

উন্মোচন

এতদিন ধরে দেখেছিনু তব
রূপখানি গদগদ,
বিবশ আবেশে বিলোল লালসে
ছিলাম বশংবদ।
বিশ্রামরসে বিহ্বল লাবণী,
তরলনয়নে তুষার-দ্রাবণী,
দেহ যেন তব ভোগাবতারণী
এই শুধু ছিল জানা—
যেন চিরকাল ক্ষণ-সুখাবহ
প্রবাহে বিগাহমানা।

বেশবিন্যাসে প্রশাসিত সদা
কাষ্ঠ-পুত্তলিকা ;
পত্রছায়ায় ছিলে কুণ্ঠিতা
কলিকা অসাহসিকা।
পথ চল নাই পাছে খরতাপ
বিমলিন করে অলককলাপ,
ছায়ায় বসিয়া মৃদু মদালাপ

করো ভীরু গুঞ্জন—
কানে পশে নাই কোথায় শঙ্খ
বাজিছে ঘনস্বন।

ব্যজন করেছি চটুল চাটুতে
করেছি ব্যাজস্তুতি,
ভুলায়ে রেখেছি তব আত্মার
কঠিন প্রতিশ্রুতি।
দেখি নাই কোথা ঘনাইছে ঝড়,
দেখেছি কেবল স্ফুরিত অধর
কটিমণ্ডলে লীলার লহর
স্তবকিত ঘন লোভ—
কানে পশে নাই কোথায় রুদ্র
সমুদ্র-বিক্ষোভ।

অস্তায়মান সূর্য যেমন
রচে আরক্ত চিতা,
তেমনি আজিকে শেষ শোভা নিয়ে
হয়েছ উন্মোচিতা।
উচ্চে বেঁধেছ দৃঢ় কেশচূড়া
তাতে ফুল গোঁজা বিষের ধুতুরা,
কোথা গীত-সুর, কোথা পীত-সুরা—
বিবর্ণ বিস্বাদ,
চরণের তলে দেখেছ টলিছে
সৃষ্টির বনিয়াদ।

অলংকৃতির কীর্তি তোমার
কিণাঙ্ক-অঙ্কন,
আজি আনিয়াছ বিশ্ব ব্যাপিয়া
নূতন বিস্মাপন।
লাসবেশ আজ লাজে গেল খসি,
অসিধারাব্রতে হাতে নিলে অসি,
রৌদ্রকিরণে উঠিলে ঝলসি
উদ্যত-প্রহরণা—
অম্বরে আজি দম্ভোলি বাজে
নবীন সম্ভাবনা।

নীল আকাশ

মরি, সেই তনু রুক্ষকঠোর
অস্ত্র-আঘাত-সহ
ভীরু পৌরুষে করালে নবীন
জন্ম-পরিগ্রহ।
কোথা উড়ে গেল লঘু প্রজাপতি
হোমধূমে তুমি হলে ধূমাবতী,
বীরবতী. তুমি রথের সারথি
আর তবে কিবা ভয়.
উভয়ের আজি অভয় আকাশে
সৌর অভ্যুদয় ॥

প্রতিবাসী

এতদিন ছিলাম তুমি আর আমি, এবার আমরা।
এবার দুজন।
আবার বেঁধেছি গাঁটছড়া
প্রতিরোধের সঙ্গে আক্রমণ।
দেখেছি অনেক কেলিকলা
স্খলিত মেখলা ;
ছুঁয়েছি অনেক ত্বক
আপাদমস্তক ;
নিয়েছি অনেক ঘ্রাণ
শিহরায়মান।
মুখরসস্থিত
আহা, চুম্বনটি ছিল মনোনীত !

দেখেছি অনেক চিলতে আকাশ.
টুকরো উঠোন ;
আলসেতে পাখির বসবাস
মাকড়সার জাল-বুনোন।
শুনেছি অনেক মিথ্যালাপ
বুকে বুক রেখে মৌখিক চুপচাপ :

বাক্য আর স্তব্ধতা
তা, একই কথা।
গান আর গুঞ্জন, ভুজ-পাশ-ভুঞ্জন
একই আয়োজন।
ইন্দ্রালয় যেন এই ইন্দ্রিয়ায়তন ॥

এবার সময় হল, এল মহান দুঃসময়
নিশ্চয়
আমাদেরো হবে জয়।
রাখো এবার তবে ওসব জীর্ণ জীবনের চেকনাই,
দহন-উল্লসন লোহাকে ডেকেছে নেহাই
ডেকেছে ঘাতুক হাতুড়ি।
ছাড়ো এবার এই অকুলান কুঠুরি
ক্ষুদ্র স্বপ্নের কোণ
স্বার্থ-খণ্ডিত উঠোন।
ভাঙো এই অন্ধ আরামের কপাট।
শুনতে কি পাচ্ছনা শ্মশানশ্যেনের পাখসাট?
তবে কালো চক্ষের কোল জুড়ি
আনো একটি অপ্রকম্প বিজুরি;
ভঙ্গিতে আনো ঔদ্ধত্যের উদ্যতি
রঙ্গরতি ছেড়ে হও এবার অভঙ্গব্রতী;
মুখে আনো কোপ
ধনুকে জ্যা-আরোপ।
দূর বাতাসে তীরক্ষেপের ধ্বনি
কটি-কিঙ্কিণির বদলে বাজুক এবার যুদ্ধাস্ত্রের রনরনি।
অমুষ্টিমেয় আকাশ আজ অনন্তজীবী
আমাদের অঙ্গন সমস্ত পৃথিবী।

আমরা এবার দুর্জন
দুর্বারণ
রক্তাক্ত পায়ে আসমুদ্র চরণ-চারণ।
নই আর আমরা মুখোমুখি
গদ্গদ দুখে দুখী।
আমরা এবার পাশাপাশি
পরস্পরের প্রতিবাসী।
তীর আর তূণ

অরণি আর আগুন ;
দীপ্তি আর দাহ
ধৈর্য আর উৎসাহ ;
তেজ আর মরুৎ
স্ফুলিঙ্গ আর বারুদ ।
আমরা দু'জন
প্রতিরোধ আর আক্রমণ ॥

১৩৪৯

চাঁদ

মুক্তির নিশ্চিন্ত শব্দ একটানা ধ্বনিল আকাশে
বাহিরে আসিতে তবু ভয় :
মনে হল নগ্ন চাঁদ ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে ঘাসে
গলিত, দলিত, রক্তময় ।

বাহিরে দাঁড়ানু এসে, ঝলিতেছে সেই চেনা চাঁদ
ঝরিতেছে শীতল ময়ূখ,
এ তো নয় সেই জ্যোৎস্না-রজনীর অলজ্জ আহ্লাদ—
অগ্নিজিহ্বা খরশরমুখ ।

মৃত্যুর দূতিকা এ যে গ্রাসগ্রাস ধ্বংসের ধাবিকা,
উগ্রস্পর্শ্য আজি তার হাসি—
এ মরীচি ভ্রমজাল, ছদ্মবেশী এ যে মরীচিকা,
হিংসাহীন, আসলে মাংসাশী ।

এতদিন প্রেম ছিল, ছিল সাথে প্রমোদকল্লোল,
গতক্লম কোমল বিরহ,
দুলেছিল এতদিন বাহুবন্ধে আনন্দ-হিন্দোল
বিশ্ব ছিল বিস্ময়-আবহ ।

কেননা সে চাঁদ ছিল সমুৎফুল্ল সমুদ্রচন্দ্রিকা,
আদিগন্ত ছিল অনাবৃতি—
আজি তার বাকা ঠোঁট অকৌতুকে আঁকা বিভীষিকা,
দুই চোখে বীভৎস বিকৃতি।

অরণ্যচন্দ্রিকা আজ নির্বাসন, নির্বাণ-প্রাপন :
আজি মোরা অন্ধকার ঘরে
কৃষ্ণবর্ণ শেষ তিথি করিতেছি একান্তে যাপন
নবতন প্রভাতের তরে।

ধরণীর গলগ্রহ, মৃতগ্রহ, জর্জরিত-জরা,
কক্ষচ্যুত হবে উৎসাদ,
নতুন মৃত্তিকালেপে গড়া হবে যবে বসুন্ধরা
নতুন উদয় হবে চাঁদ।

ততদিন চাঁদ নাই, অশ্রু নাই, নাই কোনো হাসি
নাই কোনো প্রেম কিংবা ক্ষমা ;
আছে শুধু অভ্রলেহী লোলজিহ্বা ক্ষুধা সর্বগ্রাসী
উদ্দাম উদ্‌ভ্রান্ত পরিক্রমা॥

১৩৪৯

চন্দ

এত দিন জানতাম চন্দনপঙ্ক,
ভালো লেগেছিলো তব আননকলঙ্ক।
সেটুকুতে ছিলো ধার
ঢলঢল রসভার,
অঙ্কশায়িনী ছিলো, ছিলো পর্যঙ্ক।

তব সাথে এত দিন প্রেম-রোম-অঞ্চ,
দেহমণ্ডলে ছিলো রতিরাসমঞ্চ।

আজি সব পাতাঝরা,
ছেঁড়া যত গাঁটছড়া,
পাখি সব বাসাহারা, ছিন্ন মালঞ্চ।

তোমারো সহসা আজ এ কি যতিভঙ্গ,
জঙ্গী হয়েছ দেখি ছেড়ে রসরঙ্গ।
তুমি কিনা বিদ্বিষ,
শায়কে মেখেছ বিষ,
ছড়ায়ে দিয়েছ রিষ অনলতরঙ্গ।

তব তরে মনে ছিলো কত না প্রশংস,
শর্বরী ছিল শ্বেত উড্ডীন হংস।
হৃদয়ের ছিল আলী,
একটি একটি ফালি,
আনতো শেষের ডালি কামনাবতংস।

সেই তুমি মৃত্যুর হলে সূচীপত্র
যে তুমি একদা ছিলে আরোগ্যসত্র।
সেই যে রূপসী রাত
হয়ে গেছে উৎখাত,
আজ সে করালপাত প্রলয় পতত্র।

রাখো রাখো নাগরালি যত পরিবন্দ
চুম্বনে দংশন—কপট প্রবন্ধ।
আজকে করেছে ভিড়
যত সব নতশির,
গর্তশির সাহসীর—স্কন্ধ কবন্ধ।

কুট্টিম সেই আছে আছে সে কুটঙ্ক
সঙ্কুল গিরিপথে কৃশ নদীবঙ্ক।
তৃষ্ণার জল নেই,
জীবনে দখল নেই,
ভিক্ষায় ফল নেই, আকাশে আতঙ্ক।

ছলছল এ ছলনা আর নয় সহ্য,
গদগদ তব ভাষে ভাব-আতিশয্য।

এ নিশি চান্দ্রমসী,
হয়ে যাক সব মসী,
তুমি যদি যাও খসি, হই গতলজ্জ।

পরাস্ত তুমি চাঁদ হয়ে যাও অস্ত,
আবার ধরণী হোক নতুন পয়স্ত।
সেদিন প্রেমের যাগে,
যদি বা তোমারে লাগে,
এসো তবে অনুরাগে হয়ে ধোপদস্ত।

ততদিন থাকো বাদ চাঁদ দুর্দর্শ,
তোমাকে দিয়ে যে আর মেটে না এ তর্ষ।
পৃথিবীর তুমি বোঝা,
নেমে যাও বলি সোজা,
অমা আজ প্রিয়তমা —শোনো পরামর্শ॥

১৩৪৯

কাগজ-ফেলার ঝুড়ি

সম্পাদকের টেবিলের নিচে
কাগজ ফেলার ঝুড়ি,
জমে আছে যত অনির্বাচিত
কবিতার কারিকুরি।
বোবা আখরের বাজে আঁকিবুঁকি,
তবু তারি ফাঁকে আকাশের উঁকি,
ছিল না কি এতটুকু?
ছিল না কি আঁকা কারো কালো আঁখি
কালো চুল রুখু-রুখু!

হয় তো বা ছিল অবোলা ভাষার
ভণিতার কিছু ত্রুটি;

সেই অপরাধ হয় তো তারার
অশ্রুতে আছে ফুটি' ।
ওদেরো আকাশে এসেছিল চাঁদ,
চোখে এনেছিল বিফল বিষাদ,
ক্ষণিক সুখের শিখা –
যত ছিল আশা, অধিক কুয়াশা,
মরু, নাই মরীচিকা !

মিলন ওদেরো মিলে নাই, তাই
কবিতারো নাহি মিল ;
উমা ছিল ঠিক ; উপমায় কিছু
হয়েছিল গরমিল !
এত বলিয়াও রহিল নীরব,
ভাববিরহিত গাঢ় অনুভব
ভাষায় তা অকুলান ;
ব্যাকরণহীন বেদনার কাছে
মূক হ'ল অভিধান ।

সম্পাদকের টেবিলের নিচে
কাগজ ফেলার ঝুড়ি—
অমনোনীত এ মানুষের মেলা
রয়েছে পৃথিবী জুড়ি ।
জীবনে যাদের মেলে না ছন্দ,
বিধাতার তারা নহে পছন্দ,
রয়েছে দ্বীপান্তরে ;
তবু নিরাশায় প্রতি সন্ধ্যায়
প্রদীপ জ্বালিছে ঘরে ॥

১৩৪৯

কম্পাস

স্ফুরিত তড়িতে খর অসি-নিষ্কাশ,
উত্তাল ঢেউ বিপুল বিপর্যাস।
জাহাজ যদিও ডুবো,
তারা আছে ঠিক ধ্রুব ;
উত্তর দিকে ঠিক রেখো কম্পাস।

বাজ নেই, নেই বাজপক্ষীর নখ,
সংগ্রামী কেউ, কেউ বা সমর্থক।
নেই কুঁড়া নেই খুদ,
নিস্তূণ, নিরায়ুধ,
ভঙ্গিটি শুধু রেখো তিখ তির্যক।

অরণ্যে রেখো অরণির প্রস্তুতি
রাতের অর্থ আগামী দিনের দ্যুতি।
আজি যা স্তব্ধ গনি
আসলে প্রতিধ্বনি
নিথর পাথরে ভিত্তি-প্রতিশ্রুতি।

শুষ্ক শাখায় কিশলয়-উল্লাস
শ্বাসহীন বুকে রেখো এক বিশ্বাস—
জাহাজ যদিও ফুটো
তীর তবু প্রস্ফুট
উত্তরে আছে উত্তরে কম্পাস॥

১৩৪৮

কল্য

বর্তমান আর কতটুকু বেশির ভাগই কল্য,
ফলের খোঁজে ব্যস্ত সবাই কোথায় রে সাফল্য॥

১৩৪৮

উদ্যম

মাঝে-মাঝে দেখা দেয় উলঙ্গ উদ্যম।
তরস্বান বীর তুরঙ্গম
মাঝে-মাঝে বাঁকা করে ঘাড়
ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় রজ্জুরশ্মিভার।
জোরের জোয়ার
তরঙ্গিত ক'রে তোলে পেশী,
মুখে আনে স্বতস্ফূর্ত হ্রেষা,
যেন কোন সাম্রাজ্য-অন্বেষী —
চক্ষে জ্বলে সংগ্রামের নেশা
চর্মে ঝলে চিক্কণ চিকুর.
অগ্নিময় খুর
ছিন্ন করি ভিন্ন করি পথের পাথর
সহর্ষ-ঘর্ষণ উন্মুখর
ছুটে চলে উগ্র অগ্রসর—
পিঠে তার অকস্মাৎ জন্ম নেয় পাখা।

তারপর চেয়ে দেখি ঘুরিতেছে চাকা
পিছে তার। বেগবীর্য ছাড়ি
চাবুকজর্জর মাংসে টানিতেছে ভগ্নপাত্রায় গাড়ি।

১৩৪৯

প্রচ্ছদ

ধানের মধ্যে লুকোনো রয়েছে অন্ন
গানের মধ্যে সুর আছে প্রচ্ছন্ন,
তেমনি আমার চিত্তে
শরীরের অস্তিত্বে
গহন গভীর তুমি আছ চৈতন্য॥

পর পৃষ্ঠা

অভ্যাস-আড়ষ্ট পৃষ্ঠা ধীরে-ধীরে চলেছি উলটি'
অর্গল-আবন্ধ কক্ষে ; অস্পষ্ট জীবনবোধ, পথ
পঙ্গু, পরাঙ্মুখ ; ভাগ্যের হয়েও কিনা প্রতিরথ
দৈবেরি দাসত্ব করি ; ঘোরঘটা দেখিলেই হটি
আপনার অটল কোটরে ; ক্ষীণ ক্ষণ-খণ্ড ক'টি
খুঁটি শুধু কদর্য কার্পণ্যে ; ক্ষুদ্র ক'রে স্বত্ব-সীম
নিষ্ক্রিয় রক্তের স্বাদে অনুভবি বুদ্ধির জড়িমা,
গৃহস্থ শিবিরে চিনি, ভয় করি দ্বারস্থ ধূর্জটি।

তার পর এক দিন তৃণ-প্রাণে নেমে আসে ঝড়
অনশ্বর। পথেরে বিমুক্ত করে অভিন্ন প্রান্তরে ;
পুড়ে যায় জতুগৃহ, উড়ে যায় শৃঙ্খল-শৃঙ্খলা,
দিনানুদৈনিক দৈন্য ; জীবনের শিকড়-শিখর
ন'ড়ে যায়, প'ড়ে যায় ভেঙে, অকস্মাৎ নভান্তরে
সবলে উত্তীর্ণ হই, দিগ্বালিকা উদয়-উজ্জ্বলা॥

১৩৪৯

ট্রেন

মধ্যরাতে যখনই আমার ঘুম ভেঙে যায়
নীরবতায় নীল নিঃসঙ্গ সে মধ্যরাত্রি—
শুনতে পাই আমি কেবল ট্রেনের শব্দ :
যেন কোথায় ট্রেন চলেছে।

যেন কোথায় ট্রেন চলেছে
কোন বিস্তীর্ণ-নির্জন মাঠের উপর দিয়ে

অন্ধকার দীর্ণ করে
দ্রুতগামী দীর্ঘশ্বাসের মত ।
যেন কোথায় ট্রেন চলেছে
ঘূর্ণ্যমান চাকার হাহাকারে
এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তহীনতায় ।

আমি দাঁড়াই গিয়ে তখন নীল আকাশের নিচে
কিন্তু কোথাও হায় দেখতে পাইনা সে-ট্রেন ।

অথচ শুনি কেবল তার শব্দের শিহরণ
তার দ্যুতিমান গতির তীব্রতা ।
তারায় আর তৃণে, শাখায় আর শিকড়ে
শুনি আমার এই ধাবমান ধমনীতে
আমার লবণাক্ত লোহিত রক্তের মধ্যে
মধ্যরাত্রির স্তব্ধতার এই গলিত অনর্গলতায়—
যেন কোথায় ট্রেন চলেছে অন্তহারা ॥

১৩৪১

স্তব্ধতা

আমি শুনতে পাই শুধু স্তব্ধতা
ঈশ্বরের প্রবল অট্টহাস্য দিয়ে যা তৈরি,
যা তৈরি আমার মৃত্যুর উপস্থিতি দিয়ে ।
জলের উপর যখন বৃষ্টি ঝরে পড়ে
আমি শুনি শুধু জলের অবিরল শীতলতা,
আর যখনই তুমি কথা কয়ে উঠেছ
আমি শুনেছি শুধু তোমার কথার সমাপ্তি ।

গর্জমান সমুদ্রের তলায় আমি দেখেছি শুধু বিশ্রাম ।
বিস্তীর্যমান মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আমি দেখেছি শুধু বিস্মৃতি ।

আর, যখন পাখি মেলেছে তার অস্থির পাখা
জাহাজ চলেছে তার দূর-দীর্ঘ মাস্তুল তুলে
অন্ধকারে জন্মের কোটরে কোনো শিশু উঠেছে কেঁদে
কিংবা মসৃণ হয়ে তুমি যখন আমার কোলের কাছটিতে এসে বসেছ।
যে আকাশ ছিল মনে পড়ার মত নীল
আর যে আকাশ ছিল ভুলে-যাওয়ার মত শাদা
আমি শুধু শুনেছি এক অপরূপ শূন্যতা।

বোজানো বইয়ের মত সারি-সারি কতগুলি বাড়ি—
আর অর্থহীন কতগুলি আমরা অক্ষর :
আমি শুনেছি শুধু এক সুবিশাল স্তব্ধতা
আমাদের জীবনের সেই শেষ মুখর সৃষ্টি
সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্ময় বিস্ময়॥

১৩৪১

শাখা ও শিকড়

তোমরা চলে যাও শাখায়, আমি চলে যাব শিকড়ে
তোমাদের জন্যে থাক পুলকিত পাতার প্রচুরতা,
ফলবান প্রবল সমারোহ ;
আর আমার জন্যে রুক্ষ রিক্ত এই মূল
এই উলঙ্গ বিশ্রাম।
তোমরা ছড়িয়ে পড়েছ আকাশে
উজ্জ্বল উচ্ছৃঙ্খলতায়,
সমীরিত সবুজ রশ্মিজালে ;
আর আমি নেমে এসেছি মাটিতে
মার জঠরের মত প্রশান্ত সেই মাটিতে,
যেখানে শুধু নির্বাপন আর অব্যাহতি।
তোমরা প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহ করছ,
বাধার অনুপাতে নিজেদের করছ বিস্ফারিত,
ঝড় আর পাথর, দেয়াল আর নগরী—

আর আমি নিজেকে এখানে ছেড়ে দিয়েছি
যেখানে গিয়ে না কেন পৌঁছুই,
যা না কেন আমি হয়ে উঠি
আমার এই নির্বারিত দুর্বারিতায়।

অগণন আঙুলে তোমরা হাত বাড়িয়েছ সূর্যের দিকে
যে সূর্যকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ চোখের সমুখে,
দিনে-দিনে যে ক্ষীণ হয়ে আসছে ;
আর আমি চলেছি মাটির তলাকার
অন্ধকার, অজ্ঞাত সূর্যের সন্ধানে—
আমার আত্মার আদিভূত অতল সেই অন্ধকারে ॥

১৩৪১

রোমাঞ্চ

আনাজের ক্ষেত কেহ, কেহ দেখে ফুলের বাহার,
প্রেয়সীর শাড়িটিরে তন্তুচোখে দেখিছে প্রেমিক :
আর আমি ? আমি দেখি দেয়ালে-লম্বিত ক্যালেন্ডার
কতদিনে কতদূরে দেখা দিবে রক্তিম তারিখ।

সরু চিড়ে, লাল মুলো, কোথায় বা কালো তরমুজ,
বাঁশফুল ধান কোথা, মাছ কোথা পাকল-জীয়ল—
অগণন পাতিকাক, এক্ঘেয়ে বিবর্ণ সবুজ :
ঘুরি ফিরি সঙ্গে সেই নির্ভেজাল ঘোর মফস্বল।

অগ্রিম রোমাঞ্চ শুধু পঞ্জিকায় রক্তিম নিশান,
সামান্য পিছনে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে চলিবে এঞ্জিন—
তারি তরে চক্ষুপ্রান্তে সর্ব চিত্ত উপচীয়মান,
তারি তরে সূর্য জ্বলে রাত্রে জ্বলে লাল কেরাসিন।

কোথা মাল, কোথা পত্র, কোথা কুলি, কে কাটে টিকিট,
বিছানা বাঁধিতে গিয়া খুলে গেছে নারকোল-কাতা,
ডালা-খোলা স্যুটকেস, এক যুগে একটি মিনিট :
ট্রেন হাঁকে, ঘণ্টা দেয়, আহা মরি, চলি কোলকাতা।

সেই সে পরম মুক্তি, উজ্জ্বল উদ্বেল রাজধানী :
সবুজ ঘাসের চেয়ে ঢের ভালো হলুদ রুক্ষতা,
কোমল বৃন্তের চেয়ে তূর্ণ ঘূর্ণাবর্তের সন্ধানী
আমি চাই লুক্কায়ন, আমি চাই দুর্দান্ত জনতা।

হেথায় চিহ্নিত আমি, প্রতিপদে ফেরে গুপ্তচর,
নির্বাসিত, তবু শাস্তি, কভু নহি বিস্মৃত একাকী,
ফিরি হয় ঘরে-ঘরে মোর হাঁচি কাশির খবর,
আমি না নিন্দিত হলে এ সংসার একেবারে ফাঁকি।

কী আশ্চর্য আবিষ্কার লৌহবর্ত্মে আজো চলে ট্রেন।
তারি শব্দশিখা শুনে বাতি জেলে খুঁজি ক্যালেণ্ডার,
স্বপ্ন দেখি কোলকাতা জনতার সমুদ্র সফেন,
মগ্ন আমি, নগ্ন আমি, নির্মুখোস মানুষ আবার॥

১৩৪৭

রোমাঞ্চ

২

তখন অনেক রাত ফিরিতেছিলাম একা বাস-এ ঘাড় গুঁজে,
চর্মময় সর্বদেহে লেপে আছে ক্লেদক্লেশ স্থূল অবসাদ,
হঠাৎ চমক লেগে চেয়ে দেখি জ্বলিতেছে পূর্ণিমার চাঁদ
ডালহৌসি স্কোয়ারের কালো জলে জি-পি-ওর নিটোল গম্বুজে॥

অনেক রোমাঞ্চ আমি পাইয়াছি এ-জীবনে বহু অসময়ে,
অনেক ঝড়ের রাত্রে নিষ্প্রদীপ নিরুদ্দেশ দীর্ঘ পথ চলা—
জীবনে অনেক স্পন্দ আনিয়াছে নিরানন্দ বহু বিশৃঙ্খলা,
ভয়স্ফুট স্তব্ধ রাতে, অর্ধচ্যুত আলিঙ্গনে, অসিদ্ধ প্রণয়ে।

তারপরে এ রোমাঞ্চ। ইতিমধ্যে ক্লিশ্যমান যদিও অভ্যাসে
ক্ষয়ে' গেছে সব ধার, মুছে গেছে সব মোহ, ধুয়ে গেছে স্বাদ,
গণিকা-ক্ষণিক-স্নেহ—নাগরিক আকাশের অবান্তর চাঁদ
বহু দিন ব্যবধানে শিহরি তুলিল বুক ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাসে।

১৩৪৭

রোমাঞ্চ

ছোট্ট চিঠি লিখেছিলে, যেয়ো কিন্তু উমার বিয়েতে
ভিড়ে-ভাড়ে গোলমালে এক ফাঁকে দেখা হবে ঠিক
নিরিবিলি কোনো কোণে, বারান্দায়, কিম্বা ছাদে যেতে
তীর চক্ষে খুঁজে নিয়ো দ্রুত মোর চোখের ঝিলিক!
এটি কিম্বা ওটি বুঝি নাহি দেখি সে শাড়ির সীমা,
চোরা চোখে চিনে নিয়ে এই বুঝি চলে এলে কাছে
ও বুঝি তোমার ঢেউ এই বুঝি কটির ক্লশিমা
কখন না জানি আস ঘুরি-ফিরি আনাচে কানাচে।

বলো সেই পুরাতন রোমাঞ্চ কি আজো মোর নয়
ক্লিষ্টশ্বাস বসে আছি চোরা কুঠুরির এক কোণে,
নটার সময় ঠিক, বলে গেল হোটেলের বয়,
আসিবে মিসেস ধর, খবর দিয়েছে টেলিফোনে।
কখন না জানি আসে—সরীসৃপ-পিচ্ছিল শরীর
সমস্ত ধমনী তাই যন্ত্রণায় পেতে আছে ওৎ
হৃদয়ের ক্ষীণ পিণ্ডে শব্দ শুনি নির্বোধ ঘড়ির
সম্মুখে কাঁচের প্লাশে টলমল তিক্ত রক্তস্রোত॥

১৩৪৭

অচাক্ষুষ

এখন যখন হাতে আমার অনেক কাজ
সাবেক আর নতুন,
সংক্ষিপ্ত যখন রাত্রি
আর সংকীর্ণ যখন দিন,
উদাসীন, তুমি আসতে পারো।
এখন যখন একেবারে আমি নিঃসময়।

বিশ্বময় কোথাও কি নেই বিস্ময়?

দশটা বারো মিনিটে আসে ট্রেন—
সীমায় আবদ্ধ একটু চরিত্র চাঞ্চল্য
সীমায় আবদ্ধ একটু লুলিত স্তব্ধতা।
এগারোটা বত্রিশেও যদি সে আসে
দশটা বারো মিনিটেরই সে ট্রেন।

সব কি নেমে দাঁড়াবে সমতল অভ্যাসে?

তনুতরমধ্যা বাতায়নবাসিনী যে মেয়ে—
পলায়মান দিগন্তের সঙ্কেতে ধারালো,
চলে এলো সে ঘরের মধ্যে:
অসহিষ্ণু স্রোত গিয়ে দাঁড়ালো স্থবির সরোবরে!
শরীর কি শুধু মাংসের তামাসা?
সমস্ত মুখস্থ?
হীয়মান সূর্য, মিত্রয়মাণ কি তাই আশা?

প্রত্যহের সূর্য:
প্রত্যহের টাইম-পিসে দম-দেয়া।

তার পর, এখন যখন আমি মোটেই প্রস্তুত নই,
ডুবে আছি যখন কাজের বল্মীকে,
চতুর্দিকে দুয়ার-জানালা যখন খোলা,
অচাক্ষুষ, তুমি আসতে পারো।
হে দশদিঙ্মুখ মৃত্যু,
একমাত্র রোমাঞ্চ এখন তোমার সাম্মুখ্যে।

১৩৪৭

মুহূর্ত

হঠাৎ মুহূর্ত আসে
ক্ষণদ্যুতি বিদ্যুতের বিকাশে :
অতিশ্রমে যখন তন্দ্রা,
রাত্রি তখন সচন্দ্রা ।
মাংস যখন শিথিল,
রক্ত যখন নিস্পৃহ,
তখনই আকাশ থাকে আকর্পিল—
গুঞ্জন করে মধুলিহ ।

হঠাৎ মুহূর্ত আসে
ট্রামে আর বাস্-এ
উদ্‌ভ্রান্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে ;
তখন গ্রামের মাঠ ভরেছে গ্রীষ্মের ঘাসে ।
আর, গুহা সবল জলোচ্ছ্বাসে ।
কিম্বা যখন লুপ্ত আছি আপিসে
সই আর সুপারিশে,
আকাশ আকীরিত হচ্ছে পাখিদের শিসে ।
আসছে ভেসে বজ্রের স্বর
সঙ্গে বিদ্যুতের স্বাক্ষর ।
জেলে দ্বারপালের মতই ধূর্ত
এই সব মুহূর্ত ।

তখনই জয় করবার মুহূর্ত আসে বেহুদা,
যখন জঠরে জ্বলন্ত ক্ষুধা ;
তখনই খুলতে ডাক দেয় অর্গল
যখন স্কন্ধ আর বাহু বিমর্ষ, দুর্বল,
যখন চক্ষে পড়েছে ছানি,
তখনই পর্বতের হাতছানি ।

কিন্তু আসবে নাকি সে ধার্য সময়,
যখন তোমাতে আমাতে হবে অধৈর্য পরিচয় ?

যখন শরীরে জাগবে আহ্লাদ,
তখনই উঠবে চাঁদ,
জঙ্গলে ধানের আবাদ।
তখনই পাখার ঝাপটা দেবে পাখিরা
মৃতকাষ্ঠ অরণ্যে জাগবে চাঞ্চল্য,
যখন রক্তে বাজবে মৃত্যুর মন্দিরা
ভাবব না আর অদ্য কি কল্য।

তখন আসবে শুধু একটি একক মুহূর্ত
যখন ক্ষুদ্র শঙ্খের স্বরে সমুদ্র হবে প্রতিমূর্ত॥

১৩৪৯

দুই চক্ষু

আমাদের দুই চক্ষু খোলা,
দক্ষিণ স্ফটিকস্বচ্ছ বামচক্ষু ঘোলা।
কেবলি পল্বল নহে, নদী দেখি আবর্তচঞ্চলা।

রণস্থলে জ্যোৎস্না গলে, শ্মশানে সবুজ,
বাতাসে কেবল নহে বারুদ কার্তুজ
থেকে-থেকে ঘ্রাণে লাগে সুসভ্য সৌরভ।
এই দেহ নয় শুধু শব—
পূতিগন্ধ নয় শুধু পূতিগন্ধ এখনো সুলভ;

জীবনের নাটকের কুশীলব
নয় শুধু দুঃখ আর গ্লানি,
বসন্ত-নিশ্বাস আছে, নয় শুধু ঝড়ের শাসানি,
আর আছে, নীলাকাশ চিরন্তন সৌভাগ্যের মতো,
শূন্যবক্ষে কম্প্র আশা আছে তো অন্তত।

রক্তলিপ্ত এই যে আহব,
এ কি শুধু মৃত্যু দিয়া করিব লাঘব

প্রাণের কি রাখিব না স্থান ?
তার তরে কিছু স্বাস্থ্য কিছু দীপ্তি কিছু মনোহরণের গান
রাখিব না লিখে ?

যাহা কিছু পাই নাই কেবলি কি তাহার নিরিখে
কষিব এ বাঁচিবার দাম ?
আজ যদি ক্ষয়ক্ষীণ আছি ক্ষুধাক্ষাম,
দোষ তাতে আহার্য জিনিসে ?
অমৃত মেলেনি ব'লে ক্ষুধাশান্তি করিব কি বিষে ?
আজ যদি খিন্ন ম্লান রোগে দিন কাটে,
পারিপার্শ্ব-ঊর্ধ্ব বিশ্ব দেখিব কি হলুদ, ঘোলাটে ?
দ্বার আজি রুদ্ধ ব'লে বন্ধ নাহি হবে পরিকর,
বাম চক্ষু বাম ব'লে ভামহীন রবে বামেতর ?

ভুলিনা কাহারে,
কাহারেও অপমান করি না অশ্রেয় অস্বীকারে।
যুদ্ধের শিবিরে
ক্ষণ-রণ-বিরতির তীরে
মনে পড়ে গৃহস্পৃহ স্বপ্নলীন স্নিগ্ধ প্রেয়সীরে।
ঘাতমুখ তিক্ত রক্তক্ষর,
তাহাতে মোছে না তবু অশ্রুলেখ্য প্রেমের অক্ষর,
যেমন মোছে না ঝড়ে আকাশের স্থিতি।

প্রকৃত যা ঠিক থাকে, বদলায় পদ্ধতি-প্রকৃতি।
প্রকৃত দক্ষিণে তাই বামচক্ষে বিকৃত আসীন,
সৃষ্টি তাই স্পষ্ট সর্বাঙ্গীণ।
দুঃখের দহন সাথে আনন্দ-দোহন চলে তাই,
কাতর আর্তির কণ্ঠে উল্লাস-উজ্জ্বল গান গাই।
আনন্দ করি না অস্বীকার,
যেই হেতু এ আনন্দ মোদের প্রথম অধিকার।

আজ যদি ক্ষুধাখাদ্যে না থাকে সমতা
তবু না শুকায়ে দিব সুধাস্বাদ-গ্রহণ-ক্ষমতা।
যদি আজ রক্তে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে রোগের তাড়না,
তবুও রাখিব চোখে সম্ভোগ্য আরোগ্য-সম্ভাবনা।
অবার্য নিশ্ছিদ্র অন্ধকার
সঙ্কেতিবে নিশাবসানের অঙ্গীকার।

এক চক্ষু ঘনাচ্ছন্ন অন্য চক্ষু পরিচ্ছন্ন তাই ;
কোনো ভয় নাই,
আমাদেরো সমাসন্ন দিন—
বাম চক্ষু বাম তাই দক্ষিণ দক্ষিণ ॥

১৩৪৯

আমরা নিরস্ত্র নই, হাতে আছে শাণিত শায়ক
সমুদ্যত, অমোঘ লেখনী,
শল্য সে যে সকণ্টক, লক্ষ্যবেধী, যন্ত্রণাদায়ক,
নহে শুধু বিশল্যকরণী।

তোমার হাতুড়ি আছে, দুর্বিনীত অবাধ্য লোহারে
নিয়ে আস বক্র, নম্র বশে,
তোমার লাঙল আছে, হরিন্ময় হিরণ্য সম্ভারে
ছবি আঁকা মাটির নিকষে।

তেমনি লেখনী মোর, তার তপ্ত তীক্ষ্ণ তিক্ত মুখে
ক্ষয়হীন তেমনি ইস্পাত,
এতে নেই সেই স্বপ্ন ভাসে যাহা ভারশূন্য সুখে,
আছে এতে কঠিন সঙ্ঘাত।

উত্তর্স্বান বজ্রের ঘোষণা। অপাচিব এই ধার
কাটি' শুধু কাগজের ফুল ?
নির্জনে বিরলে ব'সে অন্ধকারে করি' স্তূপাকার
মমি আর মোমের পুতুল ?

ইস্পাত নিষ্ফল তবে। মৃত কাষ্ঠে কে আনিবে তবে
হব্যলোভী আগুনমন্থন ?
সমুদ্র-শাসন হবে কী কার্মুকে, কারে দিয়ে হবে
অচলিষ্ণু পাষাণ-ছেদন ?

সে আমার-তোমার লেখনী। আমাদের মহা দায়
বহি এই অজেয় পতাকা ;
আনিব নিদ্রিত বক্ষে বাঁচিবার তীব্র অভিপ্রায়
চক্ষে হানি' অঞ্জন-শলাকা

রক্তে আনি' দাহ চিতাগ্নির। যেমন সবল হল
ধন্য হয় শস্যের উদ্গমে,
তেমনি সমাজভূমে আমরাও ফলাবো ফসল
আমাদের সামান্য কলমে।

কুসুম-আয়ুধ নয় এ কলম, ইন্দ্রের অশনি,
আর গান নয় সৌবস্তিক,
রণস্থলে চলিয়াছি লেখনিক আমরা অগ্রণী
বলব্যগ্র সশস্ত্র সৈনিক ॥

১৩৪৯

সার্বজনীন

শুধু আমি রচি তার গান,
যে জীবন ক্লান্ত, পঙ্গু, ক্ষুধাক্লিষ্ট, ঘৃণ্য, মুহ্যমান ;
পাপলিপ্ত অঙ্গে যার লাগিয়াছে লালসার ধূলি,
যে-ললাট ছোঁয় নাই সেবামৃতসুস্নিগ্ধ অঙ্গুলি,
জীবনের দাবদাহে মিলে নাই যার স্নেহ-সন্ধ্যার সন্ধান,
রচিতেছি আমি তারি গান।

ধূলিরুক্ষ রাজপথে নিরাশ্রয় যারা পরিশ্রমী,
যুগ্মকরে তাহাদেরে নমি ;
মরণের স্নেহ যেন,—সর্ব অঙ্গে ঝরিতেছে স্বেদ,
জীবনে ঘুচালো যারা মৃত্যু আর মৃত্তিকার ভেদ,
শির পাতি' লয় যারা একচক্ষু বিধাতার অমোঘ কুঠার,
তাদের জানাই নমস্কার।

শুধু আমি রচি তারি গান,
জীবনের সম্পূর্ণতা যার মাত্র জীবনাবসান ;
এক মুষ্টি নিশ্বাসের প্রীতিহীন যে প্রতিযোগিতা
জীবযাত্রারথতলে বিরচিলো বিস্মৃতির চিতা,
বিধাতার বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি-চেয়ে মহত্তর যার পরাজয়,
তারি গানে যাপিনু সময়।

দিবালোকে তারাহীন রজনীর করে উপাসনা,—
বুঝিলাম তাদের বেদনা ;
যাহাদের প্রেমপদ্ম গন্ধহীন, নিত্য নিমীলিত,
সন্ধিৎসু সে-কামনার উল্কা যারা আকাশ-স্খলিত—
আপনার দীর্ঘশ্বাসে ক্ষীণ-আয়ু প্রতীক্ষার প্রদীপ নিবালো,
তারি তরে জ্বালিলাম আলো।

তারি তরে বেদনা ঘনায়,
অঙ্গের লাবণ্য যার উপমেয় প্রিয়ঙ্গুলতায়।
অনন্ত বিরহ সহে, তবু হায় অনন্ত বিস্মৃতি,
যে কখনো চিনিলো না লোকাতীত স্বপ্নের অতিথি,
তৃষ্ণাকায়া মরুচারী, ক্ষীণশিখা, ক্ষণস্থায়ী, অমূর্ত প্রতিমা,
তবু গাহি তাহারি মহিমা।

ধূলি যার জীবখাদ্য, অশ্রু যার বিষাক্ত পানীয়,
আমি কবি, আমি তার প্রিয়।
আমারে করেনি মুগ্ধ সমুদ্র বা নভ মনোরম,
কলঙ্কের কবি আমি ; সাথি মোর কণ্টক, কর্দম ;
সঙ্গীত শোনেনি যে ই, করিয়াছে ক্ষমাহীন, অক্ষম সংগ্রাম,
তারি তরে বাহু বাড়ালাম॥

১৩৩৯

প্রস্তুতি

প্রস্তুত আছি সর্বদা
শান্ত আর সহিষ্ণু।
হোক সূর্য তোমার ক্ষয়িষ্ণু
আর ক্ষয়হীন তোমার ক্ষণদা,
আমি আছি প্রস্তুত।
ধূমজ্যোতিসলিলমরুৎ
না হয়ে, যদি বলো হতে বীতঅম্লজান
নির্বাষ্প পাষাণ
স্খলৎশক্তিমান,
আমি রাজি আছি খসে পড়তে
মহাশূন্যের গর্তে।
যেমন তোমার পরিবেশ
তেমনি আমার উন্মেষ
হে অন্তরীক্ষ।

যদি বলো, দুর্ভিক্ষ,
অনাবৃষ্টি,
দিকে-দিকে দরিদ্রিত দগ্ধ দৃষ্টি,
আমি আনবো সেই হাহাকার
অ-হল্যা মৃত্তিকার;
তোমার না যদি হয় চক্ষুলজ্জা
সাজাবো শ্মশানশয্যা
স্তূপে-স্তূপে,
তোমার ধ্বংসের ধূপে
উড়বে না-হয় ধূমধ্বজা।
আমি যে ধরিত্রী
ছিলাম প্রাণের প্রসবিত্রী
হবো না-হয় অপ্রজা।
যেমন তোমার বেষ্টনী
তেমনি আমার প্রতিধ্বনি
হে প্রশস্য।

যদি বলো, মুছে ফেলতে এ বৈরস্য,
ফলাবো না-হয় শস্য
উদ্দাম শ্রাবণের স্ফূর্তি
শ্যামল পরিপূর্তি,
গোলায়-গোলায় ধান
অজস্র ও অসাবধান।
আনবো তখন না হয় গদ্গদ চাঁদের অভিলাষ
আত্মহারা আকাশ,
নিস্তস্কর ঘুমের প্রশান্তি।
প্রাক্তন সূর্যের শেষ হবে অয়নক্রান্তি।

আমার এই স্ফীতি বা কার্শ্য
যেমন তোমার পরিপার্শ্ব,
হে অবার্য উপস্থিতি।

নাও আমার এই প্রত্যহের স্তুতি,
প্রসন্ন প্রস্তুতি॥

১৩৫১

বসন্ত

জড়ের পঞ্জরতলে বাজে কার নির্ভুল মুরলী
প্রচুর প্রগাঢ় পূর্ণে দশ দিক উঠেছে উজলি।
সত্তার গভীরে ছিল যে কুণ্ঠিত ভীরু সম্ভাবনা
কুণ্ডলী ছেড়েছে, ঊর্ধ্বে তোলে তার চেতনার ফণা
জীবন জীবন-উজ্জীবন
শুষ্ক কাষ্ঠে মঞ্জরী-রঞ্জন,
প্রতপ্ত প্রসন্ন মুক্ত প্রাণের নির্ঝরে স্নান হবে
মাতো সবে বসন্ত উৎসবে॥

১৩৫২

রবীন্দ্রনাথ

মার্তণ্ড সহেনা চক্ষে, নভস্থল অতি অনান্তিক,
দৃষ্টিরে ব্যাহত করে অভ্রলিহ পর্বতের চূড়া—
ছোট ঘরে সন্ধ্যাবেলা তাই সব বসেছি বন্ধুরা
তোমারে বিদায় দিতে, বামমার্গী মোরা সাম্প্রতিক।
পলায়ন-মনোভাবী কাব্য তব অসার অলীক
প্রকৃতির আরত্রিক শুধু, কদাচ তোমার দ্বারা
আলোচিত হয় নাই প্রত্যহের জৈব সমস্যারা
চেতনায় একা তুমি, দলবন্ধ নহ ঐকত্রিক।

হা অধুনা! অচিরজীবিনী! যত করি মাধুকরী,
অনির্বেয় আত্মার পিপাসু। ঘুরে-ঘুরে যায় চাকা
কালের আলোড়ে। কিন্তু আকাশ মোছেনা কভু ঝড়ে।
তাই শেষে একদিন রাশি-রাশি শব্দের লহরে
অন্যত্রের বার্তা আনে বেগবান বিদ্যুৎ-বলাকা,
নদীর এপারে আসে ধান্যভরা ক্ষুদ্র স্বর্ণতরী॥

১৩৪৮

সংগ্রাম

জয়ের জন্য গ্রাহ্য করি না
ফলকে মানিনা দামী,
আদ্যোপান্ত এই আনন্দ
আমরা যে সংগ্রামী॥

রবীন্দ্রনাথ

তোমারো বিশেষ সংখ্যা ! সব যেন শেষ এর পর
সব যেন অতি সাধারণ !
দিবালোকে দীপাবলি ! প্রতিদ্বন্দ্ব চলে পরস্পর
কার কত আরণ্যরোদন ।

আয়োজন প্রয়োজনহীন । এই যে কবিতা আমি
লিখি, বহি ভাবের বেদনা,
এই যে কল্পনা মোর বিবন্ধনা সীমান্তরগামী
এ তো শুধু তোমার প্রেষণা ।

এ তো শুধু তোমার নির্মাণ । যাহা কিছু বলি, ভাবি,
তোমারি সে নাম-উচ্চারণ ;
আমাদের মুখপানে চেয়ে আছে আকাশ মায়াবী
স্নেহস্রাবী এ তব নয়ন ।

এই যে রজনী যাপি দীর্ঘতমা, কে দিয়েছে বল,
কে দিয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী আশা ?
অনাগত ঊষালোকে খুলে দিবে তিমির-অর্গল
কার সেই বাণীর বিভাসা ?

চিত্ত মোর ভয়হীন, কার ডাকে উচ্চ মোর শির
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট ?
সাজায়েছ বীরসাজে, দিয়েছ যে কার্মুক-তুণীর
বক্ষোপরি আয়স-কঙ্কট ।

তুমি আজ বীত বহ্নি, মোরা তব ভস্ম-অবশেষ,
আছে তবু কুসুমসময়—
সৃষ্টির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে স্থাপিয়াছ যে উপনিবেশ
তারি মাঝে তোমারি উদয় ॥

১৩৪৮

জলধর সেন

চারিদিকে রূঢ় রৌদ্র রুদ্ধশ্বাস প্রখর প্রহর
ঘূর্ণ্যমান দিন-রাত্রি মিয়মাণ মুহূর্তের ভিড়
তার মাঝে দেখিলাম শ্যামসৌম্য স্নিগ্ধ জলধর
পূর্ণতা-প্রশান্ত-কান্তি, উদ্বেলিত, উদাত্ত গম্ভীর।
প্রসারিত পক্ষপুটে আনিয়াছ বিস্তীর্ণ মমতা
ধূলিরুক্ষ ধরণীরে করিয়াছ সুরভি-শোভন
তব দীর্ঘ উপস্থিতি পরিপ্লাবী আর্দ্র পবিত্রতা
যেখানে রেখেছ হাত সেইখানে এনেছ জীবন।

বন্ধুতা-সিঞ্চিত স্পর্শ, শুধু নহে পিপাসার জল
মরুর ললাটতটে নহে শুধু সান্ত্বনার মোহ,
তোমার মদির মন্ত্রে মৃত বন রোমাঞ্চ-চঞ্চল
কঙ্কর-আকীর্ণ পথে তৃণাঙ্কুর-প্রাণ-সমারোহ!
কঙ্কাল লভেছে কায়া, কুসুমিত হয়েছে শ্মশান
জীবনের জয়োৎসবে দিকে-দিকে দীপ্ত অভিযান॥

১৩৪৬

শরৎচন্দ্র

অনেক অনেক কথা গদ্যে-পদ্যে বলিবে এখন:
নাটকে-নভেলে-ফিল্মে তুমি ছিলে সকলের সেরা,
বেরুবে শরৎ-সংখ্যা—খেয়ালী-দীপালি-বাতায়ন,
কাঁদিবে অনেক ছাত্র, কোলাহল করিবে মেয়েরা।

সভা হবে বহুখানে, পাটনায় বহরমপুরে,
প্রফেসর-চক্ষু হতে বিগলিবে মামুলি বেদনা:
কখানা বিস্কুট খেত দিনে-রাতে তোমার কুকুরে
এই মতো হবে জানি সূক্ষ্ম-স্থূল বহু গবেষণা।

কী বিচিত্র শোভাযাত্রা—ইন্দ্রনাথ, বেণী, দেবদাস,
সাবিত্রী, অভয়া, রমা সভাস্থলে দাঁড়াইবে নমি',
খোঁড়া পায়ে সব্যসাচী দিগ্বিদিকে জাগাবে সন্ত্রাস,
আসিবে নতুন-দাদা, জলপথে টগর বোষ্টমি।

নিস্তব্ধ সংকীর্ণ শীর্ণ আতঙ্কিত অন্ধকার গলি—
শীতার্ত নাগিনী যেন লুকায়েছে ইঁটের প্রাচীরে,
দুয়ারে বাজিল কড়া, কুপি হ'তে ধোঁয়ার কুণ্ডলী—
আমি শুধু দেখিতেছি পাপীয়সী কিরণময়ীরে।

সেই শিখা, সেই জ্বালা, ললাটে সে ভয়াল সিঁদুর
তাম্বুল-আলিপ্ত সেই জর-জর তপ্ত ওষ্ঠাধর,
উদ্বেলিত তুঙ্গবক্ষে ফেনময় তরঙ্গ ভঙ্গুর—
দুটি মাত্র চক্ষুপাতে তোমারে সে করেছে অমর।

তুলসীতলায় রমা জ্বালে জানি বাতি চুপি-চুপি,
সুরেশ পোড়ায় জানি বহু মূর্খ মহিমের ঘর,
কিন্তু সে অপরিচ্ছন্ন ক্লেদাক্লিন্ন ধূম্রময় কুপি
দেখি নাই কোনোদিন এত তীব্র, এমন ভাস্বর॥

১৩৪৫

শরৎচন্দ্র

শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিব দূর হ'তে—এই ভেবে ধরিনু লেখনী
নিরানন্দ, ছন্দোহীন : অকস্মাৎ দুয়ারে কাহার করধ্বনি!
কে আসিল বর্ষাশেষে, ভাদ্রের সংক্রান্তি-লগ্নে,—খুলে দিনু দ্বার,
কি অমৃত তরঙ্গিনী! ভীরু কণ্ঠ উচ্চারিল : 'তুমি? চমৎকার!'
আকাশের দূর চন্দ্র মূর্ত আজি মোর আঁখি-তারকার কাছে,
নাহিক মহার্ঘ অর্ঘ্য, কবিতা কুণ্ঠিতা অতি—কি বা মোর আছে!

কিছু নাই। অসম্পূর্ণ মাল্য বৃথা। আসিলে মর্মের কাছাকাছি
সন্তর্পণে। 'কিছু নাই?' ফুকারিলে স্নিগ্ধস্বরে: 'তাই আসিয়াছি।'
রিক্ততার বিত্ত ল'য়ে দাঁড়াইলে স্বল্প, শীর্ণ, সুমধুর হেসে,
তৃপ্তিকর করস্পর্শে সম্ভাষিলে বন্ধুর মতন ভালোবেসে।
নিভৃত নৈকট্য মাঝে অনন্ত মাধুর্যরস—এত ভালো লাগা,
বন্ধুতায় মিশাইলে সুস্নিগ্ধ সোহাগ যেন সোনায় সোহাগা।

নভে শুভ্র অভ্রমালা, উড়ে চলে শুক্লপক্ষ চঞ্চল বলাকা,
কাশের কাননপথে লাজুক বঙ্কিম নদী দিয়াছে গা-ঢাকা
অর্ধস্ফুটফেনা। দূরে কৃষকের কুটিরের কুণ্ঠিত বাতিটি
জ্বলিতেছে ইন্দুপাণ্ডু কিশোরীর হৃদয়ের মত। কা'র চিঠি
পড়িয়াছি, কা'র মন্দ্র মৃত্যুহীন অন্তরে তুলেছে প্রতিধ্বনি,
বল্লরীবেষ্টিত পল্লীপ্রান্তরের পারে কা'র আলাপী চাহনি!
মনে পড়ে প্রিয়াহীন নির্জন নিস্তব্ধ গৃহে নিঃসঙ্গ 'রোহিণী'
নিবিষ্ট রন্ধন কার্যে; তপস্যাবিশীর্ণ-কান্তি কোথা বিরহিণী
সুনির্ভয়া সে-'অভয়া'? ভালে তার জ্বলে নাকি সতীত্ব-সিঁদুর?
মরণের পরেও কি 'বিরাজের' মুখখানি ম্লান, বিপাণ্ডুর?
কুলিশকঠোরব্রতচারিণী অপর্ণা সেই—প্রেমের মন্দিরে
নিত্যকাল কাব্যলক্ষ্মী—ভুলি নাই, ভুলি নাই সে-'রাজলক্ষ্মীরে'।
মানুষেরে দেখিলাম কত বড় অনাত্মীয় দেবতার চেয়ে।
'সাবিত্রী' সে দেবী নয়, মলিনা মমতাময়ী মানুষীর মেয়ে।
যিনি ভানু, অমর্ত্য কৃশানু, তিনি থাকুন সোনার সিংহাসনে
কীর্তিমান। তুমি এস গঙ্গার মাঙ্গল্যপূত বঙ্গের অঙ্গনে,
সন্ধ্যামল্লিকার গন্ধে, ঘনবনবেতসের নিভৃত ছায়ায়
নম্রমুখী তুলসীর শ্যামশ্রীতে,—এসেছ নদীর গেরুয়ায়!
বঙ্গের মাটির মত সুশীতল চিত্ত তব, তবু অনির্বাণ
জ্বলে সেথা দুঃখ-শিখা, সে আগুনে নিজেরে করেছ রূপবান।
তোমার সে-প্রশ্ন আজো মর্মে বাজে: 'বেঁচে বলো আছ কার তরে?'
সবিস্ময়ে শুনি আজ জীবন মুখর তব তাহারি উত্তরে॥

১৩৩৬

সব যাওয়াই এগিয়ে যাওয়া

যেন কী একটা নির্ঘাৎ ঘটবে,
কী একটা না জানি ঘ'টে যাবে এক্ষুনি,
কিম্বা হয়তো ঘ'টে গেছে কোথাও—
তাই সবাই চলেছে ছুটে
উন্মত্ত হয়ে, প্রাণভয়ে, প্রাণপণে,
বাসে-ট্রামে মোটরে-স্কুটারে ভ্যানে-লরিতে
সাইকেলে-রিকশায়,
কেউ বা ঊর্ধ্বশ্বাস পায়ে হেঁটে,
যেন গলায় ঘণ্টা-বাঁধা মোষের তাড়া খেয়েছে
তাই ছুটছে আর ছুটছে
ঢুকছে আর বেরুচ্ছে, বেরুচ্ছে আর ঢুকছে
আপিসে-আদালতে বাজারে-দোকানে
সিনেমায়-থিয়েটারে হোটেলে-সেলুনে
মাঠে-ময়দানে একজিবিশনে
নাচে-গানে, ফুর্তির আসরে, কালীবাড়িতে
ঘোড়দৌড়ে, হরিসভায়
দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা
লাইন দিয়েছে মিছিলে
কখনো বা ছত্রখান হয়ে ছুটছে
বিরক্ত অতৃপ্ত সন্দিগ্ধ অস্থির
বীতস্বপ্ন উদ্ভ্রান্ত মানুষের দল—
যেন কী একটা ভয়ানক কিছু ঘটবে
ঘ'টে যাবে এক্ষুনি—
ভূমিকম্প না জলোচ্ছ্বাস না কি অগ্নিদাহ
না কি যুদ্ধ না বোমা না ধূমকেতু
না কি গ্রহে-গ্রহে কলিশন—
প্রশ্নোত্তরের সময় নেই,
সবাই জানে, সবাই বুঝে নিয়েছে
তাই চোখে মুখে সর্বনাশের বিভীষিকা নিয়ে

ঘরপোড়া গরুর মত ছুটছে আথেব্যথে
যেন সামনেই অনিবার্য ধ্বংস
অতল গহ্বর-গ্রাস
সবার চোখে-মুখে তারই সন্ত্রস্ত যন্ত্রণা।
অন্ধ বা চক্ষুষ্মান
সবাই চলেছে সেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে।
ধ্বংসের দিকে চলাটাও তাই এগিয়ে যাওয়া
চরৈবেতি—
এগিয়ে যাওয়া ছাড়া যাওয়া নেই,
সব যাওয়াই এগিয়ে যাওয়া ॥

১৩৪৯

পিপাসা

সরসী সমীপে কেন
ব্যস্ত হয়ে বৃথা ছুটে আসা,
জল দিয়ে কী করিবে
যদি তব না জাগে পিপাসা ?

জনগণ

অগণন জনগণ
জনগণ অগণন
হল আর হাল, কাস্তে-কোদাল
খুরপি ও রেক, মই ও জোয়াল
সব একসাথে, হাত দিয়ে হাতে
চলিয়াছে অবারণ,
অশাসন হুতাশন
অগণন জনগণ।

জনবল জলবল
গিরিচূড়া টলমল
মুটে ও মজুর, জুজু ও হুজুর
শ্বেত পাথরের মেঝে ও মাদুর,
স্বর্ণের গুঁড়া আর খুদকুঁড়া
সব আজ সমতল
জগদল বেদখল
জলবল জনবল।

বরাবর যাযাবর
চলে জন-অজগর
কুমোর কামার, ছুতোর চামার
দরজি ও তাঁতি, খেতি ও খামার
ধুনুরী চুনুরী, বাটালি হাতুড়ি
জীবনের কারিকর,
নভে এক দিবাকর,
সমঘর আপামর।

অগণন জনগণ
অনটন অনশন।
সব করে ভিড়, ফতুর-ফকির।
সব ধমনীতে সমান রুধির
ঝরা আর পড়া তাই দিয়ে গড়া
নবতন আয়তন
অঘটন প্রকটন
জনগণ, জনগণ॥

১৩৫০

দৃষ্টি-কোণ

শীতে জর্জর কাঁথাখানি ছেঁড়া আঁচটুকু জ্বলে ধিমা
তুষাররাত্রে নাহি দেখা যায় অরুণী উষার সীমা।
সবটা আগুন যায়নি তবুও নিভে
লিখছ যদিও ফাটা আর ভোঁতা নিবে
ঠিক রেখো শুধু শ্যেনচক্ষুর দৃষ্টির ভঙ্গিমা।

উথলপাথল জোয়ারের জল এলোমেলো দিশপাশ
ঠিক থাকে যেন কম্প্র বুকের নির্ভীক কম্পাস।
ভিক্ষার ধান মিলছেনা দুই মুঠো
ভিক্ষার ফল এই দুই হাত ঠুঁটো
শপথের মতো তবু বুকে রেখো বিপথের বিশ্বাস।

কণ্ঠ নীরব কর্ম মলিন হয় হোক বিচ্যুতি
দৃষ্টিভঙ্গির জোরেই রচিবে নবজীবনের স্তুতি।
বিপক্ষীয়েরা যেই যত বীর হোন
হারিয়ো না যেন দেখার অগ্নি-কোণ,
সেই আগুনেই রয়েছে অমল সৃষ্টি-প্রতিশ্রুতি॥

১৩৫০

মহাত্মা গান্ধী

চাম-মেদ-মাস কিছুই দেখি না
আমি শুধু দেখি হাড়,
সংহারশেষে আনিল যা দেশে
নব উপসংহার।
এই শাদা হাড়ে জানি একদিন
বজ্র তৈরি হয়েছে কঠিন
মৃত অঙ্গারে জ্বলেছে অগ্নি-
শিখার অঙ্গীকার।

সেই হাড় আজ দণ্ড হয়েছে
কুহককরের হাতে,
ভয় নেই বলি উঠিয়া দাঁড়াল
যে ছিল অধঃপাতে।
যেই মরা কাঠে ধরেছিল ঘুণ
সেখানে জাগিছে পত্র-প্রসূন
মরুপ্রান্তরে নেমেছে বর্ষা
মেঘের অসাক্ষাতে।

যে হাড়ে কুলিশ সে হাড়ে কুহক
এ কী সে ইন্দ্রজাল!
নগ্নচরণে চলে ঘরে-ঘরে
ভারতের ভূমিপাল।
সোনা হয়ে যায় যা ছিল সিকতা,
পশুর মাঝারে জাগিছে দেবতা,
অস্তায়মান সূর্য আনিছে
প্রভাতের প্রাক্কাল॥

১৩৫৪

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু

আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন মহাত্মা।
নিরীহ মফস্বলের নির্জীব রাত্রে কানে এসে পেঁছুলো
দুঃশ্রব দুঃসংবাদ।
এ কি বিশ্বাস করবার মত? এ কি আয়ত্ত করবার?
মহাচ্ছায় বনস্পতি কি নিমেষে উন্মূলিত হবে
বাতুল বাত্যার অভিঘাতে?
নিবাতনিষ্কম্প অভ্রান্ত অর্চি কি নির্বাপিত হবে
আকস্মিক ফুৎকারে?
এক নিশ্বাসে শুকিয়ে যাবে কি সেই সরসসুন্দর নির্মল স্নেহসিন্ধু?
যোগসিংহাসন ছেড়ে মহাপ্রয়াণ করবেন কি

মহাযোগী মহারাজ—
ভারতের সারনাথ ?
বিশ্বাস করতে পারিনা। কে পারে বিশ্বাস করতে ?
বন্ধুহীনের যে বন্ধু,
নিঃস্বজনের যে আশ্রয়,
গৃহহীনের যে আচ্ছাদন,
সঙ্গীহীনের যে শরণাগতপালক—
অবিঘ্ন ও অকপট, মুক্ত ও ছলশূন্য
অপাপ অকাম অকোপ অখেদ
পুণ্যপুঞ্জতীর্থজলনিধি—
তাঁর উপর হানবে কে আগ্নেয় আঘাত,
কার হবে এই বর্বর বিরুদ্ধতা ?

জেনে রাখো, কে সেই হত্যাকারী।
তাঁরই স্বদেশবাসী—
যে দেশকে তিনি পদদলিত পথধূলি থেকে
নিয়ে এসেছেন সুবর্ণসৌধশীর্ষে :

তাঁরই স্বধর্মাশ্রয়ী—
যে ধর্মকে তিনি মার্জিত করেছেন
আচারের আবিল আবর্জনা থেকে।
প্রার্থনাপিপাসু চিত্তে
কাতর জনতার সম্মুখীন হচ্ছেন
সমাধিনিষ্ঠ সাধনায়,
অমনি নিক্ষিপ্ত হল ঘাতকের অস্ত্র
নিবুদ্ধি নির্দয়।
এ ঘাতককে প্রেরণ করেছে চক্রান্তকারী ইতিহাসের বক্রতা,
নির্মাণ করেছে জিঘাংসাজর্জর জগৎনাট্যের কালকূট।

জানতে চাইনা।
জানতে চাই সেই ঘাতসহকে,
সেই অঘাতনীয়কে।
যার অভাবে ধরণী ভারভ্রষ্ট হল সেই ধরণীধরকে।
প্রশ্ন করি, এই কি সেই মহৎ পর্যটনের যাত্রাশেষ ?
এই কি সেই মহৎ পরীষ্টির উদ্‌যাপন ?
এই কি নিয়তিনির্ধার ?

অহিংসার ব্রতধারী বলি হবেন হিংসার যূপমূলে ?
বিদ্বেষবিষে পঙ্কাহত হবে মানবপ্রেমের আলিঙ্গন ?

তুচ্ছ তৃণখণ্ডও নড়েনা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া,
বৃন্তচ্যুত হয়না সামান্য জীর্ণ পত্র,
প্রস্ফুটিত হয়না বিজন সমুদ্রের সুদূর ফেনবুদ্বুদ :
মেঘের গায়ে যে অলক্ষিত লেখা ফোটে
শিশুর মুখে যে অহেতুক হাসি
পাখির কণ্ঠে যে অকারণ কাকলি—
সব সেই ঈশ্বর-ইচ্ছায়—
বিশ্বাস করতেন মহাত্মা !
তাই, এই ভয়াবহ মৃত্যুও কি ঈশ্বরসমর্থিত ?
এ মৃত্যুকে প্রেরণ করেছে কি ইতিহাসের রথচালক,
নির্মাণ করেছে কি জগৎনাট্যের গ্রন্থকার ?

একশো তিরিশ বছর বাঁচতেন নাকি মহাত্মা
তারপরেও তাঁর জীবন একদিন অবসান হত—
হয়তো বা দুঃসহ রোগে, নিঃসহ জরায়,
হয়তো বা আত্মঘাতী অনশনে।
সে মৃত্যুর চেয়ে এ মৃত্যু কি মহনীয় নয় ?
জ্যোতির্ময় নয় ?
নয় কি অর্থান্বিত ও সমীচীন ?
এ বীরের মৃত্যু, তপস্বীর মৃত্যু,
মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করার অস্বীকার করার
পরাভূত করার মৃত্যু।
মহাভারতের মহালাভের পর মৌন মহাপ্রস্থান।
এ দধীচির মৃত্যু—
অস্থায়ী অস্থি-র চিতাগ্নিতে সুচিরজীবিনী দীধিতি।
আমাদের চারিদিকে শব্দহীন সান্দ্র অন্ধকার—
তার মাঝে জ্বলবে এই স্থির শিখা, অক্ষুণ্ণ বিভাসা,
কল্যাণ-আলয়ে স্নিগ্ধ আশ্বাসের মত।

যা বলহীনের বরাভয়,
অশরণের আচ্ছাদন,
নাথহীনের তনুত্রাণ।
অবিশ্বাসীর আস্তিক্য-আরাম,
যুযুধানের সামবাণী।
মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষার প্রতিভাস।
ইতিহাসের যে পৃষ্ঠা রঞ্জিত হল তাঁর রক্তে
তার পরেই হয়তো শুভ্রতার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছেদ
অবৈরিতার শুভারম্ভ।
এই মৃত্যু তাই তাঁর সাধনার সারবিন্দু,
যথার্থ ও যথাকালীন।
এ মৃত্যু তাঁর জীবনশ্লোকের প্রকৃত ভাষ্যকার।
এ মৃত্যু ছাড়া উদ্ঘাটিত হত না তাঁর
জীবনবহনের চূড়ান্ত মহিমা,
সম্পূর্ণ হত না তাঁর জয়গাথার শেষ চরণ।

কে জানে—

প্রায় দু হাজার বৎসর আগে
এমনি করে মেরেছিল আরেকজনকে
তাঁরই স্বদেশবাসীরা।
তারা কিন্তু আজও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে
অভিশপ্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
খুজে পাচ্ছেনা তাদের দেশ, তাদের স্থান, তাদের আশ্রয়।
আমরাও কি অতঃপর অমনি করে
দেশহারা স্থানহারা আশ্রয়হারা হয়ে ঘুরে বেড়াব ?
না, চিরন্তন-সম্মুখবর্তী বর্তিকায়
খুঁজে পাব আমাদের মন্ত্রসিদ্ধির সরণি ?

১৩৫৪

ভারতবর্ষ

আসমুদ্রহিমাচল
হে আমার অখণ্ড-অটুট সর্বাঙ্গসুন্দর ভারতবর্ষ,
জীবনের মধ্যদিনে এসে
আর একবার দেখে নিই তোমাকে।
শিয়রে দুর্ধর্ষ পর্বত,
পার্শ্বে-নিম্নে সংঘবদ্ধ সমুদ্রের আবৃতি,
আর আদ্যোপান্ত ধূসর-প্রসর প্রান্তরের অন্তহীনতা।
—অঘাতনীয়, অলঙ্ঘনীয় ভারতবর্ষ।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কুলপঞ্জীতে তুমি অনন্যনামধেয়,
স্বনামপ্রশস্ত—
ভূগোলে ও ইতিহাসে শ্রৌতে ও ঐতিহ্যে
কুলক্রমাগত সংস্কৃতিতে
অধ্যাত্মসন্ধানে
বন্ধনছেদন ও শোষণশোধনের সাধনায়
সমর্থ হবার, বিশাল হবার, মহান হবার প্রতিশ্রুতিতে
তুমি এক ও অবিভাজ্য।
তুমি বিবিধের মধ্যে বিশেষ, বহুলের মধ্যে বিরল,
বিচিত্রের মধ্যে অনির্বচনীয়।
তোমাকে নিয়ে কত মহাকাব্যকারের স্বপ্ন,
কত দুর্দান্ত সৈনিকের নিরস্ত্র ও নিরবশেষ সংগ্রাম
কত তপস্বীর সুদূর-দুর্গম তীর্থযাত্রা—
আহিত অগ্নিতে অরণির নিমন্ত্রণ।
যত গীতগাথা যত ললিত-কণিত-কলা
যত ভাস্কর্য আর সৌধশিল্প
যত নিঃসহায় অশ্রু আর উত্তপ্ত রক্তস্রোত
কারান্তরালে যত কালরাত্রির উদ্‌যাপন
মহান সে মরীচিমালীর প্রতীক্ষায়—
সব, তুমি এক ব'লে, অবিচ্ছেদ্য ব'লে
আশিরপদনখ অব্যাহত ব'লে।
হে আমার স্বপ্নের ও ভাবের
ধ্যানের ও প্রত্যাশার ভারতবর্ষ!

হে বাত্যাবিহারী উদ্দাম বিহঙ্গম,
কুটিল চক্রের কৌশলে আজ তুমি ছিন্নপক্ষ
নিম্ননিক্ষিপ্ত।
কিন্তু, চেয়ে দেখ, তুমি আকাশচ্যুত হলেও
মুছে যায়নি তোমার আকাশ,
আজও সে অক্ষুণ্ণ, অভ্রান্তলক্ষ্য।
সংকুচিত হয়নি তোমার ধাবন-বিহরণের পরিধি।
কুটিল চক্রের কৌশলে বেধেছে আজ সংকীর্ণ স্বার্থের সংঘাত
রাজ্যলোভী মধ্যবিত্ত গৃধ্নুতা
ক্ষমাক্ষান্তিহীন নখরদংষ্ট্রার উদ্ঘাটন;
খণ্ডে-খণ্ডে বণ্টন-কণ্টকিত ব্যূহ-বেষ্টনীর চাতুরী
প্রাচীরের তলে সর্বনাশের পরিখা।
কিন্তু তুমি তো জানো, আপদ্ধর্মের চেয়ে
বড় হচ্ছে আপামর-সাধারণের ধর্ম,
সবার উপরে হচ্ছে মানুষ,
মনুষ্যত্বের আবেদন।
তাই চক্রনেমিক্রমে একদিন কূট-কোটর থেকে বেরিয়ে পড়বে জানি,
অগণন সেই মানুষের নিঃসৃতি—
পতিত-দুঃস্থিত স্খলিত-গলিত অধম-অধোগত
অবর-অবনত শৃঙ্খলীকৃত জনতা—
অপ্রতিরোধ্য অনন্তবীর্যের বাহিনী।
বেরিয়ে পড়বে ঐকরাজ্যের প্রতিষ্ঠায়
সকল চক্রান্তের ঊর্ধ্বে সফল চক্রবর্তিত্বে।
সেই উদ্বেল-উত্তাল জন-গণ-জল-বন্যার আঘাতে
কোথায় থাকবে তোমার সেই প্রাচীর-পরিখা
ব্যূহ-বন্ধনের ব্যবধান।
কোথায় যাবে তোমার সেই দেহরক্ষী দ্বারপালের দল।
তুমি আবার করবে তীর্থযাত্রা
মানবতার লুপ্তোদ্ধারে
সুভ্রাতৃত্বের সংস্থাপনে।
জন-পদচিহ্ন মুছে যাবে ক্ষীণ-অঙ্ক সীমারেখা
সমস্বামিত্বের প্রয়োজনে।
আবার তুমি এক ও একীকৃত।

হে আমার ভবিষ্যমান ভারতবর্ষ,
ক্ষয়ের অযোগ্য স্বর্গলোক,
দেখি আজ আবার তোমার সেই আগামী দিনের মহিমা।
তোমার সেই প্রত্যাশা-প্রস্ফুট সম্ভাব্যতা
ভাবরূপ থেকে তুমি আবির্ভূত হবে বাস্তবে
সত্যস্বপ্নের স্পষ্টতায়।
হে বিস্তীর্যমান ভারতবর্ষ,
আজ থেকে আমরা তোমার বাস্তবরূপের স্তবকার॥

১৩৫৫

দিক

কয় দিক আছে? দশ দিক, তবু
জবাব হলনা ঠিক,
এক দিক শুধু আছে, নাম তার
তোমার দেশের দিক॥

স্বাধীনতা

চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছি না :
আমার প্রকাশ্য গৃহচূড়ে উড়ছে আমার স্বদেশের পতাকা—
তিমিরমুক্ত অম্বরের অভিমুখে
উত্থিত হচ্ছে আমার নিরুদ্ধ আত্মার প্রথম উদার সম্ভাষণ
আমার জন্মের প্রথম জয়ঘোষণা।
এক প্রান্তে গম্ভীর গৈরিক
অনপনেয় দুঃখের ঔদাস্য আর অপরিমেয় ত্যাগের প্রসন্নতা;
অন্য প্রান্তে উল্লাস-উজ্জ্বল সবুজের অপর্যাপ্তি

অমিত জীবনের সৃজনসৌন্দর্যের উদ্ভাসন ;
মধ্যস্থলে তুষারসংকাশা শুভ্রতা
কর্মের নির্মলতা ও অনবদ্য অন্তরমাধুর্যের প্রতীতি।
আর সেই শুভ্রতার অন্তরে ঘননীল অশোকচক্র,
সমস্ত অলাতচক্রের উর্ধ্বে
শান্তির স্থির বাণী
দিকে-দিকে দেশে-দেশে মৈত্রীর আমন্ত্রণ ;
শোকশূন্য সময়ের ঘূর্ণ্যমানতার প্রতীক
বর্তমান থেকে বৃহত্তর ভবিষ্যতের
মহত্তর সম্ভাবনায় নিয়ত আবর্তিত
উড়ছে আমার ধ্রুব বিশ্বাসের ধ্বজপট
আমার বীজমন্ত্রের বৈজয়ন্তী।

কত দুর্গম পর্বত ও কত কণ্টকক্লেশিত অরণ্য পার হয়ে
কত দুঃসহ দুর্যোগের মধ্য দিয়ে
অভ্রান্তলক্ষ্যে চলে এসেছ তোমরা,
দৃঢ় হাতে বহন করে এনেছ এই পতাকাকে।
কত রোষকষায়িত কশা, কত বলদর্পিত বুট
কত বর্বর বুলেট
ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে তোমাদের,
কিন্তু বজ্রমুষ্টি শিথিল করতে পারেনি,
স্খলিত করতে পারেনি তোমাদের পতাকার উদ্ধৃতি,
নমিত করতে পারেনি তোমাদের দুষ্পরাজেয় প্রতিজ্ঞা।
মায়ের বুকে সন্তানের মত
পক্ষীচঞ্চুপুটে তৃণখণ্ডের মত
বারুদের বুকে বহ্নিকণার প্রত্যাশার মত
বহন করে এনেছ এই পতাকা
যাতে আমি প্রোথিত করতে পারি আমার প্রকাশ্য গৃহচূড়ে।
নবীনারম্ভের নিশ্বাসে বিস্তার করতে পারি বুক,
উজ্জ্বল উপলব্ধিতে উদ্ধত করতে পারি মেরুদণ্ড।

লেখনীকে বিশ্বাস করতে পারছি না
যা আমি আজ লিখছি এই মুহূর্তে

কত বাক্য রুদ্ধ হয়ে গেছে তোমাদের কণ্ঠে
দলিত হয়েছে কত অরুন্তুদ আর্তনাদ
স্তব্ধ হয়েছে কত বঞ্চিত বুকে দ্রোহবাণী।
সত্যভাষের সেই অধিকারকে তবু বিধ্বস্ত হতে দাওনি;
বহন করে এনেছ এই পতাকা
এই উদাত্ত বীরবার্তা ;
তন্দ্রিত আকাশে মুক্ত করে দিয়েছ
সিতপক্ষ কলহংসের কাকলি,
যাতে আমি পেতে পারি আমার ভাষা
লেখনীতে অপরাঙ্মুখ তীক্ষ্ণতা।

তাই আজ এই পতাকাকে যখন প্রণাম করি
প্রণাম করি তোমাদের দুর্জয় বীর্যবত্তাকে।
স্মরণ করি তোমাদের
যারা ফাঁসির রজ্জুকে মনে করেছ কণ্ঠলগ্ন কোমল ফুলমালা
মৃত্যুতে দেখেছ অমরত্বের রাজধানী।
স্মরণ করি তোমাদের
নাগনক্ষত্রে যাদের যাত্রা,
যারা কারাকক্ষে নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে
যাপন করেছ অবিচ্ছেদ্য অন্ধকার,
আকাঙ্ক্ষার অগ্নিতেজে তপ্ত রেখেছ বক্ষস্থল,
জতুগৃহদাহে দেখেছ ইন্দ্রপ্রস্থের নির্মিতি।
আর তোমাদের স্মরণ করি
সেই সব অগণন নামহীন পথিক পদাতিকের দল,
নির্বিশঙ্ক জীবনের আহ্বানে
পদে-পদে রক্তচিহ্নিত করেছ পথ-প্রান্তর-জনপদ,
ঘরে-ঘরে জেলেছ
জায়া-জননীর হাহাকারের দাবাগ্নি।
যাতে আমি জীবনে পেতে পারি মর্যাদা
অমূল্য মূল্যবোধ।
যাতে হাতে পেতে পারি তেজিষ্ঠ লেখনী
কণ্ঠে পেতে পারি দুর্বার কলস্বন
আর প্রকাশ্য গৃহচুড়ে এই অপ্রকম্প পতাকা॥

১৩৫৫

কাজ করো

প্রত্যেক কাজের মাঝে আমি-তুমি প্রত্যহ একাকী :
এখনো অনেক কাজ বাকি।

তুমুল তুফানশেষে মিলেছে যদিও স্বর্ণতীর,
এখানেই রচিব না আমাদের বিশ্রাম-শিবির ;
তীরের প্রান্তর থেকে সরণির নতুন সূচনা,
আরম্ভের জলস্রোতে সুদূরে সমুদ্র-সম্ভাবনা।
ক্ষীণ রৌদ্র হবে খরতর,
কাজ করো, কাজ করো।

দুর্যোগরাত্রির পারে প্রভাতের প্রসন্ন সুযোগে ;
জীবনেরে নিতে হবে গর্বদীপ্ত গম্ভীর সম্ভোগে ;
তিমিরগুহার মুখে মিলিয়াছে যেইটুকু বিভা
তারে আরো উজ্জ্বলিবে আমাদের প্রজ্ঞান-প্রতিভা।
প্রতিজ্ঞা-পতাকা উচ্চে ধরো,
কাজ করো, কাজ করো।

সৃষ্টির নৃত্যের ছন্দে প্রতিটি মুহূর্ত থরো থরো
কাজ করো, কাজ করো।
চাষ করো, পথ বাঁধো, দূর করো বন্য আবর্জনা,
প্রতি পদে আনো নব নির্মাণের নির্মল ব্যঞ্জনা।
পেশী বুদ্ধি শক্তি হৃদি—এক স্কন্ধে ফেল আজ ধূরা,
এক রথ টানো সবে এক প্রাণে প্রেরিত বন্ধুরা।
সাধনার স্বর্ণসৌধ গড়ো,
কাজ করো, কাজ করো।

এখনো অনেক পথ, প্রক্ষালিতে হবে বহু পাপ,
আত্মলীন লোলুপতা, তৃণলীন তীক্ষ্ণদংশ সাপ—
শাসন-গৃহীত-মুষ্টি শোষণের আনো শেষ দিন,
বন্ধনের প্রতিবন্ধ, হে নবীন, হে চিরকালীন,
অন্যায়ের মুখোমুখি লড়ো,
কাজ করো, কাজ করো।

১৩৫৫

পুরাবৃত্ত

একদিন দেখেছি তোমারে,
জ্বলেছ ভাস্বর সূর্য বন্ধন-রাত্রির অন্ধকারে।
পাপলেশপরিশূন্য, তপোনিষ্ঠ, ঋজু, ঊর্ধ্বস্বান,
দারিদ্র্য-দহন-কান্তি তোমারে করেছে রূপবান।
দেখেছি তোমার স্নিগ্ধ, দৃঢ় তপশ্চারণের ক্লেশ,
লোভ নাই, স্নেহ নাই, নাই দ্বন্দ্ব, বিমুক্তবিদ্বেষ—
প্রতিজ্ঞায় অপ্রকম্প, অবিচ্যুত লক্ষ অত্যাচারে,
একদিন দেখেছি তোমারে॥

তোমারে দেখেছি একদিন
মনস্তন্ত্রে একমন্ত্র—রব নিত্য স্বার্থস্পর্শহীন।
কর্মফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী সেই কর্ম নিয়ত-নির্মল,
স্বর্গসুখ চাই নাই, এ জীবন উৎসর্গ-উজ্জ্বল।
প্রকৃতি বিকৃতিশূন্য, রিক্ততায় মহাবিত্তভাগ,
শীতে-উষ্ণে সমজ্ঞান, সমজ্ঞান সুযোগ-দুর্যোগ।
সত্যতপ্ত মনোবাক্য, মেরুদণ্ড প্রদীপ্ত, স্বাধীন
তোমারে দেখেছি একদিন॥

তোমারে আবার দেখিলাম
প্রবৃত্তির বৃত্তে বাঁধা খুঁজে মরো কোথা সুখধাম!

কোথা তুষ্টি মুষ্টি-মুষ্টি, কোথা শান্তি, আসক্তি-আরতি,
মোহালসধ্যানমগ্ন হয়ে আছ বদ্ধ বকব্রতী।
দ্বারে-দ্বারে রাজপথে পথভ্রান্ত ঘনায় জনতা,
আত্মবুদ্ধিবুদ্ধি তুমি, দেখ শুধু আপাতরম্যতা।
সংগ্রামের শেষ দেখ নিম্নে পঙ্কিল বিশ্রাম,
তোমারে আবার দেখিলাম ॥

দেখিব তোমারে আরবার
যোগযুক্ত কর্মবীর লোভশূন্য নির্মম দুর্বার,
ত্যক্তসর্বপরিগ্রহ, মুক্ত, সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী,
নিঃস্বার্থ সেবার ব্রতে দ্বারে-দ্বারে দাঁড়াইবে আসি—
আয়ুষ্য-আরোগ্যপ্রদ ভয়হর সূর্যের মতন
আবার উদয় তব, পুন সে সহর্ষ আকর্ষণ!
শুদ্ধ কর্ম, দূরগত কর্তৃত্বের লুব্ধ অহঙ্কার,
তোমারে দেখিব আরবার ॥

১৩৫৫

এর পরে আরো এক পরিচ্ছেদ আছে

এর পরে আরো এক পরিচ্ছেদ আছে,
এখনি পেয়োনা ভয়! বৃদ্ধ বট গাছে
এখনো পড়িছে ছায়া, বাতাসে বাদাম
এখনো উঠিছে ফুলে। শান্ত নির্বিরাম
এখনো বহিছে শীর্ণ নদীটির ধারা,
জানালার দীপটিরে দিতেছে পাহারা
এখনো তারার স্নেহ। নব, দ্রব, ঘন
মাঠের উপরে মেঘ ঘনায় এখনো
হলোৎকীর্ণ মৃত্তিকায় বাধা-বন্ধ ঠেলি
আপীতহরিৎ শস্য চায় চক্ষু মেলি

আমূল নতুন। এখনি ছেড়োনা আশা,
তোমার চক্ষুর লাগি রয়েছে পিপাসা
চক্ষে আজো। এখনো চন্দ্রেরে দেখা যায়,
এখনো মাথার 'পরে রয়েছে বজায়
আশ্চর্য আকাশ। এখনো কান্নার সুর
শোনা যায় সদ্যোজাত অনঘ শিশুর॥

১৩৪৮

পথ পথ আলো আলো

পথ যদি বিপথও হয়
সেই আবার নিয়ে আসবে পথে
পথই পথ হারাতে দেবে না ;
ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আবার আনবে ফিরিয়ে
পেরিয়ে-পেরিয়ে।
দীপাধার পুরোনো হোক
আলোর বার্ধক্য নেই, নেই কোনো করুণ কালচিহ্ন ;.
পিলসুজ হোক ম্লান
আলোয় মালিন্য নেই
তার দীপ্তিতে-দাহে নেই বিন্দু ব্যতিক্রম।
আর যদি বলো অন্ধকারই রমণীয়
এক ফুঁয়ে আলো নিবিয়ে দিলেই হবে
আলোরই তো অন্ধকার !
আর ভালোবাসা যদি বলো ভুল
ভুলকে ভালোবাসাও তো ভালোবাসাই।
তবে আর ভুল কই ?

১৩৫৫

আজন্ম সুরভি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রিয়বরেষু

আন্তর্জাতিক

উত্তীর্ণ হবার দিন আরেক প্রত্যয়ে,
আদিম প্রত্যয়ে।
অনেক বিজ্ঞান ঘেঁটে ফিরে আসা শাশ্বত বিস্ময়ে।
সব রঙ মুছে যায়, আকাশ অক্ষয় থাকে নিরঞ্জন নীলে,
গাছ বাঁচে মূলে জল দিলে।

শাখায় পল্লবে ত্বকে নয়, নয় কুসুমে মুকুলে
জল ঢালো মাটি হতে উঠে আসা মমতার মূলে।
প্রাণে সেই স্নেহ আনো, রক্তে আনো স্বভাবের স্বাদ
উঠোনে দাঁড়ালে পরে দেখা যায় দিগন্ত অবাধ।
খিল খুলে আসা যায় বাহিরে নিখিলে,
গাছ বাড়ে মূলে জল দিলে।
পৃথিবীরে ভালোবাসা যায় স্বদেশেরে প্রথমে বাসিলে॥

১৩৬৮

শিকড়

শিকড় মাটির থেকে অগোচরে রস নিয়ে আসে
পরার্থজীবিত বৃক্ষ ভরে তোলে পত্রপুষ্পোচ্ছ্বাসে
সুবাসে-নির্যাসে।
নতুনের বন্যা আনে প্রতি বর্ষে বসন্ত বিহ্বল—
সমস্ত নতুন হয়, ডালপালা ফুলপাতা অস্থিচর্ম পল্লব-বল্কল,
খসার ঝরার দেশে বয়ে আনে সবুজের জয়ন্ত ফসল
অজস্র প্রোজ্জ্বল।
কিন্তু তার শিকড় শিকড় থাকে, অব্যাহত, ধ্রুবলগ্ন মৃত্তিকার ভিতে
সুদূর অতীতে ;

থাকে গূঢ় দৃঢ়বন্ধ, শক্ত ও আসক্ত থাকে, থাকে সে পুরোনো,
নতুনের অবান্তর তৃষ্ণা নেই কোনো।
সে যদি নতুন হতে চায়
ঐতিহ্য যে মুখ ঢাকে পরম লজ্জায়।
সত্তায় শক্তিতে স্বপ্নে সমূলেই গাছ মরে যায়
তেমনি তোমার সর্ব নতুনের প্রাচুর্যের প্রসাদের ঘরে
অব্যয় অক্ষুণ্ণ থাকো অনাহত গভীরের স্তরে,
অব্যর্থ শিকড়ে॥

১৩৬৮

লালের অধিক লাল

শুধু নগ্ন রেখা টানা মানচিত্রে, তারপরে বলা
কামানপ্রমাণ কণ্ঠে : এ আমার নিজস্ব এলাকা,
শুধু ভুক্তি যুক্তিহীন, বকবৃত্তি, মিথ্যা সে নির্জলা,
পঞ্চশীলে পঞ্চশূল, বিষকুম্ভ দুধ দিয়ে ঢাকা।

দৈন্যগ্রস্ত কাপুরুষ, নাহি মানে মানবসভ্যতা,
একমাত্র স্ফীতি নীতি, একমাত্র খাবল-ছোবল,
কথা দিয়ে কথা রাখা সে আবার কোন্ দেশী কথা—
পরপিণ্ডলিপ্সু দস্যু, ওই এক জঙ্গলে দঙ্গল।

এদেরো সগোত্র আছে এ ভারতে, শাঠ্যশেঠ ক্রূর,
নিজের মায়েরে ভালোবাসতেও যাদের কিনা দ্বিধা—
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লুব্ধ দাঁতে শনৈশ্চর ঘুরিছে ইঁদুর,
ফোকটে পকেট মারে খুঁজে ফেরে ছিদ্রের সুবিধা।

তুমি আছ আমি আছি অসহ্য এ সহ-অবস্থান,
তুমি নেই, আদিগন্ত আমি আছি এই শুধু মানি—

বেগতিকে ঐক্য জপে, শতধৌতে অঙ্গার অম্লান,
বিদেশের চাট ছোঁড়ে স্বদেশের খেয়ে দানাপানি।

প্রচ্ছন্ন-প্রকটে দীর্ঘ আঘাত করেছে হানাদার,
প্রতিরোধে দৃপ্তদণ্ড ভারতের কিষান-মজুর
ছাত্র কবি শিল্পী কর্মী—একরক্তে একত্র ঝঙ্কার,
পর্বত প্রান্তর নদী প্রস্তর তুষার তৃণাঙ্কুর।

এ আঘাত সুস্বাগত, জীবনেরে করেছে দুর্দম,
ভারতের দেহ-আত্মা জাগ্রত-উদ্যত কৃষ্ণার্জুন—
শান্তিতে বিশাল প্রাণ, ভয়াবহ সংগ্রামে নির্মম,
লালের অধিক লাল এই এক সংযুক্ত আগুন॥

১৩৬৯

পবিত্র ঘৃণা

তোমার পবিত্র ঘৃণা
দগ্ধ-ভস্ম করে দিক যাহা কিছু মারমুখী চীনা,
যাহা কিছু শুভ্র স্বচ্ছ সত্যের বিরূপ
যাহা কিছু পরশ্রীলোলুপ।
ঘুমন্ত বন্ধুর গলা কাটে এক পোঁচে,
সমস্ত দৃষ্টির কোণ নিয়ে আসে ক্ষুদ্র এক যান্ত্রিক সঙ্কোচে,
এক সুরে সাধা বাঁশি এক ক্ষুরে মস্তকমুণ্ডন
স্বভাবেই অভাব-কৃপণ—
মানুষেরে করে ক্রীতদাস
সর্বস্বত্ত্ববিবর্জিত এক ফর্দ সরকারী ফরমাস,
ছিন্নমূল্য আর ছিন্নমূল
রুলটানা রুটিনের দীনহীন টিনের পুতুল।
নীতিহীন রীতি পচা-গলা
একমাত্র শৃঙ্খলে শৃঙ্খলা॥

যাহা কিছু হ্রস্ব করে মানবীয় মর্যাদার বোধ
ম্লান করে মৌল অধিকার,
তোমার প্রতপ্ত দৃপ্ত ক্রোধ
উড়িয়ে পুড়িয়ে দিক সেই সব স্বৈরাচার কারার আগার।
যেখানে আড়ষ্ট বাক্য, খণ্ড চিন্তা, কাব্য-কথা রিক্তের কল্পনা,
শিল্পীসত্তা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের হুকুমে,
'শত ফুল' যেথা এক নিষ্ফলের কণ্টক-যন্ত্রণা,
সবুজের সব স্বপ্ন মুছে যায় ধূসরের ঘুমে।
তার প্রতি হানো শতবার
খরধার তোমার ধিক্কার॥

এই সঙ্গে তাহাদের চেন
যেন তেন প্রকারেণ
নিজের কোলের দিকে ঝোল টানে নগ্ন লালসায়,
আকালে ফকির সাজা ছদ্মবেশী চীনী
অন্তর্ঘাতী পঞ্চমবাহিনী—
আমাদের ঘর পোড়ে ওরা ব'সে আগুন পোহায়।
তাদের কোরো না তুমি ক্ষমা,
যারা শুধু পর-দেশ-উদ্গারের পঙ্কিল নর্দমা।
দিকে-দিকে জ্বালো এক ব্যাপক বিদ্বেষ
এই সব বিভীষণ হয়ে যাক শেষ॥

১৩৬৯

তিন শত্রু

প্রতিরোধ প্রতি পদে প্রতি পথে-পথে
প্রতি ইঞ্চি মৃত্তিকায়, প্রতিটি বিঘতে।
রে দুরাত্মা, আরো তোর তিন শত্রু আছে এ ভারতে—
জেনে রাখ তার পরিচয়।

এক শত্রু, গ্রামান্তের জীর্ণ দেবালয়
ইটের কোটর কিংবা সামান্য কুটির,
আরতির ঘণ্টা শোন নিবিড় মন্দির।
বটমূলে বাঁধা বেদী, বুড়ো শিব বসানো পাদপ
হাটে ঘাটে আটচালা, চণ্ডীর মণ্ডপ।

দুই শত্রু, ছোট পুঁথি, ক'টিমাত্র শ্লোক
মৃত্যুরে অগ্রাহ্য করা অমৃত-আলোক।
ক্লৈব্য জাড্য মূঢ়তার চির-বিরোধিতা
নাম তার শুনে রাখ—গীতা।

তৃতীয়, অপরাজেয় প্রতি প্রাণে ঈশ্বরবিশ্বাস
শাশ্বতে বিশ্বাস,
ধর্ম খাদ্য ধর্ম জল ধর্ম প্রতি বক্ষের নিশ্বাস।
রে দুর্বৃত্ত, বঞ্চক বর্বর,
জেনে রাখ এ মাটিতে তোদের কবর॥

১৩৬৯

মাপ

অনন্তকে চাও মাপিতে
তোমার ক্ষুদ্র তোলে?
মূল সে কোথায় বলো দেখি
পৌঁছুবে যে মোলে?

১৩৬৭

স্বদেশ

না, না, এতে দোষ নেই, লজ্জা নেই কোনো,
হোক না সে বর্ষিষ্ঠ পুরোনো
জরাজীর্ণ মলিন গরিব,
মাকে ঠিক ডাকা যায় মা-মা বলে উৎকণ্ঠ-উদ্‌গ্রীব—
কখনো তা কানে প্রাণে লাগে না বেসুরো,
মা কখনো হয় না তো বুড়ো
পরিত্যাজ্য পরিহরণীয়,
মাতৃনাম জীবনের বলিষ্ঠ পানীয়।
না, না, এতে ক্লেশ নেই, নেই মাত্র ভাবালু আবেশ,
বলো বলো মা আমার, আমার স্বদেশ ॥

তোমার মানবজন্ম নয় আকস্মিক,
শূন্যোৎপন্ন নও তুমি আকাশস্খলিত,
ঘর আছে, বেড়া আছে, জনক-জননী আছে ঠিক ;
তেমনিও নির্দিষ্ট নির্ণীত
দেশ আছে, আছে তার মাটি—
জলোজ্জ্বল নদী আছে
শ্যামোচ্ছল মাঠ আছে
চতুর্দিক রসে-গন্ধে জমাটি-ভরাটি।
আর আছে মধুরের উৎস হতে মুখে ফোটা ভাষা,
স্বভাব-নিঃসৃত ভালোবাসা।
না, না, এতে দৈন্য নেই
কোনো মতিচ্ছন্ন নেই,
যেখানে তোমার চোখে আলোকের প্রথম উন্মেষ,
তারে ঠিক বলা যায়, মা আমার, আমার স্বদেশ ॥

১৩৬৯

পীত প্রেম

দুয়ারে এসেছে হানাদার
থাকা তো যাবে না নির্বিকার—
লড়ো, আর, সেই সঙ্গে, বলে কি না, ভাবো,
ওদের আকাশ কত সুন্দর, নীলাভ,
কী সবুজ জলভরা গাঙ,
ইয়াঙ-সি-কিয়াঙ !

শোনো শোনো কী অপূর্ব কথা,
দেশপ্রেমে যেন ভেসে নাহি যায় তোমার বদান্য মানবতা-!
সংগ্রাম করতেও তাই কিনা
পশুটাকে করবেই না ঘৃণা,
কমপক্ষে ভাববে তার কী নিপুণ মহৎ খানাপিনা !
কাগজে এনেছে নাকি অক্ষরিত ছাপায় দক্ষিণা—
সুতরাং চিত্তে কিছু রাখো পীত-প্রীতি,
মৃতদেহ যতই করুক স্তুপাকৃতি
এও তুমি ভাববে, আহা, কী প্রাচীন বিশাল সংস্কৃতি।
যতই পুড়ুক বাড়ি-ঘর
তাই বলে একেবারে বোলো না বর্বর।

প্রাণে কোনো দ্বিধা নয়, চ্যুতি নয়, ভ্রান্তি নয়, নয় গড়িমসি,
প্রতিজ্ঞায় তীক্ষ্ন করো ঋজু করো দৃপ্ত করো অসি,
থাকো রাত্রিদিন
অচল—কঠিন
সমক্ষ সংঘাতে সম্মুখীন—
অন্তঃস্থল ভেদ করো নির্লজ্জ শত্রুর।
নদী নয়, পাখি নয়, কোনো নম্র ছায়া নয়,
কোনো আর্দ্র মায়া নয়,
হও রক্তরণমত্ত দুর্দান্ত নিষ্ঠুর
জয়তৃষাতুর।

সংকল্পপর্বতে যেন একচুল নাহি ধরে চিড়
শিথিল না হয় যেন বজ্র-আঁট বন্ধনগ্রন্থির।
প্রেম-ক্ষেম পরে হবে, পরে হবে লোকনাট্যনৃত্যের জোয়ার
এখন একান্ত লক্ষ্য দয়াহীন শত্রুর সংহার
এপার-ওপার।

ওদের তো মানবতাবাদ নয়, মানবতা বাদ,
পাশবতা নিয়ে যাক খড়্গের সংবাদ॥

১৩৬৯

বারোটা

অজগরী ভূমিক্ষুধ তবু খাদ্যহারা
মুণ্ডে পুচ্ছে নখে-দাঁতে বিকট বেয়াড়া
দেখ তার আসল চেহারা।

তারি জয়ে ক'টা পাখি হেথা-হোথা করে ফুরফুর,
শান্তির কপোত বুঝি? না, না, ওরা পাঁড় ঘুঘু, পাড়ার, বাস্তুর

চোঙায় করেছে ওরা অনেক আস্ফোট,
কোনো বারে মেলেনি তো মোটমাট ভোট,
মন্ত্রে ভুল তন্ত্রে ভুল, উচ্চারণ ঠিক নেই জানা—
ব্যর্থ তেলেঙ্গানা।

তারপর দিনে-দিনে ক্ষীণ হ'ত ক্ষীণে
চায়ের দোকানে রকে আড্ডায় ক্যাণ্টিনে
মউতাত-ধরা রক্ত স্বপ্নে আনে মধুর মউজ,
শক্তি এনে দেবে হাতে বসাবে তক্তের পরে মুক্তির ফউজ।

তুং-তাং সুর ভাঁজে, তুড়ি দেয়, মিঠি-মিঠি শিস—
আয় আয় উলঙ্গ চেঙ্গিস।

এ মাটিতে অন্য ধাতু, তুং-তাং প্রতিহত, না গজায় অন্যায় আগাছা,
জীবনেরে নাহি করে অল্পীকৃত অভ্যাসের খাঁচা,
প্রাণের সম্মানে ধন্য এ দেশের মানুষ স্বাধীন
উদার বিস্তার সর্বাঙ্গীণ—
দৈন্যেরে প্রাচুর্যে ভরে মহত্ত্বে ক্ষুদ্রের প্রত্যুত্তর,
ভূমিতে দাঁড়িয়ে থেকে নেয় জেনে ভূমার খবর।
এ দেশ অনেক বড়, মেলায় সে নতুন আঙ্গিকে
পার্থিবে-আত্মিকে।

সাধ্য নেই এ দেশের মর্মমূলে হানে কেউ ঠোঁটা,
বেজে গেছে ওদের বারোটা॥

১৩৬৯

প্রতিবেশী

প্রতিবেশী-ঘরে আগুন লাগালে তাড়ানো যাবে না চীন,
এটা তো সহজ সঙ্গত কথা সভ্য ও সমীচীন।
কে তুমি হে প্রতিবেশী
আগ বাড়িয়ে কি বলছ না কিছু বেশি ?
চোরের মায়েরই হয় জানি বড় গলা,
ঠাকুরঘরে কে, শুধোলেই বলে, আমি তো খাইনি কলা।
যদি তুমি প্রতিবেশী
তবে তো আমার সমব্যথী তুমি, আমার দেশের দেশী,
এক সন্তান মা'র—
আমার সকল ধনের মানের প্রাণের অংশীদার,
সার বেঁধে বসে দাঁড় টানি এক নৌকার সওয়ার।
তবে তো আমরা এক জল এক স্থল,
মা'র পদতলে অখণ্ড শতদল॥

তা তো নও তুমি, তুমি যে মায়ের মূর্ত অমর্যাদা,
বিদেশের ট্যাঁকে মাস বরাদ্দ বাঁধা।
প্রতিবেশী নও, আসলে ছদ্মবেশী,
লখিন্দরের লোহার বাসরে ছিদ্রের অন্বেষী।
সমস্বরে সাথে নও তুমি, 'পঞ্চমে' ধরা সুর
পণ্ড করার শিখণ্ডী তুমি, কুটুম্ব শত্রুর।
তোমার দেয়ালে টাঙানো রয়েছে ওদেশের হুকুমানা,
শিবের গীতের মাঝখানে বসে কৌশলে ধান ভানা।
তুমি জানো ভালো কার গায়ে পড়ে করো সুখে ঘেঁষাঘেঁষি,
কার তুমি প্রতিবেশী।
কার নির্দেশে স্বদেশ-স্বজন-স্বাধীনতা বিদ্বেষী।
কাজেই যখন পড়বে শত্রু চীন।
তুমিও পড়বে এ তো খাঁটি কথা, সভ্য ও সমীচীন।

১৩৬৯

স্বাধীন

কাঠের উদ্ধার কাঠে
পাথরের উদ্ধার পাথরে।
অন্তঃসার যে অনল সুপ্ত আছে
গুহাহিত প্রাণের কোটরে,
ঘর্ষণে-ঘর্ষণে তারে উচ্চারিত করে দাও
উদ্দামে দারুণে,
কাঠের নির্বাধ মুক্তি নির্মল আগুনে।
তেমনি আমার মুক্তি আমারি এ মুষ্টিবদ্ধ হাতে,
পাষাণ বক্ষের দ্বারে প্রত্যয়কঠিন করাঘাতে
সঘন সবল,
গুন্ঠিতেরে অপাবৃত, নিরুদ্ধেরে করি নিরর্গল।

প্রকম্পিয়া অন্ধ গিরিদরী
জাগুক গর্জনদৃপ্ত বিক্রান্ত কেশরী—
অমিত সে ভামতী ব্যঞ্জনা।
জাগুক জীবনভরা বৃহৎ মহৎ সম্ভাবনা।
তুষারসঙ্ঘাত থেকে জন্ম নিক নির্ঝর উৎসুক
জড়ত্বের পশুনিদ্রা ভেঙে দিক চেতনাচাবুক।
শুধু পাশমুক্তি নয়
শাপমুক্তি আমার সাধন,
মৃত কাষ্ঠে মঞ্জরীরঞ্জন।

এ আমি কোথায় আছি—
একদিকে কতগুলি চীনী,
অন্যদিকে ভাসা-ভাসা ছিমছাম কজন মার্কিনী।
কোথা সেই সুপ্রিয় আত্মীয়
স্থানীয়, দেশীয়,
সত্য ভারতীয়॥

আপনার মেরুদণ্ডে সমুদ্ধত শুদ্ধ বলে বলী
দাঁড়াও হে তমোহর, দশদিক গৌরবে উজ্জ্বলি,
নিজের শক্তিতে দৃঢ়, সুসম্পূর্ণ, স্বাবলম্বে বাস,
নিজেতে নির্ভর করো নিজেতে বিশ্বাস।
নয় নয় দরিদ্রের শীর্ণ হাত পাতা ·
খুলে ধরা কীটদষ্ট মিনতির খাতা—
আমিই আমার পরিত্রাতা।

স্ববলে পর্যাপ্ত আমি স্বধামে আসীন,
শুধুই স্বাধীন নই, স্বদেশে স্বাধীন॥

১৩৬৯

তা হোক

কত শত জোয়ানের রক্ত খেল পিশাচ রাক্ষস
কত ঘরে নিয়ে এল দুঃসহ দুর্দিন,
তা হোক তা হোক—
তোমাদের কণ্ঠস্বর তবু যেন না হয় কর্কশ
ব্যবহার নাহি হয় হৃদয়বিহীন,
তা হোক তা হোক—
ভেবো ওরা তোমাদেরি পৃথিবীর লোক।
যদি চাও উঁচিয়ো সঙিন
কিন্তু দেখো থেকো ঠিক স্বপ্নেতে রঙিন॥

নির্দোষধর্ষক ওরা, প্রবঞ্চক, শিশু-হন্তারক
মাল্যবেশে বিষধর খল কালসাপ,
তা হোক তা হোক—
তোমাদের হাতে যেন নাহি থাকে গুপ্ত বাঘনখ,
পাপীরে তোয়াজ করো ঘৃণা কোরো পাপ,
তা হোক তা হোক—
দেখ দেখ কী বিনীত বুদ্ধ শান্ত চোখ।
যদি চাও ধরো যুদ্ধ-সুর
কিন্তু দেখো কৃষ্ণপ্রেমে সেজেছ অক্রূর॥

১৩৭০

সাময়িক

মহাকাশ তুলেছে অঙ্গুলি—
তোমার মুখেও তাই শুনি বুঝি শাশ্বতের বুলি,
চিরায়ত সাহিত্যের কথা,
এ যে দেখি পরিচ্ছন্ন বিবেকের অকুণ্ঠ সততা।

আহা বৃত্তি পলায়নী,
তোলো কিনা আদর্শের ধ্বনি !
চিরদিন দলগত ইস্তাহার লিখে
আজিকে আপত্তি সাময়িকে ।
যুদ্ধ যদি আকস্মিক
শত্রুর নিধনযজ্ঞ সেও সাময়িক ।
কবি শিল্পী গীতি চিত্রী যত সাহিত্যিক
অরণি সংগ্রহ করে দিক যজ্ঞে ক্ষণিক ইন্ধন,
তুলুক একত্র উচ্চারণ ;
নয় শুধু শব্দসার অরণ্যরোদন ।

তারপর একদিন ভ্রান্তবুদ্ধি যুদ্ধ যাবে নিবে,
শান্তির নিদ্রালুবাণী কলিতললিত বংশী আবার শুনিবে ।
সত্যি যদি আদর্শনামীয় কিছু থাকে অনশ্বর,
সে তো শক্ত তোমাদের কাঁটা, নাম তার সত্য ও সুন্দর
আর দিব্য প্রেম মহীয়ান
অক্ষয় অম্লান ।
তাই বলি হিত
প্রয়োগ কোরো না বিপরীত ।
যতদিন যুদ্ধ চলে বন্ধ থাকো ঘরে
আদর্শের অস্থায়ী কবরে ।
হায় ব্যর্থকাম,
আর যাই বলো বলো, ভূত হয়ে বলিও না রাম ॥

১৩৬৯

দুর্দিন

প্রথমত গলাগলি, খালি ভাই-ভাই
বিনোদিয়া রঙ্গঢঙ্গ ফূর্তি আশনাই
শুধু মধুরাই ।

তারপরে লেখালেখি চিঠি—
সোহাগ আদর ঝুড়ি ঝুড়ি
প্রেমিকেরা করে খুনসুড়ি।
ক্রমে ক্রমে বাধায় বাড়ায় খিটিমিটি।
এটা নাই ওটা চাই
সুরু করে ধানাই-পানাই।

তারপরে স্পষ্ট রূঢ় পেশ করে দাবি,
কণ্ঠ বিষস্রাবী।
করে দৃপ্ত আটোপটংকার
'এই সব ভূখণ্ড আমার।'
তুমি যত যুক্তি ধরো তত সে যে খ্যাপে
স্বচ্ছকে আচ্ছন্ন করে দলিলে ও ম্যাপে।
তারপরে অতর্কিতে মর্মে হানে শেল
অরক্ষিত ঘরে ঢোকে সশস্ত্র সিঁদেল।
ইচ্ছেমত লুটেপুটে ছিঁড়ে ছিনে অকস্মাৎ রুদ্ধ করে গতি
'এইখানে আমাদের যুদ্ধের বিরতি।'
বিশ্বের দেখায় ডেকে কত তার শান্তিতে সম্মতি।
'ফিরে যাই নিজের এলেকা
যার নাম "বাস্তাবক নিয়ন্ত্রণ-রেখা।"
কোথা যে তা কে বা জানে
শূন্যের সে কোন ময়দানে।
ভেবে ভেবে খাও হিমসিম
আপাতত বন্ধ করো যুদ্ধের ডিণ্ডিম।

রেখার নিহিত অর্থ দুরূহ কে বলে?
যেটুকু এসেছে গ্রাসে রেখে দেব সেটুকু কবলে।
তারপর পেতে থাকে ওৎ
লগ্ন বুঝে ঢেলে দেবে দানবের স্রোত।
এরই নাম চীন
পৃথিবীর মলিন দুর্দিন॥

১৩৬৯

কী বিচিত্র

কী বিচিত্র দেশ এই, নাম বুঝি উদাত্ত ভারত,
নয় ক্রীত, শৃঙ্খলিত ; চিন্তায় ও প্রকাশে স্বাধীন,
রাষ্ট্রের নিশ্চিন্তে নিন্দে, নির্ভয়ে জানায় মতামত
মঞ্চে পত্র-পত্রিকায় । কী আশ্চর্য, বাম ও দক্ষিণ
দু পায়েই পথ চলে ; দু'দিকেই দৃষ্টি যুগপৎ
মোহমুক্ত । এদের সাহিত্য দেখ নয় বাঁধিগৎ,
নয় যৌথ ইস্তাহার ; ব্যক্তিত্বে প্রেরিত, সর্বাঙ্গীণ
স্বপ্নে কল্পে ও বাস্তবে ; দেয় না তো স্থির দস্তখৎ
দলের দলিলে, এরা উচ্চে-তুচ্ছে সমস্তজনীন,
লেখনী সুখের খনি, দণ্ডেরে না করে দণ্ডবৎ,
সমকালে বাস ক'রে রাখে কিছু উত্তরকালীন ॥

এখনো স্ত্রী-পুত্র মানে, কী বিষম রুগ্ন পরিহাস,
ঘর বেঁধে সব নিয়ে ঘন হয়ে একসাথে থাকে,
গরুই লাঙল টানে, মানুষেরা খায় না তো ঘাস,
স্ত্রী-পুরুষ চেনা যায় ছাঁটকাটে আলাদা পোশাকে ।
সীমানার পরপারে প্রেম দিয়ে নম্র ছবি আঁকে,
পুষ্পিত পৃথিবী মানে, মানুষেতে রেখেছে বিশ্বাস ।
সত্য এ বিচিত্র দেশ, এ বিচিত্র, সত্য সেলুকাস ॥

১৩৭০

কেন যুদ্ধ

ক'টি সিক্ত নম্র জ্যোৎস্না, আনন্দিত ক'টি উষ্ণ রোদ
ক'টি ঘন অন্ধকার, দুয়েকটি-বা উদাসীন তারা—
বাঁচায়ে রাখিতে চাই জীবনের ক'টি মূল্যবোধ
চেতনার গভীরে ইশারা—
তারি জন্যে যত যুদ্ধ যত নির্জনে পাহারা ॥

ব্যঞ্জন স্বাদান্ত নূনে, অতিরিক্তে। কাজলরেখায়
অর্থোজ্জ্বল চাহনিতে অলিখিত ভাষা জাগে কোন !
দেয়ালের পরিধিতে ঘর না ফুরায়
প্রান্তে রচি এক ফালি সবুজ উঠোন।
ঘাসের আড়াল হতে শীর্ণ ফুল চায় ইতিউতি,
কার খোঁজে কারে করে স্তুতি—
বাঁচায়ে রাখিতে চাই জীবনের স্থির দৃষ্টিকোণ
তারি জন্যে যত যুদ্ধ যত এই নীরব প্রস্তুতি॥

১৩৬৯

সঞ্জয় ও বিদুলা

যুদ্ধে পরাভূত হয়ে বিবশ সঞ্জয়
নিল দীন শয্যাশ্রয়
ঘুম গেল গ্রাম্য সুখে। অপাংশুলা
জননী বিদুলা
ডাব দিয়া কহে তারে, অকৃতাত্মা, কাপুরুষ,
অরাতির আনন্দবর্ধন, করো গাত্রোত্থান,
আপাতসরস ঘুমে থেকো না শয়ান
নির্বোধ নিস্তেজে। তীক্ষ্ণাঙ্কুশ
চঞ্চুতে নখরে
ঝাঁপ দাও, শ্যেনপক্ষী, গভীরে প্রখরে
অতর্কিত দ্রুততায়। বিষ চোখে
বঙ্কিমে তির্যকে
ফের' খুঁজে কোথায় শত্রুর ছিদ্র।
সেই সে দুর্বল রন্ধ্রে, ইঙ্গিতজ্ঞ, হে অনিদ্র,
হানো তব নগ্ন অস্ত্র শোণিত-শাণিত,
কেন আছ বজ্রাহত মৃত
বিষন্ন বিনীত? মুহূর্তে জ্বলিত হও অর্বাচীন,

তপ্তরোষতাম্র নেত্রে। চিরদিন
ধিকিধিকি জ্বালো না তুষাগ্নিসম,
পুত্র মম,
চিরন্তন ধূমায়ন থেকে ক্ষণকাল শিখায়ন শ্রেয় ;
আয়ুতে না, বলবীর্যে প্রজ্বলিত মানুষ অমেয়,
পূর্ণকাম। পরাস্ত হবার পর
যে মূর্খ হয় না ক্রুদ্ধ, যন্ত্রণাজর্জর,
উদ্যত না হয় প্রতিশোধে, সর্বস্বান্ত সেই হতজ্ঞান
কেন প্রাণ ধরে থাকে ? যোদ্ধা যদি বুদ্ধিমান
নিজের পতনকালে শত্রুজঙ্ঘা করি আকর্ষণ
তারেও মাটিতে ফেলে—একসাথে একত্র পতন।
বিচ্ছিন্ন হয়েও বৃক্ষ স্থির লক্ষ্যে পড়ে
নির্ধারিত শত্রুর উপরে।
থেকো না থেকো না ম্লান আলস্যের ক্লেদে
নিরায়াস নির্লজ্জ নির্বেদে।
অধম উপায় দান, আপস মধ্যম,
উত্তম উপায় দণ্ড—সেই মহত্তম
উপায় আশ্রয় করো। হও দণ্ডধর
অখণ্ড দণ্ডায়মান।
আমি তব একক সন্তান,
রুদ্ধকণ্ঠে বলিল সঞ্জয়, হতাদর
আমি যদি যুদ্ধে মৃত হই, না ফিরি আলয়ে
স্নেহাঞ্চলে, কী হবে পার্থিব সুখে, ঐশ্বর্যে বিজয়ে
কাষ্ঠে লোষ্ট্রে সিংহাসনে ? কাটাবে কী নিয়ে দিন
পুত্রহারা ? তোমার হৃদয় মা গো আয়সকঠিন,
এতটুকু দয়া নাহি ধরে,
দেবে ঠেলে পুত্রে তুমি মৃত্যুমুখে শত্রুর বিবরে ?

সৌবীরমহিষী দৃপ্তা অকুণ্ঠা বিদুলা
অমূদুলা
প্রজ্বলিল বিদ্যুৎ-বিভায় : অতল কলঙ্কজলে
নিমজ্জিত বংশের গৌরব। যদি আমি বজ্রবলে

নষ্ট কীর্তি উদ্ধারিতে না দিই প্রেরণা,
আমার এ পুত্রস্নেহ মিথ্যা আবর্জনা
উপমেয় গর্দভীর বাৎসল্যের সনে,
ধর্মকামঅর্থভ্রষ্ট ভোগসুখবঞ্চিত ভুবনে
পরাজিত জীবনধারণ
কেহ নাহি মেনে নেবে, সে জীবন
সজ্জনগর্হিত ঘৃণ্য মূর্খনিষেবিত, সম্পূর্ণ অযথা।
স্নেহ? দয়া? ক্ষণদেহমমতার কথা?
তৃণগুচ্ছ হতে তুচ্ছ এ মর শরীর,
দেহে ক্ষুদ্র আত্মবুদ্ধি দাও বিসর্জন,
ধরো বৃত্তি বন্য কেশরীর,
তবেই তুমি হে পুত্র, আমার স্নেহের ধন
অঞ্চলের নিধি। নচেৎ তোমাকে ধিক। উদাসীন
নিরুদ্যম নিরুত্তেজ পুত্রে কোনোদিন
পুত্রবতী নয় কোনো মাতা।
ক্ষতত্রাতা,
শত্রুজয় হবে তব হাতে, তাই নাম
রেখেছি সঞ্জয়। দুই চোখে জয়ন্ত সংগ্রাম
হও হে অন্বর্থনামা, সার্থক সাধক,
বিপরীতনামা নয়, নয় কভু নিরর্থবাচক,
নয় নয় শিথিল স্থবির।
দুঃখ বোঝো জননীর,
অন্ধকারে, লুপ্ত অধিকারে
নিরাশ্রয়া অপ্রতিষ্ঠা রেখো না তাহারে।
দারিদ্র্য মরণতুল্য, দাস্য কারাবাস,
পতিপুত্রবধের চেয়েও দুঃখকর রাজ্যনাশ
লক্ষ্মীর বিদায়। এক রাজকুল হতে দক্ষিণ বাতাসে
এসেছি কখন উড়ে
দূর হতে দূরে
যেমন মরালী আসে
এক সরোবর ছেড়ে অন্য সরোবরে,
রাজকন্যা রাজবধূ হল কালান্তরে।
তাই রাজ্যনাশের বেদনা
দুর্বিষহ। দুর্ভাগ্যের অমিত লাঞ্ছনা

প্রাত্যহিক অন্নচিন্তা। তাই ওঠো, নিদ্রা ছাড়ো,
মরো কিংবা মারো, কখনো না হারো,
ধরো দণ্ড সমুদ্ধত।
ধনুকে জ্যারোপ করো, তোলো হে টঙ্কার।

কশাহত তুরঙ্গের মত
দুর্জয় দুর্বার
এক লাফে উঠিল সঞ্জয়, রণোন্মুখ রথকেতু,
অভিযানে উদ্যত বিদ্যুৎ।
মা কহিল হাসিমুখে : যে প্রস্তুত যুদ্ধহেতু
তার তরে জয়ও প্রস্তুত॥

১৩৬৯

জন্মাষ্টমী

নয় কোনো দেবতার সুরভিত পবিত্র মন্দিরে
রাজার প্রাসাদে নয়, নয় কোনো গৃহস্থের শান্তির কুটিরে,
সব চেয়ে হেয় যাহা, লজ্জাপ্রদ সেই স্থানে, ঘৃণ্য কারাগারে,
পীড়িতের বন্ধনের ক্রন্দনের ভারে
জন্ম নিলে হে অমোঘ, ধুলায় প্রস্তরে ভূমিতলে,
দীনাতিদীনের মত অনাদরে আর অশ্রুজলে।
জ্বলে নাই কোনো দীপ, ওঠে নাই কোনো শঙ্খধ্বনি,
দুর্যোগে বিদীর্যমান তামসী রজনী
পাঠায়েছে বিদ্যুৎ-বর্ষণ-ঝঞ্ঝা-কুলিশ-করকা
অভ্যর্থিতে তোমারে হে দুঃখীর অভয়ঙ্কর, দরিদ্রের সখা।
প্রহরী ঘুমায়ে পড়ে খুলে যায় কীলক-অর্গল
খুলে যায় যাতনার ক্ষুধার শৃঙ্খল
ঘটে যায় দুয়ার-মোচন,
সর্বভূতভয়াবহ, জাগো ত্রাতা, অরাতি-পাতন।

ভয়ে কাঁপে ক্রূর কংস, হাত হতে খসে পড়ে অসি,
কালকূটস্তনী বকী, ভয়ে কাঁপে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী,
ভয়ে কাঁপে যত স্পর্ধা, সমুদ্ধত যত মেদস্ফীতি,
ভয়ে কাঁপে মহতী অনীতি ॥

১৩৭১

মিষ্টত্ব

মিষ্টত্ব কি শর্করায়, না বা রসনায়
কে বলিবে কোন বিশ্লেষণে,
মিষ্টত্ব রয়েছে শুধু শর্করা ও রসনার
একত্র মিলনে ॥

১৩৭০

জওহরলাল

স্বপ্নে কর্মে উদ্‌যাপনে যুদ্ধে প্রেমে সন্ধানে সাধনে
সমীকৃত, হে পুরুষ, হে বিশাল নেতা,
তুমি মহাভারতের মুক্ত দৃপ্ত সমৃদ্ধ প্রণেতা
নবীনের রোপণে-বপনে আর শাশ্বতের লালনে-পালনে।
তারো চেয়ে আরো কথা, তুমি এক বিশ্বজোড়া অবন্ধন প্রাণ,
নির্যাতিত মানুষের তুমি এক ঊর্জিত ঊর্ধ্বগ সমুত্থান ॥

খণ্ডিত ভারতবর্ষে এনে দিলে একচ্ছন্দে সংহতির স্থিতি,
অমৃতের পান্থ তুমি, এনে দিলে অভয়ের অক্ষুণ্ণ আলোক,
সকলকুশলমূল এনে দিলে অনাময় মৈত্রীর জাগৃতি,
ফেলে দিলে ক্ষুদ্রজীবী আরামের উত্তপ্ত নির্মোক।

সৌম্যে রৌদ্রে তীক্ষ্ণে ভদ্রে তুমি এক অগাধ অন্বয়,
অঙ্গারে প্রচ্ছন্ন রাখো কান্তোজ্জ্বল হীরক প্রত্যয়।
ভবিষ্যৎ যত হোক দুর্লঙ্ঘ্য দুর্বার
চিত্তময় বিত্ত আছে এ গর্বিত উত্তরাধিকার ॥

১৩৭১

আরক্ত গোলাপ

নিত্য দেখি তবু থাকি তৃষিত নয়নে।
প্রত্যহের প্রথম সাক্ষাৎ তুমি, রঙিন গোলাপ,
প্রত্যহ অপরাজেয়, প্রত্যহ অমর।
যেন কোন সুনিপুণ গুণীর আলাপ
কণ্টক-কঙ্কালে স্থির কষ্টের আসনে
ঋজুনিষ্ঠ। তুমি বুঝি রক্তাক্ত মাটির প্রত্যুত্তর
কঠিনের রোমাঞ্চে রক্তিম। আপনার দানে তুমি দামী
অতীতের স্বপ্নমাখা ঘ্রাণে-প্রাণে তুমি এক বিস্তীর্ণ আগামী ॥

কত ক্লেশ ক্ষয়-ক্ষোভ দ্রোহ-দ্বন্দ্ব আঘাত-হনন
পার হয়ে এই এক উল্লসিত দীপ্ত জাগরণ
বিনিদ্রিতা কুণ্ডলী শক্তির। এই এক শুদ্ধ আত্মজ্যোতি
ব্যথার প্রদীপ জ্বালা চিরন্তন আনন্দ-আরতি।
সত্তার গহন হতে ডেকে আনে গভীরের রসের উৎসার
শোনা যায় বৃন্তে-দলে কবেকার শৃঙ্খল-ঝঙ্কার।
তাইতো তোমার যত্নে গেঁথে রাখি বুকের নিভৃত কাছাকাছি,
যতদিন তুমি আছ পৃথিবীতে আমি রব বাঁচি,
দুর্গম চূড়ায় তুমি দুঃসাধ্যের সাধ
প্রথমে প্রয়াস, শেষে প্রপূর্ণ প্রসাদ ॥

১৩৭১

প্রত্যয়

প্রত্যয়ই খননাস্ত্র
যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেখানেই খোঁড়ো
সেখানেই আছে তব তৃষ্ণার পানীয়
হোক মাটি রুক্ষ রুষ্ট প্রস্তরকঙ্করাকীর্ণ
সেই প্রাতিকূল্য থেকে হবে ঠিক জলের উদ্ধার
জলও আমার মধ্যে অস্ত্রও আমার।
আকাশ পতিত হোক খর্বীকৃত হোক হিমাচল
সমুদ্র বিশুষ্ক হোক ভূমণ্ডল খণ্ড খণ্ড ভূমি
তবু আমি উঠিবনা ব্রতাসন থেকে
আত্মোদ্ধার অর্থ জানি আত্ম উদ্ঘাটন॥

১৩৭১

রবীন্দ্র-জন্মদিনে

পঁচিশে বৈশাখ ছেড়ে যদি হত পঁচিশে অঘ্রান
তাহলে হতে কি তুমি মসীজীবী মলিন কেরানি,
গৃহকোণে আপনার ছায়ারে কি করিতে সন্ধান
দুখানি রুটির তরে টানিতে কি রুটিনের ঘানি?

ড্যালৌসী-স্কোয়ার ধরে করিতে কি নিত্য পরিক্রমা
কিংবা কোনো মফস্বলে মুন্সেফিতে হত পরিণতি—
দেয়ালের অন্তরালে উদিত না কিশোরী চন্দ্রমা
দিগন্ত মুছিয়া যেত, বসন্ত হারাত রঙ্গরতি?

তবে কেন এ তাণ্ডব মিলি যত নারী ও পুরুষে
কেন এই দিনে-দণ্ডে তিলে তিলে খণ্ডে ভাগ করা—
নাই কোনো জন্মদিন, জন্ম যার প্রতিটি প্রত্যূষে,
নাই কোনো জন্মভূমি, একনীড় যার বসুন্ধরা।

দর্পণে দেখিব সূর্য গোষ্পদে কি দেখিব আকাশ
বিধাতার সৌরসৃষ্টি চিনিব কি শাস্ত্রে জ্যোতিষীর ?
আয়ু কি মাপিব বসে ফেলি ধীরে অলস নিশ্বাস
শরীরে পাব কি কভু উদ্বেলিত কামনার তীর ?

তেমনি তোমারে চেনা—সে কি শুধু পঁচিশে বৈশাখ-
তোমার নিকটে পাওয়া সেকি শুধু শান্তিনিকেতনে ?
চৈতন্যের গূঢ়কেন্দ্রে রেখেছ যে গহনের ডাক
প্রতিটি অক্ষরে তুমি, তুমি আছ প্রতি উচ্চারণে ॥

১৩৪৫

জীবনানন্দ

চলো কোথা চলে যাই, সেই সব উজ্জ্বলন্ত মাঠ
তৃণোজ্জ্বল নির্জনতা—
চলো যাই চলো দূরে
হেঁটে-হেঁটে ঘুরে-ঘুরে
তুমি আমি কেউ নেই, নেই কোনো দেয়াল-কপাট
সেথা গিয়ে শুনি বসে পথক্লান্ত সময়ের কথা ॥

এখানে যেদিকে দেখি হাড় আর-পাথরের গুঁড়ো,
শুনারেও শোনায় বেসুরো ।
আর যত
গলিতকোটরগত
নখ নিয়ে চলে-ফেরে ক্ষুদ্রচক্ষু শকুনের দল
ছিঁড়ে-ছিঁড়ে কেড়ে খায় জীবনের জমানো ফসল ।
তার চেয়ে চলো দূরে
ভেসে-ভেসে উড়ে-উড়ে
আশ্চর্য জলের দেশে, সেই সব স্নেহঢালু-জলের কিনার,
প্রাণে-মাজা তাজা-তাজা ঘাস,
শাদা স্বপ্নে লেখা পাখা উড়ে আসে অলিখিত দিগন্তের হাঁস-
চলো যাই চলে যাই
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চিনিবার মত যেথা অতল অমল অন্ধকার ॥

তারপর ধীরে-ধীরে বন্ধ করো দোর।
আপনার যাত্রায় বিভোর
ঘরে আস ফিরে,
অন্ধকারে হাত রাখো জলের শরীরে।
অন্তরেই খুঁজে পাও অগাধ অবাধ নির্জনতা,
শোনো তার নিরুচ্চার কথা।
রক্ত আর ক্লান্ত নয় শকুনের নখরের বিষে,
একটি আকাশ দেখ নীল হল আনম্র আশিসে।
আর দেখ মাঠঢালা ঘাস
শাদা-পৃষ্ঠা চিঠি পড়ো—সংকেত-অঙ্কিত বুনোহাঁস,
আর রাখো জীবনে বিশ্বাস।
জীবনে বিশ্বাস॥

সমস্ত বোধের শেষে আরো এক বোধ থাকে বাকি,
তুমি শান্ত প্রাণ এক, মহান একাকী॥

আমি

শূন্য হতে ছিন্ন করে আনা
প্রসঙ্গের বহির্ভূত, আমি এক ক্ষুদ্র প্রাণকণা
হঠাৎ এসেছি চলে। একটানা
কতগুলি মুহূর্তের স্পন্দন ক্রন্দন উত্তেজনা,
তার বেশি কিছু নয়।
আমি এক পূর্বাপরবিরুদ্ধ ঘটনা
অনর্থক, উদ্দেশ্যবিহীন, নিরালয়।

প্রশ্ন জাগে কেন তবে দুরন্ত বিস্ময়
রাত্রিদিন? পুরাতন কেন তবে নিরন্ত নবীন?
উপুড় করিয়া ঢালা নীলোজ্জ্বল সুধাপাত্রে
একবিন্দু নেই কেন ক্ষয়?
কেন তবে
এ বিরাট দুর্ঘটনা
ভরে আছে গভীরের সুষমা-সৌষ্ঠবে?

কেন তবে দুই চোখে অম্লান আবেশ
সহসা কে সন্নিহিত সকলসুন্দরসন্নিবেশ !

একটি অণুর মাঝে পূর্ণ সৌরজগৎ-উদ্ভাস,
একটি শিশিরে ধরা আকাশের সমস্ত বিন্যাস
খুঁটিনাটি করে আঁকা নিখুঁত নিটুট,
বাসনার বারিধিরে ধরে থাকে, মরি-মরি, দুটি ওষ্ঠপুট।
স্ফুলিঙ্গেই ধনবহ্নি। বিরাট বিশাল মহীরুহ
সমাহিত ক্ষুদ্র বীজে, নিগূঢ় দুরূহ।
আমারও সেইমত আছে সম্ভাবনা, আছে কিছু কথা,
শুধু চলা, নিশ্ছন্দেও দেখি যে শৃঙ্খলা—
শরবৎ তীক্ষ্ম তন্ময়তা !
তার পরে এ বা কোন রীতি,
অমর্তের ঘরে হয় সাক্ষাৎ প্রতীতি।

অব্যক্তের মর্ম হতে নিষ্কাশিত এই সৃষ্টি যার উচ্চারণ
আমি নই সৃষ্টিছাড়া—
আমার নিশ্বাসে রক্তে শুনি তার চরণচারণ
ক্লান্তিহীন। দেখি তার বিপুল বিভাসা
দিকে দিকে, পেয়ে যাই প্রকাশের ভাষা
সঙ্কোচের গুহা হতে বিস্তারের বিস্ফার-পিপাসা,
নাম ভালোবাসা।
তার পরে মনে হয়
যেন কিছু মানে হয়,
সুখী হতে আসা নয়, হেথা বুঝি বড় হতে আসা।
প্রাণে যদি প্রেম থাকে তবে আর কাকে, কিসে ভয় ?
প্রাণে যদি প্রেম থাকে, তবে আর কিসের সংশয় ?
বাসনারে সোনা করে ক্ষুধার্ত এ বুক,
বালিরেই মুক্তা করে সমুদ্র-ঝিনুক॥

মুখ

তোমার সম্পূর্ণ মুখ দেখবার লোভে
কোথায় না গেছি বলো,
বাজারে বন্দরে মঠে পাহাড়ে সাগরে
বন্য ধন্য নগণ্যের ভিড়ে
প্রান্তরে প্রাচীরে।
দুই চোখে দুষ্পূর পিপাসা,
ঘুরেছি কণ্টকে ক্লেদে ঊর্মিলে ফেনিলে
ঐহিক একান্তচারী—
কোথায় তোমার মুখ?
যা কিছু আভাসে দেখি সমস্ত আংশিক
সমস্তই তন্দ্রাভরা।
ভুরু দুটি স্থির হলে পালায় নয়ন,
নয়নে নিমগ্ন হলে মিলায় অধর,
অধরে তো লেখা নেই সেই দীর্ঘ পল্লবের ছায়া।
সমস্তই ভাসা-ভাসা চলন্ত চঞ্চল,
দেখা দেবে খুলে দিলে কোন রুদ্ধ স্বর্গের অর্গল?

স্নান হল সর্বতীর্থে, সর্বমন্ত্রে দীক্ষা হল শেষ
সর্বগুহাদ্বারে করাঘাত,
কোথায় তোমার মুখ
উন্মুদ্র কমলকোষ বিশদ প্রাঞ্জল
আবৃত অমৃত!

ব্যর্থ বৃত্ত সাঙ্গ ক'রে
ফিরে আসি নিজ ঘরে, মানস-নিলয়ে,
ছোট ক'টি সামান্য নিশ্বাসে,
প্রাত্যহিক মুহূর্তের ছোট ক'টি বিচ্ছিন্ন অক্ষরে।
চেয়ে দেখি কী আশ্চর্য, সেইখানে রয়ে গেছে স্থির
তোমার সম্পূর্ণ মুখ সুচির-রুচির।
চিত্তের সহজ সুখ
সে তোমার মুখ॥

১৩৭১

অরুন্ধতী

ঐ দেখ অরুন্ধতী।

নববধূ, নতুন প্রণীতা,
দাঁড়াও নির্জনে এসে
অন্ধকারে, মৌন মুক্ত আকাশের নিচে,
মাধ্য-আকর্ষণ ভুলে
ঊর্ধ্বে চোখ তুলে।

ঐ দূরে, আরো দূরে, আকাশের অগোচর কোণে
সর্ব গর্ব-চূড়ান্তের একান্ত উপরে
ঐ দেখ জেগে আছে স্ফুট স্বচ্ছ প্রত্যক্ষ যে তারা
দেখেছ কি ? দেখ দেখ অনন্যনয়নে।
দেখেছি দেখেছি—
ঐ তবে অরুন্ধতী ?

না, না, আগে স্পষ্টে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির করো,
তারপরে অনিমেষে চেয়ে দেখ, তার পাশে
আছে আরো, আরেকটি তারা,
ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট, ধূসর।
দেখেছ কি ?

দেখেছি, দেখেছি—প্রচ্ছন্ন তন্দ্রিল অনুজ্জ্বল
পার্শ্ববর্তী সেই তারা, ক্ষীণদ্যুতি,
সেই অরুন্ধতী।

আগে দৃষ্টি স্থির করো স্থূলে, জড়ে, সজাগে, সজীবে,
বাস্তবে পার্থিবে,
তারপরে তার পাশে সন্নিহিতে করো উত্তরণ—
শরীরেই বন্ধ নয় জীবনজ্যামিতি
শরীরেই সাঙ্গ নয় সমস্ত যন্ত্রণা।

আগে দৃষ্টি স্থির করো কামে
উজ্জ্বলে উদ্দামে,
তারপরে তার পাশে কক্ষান্তরে সত্তান্তর
প্রেমে ও প্রণামে ॥

১৩৭১

পাকদণ্ডি

পাকদণ্ডি কিছুতে খোলে না—
এ শুধু অনন্তে টানা
দীর্ঘ এক ক্রন্দনের রেখা।
কিছুতেই নেই শেষ গ্রন্থির মোচন—
যতই টানুক দুঃশাসন
নীবীবন্ধ অব্যাহত, স্তূপাকার কেবল বসন।
এ বেদনা সর্বাঙ্গব্যাপিনী
অষ্টপাশ-অক্টোপাসে বাঁধা,
যতই সমিধ আনি এ যজ্ঞের হয় না সমাধা
এ আগুন জানে না নির্বাণ—
তবু যে আগুন জ্বলে সে গৌরবে
জলাশয় নেই থাক
করি শুধু ইন্ধন-সন্ধান।

চেতনার গুহা হতে এই যে অকুণ্ঠ আর্তনাদ
যন্ত্রণার পরিপ্রেক্ষে এই জেনো
জীবনের অগাধ আহ্লাদ,
স্পষ্টস্বর শুদ্ধ মন্ত্রপাঠে আজন্মের প্রাণের অর্চনা।
বিষদুষ্ট অবয়বে অস্ত্র-উপাচারে
আছে বুঝি রোগহর গূঢ় শক্তি—
তাই সে বিশ্বাসে
বুক ঠেলে যত কান্না—যত স্ফূর্তি আসে।

এই যে চিৎকার
ভাষান্তরে রসোজ্জ্বল আনন্দ-উৎসার।
অন্তত এ চিৎকারে যে আছে অধিকার
জীবনে তা পরম অর্জন—
একমাত্র সেই আয়ে চালাই সংসার
সুধায়িত করে তুলি তিক্ত কালকূট।

ঘোড়া দুটো বল্গাছুট
সারথি তো কবে পলাতক
একচক্র রথ—
তবু চলি অহোরাত্র অনিরুদ্ধ বেগের উৎসাহে
দাহ হতে দাহে,
পথ না পাওয়ার ক্লান্তি এ অরণ্যে একমাত্র পথ॥

১৩৭১

মন্ত্র

শুধু এক মন্ত্র আছে নাম তার অভী,
শুধু এক গন্ধ আছে অধ্যাত্ম-সুরভি

নাটক

এ নাটকে আমারও ছিল কিছু পাঠ—
নয় কোনো প্রণয়ী নায়ক, নয় বা সম্রাট,
বীর যোদ্ধা মন্ত্রী নয়, নয় বা অমাত্য সভাসদ,
নয় কোনো গীতবাদ্যনৃত্যবিশারদ,
নয় কোনো দূত বা প্রহরী দৌবারিক
সিংহ নয়, নয় বা মূষিক,
পড়ি নাই কোনো বাঁধা ছকে
আমি এক মৃত সৈন্য সেজেছি নাটকে॥

মৃত বলে নির্বাচিত নিঃসঙ্গ আমারে
রঙ্গমঞ্চে ধীরে ধীরে বয়ে নিয়ে আসে
খাটে ক'রে বাহকের দল,
রাখে পাদপ্রদীপের ধারে
অকাট্য প্রমাণ। স্তব্ধ হয়ে থাকি শুয়ে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
দু মিনিট, শূন্য অচঞ্চল
শক্ত শুষ্ক কাঠ,
জীবনাট্যে এই মোর মৃত এক সৈনিকের পাঠ।

আমি জানি আমারো অনেক মূল্য
নাটকের সফলীকরণে।
অসতর্কে যদি বা কুক্ষণে
সামান্যও নড়ি-চড়ি, তুলি হাই,
পেট-বুক যদি বা দোলাই,
মুহূর্তেই ক'রে দিতে পারি আমি সমস্ত ভণ্ডুল,
দর্শকের উচ্ছ্বসিত উপহাসে ব্যর্থ ক'রে দিতে পারি
সমস্ত নাটক। কিন্তু রহি স্থির, অনাকুল,
সাজঘরে যাই নাকো ফিরে,
রচনারে মেনে নিই নাটকের রসের খাতিরে।

ভুলি না তিলেক,
বিরাট এঞ্জিনে আমি সামান্য পেরেক,
তুচ্ছ বলটু-নাট—
নিজ স্থানে স্থির থাকি,
নাটকেরে চালু রাখি
ঠিক-ঠিক করে যাই পাঠ॥

১৩৭১

ত্রিত্রি-নে

দু' চোখে প্রথম তৃপ্তি, তোমারেই দেখি, সনাতনী,
আদ্যোপান্ত, অফুরন্ত, ঘনীভূত হয়ে আছ স্থূলে,
কনক-উত্তমা-কান্তি সম্ভোগের সৌভাগ্যরজনী
লাবণ্যের স্বরলিপি উচ্চারিত মৃদুলে-পৃথুলে।

তারপর চেয়ে দেখি, দেহ নয়, তুমি শুধু প্রাণ
যে অলঙ্ঘ্য সত্তাশক্তি নিখিলেরে রয়েছে আবরি
গতি দ্যুতি পরিস্পন্দ—সূর্য হতে তৃণে কম্পমান—
তারি এক স্ফূর্তি তুমি এক কণা ছন্দের লহরী।

শেষে দেখি তুমি কোথা, শুধু আমি, আমার চেতনা,
আমার অস্তিত্ব সব—সমস্ত আমার প্রণয়ন—
আমারি যন্ত্রণা তুমি, আত্মভূতা, আমারি প্রার্থনা,
ব্রহ্মাণ্ড আমার ভাণ্ডে, তুমি শুধু আত্মায় রমণ ॥

১৩৭১

শেষ ইচ্ছা

একটি মুহূর্তমাত্র বাকি
ক্ষুদ্র এক পলকপতন—
খরমরুপরিখিন্ন পথে চ'লে এসেছি একাকী
দাঁড়ায়েছি নিঃস্ব নিষ্কেতন
যেখানে পায়ের নিচে শেষ পাটাতন।
দাঁড়ায়েছি পিছমোড়া দিয়ে হাত বাঁধা
সম্মুখে নিশ্চিত মৃত্যু সমস্তসমাধা
জীবনের ব্যর্থ আয়ুর্বেদী,
আমি তুমি সকলেই ফাঁসির কয়েদী।
এখুনিই থেমে যাবে ঘড়ি
টেনে দেবে দড়ি
পাটাতন সরে যাবে মহাত্রাস গ্রাসিবে শর্বরী।

কী তোমার শেষ ইচ্ছা ? প্রহরীর কণ্ঠ ওঠে স্ফুরে।
শেষ ইচ্ছা, দেখে যাই নবজাত একটি শিশুরে,
দেখে যাই সদ্য শুদ্ধ অচিহ্নিত আরম্ভের কাল,
আর কোনো সাধ নয়
দেখে যাই অনাময়
একটি অপাপবিদ্ধ নির্মল সকাল।
আবার সকাল ॥

১৩৭১

অঙ্কুর

প্রত্যাশা রাখে না কারো আপন শক্তিতে ভরপুর
পাষাণী মৃত্তিকা ভেদি নিরংকুশ জাগিছে অংকুর।
চাহেনা বৃষ্টির ধারা না বা বিন্দু শিশিরের স্বাদ
আজন্ম বাধার থেকে টেনে নেয় জীবন-প্রসাদ ॥

১৩৬৯

কোনো সন্ন্যাসিনীর প্রতি কোনো সন্ন্যাসী

বিদ্রোহিনী, বৈরাগ্যলতিকা,
বিপরীত-গতাতুরা,
চেয়ে দেখ, আমি সেই নিঃসঙ্গ বৈরাগী
তোমার দারুণ দগ্ধ দীর্ঘ শিবপ্রহর।
অরণ্যে অনেক কাল করেছি সন্ধান একা-একা
নিরুদ্দেশে, শুধুই তা অরণ্যে রোদন।
অগম্য রহস্যভরা তুমিই আদিম বন
দুষ্প্রবেশ। এবার সমস্ত কান্না
তোমার তিমিরে।

একাকিত্বে অমরত্ব নেই,
অমরত্ব একমাত্র তোমার গহনে।
অভঙ্গ বাসনা তুমি আজন্ম সুরভি
সর্ব অঙ্গে দীপান্বিতা
অস্তি-ভাতি-প্রিয়তারূপিণী,
তুমিই শ্রেয়সী তৃপ্তি, পূর্তি গরীয়সী।
নাও ডেকে পথিকেরে নৈষ্ফল্যের নিরাশ্রয় থেকে
তোমার উত্তপ্ত ঘন সহিষ্ণু আলয়ে
এঁকে দাও প্রাঞ্জল স্বাক্ষর
চিরন্তন সন্ধির স্বীকৃতি ;
শূন্য হাতে তুলে দাও পূর্ণতার ঘট
অনন্তের খাদ্য দিয়ে ভরা।

তারপরে ফেলে দিই এই মিথ্যা দিব্য কলেবর,
তুমিও বর্জন করো বৈকল্যের গৈরিক বঞ্চনা,
উন্মোচিত হই দোঁহে রূপ হতে কোন অপরূপে
অবিচ্ছেদে অন্য পরিচ্ছেদে
অনিয়মে অনাচারে অলজ্জ উজ্জ্বল দুঃসাহসে
তামসে চাক্ষুষে অন্তহীন।
অল্পে খণ্ডে সুখ নেই এই এক তুঙ্গ হাহাকারে
সন্ন্যাসিনী, সাঙ্গ করি আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির সাধনা।
অতীন্দ্রিয় যদি কোথা থাকে
আছে তাহা রতীন্দ্রিয়ে,
কৃশানুকপাল রুদ্র শান্ত নাহি হলে
জাগে না তো সুধাংশুশেখর।

বিদারিণী, নির্ঝরিণী, মঞ্জুল-উজ্জ্বলা,
তোমার অক্ষত উৎসে পাতি হাত
রাখি মোর তৃষিত অধর,
মায়াবিনী, প্রাণ দাও, গান দাও,
দাও তপ্ত আয়ুষ্কর প্রেম,
এনে দাও পুনর্জন্ম বিস্মৃতা সে মৃতা কবিতার।
হিরণ্য পাত্রের মুখ খুলে দিলে
যেই সত্য উদ্ঘাটিত
তুমি সেই পরমা প্রতীতি,
যোগ-ভোগ-মোক্ষদা মৃত্তিকা—
ভূমিতেই ভূমার পদবী,
সাধনা সমাধি সিদ্ধি সমস্ত সংসারে॥

সংবাদ

এ আস্বাদও নিয়ে যাব
চিত্তবৃত্তিনিরোধের সুখ।
চঞ্চলের চূড়ার ওপারে
জেনে যাব কাকে বলে প্রশান্তবাহিতা।

তৃষ্ণা নিত্য তরুণায়মান
দহনে তর্পণ নেই,
শুষ্ক বনে অনলের নিরন্ত বিস্তার
ক্রমান্বিত। এইবার দেখে যাব
অতৃণে পতিত বহ্নি—
জেনে যাব কাকে বলে জ্যোতি নিরিন্ধন।

দক্ষিণে সুরার পাত্র, বামে বামা রমণকুশলা
অবাধিতসম্ভাষণা—
পার হয়ে চলে যাব
মরিচমিশ্রিত তপ্ত আমিষের রাত,
চলে যাব আরেক নতুন দেশে, অমল আলয়ে,
নিরস্তকুহকে ;
চলে যাব স্বতঃশান্ত নিবৃত্তির তটে
অবারিত শুদ্ধ-স্বত্বে, নিষ্কামে-বিরামে।
সংস্কারকিঙ্কর শুধু নই,
আমি শিল্পী জীবনের, ক্রান্তদর্শী, চতুরনিপুণ
সজ্ঞানজাগ্রত—
স্মরখরশরবিদ্ধ তাই এ দেহেরে
ক'রে যাব অমৃতের দীপস্তম্ভ
বার্তাবহ অন্য বর্তিকার।
জেনে যাব কাকে বলে চেতনার আরোহণ,
উচ্চাকিতে সহস্র পদ্মের বিস্ফোরণ
প্রাণের মৃণালে—
প্রাণই পরম বন্ধু পরম উপায়—
সেই পূর্ণ প্রাণের অর্জনে
জেনে যাব কাকে বলে ব্রাহ্মী স্থিতি।
দেখে যাব সর্ব দিকে সর্ব অবস্থায়
বহমানা শুধু এক ধারা—
মাধ্বী ধারা।

তারপরে বৃত্তশেষে, হে নবীনা সুভগাসুরমা,
আবার দাঁড়াবে তুমি দুয়ারে আমার,
করালী কামনা নও, তুমি চিদ্‌গগনচন্দ্রিকা,
সর্বাঙ্গে মঙ্গলমুদ্রা,

ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াবে নীরবে,
বিশারদী শুভ্র বুদ্ধি—
নিয়ে যাবে জীবনের শেষ আশীর্বাদ
ঊর্ধ্বের সংবাদ ॥

ভয়

চঞ্চল দুরন্ত শিশু ঘরময় ছুটোছুটি ক'রে
টেবিলে ঠোক্কর খেলে
ক্রুদ্ধ হয়ে মারে সে টেবিলে,
যেন, হায়, যত দোষ ক্ষুদ্র টেবিলের।

আদ্যো মৌলে প্রকৃতি নিষ্পাপ,
অম্লান পদ্মের মালা কুমারীর প্রথম শরীর—
যত মন্দ মানুষের মনে।
বৃশ্চিকের বক্র বাসা চিন্তার গহনে
কুটিলের জটিল জঙ্গলে।
বোমারে কে ভয় করে ?
যত ভয় মানুষেরে, যে মানুষ অগাধ কৌশলে
তৈরি করে সেই বোমা, আর শেষে ছোঁড়ে,
দিকে-দিকে মুঠো-মুঠো ছড়ায় মহিমা
নাগাসাকি আর হিরোসিমা।

টেবিলেরে কোথায় সরাবে ?
কোন কোণে ? কোন শুভ শূন্যতার দিকে ?
আণবিকে ভয় নেই, ভয় মানবিকে ॥

দুই ঘর

দু'-ঘরি প্রজাই স্বত্ব এই জীবনের,
যুগপৎ থাকি দুই ঘরে,
এক ঘর জড়ের কোটরে
অন্য ঘর অনন্তের দিকে,
আকাশে প্রতীকে।

উদাসিনী এক ঘরে, অন্য ঘরে তুমি বিলাসিনী
বাসনা-বাসিনী,
রসে-বিষে সমন্বিতা পৌর্ণমাসী তুমি প্রহাসনী
কামে-কামে প্রেমোত্তমা।
উমা আর অমা
দুই নামে পরিচিতা—অসীমা, সুষমা।
একজন বিবাহিতা অন্যজন প্রিয়া পরকীয়া
অমেয়-অমিয়া।
এক ঘর অনুদ্বেল শান্তির পাথার
অন্য ঘর মহানন্দ-চমৎকার বিপুল ঝঙ্কার—
ঘনিষ্ঠ নিষ্ঠুর।
এক তন্ত্রে ধরি দুই সুর
তন্দ্রাতৃপ্ত আর তৃষ্ণাতুর
মদির মেদুর।
একে একে দুই নয়, দুয়ে মিলে অখণ্ড জ্যামিতি
এক উপস্থিতি।

ধুলায় ধ্রুপদী সত্তা, আকাশেরে কেন তবে ডর?
এক ঘরে মানুষের মেলা, অন্য ঘরে থাকুক ঈশ্বর॥

১৩৭১

পূর্ণের প্রতিমা

আমারই প্রেমের কীর্তি, তুমি নারী, সমস্তসুন্দরী,
সমস্ত তোমার মধ্যে।
পূর্ণের প্রতিমা তুমি, নিপুণ নির্মিতি—
সর্বভদ্রা সর্বপ্রকাশিকা।

বাদলবিমর্ষ রাতে নিশ্চিন্ত নিষ্কম্প শিখা
তুমি স্থির জননীর স্নেহ,
দুখানি নির্মল হাতে নিরলস সেবা
স্নিগ্ধা ভগিনীর।
তুমি কন্যা, চিত্তের পুত্তলী
কলস্বনা নির্ঝরিণী
অঙ্গনে অলিন্দে গৃহে উচ্ছলা চপলা।
তুমি ছাত্রী শ্রদ্ধার বিমল জ্যোতি
বিশুদ্ধ আননে।
তুমি সখী সহচরী নর্মের গেহিনী
রসে-ভাবে পারঙ্গমা।
দুরূহে দুর্গমে তুমি মন্ত্রী সুদক্ষিণা
বিচারে সিদ্ধান্তে দ্রুত সূক্ষ্ম বিচক্ষণ।
তারপরে ?
তারপরে মনোরথপ্রিয়তমা শয়নে গণিকা
শুভ্রশোভাশুভান্বিতা
লজ্জাবতী নবীন সঙ্গমে
কালক্রমে চমৎকার স্ফুরৎবিভ্রমা
কেলি-লীলা-সম্ভোগরসিকা
আনন্দিত কন্দর্পমন্দিরে।
তারপরে ?
তারপরে আরো আছে।
সর্বসমারোহশেষে
তুমি এক তপস্বিনী বিরতির ছবি

ঋতম্ভরা পরাবিদ্যা অমৃতবাদিনী,
উৎসাহে প্রাণনে উর্জে
তুমি এক আদিগন্ত মহাতীব্র
ঈশ্বর-আস্পৃহা।
সমস্ত প্রেমের সৃষ্টি
সমস্ত প্রেমের শক্তি
দায়িত্ব প্রেমের।

অন্যত্র যাব না আমি তুমি সব অন্যত্রের কথা।
পূর্ণের বাঁশির রন্ধ্রে একমাত্র আকাশ-শূন্যতা॥

১৩৭২

প্রেম

১

আকাশের দেশ নেই প্রেমের বয়েস নেই
প্রেম শুধু প্রেম
ধনে-ঋণে ভেদ নেই মৃত্যুতে উচ্ছেদ নেই
সর্বদা কায়েম॥

২

একবার বলো ভালোবাসো
চোখের উপরে স্থির চোখ রেখে হাসো,
তারপর চেয়ে দেখ অন্ধকারে কোন সূর্য খসে,
অরণ্য উদ্বেলি ওঠে অজস্র ফুলের দুঃসাহসে।
সমুদ্রকে তুলে নেয় কৃপণ গণ্ডূষ
তোমার বৈরাগী বুকে আবিষ্কার করো এক বাউলপুরুষ॥

৩

আমি কি, তোমার শোকে সান্ত্বনায় নেমে আসা শুধু এক সন্ধ্যার প্রস্তাব ?
সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রি হয়
কী বিস্ময়
তুমি ক্রমে হয়ে ওঠো জুঁই-ফুল-ভরা এক সোনার রেকাব।
সান্ত্বনা তো ছোট কথা
অস্বচ্ছতা—
দেখা দেয় বাণবিদ্ধ যন্ত্রণার আনন্দ-আলোক.
শোক হয় শ্লোক।
ঘুচে যায় যত্নকৃত বিষয়ের ভার
শিলা থেকে শিল্পের উদ্ধার ॥

পৌঁছখবর

পেঁাছখবর চেয়েছিলে
কিন্তু এ আমি কোথায় এসে পেঁাছলাম.
আমারই পরিচিত আবাসে
না কি কোন শিহরিত সৌধচূড়ায় ?
তুমি যেতে বারণ করেছিলে—
কী জট-পাকানো বদ্ধ গলিতে তুমি থাকো
সে কোথায় কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুর
খুঁজে বার করতেই পারব না।
দুর্দান্ত ভিড়ে বাসে-ট্রামে ওঠা নামা.
তারপর খানিকটা না হয় রিকশা
তারপর স্রেফ পায়ে-হাঁটা
অলি গলি খানা-খন্দ
মাঝখানে একটা আবার মাঠ,
লেভেল-ক্রসিং—
তারপরে কী কাঠফাটা রোদ বলো দিকি ?
স্যাণ্ডেলের আবার একটা স্ট্র্যাপ গিয়েছে ছিঁড়ে।

কিন্তু জানো, পথ মনে হল
রাস-রাত্রে বেজে-ওঠা কৃষ্ণের বাঁশরি।
পথের দুঃখ অনেক—
তোমাকে দেখতে যাওয়ার সেই দুঃখ
তোমাকে দেখতে পাওয়ার সুখ হয়ে গেল।
অনন্ত দুঃখকে মুছে নিল এক পলকের সুখ।
এক পলকেই অনন্ত নিষ্পলক।
এখন বলো এত ঐশ্বর্য আমি রাখি কোথায়?

'পথের ধুলায়।'
লিখলাম: 'পথের ধুলাকেই যদি না সোনা করে,
তবে চরাচরে
অবাস্তব
এ প্রেমের কিসের গৌরব?'

১৩৭২

পূব-পশ্চিম

তোমাকে

পূব-পশ্চিম

তোমার শীতললক্ষ্যা আর আমার ময়ূরাক্ষী
তোমার ভৈরব আর আমার রূপনারায়ণ
তোমার কর্ণফুলি আর আমার শিলাবতী
তোমার পায়রা আর আমার পিয়ালী
এক জল এক ঢেউ এক ধারা
একই শীতল অতল অবগাহন, শুভদায়িনী শান্তি।
তোমার চোখের আকাশের রোদ আমার চোখের উঠোনে এসে পড়ে
আমার ভাবনার বাতাস তোমার ভাবনার বাগানে ফুল ফোটায়।

তোমার নারকেল শুপুরি অশোক শিমুল
আমার তাল খেজুর শাল মহুয়া
এক ছায়া এক মায়া একই মুকুল-মঞ্জরী।
তোমার ভাটিয়াল আমার গম্ভীরা
তোমার সারি-জারি আমার বাউল
এক সুর এক টান একই অকূলের আকূতি।
তোমার টাঙ্গাইল আমার ধনেখালি
তোমার জামদানি আমার বালুচর
এক সুতো এক ছন্দ একই লাবণ্যের টানা-পোড়েন
চলেছে একই রূপনগরের হাতছানিতে।

আমরা এক বৃন্তে দুই ফুল, এক মাঠে দুই ফসল
আমাদের খাঁচার ভিতরে একই অচিন পাখির আনাগোনা।
আমার দেবতার থানে তুমি বটের ঝুরিতে সুতো বাঁধো
আমি তোমার পীরের দরগায় চেরাগ জ্বালি।
আমার স্তোত্রপাঠ তোমাকে ডাকে
তোমার আজান আমাকে খুঁজে বেড়ায়।
আমাদের এক সুখ এক কান্না এক পিপাসা
ভূগোলে ইতিহাসে আমরা এক
এক মন এক মানুষ এক মাটি এক মমতা।
পরস্পর আমরা পর নই
আমরা পড়শি আর—পড়শিই তো আরশির মুখ
তুমি সুলতানা আমি অপূর্ব
আমি মহবুব তুমি শ্যামলী।

আমাদের শত্রুও সেই এক
যারা আমাদের আস্ত-মস্ত সোনার দেশকে খণ্ড-খণ্ড করেছে
যারা আমাদের রাখতে চায় বিচ্ছিন্ন ক'রে বিরূপ ক'রে বিমুখ ক'রে।
কিন্তু নদীর দুর্বার জলকে কে বাঁধবে
কে রুখবে বাতাসের অবাধ স্রোত
কে মুছে দেবে আমাদের মুখের ভাষা আমাদের রক্তের কবিতা
আমাদের হৃদয়ের গভীর গুঞ্জন ?
তুমি আমার ভাষা বলো আমি আনন্দকে দেখি
আমি তোমার ভাষা বলি তুমি আশ্চর্যকে দেখ
এই ভাষায় আমাদের আনন্দে-আশ্চর্যে সাক্ষাৎকার।
কার সাধ্য অমৃতদীপিত সূর্য-চন্দ্রকে কেড়ে নেবে আকাশ থেকে ?
আমাদের এক রবীন্দ্রনাথ এক নজরুল।
আমরা ভাষায় এক ভালোবাসায় এক মানবতায় এক
বিনা সুতোয় রাখী-বন্ধনের কারিগর
আমরাই একে অন্যের হৃদয়ের অনুবাদ
মর্মের মধুকর, মঙ্গলের দূত
আমরাই চিরন্তন কুশলসাধক ॥

১৩৭২

ছন্নছাড়া

গলির মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে
গাছ না গাছের প্রেতচ্ছায়া—
আঁকাবাঁকা শুকনো কতগুলি কাঠির কঙ্কাল
শূন্যের দিকে এলোমেলো তুলে দেওয়া,
রুক্ষ রুষ্ট রিক্ত জীর্ণ
লতা নেই পাতা নেই ছায়া নেই ছাল-বাকল নেই
নেই কোথাও এক আঁচড় সবুজের প্রতিশ্রুতি
এক বিন্দু সরসের সম্ভাবনা।

ঐ পথ দিয়ে
জরুরি দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি ক'রে।
ড্রাইভার বললে, ওদিকে যাব না।
দেখছেন না ছন্নছাড়া ক'টা বেকার ছোকরা
রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে—
চোঙা প্যাণ্ট, চোখা জুতো, রোখা মেজাজ, ঠোকা কপাল—
ওখান দিয়ে গেলেই গাড়ি থামিয়ে লিফট চাইবে,
বলবে, হাওয়া খাওয়ান।

কারা ওরা ?
চেনেন না ওদের ?
ওরা বিরাট এক নৈরাজ্যের—এক নেই-রাজ্যের বাসিন্দে।
ওদের কিছু নেই
থিত নেই ভিত নেই রীতি নেই নীতি নেই
আইন নেই কানুন নেই বিনয় নেই ভদ্রতা নেই
শ্লীলতা-শালীনতা নেই।
ঘেঁসবেন না ওদের কাছে।

কেন নেই ?
ওরা যে নেই-রাজ্যের বাসিন্দে—
ওদের জন্যে কলেজে সিট নেই
অফিসে চাকরি নেই
কারখানায় কাজ নেই
ট্রামে-বাসে জায়গা নেই
মেলায়-খেলায় টিকিট নেই
হাসপাতালে বেড নেই
বাড়িতে ঘর নেই
খেলবার মাঠ নেই
অনুসরণ করবার নেতা নেই
প্রেরণা-জাগানো প্রেম নেই
ওদের প্রতি সম্ভাষণে কারু দরদ নেই—
ঘরে-বাইরে উদাহরণ যা আছে
তা ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের উদাহরণ নয়,
তা সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ—
শুধু নিজের কোলের দিকে ঝোল-টানা।

এক ছিল মধ্যবিত্ত বাড়ির এক চিলতে ফালতু এক রক
তাও দিয়েছে লোপাট ক'রে।
তাই এখন পথে এসে দাঁড়িয়েছে সড়কের মাঝখানে।
কোত্থেকে আসছে সেই অতীতের স্মৃতি নেই।
কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বর্তমানের গতি নেই
কোথায় চলেছে নেই সেই ভবিষ্যতের ঠিকানা।

সেচ-হীন ক্ষেত
মণি-হীন চোখ
চোখ-হীন মুখ
একটা স্ফুলিঙ্গ-হীন ভিজে বারুদের স্তূপ।

আমি বললুম, না, ওখান দিয়েই যাব,
ওখান দিয়েই আমার শর্টকাট।
ওদের কাছাকাছি হতেই মুখ বাড়িয়ে
জিজ্ঞেস করলুম,
তোমাদের ট্যাক্সি লাগবে? লিফট চাই?
আরে এই তো ট্যাক্সি, এই তো ট্যাক্সি, লে হালুয়া,
সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ছোকরারা
সিটি দিয়ে উঠল
পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি, চল পানসি বেলঘরিয়া।
তিন-তিনটে ছোকরা উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে,
একজন ড্রাইভারের পাশে, দুজন পিছনের সিটে।
বললুম, কদ্দুর যাবে?
এই কাছেই। ঐ দেখতে পাচ্ছেন না ভিড়?
সিনেমা না, জলসা না, নয় কোনো ফিল্মী তারকার অভ্যর্থনা।
একটা নিরীহ লোক গাড়িচাপা পড়েছে,
চাপা দিয়ে গাড়িটা উধাও—
আমাদের দলের কয়েকজন গাড়িটার পিছে ধাওয়া করেছে
আমরা খালি ট্যাক্সি খুঁজছি।

কে সে লোক?
একটা বেওয়ারিশ ভিখিরি
রক্তে-মাংসে দলা পাকিয়ে গেছে।
ওর কেউ নেই কিছু নেই
শোবার জন্যে ফুটপাথ আছে তো মাথার উপরে ছাদ নেই,

ভিক্ষার জন্যে পাত্র একটা আছে তো
তার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ফুটো।

রক্তে মাখামাখি সেই দলা-পাকানো ভিখিরিকে
ওরা পাঁজাকোলে ক'রে ট্যাক্সির মধ্যে তুলে দিল।
চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে—আনন্দে ঝংকৃত হয়ে—
প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে।

রক্তের দাগ থেকে আমার ভব্যতা ও শালীনতাকে বাঁচাতে গিয়ে
আমি নেমে পড়লুম তাড়াতাড়ি।
তারপর সহসা শহরের সমস্ত কর্কশে-কঠিনে
সিমেণ্টে-কংক্রিটে
ইটে-কাঠে-পিচে-পাথরে দেয়ালে-দেয়ালে
বেজে উঠল এক দুর্বার উচ্চারণ
এক প্রত্যয়ের তপ্ত শঙ্খধ্বনি—
প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে,
প্রাণ থাকলেই স্থান আছে মান আছে
সমস্ত বাধা-নিষেধের বাইরেও
আছে অস্তিত্বের অধিকার।

ফিরে আসতেই দেখি
গলির মোড়ে গাছের সেই শুকনো বৈরাগ্য বিদীর্ণ ক'রে
বেরিয়ে পড়েছে হাজার-হাজার সোনালি কচি পাতা
মর্মরিত হচ্ছে বাতাসে,
দেখতে দেখতে গুচ্ছে-গুচ্ছে উথলে উঠেছে ফুল
ঢেলে দিয়েছে বুকের সুগন্ধ,
উড়ে এসেছে রঙ-বেরঙের পাখি
শুরু করেছে কলকণ্ঠের কাকলি,
ধীরে ধীরে ঘন পত্রপুঞ্জে ফেলেছে স্নেহার্দ্র দীর্ঘছায়া
যেন কোন শ্যামল আত্মীয়তা।
অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে দেখলুম
কঠোরের প্রচ্ছন্নে মাধুর্যের বিস্তীর্ণ আয়োজন।
প্রাণ আছে, প্রাণ আছে—শুধু প্রাণই এক আশ্চর্য সম্পদ
এক ক্ষয়হীন আশা
এক মৃত্যুহীন মর্যাদা॥

১৩৭২

উদ্বাস্তু

চল, তাড়াতাড়ি কর,
আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড় বেরিয়ে পড় এখুনি।
ভোররাতের স্বপ্নভরা আদুরে ঘুমটুকু নিয়ে
আর পাশ ফিরতে হবে না।
উঠে পড় গা ঝাড়া দিয়ে,
সময় নেই—
এমন সুযোগ আর আসবে না কোনো দিন।
বাছবাছাই না ক'রে হাতের কাছে যা পাস
তাই দিয়ে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে নে হুট ক'রে।
বেরিয়ে পড়,
দেরী করলেই পস্তাতে হবে
বেরিয়ে পড়—
ভূষণ পাল গোটা পরিবারটকে ঝড়ের মত নাড়া দিলে।
কত দূর দিগন্তের পথ—
এখান থেকে নৌকা ক'রে স্টিমার ঘাট
সেখান থেকে রেলস্টেশন—
কী মজা, আজ প্রথম ট্রেনে চাপবি,
ট্রেনে ক'রে চেকপোস্ট,
সেখান থেকে পায়ে হেঁটে—পায়ে হেঁটে—পায়ে হেঁটে—
ছোট ছেলেটা ঘুমমোছা চোখে জিজ্ঞেস করলে,
সেখান থেকে কোথায় বাবা ?
কোথায় আবার! আমাদের নিজের দেশে।
ছায়াঢাকা ডোবার ধারে হিজল গাছে
ঘুমভাঙা পাখিরা চেনা গলায় কিচিরমিচির করে উঠল।
জানলা দিয়ে বাইরে একবার তাকাল সেই ছোট ছেলে,
দেখলে তার কাটা ঘুড়িটা এখনো গাছের মগডালে
লটকে আছে,
হাওয়ায় ঠোক্কর খাচ্ছে তবুও কিছুতেই ছিঁড়ে পড়ছে না।
ঘাটের শান চ'টে গিয়ে যেখানে শ্যাওলা জমেছে
সেও করুণ চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করছে, কোথায় যাবে ?

হিজল গাছের ফুল টুপ টুপ ক'রে এখনো পড়ছে জলের উপর,
বলছে, যাবে কোথায় ?
তারপর একটু দূরেই মাঠে কালো মেঘের মত ধান হয়েছে—
লক্ষ্মীবিলাস ধান—
সোনা রঙ ধরবে ব'লে। তারও এক প্রশ্ন—যাবে কোথায় ?
আরো দূরে ছলছলাৎ পাগলী নদীর ঢেউ
তার উপরে চলেছে ভেসে পালতোলা ডিঙি ময়ূরপঙ্খি,
বলছে, আমাদের ফেলে কোথায় যাবে ?
আমরা কি তোমার গত জন্মের বন্ধু ?
এ জন্মের কেউ নই ? স্বজন নই ?

তাড়াতাড়ি কর—তাড়াতাড়ি কর—
ঝিকমিকি রোদ উঠে পড়ল যে।
আঙিনায় গোবরছড়া দিতে হবে না,
লেপতে হবে না পৈঁঠে-পিঁড়ে,
গরু দুইতে হবে না, খেতে দিতে হবে না,
মাঠে গিয়ে বেঁধে রাখতে হবে না।
দরজা খুলে দাও, যেখানে খুশি চ'লে যাক আমাদের মত।
আমাদের মত! কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায় ?
তা জানিনা। যেখানে যাচ্ছি সেখানে আছে কী ?
সব আছে। অনেক আছে, অঢেল আছে—
কত আশা কত বাসা কত হাসি কত গান
কত জন কত জায়গা কত জেল্লা কত জমক।
সেখানকার নদী কি এমনি মধুমতী ?
মাটি কি এমনি মমতামাখানো ?
ধান কি এমনি বৈকুণ্ঠবিলাস ?
সোনার মত ধান আর রুপোর মতো চাল ?
বাতাস কি এমনি হিজলফুলের গন্ধভরা
বুনো-বুনো মৃদু মৃদু ?
মানুষ কি সেখানে কম নিষ্ঠুর কম ফন্দিবাজ কম সুবিধেখোর ?
তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো—
ভূষণ এবার স্ত্রী সুবালার উপর ধমকে উঠল:
কী অত বাছাবাছি বাঁধাবাঁধি করছ,
সব ফেলে ছড়িয়ে টুকরো-টুকরো ক'রে এপাশে-ওপাশে বিলিয়ে দিয়ে
জোর কদমে এগিয়ে চলো,

শেষ পর্যন্ত চলুক থামুক ট্রেনে গিয়ে সোয়ার হও,
সোয়ার হতে পারলেই নিশ্চিন্ত।
চারধারে কী দেখছিস ? ছেলেকে ঠেলা দিল ভূষণ—
জলা-জংলার দেশ, দেখবার আছে কী !
একটা কানা পকুর
একটা ছেঁচা বাঁশের ভাঙা ঘর
একটা একফসলী মাঠ
একটা ঘাসী নৌকো—
আসল জিনিস দেখবি তো চল ওপারে,
আমাদের নিজের দেশে, নতুন দেশে,
নতুন দেশের নতুন জিনিস—মানুষ নয়, জিনিস—
সে জিনিসের নাম কী ?
নতুন জিনিসের নতুন নাম—উদ্বাস্তু।

ওরা কারা চলেছে আমাদের আগে-আগে—ওরা কারা ?
ওরাও উদ্বাস্তু।
কত ওরা জেল খেটেছে তকলি কেটেছে
হত্যে দিয়েছে সত্যের দুয়ারে,
কত ওরা মারের পাহাড় ডিঙিয়ে গিয়েছে
পেরিয়ে গিয়েছে কত কষ্টক্লেশের সমুদ্র,
তারপর পথে-পথে কত ওরা মিছিল করেছে
সকলের সমান হয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে,
পায়ে-পায়ে রক্ত ঝরিয়ে—

কিন্তু ক্লান্ত যাত্রার শেষ পরিচ্ছেদে এসে
ছেঁড়াখোঁড়া খুবলে-নেওয়া মানচিত্রে
যেন হঠাৎ দেখতে পেল আলো-ঝলমল ইন্দ্রপুরীর ইশারা,
ছুটল দিশেহারা হয়ে
এত দিনের পরিশ্রমের বেতন নিতে
মসনদে গদীয়ান হয়ে বসতে
ঠেস দিতে বিস্ফারিত উপশমের তাকিয়ায়।
পথের কুশকণ্টককে যারা একদিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি
আজ দেখছে সে-পথে লাল শালু পাতা হয়েছে কিনা,
ড্রয়িংরুমে পা রাখবার জন্যে আছে কিনা
বিঘৎ-পুরু ভেলভেটের কার্পেট।

ত্যাগব্রতের যাবজ্জীবন উদাহরণ হয়ে থাকবে ব'লে
যারা এত দিন ট্রেনের থার্ড ক্লাসে চড়েছে
সাধারণ মানুষের দুঃখদৈন্যের শরিক হয়ে
তারাই চলেছে এখন রকমারি তকমার চোপদার সাজানো
দশঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে
পথচারীদের হটিয়ে দিয়ে, তফাৎ ক'রে দিয়ে
সমস্ত সামনেওয়ালাকে পিছনে ফেলে
পর-ঘর বিদেশী বানিয়ে।
হ্যাঁ, ওরাও উদ্বাস্তু।
কেউ উৎখাত ভিটেমাটি থেকে
কেউ উৎখাত আদর্শ থেকে।

আরো আগে, ইতিহাসেরও আগে, ওরা কারা ?
ঐ ইন্দ্রপুরী—ইন্দ্রপ্রস্থ থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছে
হিমালয়ের দিকে—
মহাভারতের মহাপ্রস্থানের পঞ্চনায়ক ও তাদের সঙ্গিনী
স্ব-স্বরূপ-অনুরূপা—
যুদ্ধ জয় ক'রেও যারা সিংহাসনে গিয়ে বসল না
কর্ম উদ্‌যাপন ক'রেও যারা লোলুপ হাতে
কর্মফল বণ্টন করল না নিজেদের মধ্যে,
ফলত্যাগ করে কর্মের আদর্শকে রেখে গেল উঁচু ক'রে,
দেখিয়ে গেল প্রথমেই পতন হল দ্রৌপদীর—
পক্ষপাতিতার।
তারপর একে একে পড়ল আর সব অহঙ্কার
রূপের বিদ্যার বলের লোভের—আগ্রাসের—
আরো দেখাল। দেখাল—
শুধু যুধিষ্ঠিরই পৌঁছয়
যে হেতু সে ঘৃণ্য বলে তুচ্ছ বলে পশু বলে
পথের সহচর কুকুরকেও ছাড়ে না।

১৩৭২

চাঁদ

এ আমি আগেই জানতাম,
আর এও জানতাম
অনেক তৃষ্ণার মত এ জানার তৃষ্ণাও
আমাকে জেরবার করে ছাড়বে।

উদ্বেল কান্তির ঘরে গর্বের পালঙ্কে
আলস্য-লাস্যের ধবধবে বিছানায়
আমিই তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম,
ঢেকে রেখেছিলাম কত নম্র আচ্ছাদনে
কত বিনোদ-বিন্যাসে, স্বপ্নের বেনারসিতে,
কত দুরূহ সূক্ষ্মতার কারুকার্যে।
কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে পড়লেও, সুভঙ্গাঙ্গী, তোমার রহস্য ঘুমোয় না,
ঘুমোয় না আমার জিজ্ঞাসার পিপাসা।

আমি জানতাম, জানবার জন্যে আমাকে
উন্মাদ হতে হবে
বেগান্ধ হয়ে ছুটতে হবে দিকবিদিকে,
শেষ পর্যন্ত না পৌঁছে আমি ক্ষান্ত হব না—
শেষ পর্যন্ত পৌঁছুবার জন্যেই তো আমার জীবনযাত্রা।
জানতে হবে কোন সুদূরে-নিগূঢ়ে
গোপন সেই গহন উৎস
যার থেকে উচ্ছ্রিত তোমার এই মাধুরীর চাতুরী।
কোথায় কোন কক্ষে আকাঙ্ক্ষার আলো
কোন কক্ষে স্নান-মার্জন-প্রসাধন লিখন-লেপন,
কোথায় বা সঞ্চিত বাসনার সোনার সিন্দুক।
জানতাম জানবার দুর্দান্ত আগ্রহে
আমাকে যেতে হবে চোর-কুঠুরির অন্ধকারে,
কোথায় তোমার সেই উদ্ঘাটনী রহস্যের কুঞ্চিকা।

তাই ব্যগ্র হাতে তোমার আচ্ছাদন সরিয়ে দিতে চাইলাম
স্তরে স্তরে ক্রমাগত উন্মীলনে
সরলীকরণে।
ফুটন্ত ফুলকে তীক্ষ্ন নখে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে দেখতে চাইলাম
কোথায় তার সুগন্ধের বাসা, তার রঙের আলপনার সাজঘর—
তোমাকে নিয়ে এলাম সহজের মসৃণ অনাবৃতিতে।
তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম নিথরে পাথরে
কোনো ভাষা লেখা আছে কিনা,
কোনো বা ভাষ্যের অবকাশ—
নেই, কিছু নেই, একটা বিসর্গ-অনুস্বারও নেই
আদ্যোপান্ত শুধু এক নিস্তব্ধ শূন্যতা।
লাবণ্যের বল্কল খুলে গেলাম আরো গভীরে
মেদমাংসেরও নিচে, রক্তের রাজত্ব পেরিয়ে,
কোথা থেকে আসে ওই প্রাণবিহঙ্গের কুহরন।
দেখলাম সেখানেও কেউ নেই, কিছু নেই—
তুমি শুধু এক অনিবার্য কঙ্কালের মালা।
তবু থামিনি,
নিয়ে এলাম রঞ্জনরশ্মি
দেখি কী ভেলকি খেলছে তোমার হাড়ের মধ্যে,
তোমার মজ্জার নির্যাসে।
কিন্তু কী দেখলাম? দেখলাম শুধু এক খেলা
তোমার দেহময় শুধু এক অঙ্গার হবার অঙ্গীকার।
মনে হল এ তুমি নও
এ শুধু আমার জানবার উন্মাদনার প্রচণ্ড পণ্ডশ্রমের পরিহাস।

তোমাকে আবার ফিরিয়ে আনলাম
তোমার সহজ সৌন্দর্যে
আটপৌরে আবরণে, দূরত্বের সীমাশ্রীতে।
তুমি আবার সহসা অনন্তের জিনিস হয়ে গেলে।
হয়ে গেলে সেই মনোহরের বন্দর
যেখানে তোমাকে নিয়ে অফুরন্ত বাণিজ্য মধুর।

চাঁদের অভিকর্ষ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম
আমরা পৃথিবীর টানের মধ্যে।

তারপর মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে
দেখলাম জ্যোৎস্নায় সমস্ত সংসার ভেসে যাচ্ছে,
তাকালাম চাঁদের দিকে।
না, এ নয়, মহাকাশে যেখানে আমরা গিয়েছিলাম
সে এ চাঁদ নয়,
এ চাঁদে কোনো দিন যাওয়া যায় না
এ চিরকাল আমাদের কম্পাসের বাইরে,
আমাদের মনের মানচিত্রে।
এ যে তুমি, আমার সেই ঠিকানাহীন রহস্যের রাজপুরী ॥

১৩৭২

ঢেউ ও ঢল

আলস্যের ফিতে দিয়ে বাঁধা,
অনেক অনিচ্ছা আর শৈথিল্যের ধুলোজমা ফাইলে
পড়লো এসে অকস্মাতের আঘাত।
হবে-হচ্ছে হবে-হচ্ছে
এই গয়ংগচ্ছতার উপরে
পড়লো এসে প্রলয়ের ঘাড়ধাক্কা—
কোথায় ফিতে, কোথায় ফাইল, কোথায় ফতোয়া!

কালও সুস্থ ভোর হবে
মানুষের এই নির্মল নিশ্চিন্ততার উপর
পড়লো এসে অকাট্য কুঠার।
কুড়ুলে মেঘে রাতভোর বৃষ্টি হবে
আর চোখভোর ঘুম—
সেই অর্জিত অভ্যাসের উপর
পড়লো এসে অঘটনের অট্টহাস।
গৈরিকাভ পাহাড়ি জল দেখতে-দেখতে
শাদা হয়ে গেল,

সর্বনাশের অপক্ষপাত শাদা
সমীকরণের শাদা—
উদ্ভিদের শেষ ঔদ্ধত্যটুকুও রইল না কোথাও।
কয়েদিরা জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে
বেরিয়ে এসে দেখলো,
এ আবার আরেক জেলখানা—
জলের জেলখানা—
জলে-জলে জনে-জনে কোথাও কোনো ব্যবধান নেই.
বেনারসি আর ধূলধূলে ন্যাকড়া ভেসেছে পাশাপাশি
ক্ষুধার পাশে ক্ষুধা, শীতের পাশে শীত, মুক্তির পাশে মৃত্যু।
মুছে গিয়েছে দেশ-বিদেশের সীমানা,
মানচিত্রের কপট রেখায়
জরিপ-করা জমির চৌহদ্দি।

কিন্তু ঢেউ, এই পর্যন্ত, আর নয়,
আর তুমি পারবে না এগোতে।
বাইরের সেতুই তুমি উড়িয়ে দিতে পারো,
কিন্তু কী করে ভাঙবে অন্তরের সেতু,
যে-সেতু মানবিকতার কংক্রিট দিয়ে গাঁথা!
কী করে ভাঙবে তুমি মানুষের ভালোবাসা,
এ যে তোমার প্রাকৃতিক জড়শক্তির চেয়েও
বিপুল দুর্বার, অন্ধের চেয়েও অন্ধতর?
আমরা যে সব এক ভূগোলের মধ্যে
একই মাধ্যাকর্ষণের শরিক
একই অন্তরীক্ষের সাক্ষী
একই গ্রহের বাসিন্দে।
আমরা যে একে-অন্যাকে হাতে ধ'রে বুকে ক'রে
বাঁচিয়ে তুলতে প্রতিশ্রুত।
তুমি ভাঙতে পারবে না আমাদের এই নিঃসমুদ্রের সেতু,
আবহমান রক্তের প্রতি অতলান্ত টান,
নিত্যনতুন দৃঢ়তর করে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা।

ঢেউ, ফিরে যাও, চল, ফিরে যাও,

দূরে দাঁড়িয়ে দেখ আমাদের
প্রাণের ঢেউ, মমতার ঢল ॥

১৩৭২

ঈশ্বর

বোলো না লজ্জার কথা—
আমি বৃদ্ধ অকর্মণ্য সংকীর্ণ কৃপণ
হৃতরাজ্য গতপ্রভ, ফিরি পথে পথে
দ্বার হতে দ্বারে,
কুখ্যাত অপুরস্কৃত ; বিশ্ব-ভবঘুরে—
বোলো না লজ্জার কথা,
আমারেও ভালোবাসে কিনা
নিগূঢ়চারিণী এক বিগাঢ়যৌবনা,
সে তরুণী মহাশোভা উৎসব-উজ্জ্বলা
রতিরাসপ্রহর্ষিণী
রজনীরঞ্জিনী।
বোলো না আশ্চর্য কথা
আমারেও নাকি ভালোবাসে !

কে জানে কী রহস্য দুরূহ,
আমি—আমি তার মনোনীত
সুনন্দ সর্বতোভদ্র সর্ববরেশ্বর !
বল, কী অদ্ভুত কথা—
আলো আলো, সুখদুঃখবিরহিত বিশুদ্ধ আগুন,
তার মাঝে প্রশ্ন নেই, কখন সে প্রজ্বলিত
কতক্ষণ ধ'রে। প্রশ্ন নেই
পুরাতন কিংবা আধুনিক, স্মৃতি না সম্প্রতি,
সে কি দূর প্রত্যূষের না কি সদ্য প্রদোষের শিখা !

আলো আলো, স্ফুলিঙ্গেই রয়েছে নিহিত
দাহ দীপ্তি তাপ তেজ, অতৃপ্তি মহান
দাবানল-বিশাল-প্রতিভা,
সেই অর্চি অর্চনীয়।
তেমনি এ প্রেম প্রেম, এ এক প্রাণায় স্বাহা
চিরন্তন হবি-দান পুরুষের কাছে।

কী অমোঘ রসায়নে কায়কল্প ঘটে যায়
দেহে আসে যযাতি-যৌবন,
ঝ'রে যায় শীতপত্র পাংশুল জীর্ণতা,
বেগে বীর্যে সৌভাগ্যে আরোগ্যে
জেগে ওঠে সুদুঃসহ সংসারপিপাসা
বিপাশা সে বন্ধনমোচনী,
নিয়ে আসে বিচিত্রের বাসনা-এষণা
উন্মোচিত হৃদয়ের আকাশ-বিকাশ।
দেখি জরা, কালকন্যা, ভীতত্রস্ত পলায়নপর
ক্লান্তি তার সহচরী দেখি দ্রুত প্রস্থান-উদ্যত
আর মৃত্যু, জীবনের পরম পাচক,
সেও দেখি অকস্মাৎ স্তম্ভিত, শীতল।

সর্ব-পূর্তি-সমর্থা সে
সে তরুণী সুহৃত্তমা উচিতরুচিরা
করে না তো জালাবৃত সংসাররচনা,
গতাগতকৌতূহলে নেই তার রুচি,
বলে, বন্ধু, মনস্পতি,
আমি তব সাধনার তাপসী তাপিনী
হব না তো সুখলভ্যা অভ্যাসগৃহীতা,
দূরে থেকে দৃঢ় থাকি, সন্নিকর্ষে অনাদর
নৈকট্যই আকীর্ণ কণ্টকে।
সর্বছন্দে অধিষ্ঠিতা
আমি তব জীবনের অন্ন ও অনন্নদাত্রী
প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিতা
অস্পর্শ হর্ষের রাজ্যে, নিশ্বাসবাসিনী,
আমি তব চিরদ্যুতি সৃষ্টির প্রেরণা।

সেই প্রেমে চেয়ে দেখি সিংহাসন-অধিরূঢ়
আমি এক অনশ্বর নিঃসঙ্গ ঈশ্বর,
সে তরুণী বুকে আঁকা
দীর্ঘ এক ক্রন্দনের রেখা,
আর সেই রেখা ধ'রে
শুধু সৃষ্টি—শুধু সৃষ্টি
শাশ্বতের সুপ্রশস্ত পটে ॥

১৯৭৩

নজরুল ইসলাম

হে বন্ধু, চোখ চাও,
তাকাও তোমার সেই স্বপ্নজাগানো মন্ত্রজাগানো চোখে
যে চোখে দেখেছিলে ধূমকেতুকে, শাতিল-আরবকে,
এ পারের গঙ্গা আর ও পারের গোমতীকে,
অজানিতা অনামিকা দোলনচাঁপাকে,
তাকাও তেমনি ক'রে।
তারপর মহাকালের ইন্দ্রজালে আচম্বিতে
কথা কয়ে ওঠো। দুর্বার দমকা হাওয়ায়
স্তব্ধতার নিকষপুরীর সবগুলি দরজা-জানলা খুলে দিয়ে
একসঙ্গে জেলে দাও তোমার রাশি-রাশি বাক্যের বিদ্যুচ্ছটা,
অন্ধ তামসী রাত্রিকে শতদীপশোভনা রাজেন্দ্রাণী ক'রে তোলো।
তারপর কইতে-কইতে হেসে ওঠো—
তোমার সেই অনর্গল অমল-উচ্ছল অকাপট্যের হাসি—
অকারণ বেঁচে থাকাই অবারণ হেসে থাকা।
অশব্দের নীরন্ধ্র আকাশে
উড়িয়ে দাও পাখাঝাপটানো শ্বেত মরালের দল
আশা নেই বাসা নেই, শুধু নিরুদ্দেশ যাত্রার
ভাষা দিয়ে ভরা।
জড়ত্ব-কারার লৌহ কপাট ভেঙে ফেলে দিয়ে

মূকের ছদ্মবেশ কেড়ে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
মুক্ত করো সেই মহান উন্মুখরকে—কথা কও, হেসে ওঠো,
তারপরে পরিপূর্ণ উচ্চারণে
রাজকীয় ঐশ্বর্যে, হৃদয়ের সমস্ত ভাণ্ডার ঢেলে দিয়ে
গান গেয়ে ওঠো—
'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর—নমো নমঃ, নমো নমঃ।'
পাষাণশায়িনী পরিত্যক্তা অহল্যার ঘুম ভাঙাও।
সেই চিররাত্রিজীবিনী অসূর্যম্পশ্যাকে
সূর্যকরোজ্জ্বলা ভুবনমোহিনীরূপে অভিষিক্ত করো।
হরজটাজালে বন্দী আছে যে মন্দাকিনী
তাকে স্বরতরঙ্গে উদ্ধারিত ক'রে দাও
মর্তের ধূলিতে—ঊষরে ধূসরে—
তারপর দিক-দেশ ভ'রে তোলো অমলে-শ্যামলে সজলে-সফলে
প্রাচুর্যে ঔদার্যে
বল্লভ প্রগলভতায়।

যে কারাগারের লৌহকপাট ভাঙতে চেয়েছিলে
'শেকল-বাঁধা পা নয় এ শেকল-ভাঙা কল' দিয়ে,
দেখ চেয়ে কবে তা লোপাট হয়ে গিয়েছে
এসেছে তোমার সেই আকাঙ্ক্ষিত বন্দিত-বাঞ্ছিত স্বাধীনতা।
তুমি কি পাচ্ছ না তার সৌরভ
শুনছ না তার মাঙ্গলিকী?
তবে তুমি কি যুদ্ধজয়ের উল্লাসে সমুদ্রের মত উদ্বেল হয়ে উঠবে না?
বীরদর্পে উঠে দাঁড়াবে না হিমাদ্রিশিখরের চেয়েও উঁচু হয়ে?
না কি অবসন্ন কণ্ঠে বলবে, পূর্ণ স্বাধীনতা মিলল কই?
কই মিলল ক্ষুধার থেকে মুক্তি; দারিদ্র্যের থেকে মুক্তি,
মুক্তি ক্রুর শোষণের থেকে?
তাই তুমি যাকে আপন হতে আপনার বলে জানতে
প্রাণঢালা মৃন্ময় মমতায়
সেই সব নিগৃহীত বঞ্চিত মানুষের দল—
মাঠের মানুষ কলের মানুষ দিন-খাটা দীনাতিদীন মানুষ
তোমার কাছে তারা আজ দাঁড়িয়েছে ভিড় করে।
চোখ চাও, তাদের বিদ্যুন্ময় বজ্রগর্ভ মন্ত্র দাও—

প্রাণ-উজ্জীবন মন্ত্র
ক্ষুধা-জয়ের মন্ত্র
অচ্যুত ও অসংশয়
বলো, গান গেয়ে ওঠো :
'এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয় ।'

জানি তুমি কথা কইবে না, গান গাইবে না,
মৌনভঙ্গ হবে না এখানে ।
আরো জানি এ মৌন তোমার ব্যাধি নয়,
এ তোমার যোগ—এ যোগসমাধি ।
তুমি নিঃস্ব নও, হৃতসর্বস্ব নও,
এ তোমার অক্ষুণ্ণ আত্মতত্ত্বে অবস্থান ।
এ শুধু দেহস্থিতি নয়, এ এক নবতর সত্তার উন্মোচন ।
এ সঙ্গীতের স্তব্ধতা নয়, এ স্তব্ধতার সঙ্গীত ।
আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখছ তুমি আরেক জগৎকে
আমাদের অন্ধকার গোলার্ধে রেখে
যেমন সূর্যের মুখফেরানো ।
আমাদের কাছে এ-দেশে যা নিশি তোমার কাছে ও-দেশে তা দিবা,
আমাদের কাছে যা অমা তোমার কাছে তাই পৌর্ণমাসী ।
আমাদের কাছে যা জড়তা তাই ও দেশে চৈতন্যের আরোহণ
চৈতন্যের ঝংকার ।
তাই এই অলীকপ্রপঞ্চের উর্ধ্বে
কোন অবাঙমানসগোচরকে দেখবার জন্যে
দুরারোগ্য প্রত্যাশায়
ব'সে আছে একাসনে ।
এ তোমার সুদৃঢ় নিষ্ঠা, ধ্রুব স্মৃতি, শরবৎ তন্ময়তা ।
বল্মীকের স্তূপে যেমন রত্নাকর
তেমনি জড়তার আবরণে তুমি আরেক ধ্যানলীন কবি,
বলো, কথা কয়ে ওঠো, বলো আরেক কথা—
রুদ্ধ যবনিকার পরপারের কথা
দুর্গম গহনের দুঃসাধ্য কথা—
বলো, আমি দেখেছি, দেখেছি সেই মহান পুরুষকে
সেই সর্বান্তর্বর্তী অন্তর্যামীকে
যাকে দেখলে মানুষের পরলোকে সর্বত্র আত্মদৃষ্টিতে
সমদর্শন ঘটে, সকলে সমান হয়ে যায় ।

আমাদের আশ্বস্ত করো
আমাদের দুঃস্বপ্নের শান্তিবিধান করো
তুমি নিরর্থক নও তুমি নিঃসঙ্গ নও তুমি নিঃশেষ নও,
তুমি জাগ্রত তুমি উত্থিত, তুমি স্বাদে-বোধে পরিপূর্ণ।
তুমি দেখেছ সর্বময় সত্যবস্তুকে—
বলো, ঘোষণা করো,
আমরা, অকিঞ্চনের দল, আমরা সবাই সেই সত্যবস্তু॥

১৩৭৩

আমূল

ছেঁড়ার উপর ছেঁড়া জোড়াতালি
অনেক সে গোঁজামিল,
খসেছে অনেক ইট-চুন-বালি
খিলেন এবং খিল।
চলবে না আর মেরামত করা
চলবে না চুনকাম,
ছুঁড়ে দাও সব দড়ি আর দড়া
সাবেক সরঞ্জাম।
হেলে গেছে চূড়া নড়ে গেছে ভিত
অথচ কী সুগঠন,
সমাধান তার চাই সমুচিত
সমূল উৎপাটন।
এবার গোড়ায় পড়বে কুড়ুল
নয় আর রাং-ঝাল,
শাখায়-শিকড়ে নত-নির্মূল
এবার বিজঞ্জাল।

ভেঙে যাবে ওই স্থবিরের জেদ
পলকে মুহূর্তেকে
পত্তন করো নতুন বনেদ
নতুন নক্সা এঁকে।

নির্মাণ করো নতুন মানুষ
আশিরচরণনখ
নতুন চোখের নতুন জলুস
সমান সংক্রামক।
খোলো জীবনের নতুন দুয়ার
দেখো নাক খণ্ডশ
কোথা হকিয়ৎ হক বা কাহার
আর বার দাম কষো।
যা কিছু শিখেছ ধরতাই বুলি
পাখিরে পড়ানো কথা
দেখবে চোখের খুলে গেলে ঠুলি
জোলো অপদার্থতা।
যা কিছু দেখেছ স্বার্থে নিহিত
মেলাবে তা পরাভবে
জীবন যখন হবে মনোনীত
নবতন অনুভবে।

বদলিয়ে ফেলা পৃথিবীর লোক
আজ থেকে হোক নীতি
চোখে উজ্জ্বল নতুন আলোক
আমূল নবীকৃতি।
এজমালি মাটি সবার দখলে
এক সুখ বাঁচবার,
জীবনের ভোজে আজকে সকলে
সমান অংশীদার॥

১৩৪৯

বৃত্ত

কারেও বলি না আমি কোন সে নির্জন বিত্তে হয়ে আছি ধনী
কোথা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি পথে বিশল্যকরণী
ব্যথাবাধাবিনশিনী নিগূঢ়া করুণা—
প্রতি দিন একই দিন সকল সময় সেই এক দুঃসময়
যা প্রাক্তনী চিরন্তনী ফিরে-ফিরে আবার অধুনা—
তারই মাঝে ধীরে-ধীরে করেছি সঞ্চয়
একটি অম্লান বিত্ত—নাম তার প্রত্যহ-প্রত্যয়।
হঠকারী জাগ্রত বিশ্বাস
অস্তিত্বের অমৃতনির্যাস
জ্বলন্ত পাষাণে, বারি, বিদ্যুৎ সে স্থির অনিমেষ
নিবিড় প্রাবৃটে, অন্ধকারে বিকাশবিশেষ,
এ প্রত্যয়
বন্ধু মোর অভিন্নহৃদয়
উত্তরঙ্গ সমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপ
মোর সর্বপথের প্রদীপ ॥

কী প্রত্যয় ? আছে আছে কোথাও না কোথাও তা আছে
না-হয় না-হোক কিছু, না বা থাক নাগালের কাছে
শুষ্ক কাঠে ঠিক আছে অব্যক্ত আগুন
ঠিক আছে আরণ্য প্রসূন।
হোক মাটি পরাঙ্মুখ, রুক্ষ রুষ্ট আস্তীর্ণ-উপল,
গহনে গভীরে আছে নীরধারা সুচির শীতল,
সে ধারাতে বন্যা আছে শস্যের সম্মতি
বীজের প্রচ্ছন্নে আছে রাজা বনস্পতি।
তেমনি যতই হই নিঃস্ব দুঃস্থ শূন্য নিষ্কিঞ্চন
আছে আছে আমারই মাঝে আছে স্থির আয়তন
নিত্য নিকেতন।
না থাক আমার কোনো স্থান
আমারই মাঝে আছে কোনো এক শুদ্ধ অধিষ্ঠান
সেই গর্বে আমি মহীয়ান।
বড় নিজে নাই হই বড় করে রেখেছি বড়াই
শুধু চেষ্টা শুধু নিষ্ঠা, তাই দিয়ে জীবনের পৃষ্ঠা ওলটাই ॥

অব্যক্তেরে দিতে নাহি পারি উচ্চারণ
শক্তি নাই নিহিতেরে করি নিষ্কাশন
পত্র পুষ্পে বিটপীর না বা উদ্বোধন,
তবু যত থাক অন্তরায়,
চেষ্টায় সমর্থ আমি পরিপূর্ণ কৃতার্থ চেষ্টায়।
এই ব্রতে না হই শিথিল,
করাল আকাশ কালো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মোর কাছে নিয়তসুশীল।
রিক্ততার শুষ্ক পথে যখন পেরেছি নিতে ব্যর্থতার ভার,
জীবনেরে মনে হয় কান্ত উপহার,
বিনম্র বদান্য নমস্কার।

যতদূরে প্রসারিত হোক দগ্ধ মরু-পাণ্ডুরতা
আমার বিশ্বাস তাতে ছায়া মেলে, রচে সরসতা,
দিন যত হোক না দুঃসহ
আমার বিশ্বাস তবু অপারতৃপ্তির বার্তাবহ।
যতই দুর্দিন দীন ঢালে তার দাহ
উৎস কভু না শুকায়, উৎসই উৎসাহ।
আকাশেরে ছিঁড়ুক ছুঁড়ুক যত বিসংবাদী ঝড়
ধরিত্রীরে হিংস্র ক্ষিপ্ত পশুর নখর,
আমার প্রত্যয় জেনো শান্ত স্থির দৃপ্ত প্রত্যুত্তর,
মহাশূন্যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর॥

১৩৭২

একক

অস্তিত্বের রক্তপদ্মে নিত্য কার প্রাণ
আনন্দে গুঞ্জায়মান,
সর্বকোলাহল থেকে করে আহরণ
নিস্তব্ধের গভীর গুঞ্জন,
কে সে বাণবিদ্ধ পাখি
আকাশে একাকী—
কার সে যন্ত্রণা

অনাগত দিগন্তের নিরন্ত বন্দনা,
কার আর্তনাদ
বয়ে আনে সুন্দরের মধুর সংবাদ
প্রমাদের বহু ঊর্ধ্বে রয়েছে প্রসাদ
এক স্থির স্থিতি—
কার সে হৃদয়
নিরালয়
বন্ধনের মাঝে আনে শ্যামল বিস্তৃতি।
কার দীর্ঘ প্রেমপত্রে নেই কোনো ইতি
শুধু সম্ভাষণ—
অরণ্যে সিংহের মত করে বিচরণ
জনতায় মগ্ন থেকে একান্ত নির্জন,
বর্তমানে দৃঢ় থেকে শাশ্বতে গম্ভীর
কে সে দুঃখী মহাবীর
দ্রুতচিত্ত নির্মম একক,
সেই শিল্পী সেই কবি সুহৃত্তম সেই সে লেখক।

১৩৭৩

যোদ্ধা

আমারও আছে এক অস্ত্রের আগার,
কাগজ কলম কালি—এই সব আমার আয়ুধ
বন্দুক বারুদ
আর কিছু দীপ্ত মন্ত্র, মুক্ত খড়্গ করেছি মজুদ
আমার চিন্তায়, এই সব সমরসম্ভার
সঞ্চিত করেছি আমি দিনে-দিনে পলে-অনুপলে
গোপনে বিরলে
দুর্ভেদ্য দুর্বার
আমারও আছে এক বজ্রসার অস্ত্রের আগার।

আকাশেরে কালো করে অকস্মাৎ এল ছুটে কী কালবৈশাখ
আমারও অস্ত্রাগারে পৌঁছুল সে ডাক—
সশস্ত্র সসজ্জ হও, বিঘ্নবিদারণ তব তীক্ষ্ম অস্ত্র হাতে তুলে নাও
আমারে বাঁচাও।
কে তুমি অপরিচিত, অস্পষ্ট ধূসর অনির্দেশ ?
আমি তব জ্যোতির্ময় রাজ্যেশ্বর দেশ।

দেশ কোথা ? দেশ কারে বলে ? কী বা ব্যাখ্যা দেশের সংজ্ঞায় ?
কে কারে বোঝায় ?
সে কি মাটি শস্যশ্যামা বহতী ক্ষরতী কোনো নদীর নিরালা,
সে কি শুধু গিরিশ্রেণী, নীলাকাশে জলধরমালা,
না কি শুধু মানচিত্রে রঙ রেখা নামের তামাসা ?
না কি কোনো গোষ্ঠীবন্ধ মানুষের বাসা ?
কে মানুষ ? তারে চিনি ? জানি তার মুখে বলা ভাষা ?

স্থানে কালে অবিচ্ছিন্ন পূর্ণ অনিঃশেষ
এক দীপ্ত ভাবের উন্মেষ
এ আমার দেশ—
মাটি নয়, নদী নয়, লোক নয়, ভাষা নয়, নয় রীতি-নীতি,
এ আমার সর্বসত্তা অস্তিত্বের অমৃত-দীধিতি,
প্রাণনে-মননে-জ্ঞানে মহত্তম গ্রামে ওঠে পরম ঝঙ্কার
প্রবৃত্তি অপ্রতিরোধ্য, প্রবাহিনী প্রাণবন্যা মহা-মমতার—
সব কিছু দিয়ে দেয়া যায় যারে, সব কিছু ছেড়ে
মুহূর্তেই জলাঞ্জলি দেয়া যায় কৃপণ স্বার্থেরে—
তাই তো চিনেছি তারে সে আমার দেশ
সকল-রোমাঞ্চ-শিখরেশ !

তাই যুদ্ধে এনেছি যে সমগ্র ভাণ্ডার
কাগজ কলম কালি আর ঘন দৃঢ় দপ্ত—অস্ত্রের আগার।
আমিও তো যুদ্ধলিপ্ত, শস্ত্রপাণি আমিও সৈনিক
আমি সাহিত্যিক॥

১৩৭২

সেই আমি

কাজের নেই জিরেন—
শুধু টানা-পোড়েন।
যেমন নেই সূর্যের, রাত্রির, বায়ুর।
শুধু দগ্ধ হয় দেহ, শেষ হয় পরমায়ুর।
বেণু নেই, অথচ বংশী শুনি,
শুধু সুর আসে
সুদূরে, সকাশে—
কোন অতলে সে সুরমা সুরধুনী।
নিরন্তর বইছে এ শরীরের নদী
তার মানে, বাইছি এক ভাঙা তরী পাল ছেঁড়া,
বাঁকা হালে ইতস্তত ঘোরাফেরা—
কিন্তু কোথায় যে তার পার, কোথায় যে তার অবধি!
শুধু উত্তাল ঢেউ
কোথাও নেই কেউ।
শুধু মসৃণ অন্ধকার
শুধু খরবেগ কান্না, স্থান নেই পেঁছুবার।

আমিই যখন নদী আর আমিই যখন তরী,
তদুপরি
আমিই যখন মাঝি,
সকল কাজের কাজী—
তখন নির্ভুল
আমিই আমার কূল।
সৃষ্টির উদয় আর অস্ত
আমার মধ্যেই সমস্ত॥

১৩৬০

প্রেম

জ্বর নাহি বোঝা যায় চক্ষুর মাধ্যমে
গাত্রস্পর্শে বোঝা যায় কতখানি জ্বর।
মধুর মিষ্টত্ব নাহি বোঝা যায় দর্শনে-স্পর্শনে:
লাগে তাতে লালসরসনা
বোঝা যায় একমাত্র গূঢ় আস্বাদনে।
শুধু বেঁচে থেকে বোঝা নাহি যায়
এই প্রাণ কী বিশাল, কত সুখে ভরা,
কতখানি সম্পন্ন উদার,
বোঝা যায় যদি জাগে প্রেম।

কর্মদুঃখী দৈন্যগ্রস্ত
টেনে নিয়ে চলেছি এ অধন্য জীবন
রাজপথবিবর্জিত নগরের অলিতে-গলিতে।'
ঈর্ষী ঘৃণী অসন্তুষ্ট নিয়তনিন্দুক
বিকারে ধিক্কারে ভরা বিরুদ্ধ বিবাদী
নিজেতেই আস্থা নেই, তাই তো নাস্তিক।
অকস্মাৎ এ কী অস্তি, মহা আবিষ্কার,
আমাদের মাঝখানে সব চুক্তি শর্তের বাহিরে
বিসদৃশ তাণ্ডব বিস্ময়
অযৌক্তিক আনন্দ-উদয়।
কী আশ্চর্য, আমরাও আনন্দিত!
ধমনীতে রক্ত নয়, অস্তিত্বের অমেয় অমৃত।
অকস্মাৎ সব কালো মুছে যায় নীলে
যবে দেখি তুমি-আমি একই মিছিলে।

সব ক্ষতি অসঙ্গতি ধুয়ে মুছে যায়
যবে দেখি তুমি-আমি উপস্থিত একই সভায়।
কোথা হতে কার পক্ষপাতে
লক্ষ্মীর কটাক্ষ পড়ে এ মরুশ্মশানে,
কোথা হতে অভ্যাসের পথের ধুলায়

হঠাৎ কুড়ায়ে পাই
বৃহত্তর এই বস্তু এই প্রেমধন
যেই ধনে বদান্য সে বিধাতারে
ইচ্ছা করে ক্ষণতরে জানাতে স্বীকৃতি,
বিক্ষুব্ধ সত্তার ঊর্ধ্বে যে জাগায়
মৌনময় সুতৃপ্তির জাগর প্রদীপ।

জনাকীর্ণ রুক্ষ মাঠ অকস্মাৎ শূন্য মনে হয়
মনে হয় ভরা শুধু বর্ষাধৌত প্রগাঢ় সবুজে
যে সবুজ কোনো এক হৃদয়ের আত্যন্তিকী নির্জন মমতা,
সে সবুজ চক্ষে লাগে,
নও তুমি আর সেই বিমর্ষ শিক্ষিকা
নই আর আমি সেই করুণ কেরানি।
চিরনীরমনোহর আমি এক সমুদ্র তোমার
আর তুমি—তুমি নদী নিরাবিলা
বিরলবাহিনী
স্রোতের ময়ূখরেখা তরঙ্গতন্ময়।
আমি এক আকর্ষণ তুমি এক আশা
এই নিয়ে সংগ্রামী এ জীবনের সমগ্র পিপাসা।
রক্তক্ষরা আঘাতের পরে মধুক্ষরা উপশমে
সমস্ত সংগ্রাম থামে
সব দৈন্য-ন্যূনতার হয় যে পূরণ,
প্রেম শুধু অপূর্ণ অপার।
প্রাপ্তি নিয়ে ওরা সব চলে যায় লুপ্তির কোটরে,
আমাদের প্রাপ্তির সমাপ্তি নেই। আমাদের প্রেম
পথপ্রান্তে জেগে ব'সে থাকে
নিরবধি শাশ্বতে সুস্থির,
জীর্ণপত্রে ক্ষণে ক্ষণে নতুন নির্মিত করে স্বর্ণের কুটির॥

১৩৭৩

অক্ষর

অক্ষরে শব্দের জন্ম নিরন্তর নূতন
শব্দ হতে নবীন বাক্যের জাগরণ।
বাক্য হতে অনুচ্ছেদ, ক্রমে ক্রমে অধ্যায়-বিন্যাস,
পৃষ্ঠার পরেও পৃষ্ঠা—বেড়ে চলে বিস্তার-বিলাস,
মহাকাল লিখে যায় দীর্ঘ ইতিহাস
নেই যার ইতি—
প্রতিটি অক্ষরে আছে নবীভূত শব্দের স্বীকৃতি,
অব্যক্ত পরম শব্দ গূঢ় অর্থবহ
আনন্দ দুঃসহ।
প্রতি শব্দে ধরা আছে দূর সম্ভাবনা
কোনো মহাকাব্যের রচনা॥

জীবনে মুহূর্তগুলি তেমনি অক্ষর
রক্তক্ষরা মধুক্ষরা
কোন সে লেখনী হতে ঝরে-ঝরে পড়া
রোমাঞ্চ-নির্ঝর।
প্রতিটি মুহূর্তে তাই লেখা আছে কোনো প্রতিশ্রুতি
কোনো উপন্যাসের প্রস্তুতি।
তাই শুধু ক্ষণে ক্ষণান্তরে
সোনার অক্ষরে
শব্দ শুনি মর্মপিণ্ডে, বাক্য দেখি রক্ত-চলাচলে,
সুখে দুঃখে হাহাকারে উত্তপ্তে-সজলে
অধ্যায়-বিন্যাস দেখি ত্বকে মাংসে অস্থিতে মজ্জায়
সেই মহাগ্রন্থ প'ড়ে দিন চ'লে যায়
তবু তার নেই সমাপন
প্রতি ছত্রে অখণ্ড জীবন।

শুধু বাক্যগঠনের শুধু শব্দস্পন্দনের মদ
সমস্ত ব্যাধির মহৌষধ।

শুধু এক শোভাযাত্রী ধ্বনির উৎসার—
সমস্ত মৃত্যুর অস্বীকার ॥

১৩৭৪

তিন জন

আমরা তিনজন
আমরা একই নৌকোর সোয়ারি
আমি তুমি আর সে
চলেছি একই বন্দরের সন্ধানে।
আমি কবি শিল্পী চারুকারু
আমি শুধু দেখছি চর্মচক্ষে
আপাতপ্রতীয়মানকে
দেখছি কেমনটি হয়ে আছে চোখের সামনে
ছন্দে শ্রীতে ভঙ্গিতে কেমন,
আমার কারবার শুধু কেমন-কে নিয়ে।

আর তুমি বৈজ্ঞানিক
তুমি দেখছ সূক্ষ্মযন্ত্রে, অনুবীক্ষণে
শুধু দেখছ কী আছে, কী আছে
গহনে গহ্বরে সমস্ত আবরণের অন্তরালে
অণুর অন্দরমহলে, শূন্যের দুর্গমে,
কী আছে, আরো যেন কী আছে
এর পরেও যেন আরো কী
আরো—
তোমার কারবার শুধু কী-কে নিয়ে।

আর সে
অজানা নির্জনে বসেছে কঠিন ধ্যানাসনে

সে দেখছে তৃতীয় নয়নে
বুদ্ধির অতীত বোধে
দেখছে, কে আছে ? কে আছে ?
দু'টি জড়কণা ছুটে এসে মিলিত হয়েই
এই জগতের বিস্ফোরণ—
কে প্রথম ছোটাল তাদের
কে তাদের অন্ধ ক'রে মিলিত করল।
তার কারবার শুধু কে-কে নিয়ে।
আমরা তিন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী
চলেছি একই ভাঙা নৌকোয়
একই অতল জল ঠেলে-ঠেলে,
আমি দাঁড় টানছি তুমি হাল ধরে আছ
আর সে বসে গান গাইছে।
কিন্তু আমাদের এক মিলিত জিজ্ঞাসা
এক মিলিত আর্তনাদ—
কোথায় ?

১৩৭৩

তৃতীয় নয়ন

কী ক'রে তোমারে স্থির রাখি
স্থির রাখি আপন চেতনা ?
স্বাধ্বী শুভ্রা সত্তা নিরঞ্জনা !
হৃদয়ের কোন রসায়নে
কোন শুদ্ধ ছন্দের সাধনে
তোমাকে শাশ্বত রাখি সুন্দরের রঞ্জনে-অংকনে ?
যদি দেখি তৃতীয় নয়নে॥

মন্মথের আপ্যায়নে নয় শুধু তনিমা মার্জিত,
আরো এক জ্যোতি আছে—

সব প্রীতি নয় শুধু স্বরত-চালিত,
আরো এক প্রীতি আছে—
সেই প্রীতি-জ্যোতি দিয়ে কী ক'রে অক্ষয় রাখি
অখণ্ড মণ্ডনে,
অরণি-ঘর্ষণ বিনা অগ্নির মন্থনে ?
যদি দেখি তৃতীয় নয়নে ॥
মদনেরে দহি নাই, মোহিয়াছি দোঁহে
নিত্য ধূপে সুরভিতপ্রাণ সুস্থ রসের সন্দোহে ।
নও তুমি শোকখিন্ন কামনার শিখা
শর্করা-অন্বেষী পিপীলিকা—
তুমি এক অভ্রান্তির প্রজ্ঞানবর্তিকা ।
তুমি সেই মাঙ্গী তনু স্বাহা যার নাম,
ধূলির কণ্টকবৃন্তে পুষ্পায়িত মর্তের প্রণাম ।
কী ক'রে সে স্ফুটনের ব্যথা বুঝি বক্ষের স্পন্দনে
আশ্চর্যের অদ্বৈত কাননে ?
যদি দেখি তৃতীয় নয়নে ॥

১৩৭২

অন্বেষণ

বৃদ্ধ বট গাছে
পাখি এক আছে
নিরীহ একান্তবাসী
পক্ষপাত-আচ্ছাদ-পিয়াসী ।
সারা দিনমান
চলে তার সংসার-নির্মাণ ।
কোথায় একটি দু'টি
পাবে নাকি খড়কুটি
তীক্ষ্ণ চোখে অতৃপ্ত সন্ধান ।
সঙ্গে সঙ্গে চলে গান
নেপথ্যবিধান ।

ছোট ছোট ক'টি আশা
ক'টি ভীরু ভালোবাসা
চঞ্চুপুটে চঞ্চল চুম্বন
আকাশের স্বপ্ন ক'টি
বাতাসের ঝটাপটি
এই নিয়ে হৃদয়ের উষ্ণ প্রলোভন।
কিছু বা নদীর মায়া
কিছু বা মেঘের ছায়া
জোৎস্না এক রতি
কিছু ভয় কিছু ব্যথা
কিছু ক্ষুদ্র সতর্কতা
আপন বুকের স্নেহে সঙ্গোপিত ভবিষ্য সন্ততি।
বহু যত্নে তিলে তিলে গড়া এই নীড়
নিভৃত-নিবিড়।

তারপর একদিন অকস্মাৎ ঝড়ের নিশীথে
ডাক এসে পড়ে অতর্কিতে।
বলা নেই কওয়া নেই নীড়-তীর ছাড়ি
মেলি দুই ডানা
ব্যাকুল বিস্তারে
পার হয়ে বেষ্টন-সীমানা
দেয় দীর্ঘ পাড়ি
অমিত অপরিচিত আর কোনো আকাশের পারে,
আর কোনো বিকাশের দেশে
আরেক চেতনা আছে এই চেনা চেতনার শেষে,
আরেক বসতি
অন্য বন অন্য বনস্পতি
আরেক আশ্রয়
আর কোনো উন্মোচন-উদার বিস্ময়।

কে যে তারে দিল ডাক কে দিল ঠিকানা
কারু নেই জানা।

কী সংকেতে কে দেখাল পথ
কোথায় সে বিস্তৃতি বৃহৎ
কিছু শুধালো না,
এত বিচারণা
এত আশা এত শত নিপুণ ভাবনা
সব কিনা নিমেষার্ধে হয়ে গেল ফাঁকা,
নববেগব্যঞ্জনায় উদ্বেজিত দুই দীপ্ত পাখা
প্রসারিত হল শূন্যে অন্য অন্বেষণে
মাত্রাহীন যাত্রার গগনে।
আরো আছে স্থান
শুধুই প্রবেশ. নেই কোথাও প্রস্থান.
আরো স্পর্শ আরো ঘ্রাণ আরো আছে স্বাদ
বিস্তীর্ণ অবাধ
নেই থামা নেই আর বাসা
যাত্রাতেই নিত্য বসবাস
একমাত্র আদিগন্ত সেই ভালোবাসা
অবিচ্ছেদে নব-নব পরিচ্ছেদ ইতিহীন লেখে ইতিহাস
স্তর হতে স্তরে
দুর্গমে দুস্তরে।

শুধু যাত্রা উন্দাম ধাবন
অবারণ দুই পক্ষে নেই সম্বরণ,
প্রতিক্ষণে নিজেরে লঙ্ঘন
বৃত্ত হতে উদ্বৃত্তের দিকে
মূর্তি হতে স্বচ্ছ শুভ্র অভ্রের স্ফটিকে ॥

১৩৭৪

আরোহণ

চিদ্‌রূপে বিদ্রূপ নেই।
ব্যঙ্গময়ী বুদ্ধিমতী সাহিত্যসুন্দরী,
অলক্ষ্য কটাক্ষপাতে স্পর্শগরীয়সী
জানি জানি একদিন মুছে দেবে সমস্ত বক্রতা।

বহিরঙ্গ ছেড়ে যেই অন্তরঙ্গ তুমি
অস্তিত্বের সার-অংশ, প্রাণের পাথেয়,
সে মুহূর্তে সে গভীর পরিচয়ে
নেই আর তুচ্ছ পরিহাস
নেই আর বাক্যের চাতুরী, আবর্ত কুটিল,
তখন সমানস্রোতে অভিন্ন মননে
তুমি-আমি এক যাত্রা এক মাত্রা একত্র প্রবেশ।
এক নাভি এক নেমি এক চক্রাকার।

সেই তো আমার ধ্যান
মন্ত্রেরে প্রমূর্ত করো,
করো তব সর্বাংশ-অধীন, অধিকৃত।
ছিন্ন ক'রে নিয়ে যাও
পরিহিত বসনের মতো
পরিচিত জীবনের কুণ্ডলের থেকে
রাজেন্দ্রিয়-প্রকাশের অমরাবতীতে।
তুষারে বন্দিনী নির্ঝরিণী
তুমি ব্রজবিলাসিনী, রবে না তো আয়ান-ঘরনী,
হও তাই নিরর্গল নিত্যবর্ষী
গোষ্পদের ভূমিকারে দাও এনে সাগরসমাধা,
তোমার অনন্ত দানে প্রসারে প্রাচুর্যে গানে
পিষ্ট করো চূর্ণ করো ব্যক্তিত্বের প্রচ্ছদের ভার,
স্বাতী নক্ষত্রের জলে জন্ম দাও প্রসুপ্ত মুক্তার।

যতই শাণিত হোক
বুদ্ধি অল্পযায়ী।
বারে বারে ফিরে আসে গুহাপ্রান্ত থেকে.
কিন্তু প্রেম স্বতঃসিদ্ধ
অন্তঃপুরে নিয়ে যায় রত্নকুঠুরিতে,
নিয়ে যায় কোন পথে কে বা জানে
সহজ বিজ্ঞানে।
নিজেরা সহজ নই সাধন সহজ।
নিষেধের নাগপাশ ছিঁড়ে নিয়ে যায়

অনায়াসে, স্বতঃস্ফূর্ত উন্মেষের দেশে।
সেথা দেখি তৃপ্তির অমৃত জ্যোৎস্না
গলে পড়ে অবাধ প্রাপ্তির সরোবরে।
সে অতল সরসীতে
স্নান করে পুণ্য হই শুচি হই স্নিগ্ধ করি জীবন-মরণ।

ভালো লাগে, শুধু ভালো লাগে—
দয়া করো এত অল্পে রেখো না নিষ্প্রভ ক'রে
স্তিমিতে নির্জীবে উদাসীন।
তার চেয়ে সুনিপুণো কথাপ্রাণা,
প্রাণের প্রবল নিমন্ত্রণে, প্রস্ফুট প্রণবে,
বলো, ভালোবাসো, বন্ধহীন ছন্দহীন অপরাধহীন
পরিপূর্ণ প্রতপ্ত বিহ্বল
আবরণ নিবারণ-করা
বৈরাগ্যের শুভ্রতায় প্রণাম নির্মল।
সুখে দুঃখে ভালো-মন্দে সুরে বা বেসুরে
উত্থানে পতনে
স্বেদে ক্লেদে শোণিতে অশ্রুতে
সর্বময় সত্তার সৌরভে
মন্থনে মোচনে, ভদ্রে ও ভীষণে
সর্বক্ষণ ভালোবাসো
সর্বক্ষণ হৃদয় দুর্বার
উদ্ঘাটিত আনন্দের চেতনার ক্রম-আরোহণ॥

১৩৭৪

দ্বিপক্ষ

বৈপরীত্য পৃথিবীর রীতি,
শুক্লা-কৃষ্ণা অমা-উমা তামসী-ভামতী—
বাধক শক্তির সাথে সাধক শক্তির
শাশ্বত শত্রুতা।
পক্ষ বেছে নিতে হবে, তুমি কোন দিকে,
কোন কোটি তোমার শিবির।

একদিকে আসুর ঔদ্ধত্য, আর
অন্যদিকে দৈবত দৃঢ়তা,
হরণের সঙ্গে যুদ্ধ শুধু পূরণের।
একদিকে বিয়োগ-বিলয়, আর
অন্যদিকে নিয়োগ-নিবেশ,
পক্ষ বেছে নিতে হবে।
একদিকে দাবির তাণ্ডব শুধু
প্রসারিত করাল কবল,
দায়িত্বচেতনাহীন দুর্মতিমত্তুতা,
দিকে-দিকে স্বরচিত করতালি—
অন্যদিকে নীরব নিষ্ঠার শক্তি
উদ্যমের নিয়মের নির্বাহের দীপ্ত সমারোহ
ফলাফলে সমস্বাদ।
পক্ষ বেছে নিতে হবে।
সাম্য অতি গ্রাম্য কথা, বৈচিত্র্যই রাজকীয়,
একায়নে হয় না তো কাল-পরিক্রমা,
স্বত্ব কারো নয় চিরন্তন।
এ পৃথিবী হবে না তো ঈশ্বরের মন্দির-নগরী,
হবে না বা একটানা পাপরাজ্যবিলাস-প্রাসাদ,
দুই দল থেকে যাবে।
পিঙ্গল জটিল ঝঞ্ঝা অগ্নিজিহ্ব ধূসরকেশর,
তার ঊর্ধ্বে থেকে যাবে নীলশান্ত আকাশ-সন্তোষ
গভীরতা সুদূরব্যাপিনী।

শুধু পক্ষ বেছে নাও,
হয় অন্ধ নাস্তিকতা লক্ষ্যহীন নৈরাজ্য নরক,
অকর্মক অলস হতাশা,
নয় কোনো লোকালোকধৃত জ্যোতির্ময়
মর্মের রুধিরে লেখা অস্খলিত ভাষা
নিরঞ্জন অদ্বৈত প্রত্যয়।
পালাবার পথ নেই, বেছে নাও দল,
হয় সত্য নয় রসাতল॥

১৩৭৩

বাইশে শ্রাবণ

ঘরে দোরে বারান্দায় গলিতে সিঁড়িতে
বাঁকে কোণে আনাচে-কানাচে
শত-শত- ক্রমাগত দীপ জেলে দেওয়া
বিচিত্র বর্ণালি—
আলো দিয়ে ভ'রে তোলা যেখানের যত কিছু ফাঁক
নাম তার পঁচিশে বৈশাখ।
তারপরে অন্ধকারে
মৌনের সে মহান মন্দিরে
উচ্চতম চূড়ে
নিজে এক দীপ হয়ে জ্বলা
সংকেতে সুন্দর স্থির অভ্রান্তদর্শন
নাম তার বাইশে শ্রাবণ।
শুধু দীর্ঘ পথ চলা, পথে-পথে গান গেয়ে যাওয়া
নানা ছন্দে, ললিতে বিভাসে
দিনে-রাতে ঘাতে-প্রতিঘাতে
উল্লাসে-উদাসে।
তারপরে স্তব্ধতার দেশে
শাশ্বতের সুর দিয়ে ভরা
নিজে এক হয়ে ওঠা গান
অনন্তের অতল আহ্বান।

শুধু পাওয়া, ধরে রাখা, তুলে রাখা—সঞ্চয়ের ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।
তারপরে হওয়া আর হয়ে ওঠা, হয়ে থাকা
ত্রিভুবনে নিরন্তর নূতন,
তারি নাম বাইশে শ্রাবণ॥

১৩৭৩

কবিতা

কবিতাই অমর জীবন।
সব কিছু চলে যায়
দিন, রাত, প্রগাঢ় প্রদোষ,
চলে যায় যৌবনের মুহূর্ত-গরব
বাসনার কুসুমসুষমা,
মদনমন্দিরকোণে নিবে যায় রতির প্রদীপ,
অশরীরী আশাগুলি
একে একে উড়ে যায় চলে
অচিহ্ন আকাশে।
তবু যদি অন্ধকার থেকে যায় কোনো
থেকে যায় কোনো বিধ্বস্ততা,
সে বেদনা বিনোদিনী
সেই তো কবিতা।

যদি ক্লান্তি এসে থাকে
এসে থাকে শুষ্ক শূন্য অস্পৃহার জ্বর
আলস্য বৈমুখ্য ঘৃণা বিরক্তি অরুচি
সেও জেনো জীবনের অনবদ্য কবিতা রচনা।
রুক্ষতাই কাব্যকলা বন্ধ্যা মৃত্তিকায়
অহল্যা উপলতনু সেও জেনো একদিন আর্যা হয়ে যায়।
যখন যেমন থাকো
রহস্যে প্রকাশ্যে কিবা উত্থানে শয়নে
নয়তো বা বিস্মৃতির শীতল অঙ্গারে,
কবিতা নিয়তস্থিতা
প্রাণহংসী নিশ্বাসবাসিনী
জীবনের কাদম্বরী
সে কবিতা একান্তা প্রেয়সী আমার॥

১৩৭২

বাড়ি

তুমি আমার কাছে একখানা ঘর চেয়েছিলে,
আমি তোমাকে আস্ত একটা বাড়ি এনে দিয়েছিলাম
তোমার আকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশি।

উপরে-নিচে এতগুলি কামরা
ভিতরে-বাইরে এতগুলি বারান্দা
তোমার সে কী আহ্লাদ!
আকাঙ্ক্ষার বেশি হলেও আকাঙ্ক্ষাকে মুহূর্তে বড় ক'রে
বেশির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে।
তাকিয়ে দেখলে বাড়ির আওতায়
কোনো ফাঁকা জমি আছে কিনা—
আমাদের সমস্ত সংগ্রামই এই বেশির জন্যে
বাড়তির জন্যে, বাহুল্যের জন্যে।
তখন কি আর জানি অভাব যেমন নষ্ট করে
প্রাচুর্যও তেমনি পথে বসায়!

না, ভাড়াটে বসাতে পারবে না—
বললে মুখ ঘুরিয়ে,
বাড়ির সুমুখটা তাকে ছেড়ে দিয়ে
চোরের মত খিড়কির দরজা দিয়ে নিজের বাড়িতে ঢোকার লজ্জা
বরদাস্ত হবে না।
আর, দেখতে গেলে, আহা, কখানাই বা ঘর!
এরই মধ্যে তুমি পাওয়াটাকে চাওয়ার মাপে কম ক'রে দেখলে
কম ক'রে ফেললে।
দুটো বসবার কুঠুরি—একটা নিচে বাইরে মক্কেলদের জন্যে
উপরেরটা সুহৃত্তম অন্তরঙ্গদের জন্যে।
দুটো স্নানের, দুটো স্টাডি,
একটা সংযুক্ত লাইব্রেরি, একটা সংযুক্ত বেডরুম
কিচেন স্টোর ডাইনিং রুম—এ সব মামুলি তো আছেই,
এটা বাক্স-প্যাঁটরা রাখবার, এটা সাজগোজ সারবার—
জায়গার শেষ আছে জিনিসের বুঝি শেষ নেই
কিংবা জিনিসের বুঝি শেষ আছে, জায়গাই উত্তাল সমুদ্র!

এখন এখানে ঐশ্বর্য বলতে আতিশয্য
আনন্দ বলতে ফূর্তি
সম্ভোগ বলতে মত্ততা
সাফল্য বলতে আস্ফালন
সংস্কৃতি বলতে বকবৃত্তি
অহংতা বলতে বৈষ্ণবতা—
আর অবসর ?
যেমন শ্রমের সম্ভ্রম আছে তেমনি অবসরের সম্ভ্রম।
মানুষের আসল দাম কী সে কাজ করে তাতে নয়
কী ভাবে অবসর যাপন করে তাতে।
কিন্তু কোথায় অবসর ?
শুধু একটা পোষা পশুর সেবা করছি,
সে পশু বাঘ-সিংহের বাচ্চা নয়
নয় কুলীন কুকুর-বেড়াল।
সে পশুর নাম অভ্যাস
পুরোনো প্ররোচনা এখন প্রথার খুঁটিতে বাঁধা।
সোনার গাছে চেয়েছিলে হিরের ফুল,
সোনা নিয়েছে ডাকাতে
হিরেগুলি সব অঙ্গার।

বাড়ির মধ্যে থেকে ঘর খুঁজছি
ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে ঘোড়া খোঁজার মত।
মধ্যরাত্রির অনিদ্রা থেকে উঠে এসেছি দুজনে
আমি হাঁটছি এ-বারান্দায় তুমি ও-বারান্দায়।

তুমি শুধু একরাত্রির ভালোবাসা চেয়েছিলে
আমি তোমাকে বেশি দিয়ে ফেলেছিলাম,
দিয়ে ফেলেছিলাম আমৃত্যু হাহাকারের মত
একটা গোটা জীবন।
তখন কে জানত বাহুল্যেও আমাদের সর্বস্বান্ত করে॥

১৩৭৪

এক গ্রহ

মগ্ন করো শুষ্ক চোখ প্রথমত ঊর্ধ্বে ঐ আকাশের নীলে
পরে তারে প্রসারিত ক'রে দাও দিগন্তরেখায়
অপাপা এ পৃথিবীর শ্যামল কুট্টিমে,
শেষে সেই দৃষ্টি তুলে, রাখো এনে মানুষের মুখের উপর,
কাছে দূরে দৃশ্যাদৃশ্যে বিস্তীর্ণ নিখিলে
যেখানে যে কর্মরত
যেখানে যে ভ্রাম্যমাণ
যেখানে যে সংগ্রামে চালিত,
সেখানেই সে দর্শনের উত্তপ্ত ব্যাপ্তিতে
মনে হবে সব তুমি, তোমারই সে নিখুঁত দর্পণ
তোমারই দ্বিতীয় সত্তা, মহত্ত্বমণ্ডিত
তোমারই একাত্ম বন্ধু, শ্রদ্ধেয় স্বাধীন—
আর সে সামান্য নয়, নয় কোনো বিচ্ছিন্ন চেতনা,
নয় কোনো আকস্মিক আলোড়নে
শাশ্বতের ছন্দের পতন,
নয় কোনো অপভ্রংশ, অসংলগ্ন অশুদ্ধ উদ্ধৃতি অর্থহীন—
এক স্থির তত্ত্ববস্তু সর্বব্যাপী এক দেহে সকল স্বরূপে।

যে অনুক্ত এক শ্লোক আমাদের রক্তের গভীরে
প্রথম ছত্রের ছন্দে অহরহ হয় উচ্চারণ
আংশিক ও অসম্পূর্ণ—
সে-শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ কোথা ?
তুমি আমি এরা ওরা সব মিলে সে শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ,
স্বল্পাক্ষরে প্রভূতার্থ।
এক সংজ্ঞা এক স্বত্ব একই সংহিত
শূন্যে-পূর্ণে আমাদের একই যন্ত্রণা
এক অমা এক চান্দ্রমসী।
কিন্তু এই এক গ্রহে মর্ত গৃহে আমাদের সংযুক্ত বসতি।
পরস্পর পরিচিত
পরস্পর প্ররোচিত
এক প্রেমে উন্মীলিত আমাদের অন্তহীন প্রাণের শুশ্রূষা ॥

১৩৭৪

যাত্রা

দূরে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, এলোমেলো
শোনা যাচ্ছে গুলির আওয়াজ
বিত্রাসিত লোকজন ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে
অলিতে-গলিতে দিশেহারা।
কী ব্যাপার? কে দেবে উত্তর?
সবাই পালাচ্ছে, তুমিও পালাও
প্রশ্ন করবারই বা সময় কোথায়?
যদি পর মুহূর্তের জন্যে মায়া থাকে তুমিও নেমে পড়ো,
এই বাসটাও এবার পোড়াবে।
কেন—এই প্রশ্ন করা বৃথা
বজ্রপ্রহার বিপ্লবের মুহূর্তে আবার প্রশ্ন কী!
সব কিছু পুড়ছে, মাঠ থেকে ললাট—
ট্রেন স্টেশন ডিপো কারখানা দোকান স্টল
খেত-খামার খত-তমশুক পাট্টা-কবালা
পুড়ছে প্যাণ্ডেল—পুজোর, সংস্কৃতির, বিয়ের,
শ্মশানের স্বপ্ন দেখলেই নাকি বিয়ে হয়—
পুড়ছে চট বাঁশ শামিয়ানা দড়ি-পেরেকের জঞ্জাল
পুড়ছে স্টেডিয়াম, পুড়ছে জ্যান্ত দ্বিপ্রহর
ব্যাট আর স্ট্যাম্প হাতে ছুটছে আগন্তুক খেলোয়াড়
বনপোড়া হরিণের মত।

পুড়ছে সবুজ সরোবর, পুড়ছে চটুল অন্ধকার
শুধু আতঙ্ক ছুটছে না, ছুটছে পৈশাচ উল্লাস
মুক্তমধ্যা স্বল্পাবৃতির পিছনে আমিষগৃধ্নুতা—
কাঁদছে কাতরাচ্ছে চেঁচাচ্ছে গর্জাচ্ছে
রুষছে ফুঁসছে টোল খাচ্ছে তালগোল পাকাচ্ছে—
এখুনি যেন কী একটা তুলকালাম কাণ্ড হবে তারই উত্তেজনায়ঃ
ছুটছে, যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে প্রমোদমদিরার হাট,
জুয়োর আসর।
নানাকেলিবিলাসিনী তারকার দল নেমেছে ক্রিকেট খেলতে
রুপোলি পর্দায় অধরসুধোর্মির স্বাদ,

মণি ঝলে নাভিকুণ্ডে, লেগেছে অঙ্গরাগচ্ছটার বন্যতা—
না কি কেউ কোথায় ওষুধ বিলোচ্ছে সঞ্জীবনী .
না কি কোথাও দেয়ালের স্তম্ভে ফুটছে অলৌকিক পদাঙ্ক ।

কিন্তু এরা কারা পথারণ্যে থেমে আছে
ব্যাহত-বারিত পথহারা ?
যেন এক অজাগর অজগর বিপুল আলস্যে কুণ্ডলী পাকানো !
জ্যাম লেগেছে—যন্ত্র-যান-বাহনের এ এক জটিল জটলা ।
এও ছোটা, এও গতি—ক্রোধস্তব্ধ গতির নীরব আক্রোশ ।
কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে, আগে যাবে
কেড়ে নেবে আগে পিণ্ডভাগ,
শুধু অন্ধ স্বার্থপরতায় সংশ্লেষ-বিশ্লেষ
নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল ফন্দিতে নিজেরাই বন্দী
নিমজ্জিত স্বখাতসলিলে ।
কিন্তু বিপ্লবে স্থগিত নেই
বিপ্লবের পথে নেই পান্থশালা, নেই কোনো মুসাফিরখানা
নেই কোনো লভ্যাংশবণ্টন ।
তাই ফের বন্দিত্বের শেষে স্রোতে-পথে ছুটেছে জনতা
আবার গুলির শব্দ, বোমার গর্জন
আবার উদ্দাম ছুটোছুটি ভয়ে ক্ষোভে লালসায়
যেন লোভনীয় বলেই লভনীয়—
কী যেন হবে কী যেন ঘটবে কী যেন কোথায় শেষ হয়ে গেল
আবার ফাটছে বোমা ফাটছে সোডার বোতল
ছুঁড়ছে ইটপাটকেল ।
কিন্তু কেউ কী জানে কোথায় চলেছে, কী নীট মুনাফা ?
হিসেবও কি অঙ্কের বাইরে ? বন্দরও কি দিগন্তে পলাতক ?
পৃথিবীতে কোনো রেখাই সরল নয়
পারে না সরল হতে
যেহেতু পৃথিবী গোল সেহেতু তার সমস্ত রেখাও বৃত্তাকার ।
শুধু ঘোরা শুধু ফিরে আসছে
তাই যে যাচ্ছে সেই ফিরে আসছে
ফিরে আসছে তার প্রথম বিন্দুতে, আদি লগ্নে,
এক নগ্নতা থেকে আরেক নগ্নতায়
এক ইটপাটকেল থেকে আরেক ইটপাটকেলে ॥

১৩৭৪

চিরকাল

আগে ঢেউ শান্ত হোক ; কেটে যাক ঝড়,
সাম্যে-শ্রীতে স্থির হোক উত্তাল সাগর,
স্নান করা যাবে তারপর।
এক ঢেউ চ'লে যায় আসে অন্য ঢেউ,
এক কাম মিটে গেলে জাগে অন্য কাম,
সংগ্রামের শেষেও সংগ্রাম।
থামবে না কখনো দীর্ঘ জীবনের দুর্দাম তুফান
দুর্যোগেই করে নেব স্নান॥

পথ ভরা আগাছায় কাঁটায় আঘাসে
মৃদু মৃদু বুনো গন্ধ টের পাই তবুও বাতাসে,
দুই পায়ে রক্ত ঝরে
যন্ত্রণায় তবু গান আসে।
দ্বেষে বিষে তিক্ততায় যত কেন হানি না আঘাত,
প্রেম তবু হয় না উৎখাত,
পিপাসারে পানীয় যে ডাকে
বিষাদে প্রসাদ-স্বাদ তবু লেগে থাকে।
সব বৃত্তি ক্ষান্ত হয়, প্রেম না ঘুমায়,
রাধার সছিদ্র ঘটে চিরকাল জল ভরা যায়॥

উপন্যাস

অনন্যা

তাঁর আর-আর দুই মেয়েকে নিয়ে বিনায়কবাবু বিশেষ কৃতকার্য হতে পারেননি, তাই তৃতীয় মেয়ে বীথির বেলায় সরাসরি ঠিক করেছিলেন তার আর তিনি বিয়ে দেবেন না।

বীথির বড়ো দুই বোনের যখন বিয়ে হয়, তখন সমাজের হাওয়াটা দক্ষিণ থেকে এমন প্রবাহিত ছিলো না; চাপা গুমোটের মধ্যে থেকে মেয়েদের বয়েস কেমন দেখতে-দেখতে তখন বেড়ে যেতো। ফলকে তখন গাছেই পাকতে দেয়া হতো না, কাঁচা ছিঁড়ে এনে চালের ভাঁড়ে, চারিদিকের অবরুদ্ধ শাসনের গরমে, হাঁপিয়ে তুলে, দিতে হতো তাকে একটা পক্কতার আভা। ভিতরে স্বাদ না থাক, বাইরেটা শোভন হলেই হলো। তখন শুধু মলাটের পরিপাট্য। বিবাহিতব্যতাই ছিলো তখন বয়সের একমাত্র লক্ষণ। তার অতিরিক্ত মেয়েদের আর কোনো লক্ষ্য তখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

বিয়েটা তাই বলে প্রজাপতির মৃদুল একটি পাখার কাঁপনেই ঘটে যেতো মনে কোরো না: ছিলো নানারকম অনুষঙ্গ, নানারকম উৎপাত। ছিলো বরপণ; ছিলো শাশুড়ি। বড়ো মেয়ের বিয়েতে বরপণ ও জামাইর চার-বছরের পড়া-খরচ চালাতে বিনায়কবাবুর পৈতৃক বাড়িখানা নিলামে উঠেছিলো; মেজো মেয়ের বেলায় প্রত্যক্ষ তাঁকে পণ দিতে না হলেও অপর পক্ষ আশা করেছিলেন, সেই ফাঁকটা তিনি অন্য কায়দায় ভরাট করে তুলবেন। অর্থাৎ, বরপণ বলে নগদ টাকা যাঁরা নেন না, সেই ক্ষতিটা তাঁরা পূরণ করে নিতে চান গয়না আর দানসামগ্রীতে। গোড়ায় মুখ ফুটে কিছু বলেন না বটে—ওটা হচ্ছে, আর কিছু নয়, ভদ্র মনের চতুর উদারতা—কিন্তু বুক ফেটে যায় তা না পেলে। অতএব মেজো মেয়ের বেলায় বরপণ এড়াতে পারলেও তার শাশুড়িকে ঠেলে রাখা গেলো না। শোনা যায়, খিদের তাড়নায় কড়া থেকে লুকিয়ে একবাটি দুধ খাওয়ার অপরাধে তাকে তার শাশুড়ি কড়াশুদ্ধ গরম সেই পাঁচ সের দুধ এক ঢোঁকে গিলিয়ে ছেড়েছিলেন। আরেকবার, আদা বাটবার বেলায় সেটাকে যে আগে ছেঁচে থেঁৎলে নেয়া দরকার, সেটা ঠিক ভালো জানা ছিলো না বলে তার শাশুড়ি শিলের উপর নোড়া দিয়ে ঠুকে-ঠুকে বাঁ-হাতটা তার আর আস্ত রাখেননি।

চারদিক দেখে-শুনে, বিনায়কবাবু তাই এবার ঠিক করেছিলেন, বীথির তিনি বিয়ে দেবেন না। তাকে তিনি মূল্যবান করে তুলবেন।

চারদিক দেখে-শুনে, কেননা ইতিমধ্যে সমাজের জলবায়ু গেছে বদলে। আর যাতেই কেন না হোক, মেয়েরা বয়েসে গেছে এগিয়ে, তাদের বিয়ের জন্যে হন্যে-কুকুরের মতো দোরে দোরে আর ঘুরে বেড়াতে হয় না। প্রভাত মুখুজ্জের গল্পের নায়িকারা যে-বয়েসে স্বামীর জন্যে বিছানা পাতছে, সে-বয়েসে আজকালকার মেয়েদের ফ্রক ছেড়ে শাড়ির পরিচ্ছেদই আসেনি। তখনকার দিনে পারস্পরিক

সখীত্বে মেয়েরা যা বলাবলি করতো, এখনকার মেয়েদের পক্ষে তা ভাবতে যাওয়াও অশ্লীলতা। এখন থেকে ফল গাছেই একেবারে পাকে, যতো দিনে না তা আপন দুর্বহ রসঘনিমায় মাটির উপর খসে পড়ে, আপনি পরিপূর্ণমান স্বাভাবিকতায়। এমনি করে সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতই এসেছে বদলে। বইয়ের দেশে মেয়েরা কেবল বড়োই হয়, তাদের বয়েস আর বাড়ে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘোরতর দুর্দশার জন্যেই মেয়েদের যা কিছু এই উড়ন্ত উচ্ছ্বাস।

আরো অনেক কথা ছিলো। উকিল রমানাথবাবুর সেজো মেয়ে কেমন এবার দিব্যি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে বসলো—সামাজিক প্রতিষ্ঠায় বিনায়কবাবুর চেয়ে তিনি এমন কিছু অগ্রসর নন। অতএব তাঁর মেয়েকেই বা স্কুলে না দিলে চলে কি করে? তাঁকেও তো পাড়ার মধ্যেই থাকতে হচ্ছে। সুরেন ডাক্তারের মেয়ে বনলতা গানে যে কি একটা সেদিন মেডেল পেয়ে গেলো—এ কথা রুগীর ফোড়া কাটতে এসেও তাঁর বলা চাই। সে-যন্ত্রণা কতোদিন আর সহ্য করা যায় বলো। বীথিও আর এমন কিছু বয়ে যেতে আসেনি।

'তুমি ঠিক দেখো,' বিনায়কবাবু দীপ্তমুখে বললেন, 'বীথির কক্‌খনো আমি বিয়ে দেবো না।'

স্ত্রী সর্বাণী মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'তোমার মেয়ের যা ছিরি, তাকে বিয়ে করবার জন্যে বাঙলা-দেশের ছেলেরা সব একজোট হয়ে একেবারে হরধনু ভাঙতে বসেছে! বিয়ে দেবে না মানে, তোমার ওকালতির আর আয় নেই, ঝাঁজরা হয়ে গেছে তোমার পুঁজি-পাটা। বিয়ে দেবে না মানে, যা বাজার-কাল পড়েছে, মেয়ের বিয়ে না দিয়ে নিশ্চিন্তে আজকাল তুমি সমাজে বসবাস করতে পারো। এর মাঝে তোমার কৃতিত্বটা কোথায়?'

বিনায়কবাবু গোঁফ চুমড়ে হেসে বললেন, 'বীথি আমার মেয়ে, সে-ই আমার কৃতিত্ব। রূপবিচারে আজকাল চামড়ার চাকচিক্যটাই প্রধান নয়, বীথি এবার পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে, সে-খবর রাখো? যে সেকেণ্ড হয়েছে,—সুরেশ বোসের মেয়ে—তার সঙ্গে ওর একশো-বারো নম্বরের তফাত। ভাবতে পারো একবার, তোমার মা'র বয়সে শুনেছ এমন কাহিনী? এর কাছে তোমার চামড়ার চটক লাগে কোথায়? বুঝলে, সে-সব দিন আর নেই, মেয়েদের মাকালত্বে আর কারু মন উঠছে না।'

'এমন একখানা মুখ করে কথা বলছ যেন ওকে তুমি একলাই পেয়েছ কুড়িয়ে, আমি আর ওকে পেটে ধরিনি।' সর্বাণীও মেয়ের কথা ভেবে গর্বে ঝিলিক দিয়ে উঠলেন।

পরীক্ষার নম্বরে মেয়ে তাঁর ছাড়িয়ে গেছে সুরেশ বোসের মেয়ে, কুঞ্জলালবাবুর বোন, সীতারামবাবুর ভাই-ঝিকে।

বিনায়কবাবুর স্ত্রী বলে যতো নয়, বীথির মা বলেই তাঁর বেশি মাহাত্ম্য। কিন্তু পরক্ষণেই গলা নামিয়ে বললেন, 'কিন্তু বিয়ে তুমি একেবারে দেবেই না বা কি করে বলতে পারো? ঐ তো ভাগীরথী সান্ন্যালের মেয়ে—ম্যাটিক্রটা পাশ করতেই কেমন এক সাব-রেজিস্টারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলো।'

'রাখো! সাব-রেজিস্টারি আবার একটা চাকরি! মেয়ে যেমন পাশ করেছিলো থার্ড ডিভিসানে, বরও জুটেছে তেমনি ছ্যাকড়া গাড়ি। যাও, ওর বিয়ের জন্যে

এখন থেকে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না,' বিনায়কবাবু বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'লেখাপড়া শেখাটা কি বর পাকড়াবার একটা চালাকি পেয়েছ নাকি? জোনাকিরা যেমন আলো দেয় সঙ্গীর খোঁজে, মেয়েরাও কি তেমনি বরের জন্যেই বিদুষী হচ্ছে?'

'না, তা বলছি না,' সর্বাণী কুণ্ঠিত মুখে ঢোক গিলে বললেন, 'তবে ওর গুণে মুগ্ধ হয়ে কোনো ভালো পাত্র ওকে পছন্দ করে ফেলতে পারে তো।'

'রাখো,' বিনায়কবাবু আরেকটা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'পছন্দটা যেন আর বীথির করতে হবে না! ততোদিনে সে-ই যেন কিছু গুণাগুণ বিচার করতে শেখেনি!' তাঁদের কাছে বীথি, বিশেষ করে স্কুলের পরীক্ষায় এ-পাড়া ও-পাড়ার সব মেয়েকে ডিঙিয়ে এবার তার এই ফার্স্ট হওয়ার পর থেকে, দিনের বেলাকার তারার মতোই দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। আকাশের নীল দূরত্বের মতো সে ছিলো তাঁদের পৃথিবীর স্বপ্ন। সে-ই যেন দিতে এসেছে তাঁদের নামের অমরতা—তারই মাঝে এতোদিনে যেন তাঁদের প্রেম উঠেছে পর্যাপ্ত, পরিণাম-রমণীয় হয়ে। বীথিকে তাঁরা অপব্যয় করতে পারেন না, দিতে পারেন না তাকে ধূলার ধূসরতা।

বীথিও তাই বেড়ে উঠেছিলো বাপ-মায়ের এই প্রশ্রয়ের অজস্রতায়, তার এলো-মেলো খুশির বাতাসে। বেড়ে উঠেছিলো সে তার মনের উজ্জ্বল উন্মুক্তিতে, শরীরের চমকিত প্রফুল্লতায়। তার প্রতীক ছিলো দীর্ঘীকৃত, সর্পিল বেণী; সীমাবদ্ধ, সংক্ষিপ্ত খোঁপা নয়। তার শরীরের উপর কিশোরকাল থেকেই গুচ্ছে-গুচ্ছে লজ্জার ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়নি: তার শরীর ছিলো নির্মেঘ, নীল একটি দিন, রৌদ্রঝলকিত কৃশ একটি অসিলেখা। কখন কোথা থেকে তার আঁচলের প্রান্তটা এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক ভ্রষ্ট হচ্ছে তার দুই চোখ শুধু তারই সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলো না: তার শরীরে ছিলো না এতোটুকু শারীরিকতা। বনের কিনারে নিজের নির্জনতার ঐশ্বর্যে সে ফুটে উঠেছে একটি অনামী ফুল, তার শুধু ফুটে ওঠার অহঙ্কারে। শুধু লাবণ্য নয়, জীবনকে আস্বাদ করবার গভীর লবণাক্ততা ছিলো তার সমস্ত রক্তে। শুধু দীপ্তিতে নয়, দৃঢ়তায় ছিলো তার উচ্চারণ। দেয়ালের ফোকরে ভীরু ইঁদুরের মতো নয়, তরঙ্গ-ভঙ্গিম সমুদ্রের উপর দিয়ে সিন্ধু শকুনের মতো সে বাত্যাদীপ্ত দুই পাখা মেলে দিয়েছে। সে বাঁচতে এসেছে, বিকিয়ে যেতে আসেনি।

যে-বয়সে তার দিদিরা ঝিনুকে করে ছেলেদের দুধ খাইয়েছে, সে-বয়েসে সে মানচিত্র খুলে খুঁজে বেড়িয়েছে কোথায় রয়েছে মোম্বাসা, কে বা ছিলো সেই চেঙ্গিস খাঁ, যে তার ঘোড়া চরাবার জন্যে সমস্ত চীনদেশটাই একদিন সমতল করে দিয়েছিলো, কেমন করে শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে অনন্ত হয়ে ওঠে!

তার বাবাই তাকে স্বপ্ন দেখাতেন। ঘরের জানালা থেকে দেখাতেন তাকে পৃথিবীর ধূসর বিশালতা, তার মনে ধরিয়ে দিতেন অক্ষরের আগুন। শেখাতেন তার ছোট দুটি চোখের তারার মধ্যে বিশাল আকাশ রয়েছে ঘুমিয়ে, সমস্ত পৃথিবী তার করতলে। আগে সে মানুষ, পরে মেয়ে। কি সে না হতে পারে ইচ্ছে করলে, যদি সে পায় ওড়বার জন্যে আকাশ, বাড়বার জন্যে আবহাওয়া? নতুন আর আমেরিকা আবিষ্কার করা না যাক, সে আবিষ্কার করবে তার

জীবনের নতুন মহাদেশ। কেঁচোরা কিছু দেখতে পায় না, তাদের চোখ বলে কিছু বালাই নেই, তবু সূর্য উঠতে দেখলেই তারা আতঙ্কে আসে কুঁকড়ে। বীথি হবে সেই লঘুপক্ষ উড্ডীয়মান পাখি, আলোকিত আকাশে যে অগণন মুহূর্তের রঙিন পাখা মেলে দিয়েছে।

বীথিকে তাই তিনি দিয়েছিলেন উদ্দাম একটা স্বাধীনতার অবকাশ, চারপাশে তার শাখা প্রসারিত করে দেবার বিশাল বিস্তৃতি। যে ফুল সত্যি করে ফোটে, সে মাঠেই ফোটে স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্বিতায়, ঝড়বৃষ্টির ভয়ে তাকে বোতলে এনে পুরে রাখলে তার থাকে না আর সেই বর্ধিষ্ণু বলদীপ্তি! বাপের সঙ্গে-সঙ্গে বীথিও ভাবতে শিখেছিলো সে সেই বর্ণহীন সাধারণ দলে নয়, যারা জীবনধারণের উদ্দীপনাকে নামিয়ে নিয়ে এসেছে মাত্র কায়িক যান্ত্রিকতায়, মাত্র একটা দিন-যাপনের ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তিতে। সে যে কিছু একটা করতে এসেছে এই কথা সে আয়নায় তার মুখ দেখেই অনায়াসে বলে দিতে পারে। সেই কথা তার বাবা-মায়ের দুই চোখের তারায় স্পষ্ট জ্বলজ্বল করছে। তাঁদের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে সে তার জীবনের মূল্য, তার জীবনের মৌলিকতা। সে স্রোতের ফুলের মতো ভেসে যেতে আসেনি।

'আজ বিকেলে পুলিশ-সাহেবের বাঙলোয় কালেক্টার-সাহেবের সেই ফেয়ারওয়েল পার্টিটা আছে, বাবা। আমাকে সেখানে গাইতে ধরেছে। যাবো?' করতে হয় বলে বীথি একবারটি এসে জিগগেস করলো।

'যাবে বৈকি, তোমার যদি ইচ্ছে করে।'

'সেখানে দু'একটা নাচের জন্যেও বলেছে। আমার সেই গৌরীনৃত্যটা, বাবা। কি বলো?'

বিনায়কবাবু সহাস্যমুখে বললেন. 'লোককে যদি না-ই দেখাবে, কষ্ট করে নাচগুলি তবে শিখলে কি করতে? পোজগুলি সব তোমার মনে আছে তো? যাবার আগে বার কয়েক রিহার্সেল দিয়ে নিয়ো।'

'সব ঠিক মনে আছে, বাবা। দেখো, কি রকম ক্যারি করে নিয়ে যাই।'

বেণীটা পিঠের উপর থেকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বীথি ছুটে বেরিয়ে গেলো।

বীথির পিসিমা মহেশ্বরী সামনেই কোথায় ছিলেন, চোখ কপালে তুলে বললেন, 'তাই বলে এতো বড়ো মেয়েকে তুমি সভায় নিয়ে গিয়ে নাচাবে, দাদা?'

'আহা, কতো ওর বয়েস হয়েছে জিগগেস করি?' সর্বাণী মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'এই আষাঢ়ে সবে ও পনেরোয় পা দিয়েছে। দেখতে একটুখানি একটা খুকি।'

'ওর কথা আর বোলো না, বৌদি। এই বয়সেই কোলে তুমি হরেনকে পেয়েছিলে। একটুখানি একটা খুকিই তখন ছিলে কিনা!'

'মেয়েদের কাঁধ থেকে বয়স নামে সেই অতিকায় ভূতটা কখন নেমে গেছে,' বিনায়কবাবু হালকা ঠোঁটে অস্ফুট একটু হাসলেন, 'আগেকার দিনে উঠোনটা নেহাত বাঁকা ছিলো বলেই মেয়েরা নাচতে পারতো না। নাচটা একটা উঁচু দরের শিল্প-বিদ্যা, তাতে বয়েসের কথাটা আসে কোত্থেকে? আর খেলো কতোগুলি

হাত-পা ছোঁড়া নয়, দস্তুরমতো দেব-দেবীর নাচ। আগেকার কালে পুণ্যশ্লোকা সতীরাও অনেকে এ-বিদ্যেটা অভ্যেস করেছিলেন। বেহুলার কথা পড়িসনি মহাভারতে?'

মহেশ্বরীর বিয়ে হয়েছিলো বারো বছর বয়সে, পনেরোয় পা দিতে-না-দিতেই শাঁখা-সিঁদুরে জলাঞ্জলি দিয়ে বাপের সংসারে তিনি ফিরে আসেন: উত্তরাধিকার-সূত্রে বিনায়কবাবু পেয়েছিলেন তাঁরও রক্ষণাবেক্ষণের ভার। তখন থেকে এই রামায়ণ-মহাভারতই তাঁর একমাত্র পাঠ্য ছিলো—শরৎ চাটুজ্জে তখনো লিখতে শুরু করেননি। রামায়ণ-মহাভারত শাস্ত্র বটে, শাস্ত্র মহেশ্বরীর মাথায় থাকুক, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে তিনি জোর গলায় বলতে পারেন, আগাগোড়া সমস্ত পৃষ্ঠায় বই দুখানি একেবারে নিখুঁত পবিত্র নয়। দেব-দেবীর আচরণ সম্বন্ধে দাদা যেন তাঁকে কিছু বলতে না আসেন।

মহেশ্বরী হাঁ করে বিনায়কবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, 'কিন্তু লোকে শুনলে বলে কি?'

বিনায়কবাবু গম্ভীরমুখে বললেন, 'এ শোনবার জিনিস নয়, দেখবার জিনিস। যদি তারা দেখলোই, তবে তারা গায়ে পড়ে দেখতে গেলো কেন? নভেল যে পড়ে, সে সেই বইটারই নিন্দে করতে পারে, নভেল পড়াকে কক্খনো নয়। আর যারা দেখলোই না, তাদের কথায় কোনো যুক্তি নেই, অতএব তাদের কথায় আমাদের কিছু এসে যায় না।'

পুলিশ-সাহেবের বাঙলোয় বিনায়কবাবুর নেমন্তন্ন হয়নি; না হোক, তবু বীথির জন্যে যেখানে আজ দরজা খোলা, সেখানে, চৌকাঠের এপারে থেকেই তিনি সোজা 'ডেইসে' গিয়ে বসতে পাচ্ছেন!

'কালেক্টার সাহেব আমার নাচ দেখে সোনার একটা মেডেল দিয়েছেন, বাবা!' রাত করে সভা থেকে ফিরে এসে বীথি বিনায়কবাবুকে সুখে একেবারে বিভোর করে তুললো।

সর্বাণী লেলিহান একটা শিখার মতো সর্বাঙ্গে কেঁপে উঠলেন, 'দেখি,দেখি,তোর পিসিমাকে একটিবার দেখিয়ে দিয়ে আসি। ক' ভরি সোনা আছে মেডেলটায়? সভার মাঝে সবাইর সামনে গলায় তোকে সেটা পরিয়ে দিয়েছিলো? কই, রাখলি কোথায়?'

বীথি খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'এখুনি দেয়নি মা, পরে দেবে বলে ঘোষণা করেছে।'

'দেয়নি?' সর্বাণীর মুখ এক ফুঁয়ে নিবে গেলো।

বিনায়কবাবু সাহস দিয়ে বললেন, 'সভায় যখন একবার ডিক্লেয়ার করা হয়েছে, তখন সেটা এসে এই পৌঁছুলো বলে। যা-তা লোক মনে কোরো না, স্বয়ং জেলার মেজিস্টেট্রট।'

হাতে-হাতে সেটা তখুনি না পেয়ে দেখতে-দেখতে সর্বাণীর হাত-পা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে এলো, 'সে তো এখান থেকে বদলিই হয়ে যাচ্ছে শুনলাম, বয়ে গেছে তার মেডেল পাঠাতে! অতো হাসছিলি যে, না পাঠালে তুই কি করতে পারিস? ম্যাজিস্টারের নামে মামলা করতে পারবি তুই?'

তবু বীথি হাসে, তার হাসির টুকরোগুলি বর্ষমাণ বৃষ্টিবিন্দুর মতো তার মায়ের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এই হাসি দেখে সর্বাণী মনে-মনে জোর পান। জোর পান মেয়ে তাঁকে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করছে বলে। জোর পান; তাঁর নিজের চেয়ে তাঁর মেয়ে আজকাল বেশি বোঝে। জোর পান তাঁর মেয়ের তুলনায় তাঁর আনুপাতিক মূর্খতায়।

তারপর, আশ্চর্য, সত্যি-সত্যি সেই মেডেল এসে একদিন পৌঁছুলো। ছোট নীল একটি মখমলের বাক্সে লাল ফিতেয় বাঁধা গোল একতাল সোনা।

সত্যি-সত্যি খাঁটি সোনা, পাকা সোনা, কোথাও এতোটুকু খাদ নেই।

'প্রায় দু'ভরিটাক হবে, কি বলো? কি ভারি!' হাতের চেটোয় নিয়ে মেডেলটা বারে-বারে উলটে-পালটে ওজন নিতে-নিতে সর্বাণী বললেন, 'দাম কতো আজকাল সোনার? স্যাকরাকে একবার গিয়ে জিগগেস করে এসো না।'

বিনায়কবাবু কঠিন মুখে বললেন, 'তুমি ওর এই মেডেলটা বেচবে মনে করেছ নাকি?'

'পাগল!' সর্বাণী মেডেলটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরলেন, 'আমি এমনি জানতে চাচ্ছিলাম কতো দাম পড়তে পারে। মজুরি নিয়ে প্রায় ষাট-সত্তর টাকা হবে, কি বলো?' পরে এগিয়ে এলেন মেয়ের দিকে, 'পর্ না, পর্ না, গলায় একবারটি ঝুলিয়ে দে না দেখি। দেখি কেমন তোকে দেখতে হয়।'

বীথি হেসে গড়িয়ে পড়লো, 'তুমি কি ছেলেমানুষ, মা। সামান্য একটা কি মেডেল পেয়েছি, তাই গলায় দিয়ে আমি এখন আবার নাচ শুরু করি।'

তাই হয়তো হবে, মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সর্বাণী নিজেকে তখুনি সংশোধন করেন, মেডেলটা বুঝি বাক্সেই বন্ধ করে রাখতে হয়। বীথি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি বোঝে, নইলে সত্যি-সত্যি আর একটা জলজ্যান্ত সোনার মেডেল পেয়েছে! গলায় না দিক, সবাইকে এমনি দেখাতে কি দোষ! নইলে মেডেলটা পেয়ে আর কি এগুলো জিগগেস করি?

সর্বাণী বললেন তক্ষুনি সবাইর আগে ঠাকুরঝিকে দেখাতে।

'নাচ একটা খুব খারাপ জিনিস, না? দেখি কেমন আর তুমি নাক সিঁটকাও। স্বয়ং জেলার ম্যাজিস্টার দিয়েছেন—যা-তা লোক নয়, খাঁটি সাহেব। তাঁর মুখের উপর কথা বলো তোমার সাধ্য কি!'

তারপর থেকে তাঁদের বাড়িতে পাড়ার যে কোনো মেয়ে বেড়াতে এসেছে, সর্বাণী আগে তাঁর ট্রাঙ্ক খুলে বার করেছেন সেই একচাকতি মেডেলটা।

'সেই দিন ম্যাজিস্টার-সাহেবের সেই সভা ছিল না? সেইখানে নাচ দেখিয়ে খুকি এই মেডেলটা পেয়েছে দেখ। দু'ভরিটাক হবে, কি বলো, ননীর মা?' বাক্স থেকে কাল্পনিক ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সর্বাণী মেডেলটা সবাইর চোখের উপর মেলে ধরেন।

'একটু আলগোছে ধরো ছোট বৌ, দামী জিনিস।' সর্বাণী চোখে-মুখে নিদারুণ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'তাই বলে ঠং করে একেবারে মেঝের উপর ফেলে দিয়োনা। বোকা-ছোকা মানুষ, আমরা কি আর এ সবের ব্যবহার জানি?'

তারপর গলা খাটো করে লস্কর-গিন্নীর কানে, 'ডাক্তারবাবুর মেয়ে—সে তো

পেয়েছিলো। এক চিলতে একটুখানি রুপো। রুপো না দস্তা কে জানে? আর এ বাবা জেলার ম্যাজিস্টার দিয়েছেন!'

সেইদিন সুধীনের সঙ্গে দেখা হলেও সর্বাণীর মুখে সর্ব-প্রথমে এই কথাটাই বেরিয়ে এলো।

'হপ্তাখানেক হলো বাড়ি এসেছ শুনছি, কই, একবারটি তো আমাদের ওখানে গেলে না। খুকির মেডেলটা তো দেখে এলে না গিয়ে।'

সুধীন মোক্তার রামহরিবাবুর বড়ো ছেলে, কলকাতার কলেজে বি-এ পড়ে। এক পাড়াতেই থাকে, এইটুকু থাকতে জানাশোনা। এক বাড়ির ক্ষেতে নতুন তরকারি উঠলে পাশের বাড়িতে তার ভাগ যায়। রামহরিবাবুর বাড়িতে গিয়েই তাকে তিনি আজ মুখোমুখি ধরে ফেললেন। নেহাত মেডেলটা আঁচলে করে বেঁধে নিয়ে আসা যায় না। সর্বাণী হাঁসফাঁস করতে লাগলেন।

সুধীন অবাক হয়ে বললে, 'কেন, এসেই তো গেছি আপনাদের বাড়ি। কালও সন্ধের সময় বীথির সঙ্গে কতো গল্প করে এলাম।'

'কখন গেলে? বা রে, মেডেলটা তো আমার ট্রাঙ্কে, খুকি তো আমাকে সেকথা কিছু বললে না!'

'আমাকেও হয়তো বলতে ভুলে গিয়েছিলো,' সুধীন হাসিমুখে বললে।

'এ আবার কি রকম কথা! কালও গিয়েছিলে সন্ধের সময়, অনেক গল্প করে এসেছ বলছ,—অথচ—' কথাটা কি বলে যে শেষ করবেন সর্বাণী কিছু ভেবে পেলেন না।

'দেখ, দেখ তোমার মেয়ের কীর্তি!' আবাঁধা একটা এক্সারসাইজ খাতা হাতে নিয়ে সর্বাণী স্বামীর কাছে ঘন হয়ে এসে দাঁড়ালেন। ভয়ে তার সমস্ত মুখ গোল হয়ে উঠেছে।

বিনায়কবাবু সন্দিগ্ধ চোখে বললেন, 'কেন, কি হলো?'

'দেখ, খাতায় এ-সব কি লিখেছে খুকি,' চিন্তিত, ঝাপসা গলায় সর্বাণী বললেন, 'বোধ হয় কবিতা। দস্তুরমতো মিলিয়ে-মিলিয়ে লিখেছে। এ আবার ওকে কে শেখালো?'

'দেখি, দেখি,' বিনায়কবাবু খাতাটা কেড়ে নিয়ে বিস্ফারিত চোখে পড়তে শুরু করলেন। উৎসাহে উঠলেন ঢেউয়ের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে, 'এ যে দস্তুরমতো ভালো জিনিস। বলো কি, এসব বীথি লিখেছে?'

'হ্যাঁ, ওর টেবিলের ওপর খোলা পড়ে ছিলো। টেবিলটা গুছিয়ে দিতে গিয়ে চোখ পড়লো, দেখলুম পদ্য করে লেখা, বড়ো-বড়ো অক্ষরে,' স্বামীর আনন্দদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে সর্বাণী ভরসা পেলেন, 'সত্যি বলছ, এ ভালো জিনিস?'

'ভীষণ ভালো। আমি তো ভাবতেই পারছি না বীথি এ-রকম লিখতে পারে—এতো বড়ো-বড়ো ভাব, অথচ কোথায় এতোটুকু একটা ছন্দপতন হয়নি?' বিনায়কবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন, 'তুমি এ লেখাগুলি দেখে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলে?'

'ভয় পাবো না? মেয়েছেলে শব্দ মিলিয়ে-মিলিয়ে কবিতা লিখছে, এ একটা ভয়ের কথা নয়? আমাদের সময় হলে—'

'সে-সময় আর নেই, যেমন নেই আর মেয়েদের নাকে নোলক, সেই পাছা-পেড়ে শাড়ি—তোমাদের সময় যে-সব প্রচণ্ড ফ্যাশান ছিলো। তা ছাড়া,' খাতার পৃষ্ঠাগুলো একের পর এক উলটোতে-উলটোতে বিনায়কবাবু বললেন, 'তা ছাড়া দস্তুরমতো উঁচুদরের কবিতা—এটা, এটাতে তো প্রায় শঙ্করাচার্যের ফিলসফি দেখতে পাচ্ছি! শোনো—'

বিনায়কবাবু স্বর করে কবিতাটা পড়তে লাগলেন, আর সর্বাণী ডিমের মতো নিটোল মুখ করে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে। 'আর এই দেখ শরৎকাল নিয়ে একটা লিখেছে, কথামালার সেই শৃগাল আর সারস নিয়ে, দস্তুরমতো শক্ত কাজ তাকে কবিতায় নিয়ে যাওয়া, ওদের স্কুল নিয়ে, মাতৃভক্তি নিয়ে—তুমি বলো কি,' বিনায়কবাবু উত্তেজনায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন, 'আর এই দেখ পরম পিতা ঈশ্বরকে নিয়ে কবিতা। তুমি বলো কি! এতো অল্প বয়সে এমন প্রতিভার কথা তুমি কোথাও শুনেছ? এমন সব উপদেশ-পূর্ণ ভালো-ভালো কবিতা, আর তুমি এসেছিলে বীথির নামে আমার কাছে নালিশ করতে।'

সর্বাণী আমতা-আমতা করে বললেন, 'আমি কি জানি মেয়েছেলে কেউ এমন ভালো-ভালো বড়ো-বড়ো কথা লিখতে পারে কখনো? আমাদের সময় হলে তো কেলেঙ্কারির শেষ থাকতো না। তখন দু' এক লাইন বা যদি কেউ কবিতা লিখতো, নেহাত স্বামীর চিঠিতে। তাই তো অতো ভয় পেয়ে গেছলুম। আমাদের সময় হলে—'

বিকেল বেলা ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরলে বীথিকে বিনায়কবাবু ডেকে পাঠালেন।

'তুমি এতো সব চমৎকার কবিতা লিখেছ, আমাকে দেখাওনি কেন?'

বীথি লজ্জায় দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেলো। যেন মন্দিরে ঢুকে দেবতার বিগ্রহ ছুঁতে এসে আপাদমস্তক সে পাথর হয়ে গেছে।

অপরাধীর মতো ম্লান মুখে বীথি বললে, 'ভারি বিশ্রী হয়েছে, বাবা। ও কেন তুমি দেখতে গেলে?'

'আমার মেয়ে বলে তোমাকে কিছু বাড়িয়ে বলছি মনে কোরো না। চমৎকার হয়েছে মার্ভেলাস্ হয়েছে। মার্ভেলাসে কিন্তু দুটো এল্, তা মনে রেখো, বীথি।' মাঝখানে বিনায়কবাবু একটু মাস্টারি করে নিলেন, 'যেমন শব্দচয়ন, তেমনি ছন্দজ্ঞান। আমি দস্তুরমতো অবাক হয়ে যাচ্ছি এ-শক্তি তুমি কোথায় পেলে? আমি তো কোনোদিন জলের সঙ্গে বেল পর্যন্ত মেলাতে পারলুম না।'

বীথির মনে হতে লাগলো সে কেন এর চেয়েও আরো ভালো লেখেনি? মনে হতে লাগলো, কবে সে আরো ভালো লিখতে পারবে?

'এ একটা খুব বড়ো গুণ, এর চর্চা কখনো ছেড়ো না। যখনই ফাঁক পাবে, তখনই লিখতে বসে যাবে—তাই বলে পড়াশুনায় যেন ঢিল দিয়ো না। ডু নট নেগলেক্ট ইয়োর স্টাডিজ। মানকুমারীর পর বাঙলাদেশে আর মেয়ে-কবি জন্মালো না। তোমারও তাঁরই মতো প্রায় ডিক্শান্—ডিক্শান্-কথাটার বানান জানো তো?

বীথি লজ্জায় ঘাড় নোয়ালো।

'আগের দিনে মেয়েদের নিজের বলে কাগজ-কালি কেনবারই পয়সা ছিলো না, ছিলো না নিজেদের বলে আলাদা একটা ঘর—কবিতা লিখবে কি করে? ভাগ্য-ক্রমে তুমি সেই যুগটা পার হয়ে এসেছ এসেছ আমাদের সংসারে। তুমি সমস্ত বাঙালী মেয়ের মুখোজ্জ্বল করবে, সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরও। তোমার কাছ থেকে কতো আমরা আশা করি, বীথি।'

বিনায়কবাবু ঘরের মধ্যে দ্রুতপায়ে খানিকটা পাইচারি করে নিলেন। ফের বলতে লাগলেন, 'লিখবে, লিখবে, আরো লিখবে, বেশ ভালো ভালো সদুপদেশ থাকে, ঐশ্বরিক ভাব থাকে, প্রকৃতি-বর্ণনা থাকে—নবীন সেনের সেই পলাশীর যুদ্ধ পড়োনি—সেই : কাঁপাইয়া রণস্থল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল, কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি। গ্লোরিয়াস্ কবিতা, গ্লোরিয়াস্-এ আবার একটা এল্—থামবে না কোনোদিন। আমি সমস্ত তোমার ছাপিয়ে দেবো, দেখো।'

'ছাপিয়ে দেবে?' বীথি যেন কথাটা বিশ্বাস করতে চাইলো না 'কোথায়?'

'কেন, মহার্ণব-পত্রিকার সম্পাদক জাহ্নবীবাবু আমার মাস্টার ছিলেন, আমার মেয়ে কবিতা লিখেছে শুনলে তিনি প্ল্যাডলি ছেপে দেবেন। নাই বা যদি ছাপেন,' বিনায়কবাবু বাঁ-হাতের উপর ডান-হাতে একটা ঘুঁষি মারলেন, 'আমি এখানকার বার্তাবহ-প্রেস থেকে ছেপে নিজে বই করে বার করবো। এমন জিনিস লোকে পড়বে না? তুমি লিখে যাও, বীথি' বিনায়কবাবু চোখের উপর ভুরু দুটো ঘনিয়ে তুললেন, 'পড়াশোনায় যেন ঢিল দিও না। ওয়ার্ক হোয়াইল ইউ ওয়ার্ক, প্লে হোয়াইল ইউ প্লে।'

সেই দিন থেকে বীথির কবিতার খাতাটা বিনায়কবাবুর বগলের তলায়। সন্তর্পণে সেটাকে তিনি তাঁর বার-লাইব্রেরীতে নিয়ে গেছেন। উকিল-মহলে একদিনেই তাঁর প্রতিপত্তির তাপমান অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। ব্রিফের বদলে তাঁর হাতে তাঁর মেয়ের কবিতার খাতা।

দেবীদাসবাবু গম্ভীর, গদগদ মুখে বললেন 'সত্যিকারের জিনিয়াস আছে বটে। কি জানি সেই ইংরেজ মেয়ে-কবির নাম, সেই যে দি বয় স্টুড অন দি বার্নিং ডেক লিখেছিলো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিসেস্ হেমান্স, মিসেস্ হেমান্সের মতো চমৎকার।'

বিনায়কবাবু কুটিল চোখে বললেন, 'আর প্রকৃতি-বর্ণনা? এই যে, শোনোই না এখানটা। শরতের পর শীত এসেছে—শোনোই না একবার, আমাদের তখন কি অবস্থা হয়।'

মণীন্দ্রবাবু বললেন, 'বুড়ো বয়েসে নিজে কবিতা লিখে মেয়ের নামে চালাচ্ছেন নাকি? নইলে এমন মিল, এমন কঠিন কঠিন শব্দ, এমন সারগর্ভ সব কথা—সেকেণ্ড ক্লাসের মেয়ের পক্ষে একটু যেন কেমন কেমন ঠেকছে না? কি বলো হে, কেষ্টকমল?'

বিনায়কবাবু ঘোরতর প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ কখনো তেলে-জলে মেলাতে পারলো না, তায় আমি লিখবো কবিতা!'

কৃষ্ণকমলবাবু টিপ্পনি কাটলেন, 'তা, মেয়েও তো তোমারই মেয়ে।'

'তাই তো ভেবে অবাক হচ্ছি, এ জিনিয়াস ওর এলো কোত্থেকে?'

সুবিধেমতো যাকে হাতের কাছে পাচ্ছেন, যার কাছে তিনি চান বা মনে-মনে একটু মর্যাদাবান হতে, তাকেই ধরে বিনায়কবাবু মেয়ের কবিতা পড়িয়ে শোনাচ্ছেন। নদীর ধারে, ল্যাম্প-পোস্টের নিচে, বাজারের রাস্তায়।

প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকদের মধ্যে একমাত্র মুন্সেফবাবুই তাঁর নাগালের মধ্যে। সেদিন সকালবেলা সটান তাঁর বাড়িতে গিয়েই তিনি হাজির।

কথায়-কথায়ঃ

'এই দেখুন আমার মেয়ের কবিতা। এই এটা আগে পড়ুন, নদী নিয়ে লিখেছে।'

টাকে হাত বুলতে-বুলতে মুন্সেফবাবু বললেন, 'আমার মেয়ের কাছে আপনার মেয়ের কথা শুনেছি। শুনেছি অসাধারণ মেয়ে। লেখা-পড়ায়, নাচে-গানে, সব দিকে অসামান্য। কবিতার আমি কিছু বুঝি না, মশাই, কোল্ড ফ্যাক্ট, তবে এই আসচে মাঘে আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, আপনার মেয়েকে সেই উপলক্ষে দয়া করে যদি একটা প্রীতি-উপহার লিখে দিতে বলেন—'

'ও, মাঘ মাস?' বিনায়কবাবু সামনের টেবিলের উপর একটা চড় মেরে বসলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। অনায়াসে, একশো বার লিখে দিতে পারবে—শীতকাল সম্বন্ধে ওর স্টকে খুব ভালো-ভালো আইডিয়া আছে—এই যে সাতাত্তর পৃষ্ঠায়।'

বীথির প্রথম কবিতা বেরুলো এই শহর-থেকে ছাপা, প্রুফের কাগজে ছাপা, সাপ্তাহিক 'দর্পণে'। কবিতার নামের পাশে ফুটকি দিয়ে নিচে রুল টেনে তার তলায় তার বাবার নাম ও তার বয়সের সংখ্যাটা পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

লজ্জায় বীথি আকর্ণমূল বিবর্ণ হয়ে গেলো। এক জন্যে ততো নয়, যতো সে কেন এর চেয়ে আরো ভালো লিখতে পারলো না। কবে সে আরো ভালো, মনের মতো করে লিখতে পারবে? প্রকৃতি কি অনুভব করছে, তাতে তার কি এসে যায়? সে সত্যি-সত্যি কি অনুভব করছে এই মুহূর্তে, বুক ভরে এই নিশ্বাস নিতে-নিতে, তাই যদি সে না লিখলো, তার হয়ে সে-কথা তবে আর কে লিখে দিয়ে যাবে বলো?

কিন্তু, কাগজের থেকে কলম তুলে বীথি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে, নিজের মনের নীরব কথাটি ভাষায় হুবহু প্রকাশ করা কি ভয়ানক শক্ত কাজ! ছোট এই এক্সারসাইজ খাতাখানি নিয়ে বীথির কতোদিন সঙ্কোচের অন্ত ছিলো না—তার এই সঞ্চীয়মান যৌবনের সঙ্কোচ। কারু চোখের সামনে তার একটি পৃষ্ঠা মেলে ধরা মানে তারই যেন আশরীর অনাবরণ। তাই বাবা যখন তাকে কবিতার জবাব দিহি দেবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, লজ্জায় ও ভয়ে সে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো, মাটির অসহায়তায় ছাপার অক্ষরে দেখা তা বরং কতো সহজ, কত পরিচ্ছন্ন, কিন্তু হাতের লেখায় আঁকাবাঁকা তার ঐ কটি অস্পষ্ট কাটাকুটিতে তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত গোপনতা যেন ধরা পড়ে গেছে।

আশ্চর্য, তাই বলে এতোটা সে কখনো ভাবতেও পারতো না। তিরস্কার করা দূরের কথা, বাবা সামান্য একটা ভ্রূকুটি পর্যন্ত করলেন না। মা'র মুখ যা একখানা হাঁড়ির মতো থমথমে হয়ে উঠেছিলো, এক নিশ্বাসে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর

সমস্ত কুয়াশা। দু'হাত তুলে বাবা তাকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন, অকৃপণ রৌদ্রের মতো তার আনন্দ দিলেন ঝরিয়ে। বইয়ে দিলেন উৎসাহের ঝড়, বিদ্যুদ্দাম বিজ্ঞাপন।

পৃথিবীর কোন নবীন কবি তার প্রথম কাব্যারাধনার সূচনায় এমন দিগন্তবিস্তৃত অভ্যর্থনা পেয়েছে? বিশেষতো মেয়ে হয়ে, বুক ফাটলেও 'যাদের মুখ ফোটবার কথা নয়। সর্বাণীর ভাষায় বলতে গেলে, যাদের কবিত্বের এলাকা স্বামীর চিঠির মধ্যেই সীমাবন্ধ!

কিন্তু বীথির বেলায় হঠাৎ এই উত্তপ্ত পক্ষপাত কেন? কেন এই প্রশংসমান কলগুঞ্জন? সে এমন কি আর ভালো লিখেছে?

ভালো না লিখুক, তার লেখবার বিষয়গুলি তো ভালো। সে নদী নিয়ে লিখেছে, মাতৃভক্তি নিয়ে লিখেছে, শৃগাল আর সারসপক্ষী নিয়ে লিখেছে। মেয়েদের বেলায় এর অতিরিক্ত আর কি দেখবার থাকতে পারে? তারা কি, তাই যথেষ্ট: তারা কেমন, তা নিয়ে কেউ বিচার করতে আসে না। কি নিয়ে তারা লিখলো, নয়।

কিন্তু তেমন করে বীথি কবে লিখতে পারবে?

সেই দিন থেকে বিনায়কবাবু কেবল তাকে মৃদু-মৃদু টোকা মারছেন, 'তারপর আর কি লিখলে, বীথি? এখন তো দিব্যি গরম এসে পড়েছে—এবার একটা গ্রীষ্ম নিয়ে লিখে ফেল না। গ্রীষ্মকালে খুব ভালো প্রকৃতি বর্ণনা করার সুবিধে।'

লজ্জায় বীথির ঘাড়টা ছোট হয়ে শক্ত হয়ে এলো, 'এখন আর কিছু লিখতে পাচ্ছি না, বাবা।'

'না, না, আইডিয়া না এলে লিখবে কোত্থেকে? এ তো আর মুখস্থ করা নয় যে জোর করে খানিকটা গিলে ফেললেই হলো! এ হচ্ছে, কোথাও কিচ্ছু নেই, খানিকটা শূন্য থেকে একটা তারা সৃষ্টি করে তোলা। রেডি থেকো, সব সময়ে রেডি থেকো, কখন কোত্থেকে আইডিয়া এসে যাবে তুমি টেরও পাবে না। সময় বয়ে যেতে দিয়েছ কি, হয়তো আর একটি তারাই ফুটলো না তোমার আকাশে।' বিনায়কবাবু যাবার আগে ওপাশের জানলাটা খুলে দিয়ে গেলেন, 'ক'দিন থেকে কি গরমই যে পড়েছে!'

কিম্বা ধরো, সেই দিন, বীথি যখন লণ্ঠনের আলোয় টেবিলের সামনে হেঁট হয়ে বসে কি লিখছিলো।

পিছন থেকে চোরের মতো চুপি-চুপি বিনায়কবাবু কখন ঢুকে পড়েছেন। ভয়ে বীথি প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে আসবার যোগাড়।

খাতার উপর গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে বিনায়কবাবু বললেন, 'কিছু লিখছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ বাবা, একটা ট্রানশ্লেসান করছিলুম।'

'ভালো কথা, খুবই ভালো কথা। কিন্তু মাঝে-মাঝে দু'একটা কবিতাও লিখো মনে করে। এ সাঁতার শেখা নয়, যে জল পেলেই অনায়াসে ভেসে থাকা যাবে। চর্চা চাই, সাধনা চাই—চর্চা না থাকলে অন্তরের সমুদ্র থেকে একটি মণি-মুক্তোও তুমি তুলে আনতে পারবে না।'

'আমার পরীক্ষা যে বাবা, খুব কাছে এসে পড়লো।'

'তা তো ঠিকই। আগে পড়া তার পর লেখা, না পড়লে তুমি লিখবে কোত্থেকে? তবে একটা কথা, বীথি, শোনো, একটা কবিতা তোমাকে আমার লিখে দিতে হবে কিন্তু।' কথাটা একটা কাতর আবদারের মতো শোনালো।

বীথি অল্প একটু হাসল, 'কি নিয়ে?'

'আমাদের সেকেন্ড-মুন্সেফ এই এপ্রিলে বদলি হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর ফেয়ারওয়েল নিয়ে—মনে থাকে যেন ফেয়ারওয়েলে দুটো এল্, আর ওয়েলফেয়ারে একটা। পারবে না লিখে দিতে?'

'আমি যে তাঁকে চিনি না বাবা, কোনোদিন দেখিওনি।'

'তোমাকে দেখতে হবে না। কি-কি লিখতে হবে, তাঁর কোয়্যালিফিকেশান্স্—সব আমি তোমাকে লিখে দেবো পর-পর। তার পর তুমি সেগুলোকে সুন্দর করে মিলিয়ে দেবে—কতোক্ষণ আর লাগবে তোমার? তারপর পড়াশুনো, হ্যাঁ, খবরদার, পড়াশুনোয় যেন তাই বলে ঢিল দিয়ো না।'

সম্মতিতে বীথি আরক্ত হয়ে উঠলো।

তার আপত্তি করা উচিত নয়। বিষয়টাকে সত্যি ভালোই বলতে হবে।

না, কবিতা লেখার জন্যে বীথি ক্লাসের পড়ায় একতিল ঢিল দেয়নি। দস্তুরমতো গলা ছেড়ে সে মুখস্থ করেছে। এবারও সে প্রথম হয়ে ফার্স্ট-ক্লাসে প্রমোশান পেলো। এবার পেলো চার টাকা করে বৃত্তি।

সংসারের দস্তুরমতো আয় বেড়ে গেলো বলতে হবে—সর্বাণীর এটা-ওটা খুচরো হাত-খরচ। এমন-কি, পোস্ট-আপিসে বীথির নামে খোলা হলো ছোট একখানি খাতা। সে-টাকা তুলতে হলে বীথির দস্তুরমতো সই চাই।

'কি মজবুত জমি দেখেছ এ শাড়িটার!' সর্বাণী পাড়ার পোস্ট-মাস্টারের স্ত্রীর দিকে শাড়ির পাড়ের কাছটা আঙুলে করে তুলে ধরেন, 'কতো বললুম, বুড়ো বয়সে এতো টেঁকসই শাড়ি পরবার আমার কি হয়েছে! তা, বীথি কিছুতেই শুনবে না, নিজে দোকানে গিয়ে কিনে এনেছে দেখ না—দু' টাকা বারো আনা করে জোড়া। চার টাকার মধ্যে দু' টাকা বারো আনা-ই যদি তুই বার করে দিলি, তবে তোর নিজের জন্যে আর থাকলো কি?'

এই টাকাতেই মা এমন আথালি-পিথালি করছেন, বড়ো হয়ে বীথি যখন চাকরি করবে, তখন কি না-জানি হবে! কি আবার হবে—সে ফিরিয়ে দেবে সংসারের এই কাতর চেহারা, তখন সামান্য এই চার টাকা বাজিয়ে মাকে এমন স্ফূর্তি করতে হবে না।

দ্বিগুণতর উৎসাহে বীথি বইর উপর ঝুঁকে পড়লো। তার শেষ পরীক্ষার দিন এখন প্রায় আঙুলে গোনা যায়।

পড়া নিয়ে এমনি একটা তাড়াহুড়োর সময় বীথির কানে এলো পাশের বাড়ির উমাশশীকে কারা মেয়ে-দেখতে এসেছে।

উমাশশী তার সঙ্গে পড়ে, একই ক্লাসে, নম্বরের দৌড়ে চলছিলো প্রায় তার কান ঘেঁষে। পরীক্ষার আর মাসখানেকও বাকি নেই, সে কিনা এর মধ্যে, এতো সকালেই কুপোকাৎ।

মজা দেখবার জন্যে বীথি লুকিয়ে চলে গেলো ও-বাড়ি। আর-আর মেয়েদের সঙ্গে সে-ও জানলার ফাঁকে উঁকি মারলে।

উঃ, সে কী বিভৎস নাটকীয়তা! জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে বীথির সমস্ত গা জ্বলে যেতে লাগলো। উমার খোঁপাটা পিঠের উপর ভেঙে ফেলে দেখছে তারা তার চুলের কতোখানি দৈর্ঘ্য, কিম্বা খোঁপার ভেতর মোজা লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা, হাতে নিয়ে অনুভব করছে তার কেমন মসৃণতা। হাঁটিয়ে-হাঁটিয়ে দেখছে তার চলার চাপল্য। মুঠোর মাঝে করতল তুলে নিয়ে ওজন করছে তার লালিত্য ও লজ্জা, চামড়ার ওপর আলগোছে একটু আঙুল ঘষে পরীক্ষা করছে তাতে কিছু মেকি পালিশ আছে কিনা। দেখছে তার দাঁতের কোনো দোষ আছে কিনা, হাসিয়ে দেখছে তার মাড়িটা কতোদূরে পর্যন্ত দেখা যায়, চেয়ারে না বসে উবু হয়ে বসবার সময় যেমন ধরো, সে যখন গ্রামে গিয়ে পিঁড়ে লেপবে বা ঘাটে বসে বাসন মাজবে—তখন সে কতোটা শ্রীমতী হয়ে ওঠে।

আর কি সব জঘন্যতরো প্রশ্ন!

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির নাম করো। ইংরিজিতে মজঃফরপুরের বানান কি? কনটিনুয়ালের তফাত কোথায়?

আশ্চর্য, উমাশশী কোথাও এতোটুকু প্রতিবাদ করলো না: হাঁটলো, দাঁত দেখালো, ওঠ-বোস করলো। একটা প্রশ্নেও একচুল ঠেকলো না। এতো সব যেন সে পড়ে রেখেছিলো এই পরীক্ষাটাই উৎরে যেতে।

কিন্তু দেখে-শুনে বীথির সমস্ত স্নায়ু-শিরা বিষাক্ত সাপের মতো উঠলো কুণ্ডলী পাকিয়ে।

ফাঁকা একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে উমাশশীকে সে পাকড়াও করলে। ঝাঁজালো গলায় বললে, 'তুই কি বাজারের একটা জিনিস, বাইরের শো-কেসে সাজানো, যে, যে-সে যখন-খুশি এসে নেড়ে-চেড়ে তোকে যাচাই করে যাবে? শরীরে তোর রক্ত নেই, তুই মানুষ নোস?'

উমাশশী ম্লান হেসে বললে, 'নইলে কি করে আর আমাদের বিয়ে হতে পারে বল্?'

কথাটা বীথিকে একটা ধাক্কা দিলো। তবু জেদি গলা বললে, 'নাই বা হলো বিয়ে। তার জন্যে আমাদের হাত টিপে-টিপে দেখবে, বলবে, হাঁ করো, তোমার দাঁত দেখি? এ কি কসাইখানায় একটা মাংসের দোকান পেয়েছে নাকি? তোর একটা আত্মসম্মান নেই? বিয়ে হবে বলেই তুই তোর সম্মান খোয়াবি নাকি? মেয়েদের সমস্ত সতীত্ব বুঝি কেবল বিয়ের পরে থেকেই আসে, বিয়ের আগে আর তার কোনো বালাই নেই, না?'

কথার ঝাপটায় উমাশশী একেবারে হাঁপিয়ে উঠলো। নির্জীব গলায় বললে, 'তা আমি কি করতে পারি? ওরা ভদ্র নয় বলে আমি অভদ্র হই কি করে?'

'তাই বলে তোকে নিয়ে তারা বাঁদর-নাচ করাবে? হাঁচতে বললে হাঁচবি, হাই তুলতে বললে হাই তুলবি?'

উমাশশী করুণ করে বললে, 'বাবা-কাকারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা যখন

সেইটেই পছন্দ করছেন দেখা যাচ্ছে, তখন, তুইই বল্, তাঁদের মুখের উপর আমি গোঁয়ারতুমি করতে পারি নাকি ?'

'পারা উচিত ছিলো। আগে আমরা মানুষ, পরে মেয়ে,' বীথি জোর গলায় বললে, 'কিন্তু বিয়েটা তো একটা একতরফা জিনিস নয়. তোকে তোর বর যাচাই করে দেখতে দেবে? তোর চুল ছোট বলে যদি তুই অপছন্দের হোস তো তোর বর গোঁফ রাখে বলে তাকে তুই বাতিল করে দিতে পারবিনে কেন? তুই বা কেন তাকে বাজিয়ে নিতে পারবিনে? তোকে যেমন হাঁটিয়ে দেখেছিলো. তেমনি তাকেও বা কেন তুই বলতে পারবিনে এখান থেকে ঐ পর্যন্ত একটা লং-জাম্প্ দাও ?'

এতো দুঃখেও উমাশশী হেসে উঠলো।

'তুই তো হাসবিই, বিয়ের নাম শুনে সারা গায়ে যে তুই পেখম মেলে ধরেছিস। কিন্তু আমার.' বীথি দাঁত দিয়ে চেপে ঠোঁটের একটা কোণ ধারালো করে তুললো, 'রাগে আর অপমানে আমার সমস্ত রক্ত কালো হয়ে উঠেছে।'

এতে এতো যে কি রাগের থাকতে পারে উমাশশী একনিশ্বাসে যেন তা কিছু বুঝে উঠতে পারলো না।

অসহায়ের মতো মুখ করে বললে, 'বাবা-মা যদি জোর করে বিয়ে দিতে চান যদি সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠিয়েই দেন ভদ্রলোকের সামনে—আমি যে কি করতে পারি, তখন যে কি করা যায়, আমি তো ভাই কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।'

'তা তো ঠিকই.' বীথি প্রচণ্ড চোখে তাকে একটা চিমটি কাটলো, 'রত্নাকর দস্যুও সে-কথাই বলেছিলো। কিন্তু, পড়াশুনো তা হলে তুই এখেনেই ছেড়ে দিলি ?'

বীথির প্রশ্নটা যেন তাকে বিদ্ধ করলো।

'বিয়ে যদি সত্যিই হয়, তবে কি দাঁড়ায় কেমন করে বলবো ?' উমাশশীর চোখ বুঝি বা এলো ঝাপসা হয়ে. 'শেষ পর্যন্ত বোধহয় ছেড়েই দিতে হবে।'

'ছেড়েই দিতে হবে তো ঠাট করে পড়তে গিয়েছিলি কেন ?'

উমাশশী হেসে ফেললো, 'নয় তো বাড়িতে বসে শুধু-শুধু এমনি ধুমসো হবো নাকি? মাঝের এতগুলি দিন কি করা যায় তবে ?'

'মাঝের এতোগুলি দিন!' বীথি আবার তপ্ত হয়ে উঠলো. 'তবে বিয়ে হবে বলেই লেখাপড়া শিখছিলি? লেখাপড়া একটা উপায়, উদ্দেশ্য নয় ?'

'কিছু জানি না বাপু, পারিস তো বাবার সঙ্গে লড়ে দ্যাখ,' উমাশশী উঠে পড়লো, বললে, 'যাই কেন না বলু, পরীক্ষাটা না দিয়ে আমি পিঁড়িতে গিয়ে বসছি না।'

'যথেষ্ট পরীক্ষা দিয়েছিস!' বীথিও আর বসলো না, বিদ্রূপে উঠলো ঝিলিক দিয়ে, শেষকালে তোর যুদ্ধ অন্যকে গিয়ে লড়তে হবে? যাক, আমি বেঁচে গেছি উমা,' শরীরের লীলায়িত লঘিমায় বীথি একটা মুক্তির ঢেউ তুললে, 'আমার বাবা-মা কক্খনো আমার এই অকালমৃত্যু দু'চোখ মেলে দেখতে পারতেন না। আমরা বাঁচবো বলেই এসেছি, বেচবো বলে নয়।'

বীথি দ্রুত পায়ে ঘর থেকে গেলো বেরিয়ে। তার বেণীর ত্বরিত চমক তার সমস্ত ছায়ায় একটা ধারালো আভা এনেছে।

শোনা গেলো, পাত্র নাকি, শেষ পর্যন্ত উমাশশীকে পছন্দ করতে পারেনি।

[illegible]

পাশের ঘরে দেয়ালে কান পেতে বীথি সব শুনতে পাচ্ছে।

'গান জানে না যে। খালি একটু বিদ্যের বাহার থাকলেই তো চলে না আজকাল, একটু নাচ-গানও যে জানা দরকার। সব দিক থেকেই সরস্বতী হয়ে ওঠা চাই যে,' মহেশ্বরী একটা ঢোঁক গিললেন, 'আমি বলি কি, আমাদের বীথির সঙ্গে কথাটা একবার পেড়ে দেখি না। আমার ঠিক বিশ্বাস, ওকে তাদের পছন্দ হবে, নাচে-গানে সোনার মেডেল-পাওয়া মেয়ে - ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে, দেখো।'

নাকের ভিতর দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে বিনায়কবাবু বললেন, 'পাগল!'

সর্বাণী বললেন, 'কি যে তুমি বলো, ঠাকুরঝি, সামনে ওর একজামিন।'

'একজামিন বলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না নাকি?' মহেশ্বরী ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'বেশ তো, ফাল্গুনটা পেরিয়ে গিয়ে বোশেখে দিন ফেললেই হবে। তখন তো আর মেয়ের পরীক্ষা নেই?'

'তখন ও কলকাতা গিয়ে কলেজে পড়বে না?' কথাটা মুখে বলতেই যেন সর্বাণীর বুকটা দশ হাত হয়ে উঠলো।

'ভালোই তো। ছেলেও তো কলকাতাতেই কাজ করে।'

'কি কাজ?'

'কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় আলো জ্বলে না?—তার ইনস্পেকটার। একশো টাকা নাকি মাইনে। বেশ ভালো বংশ। এমন পাত্র হাত-ছাড়া কোরো না। আমারই তো দূর-সম্পর্কের মাসতুতো দেওর, আমি যদি বলি —'

হাসতে গিয়ে বিনায়কবাবু আবার একটা শব্দ করলেন।

'কি যে তুমি বলো, ঠাকুরঝি,' ঠাট্টায় সর্বাণীও তাঁর ঠোঁটের প্রান্তটা একটু কুঁচকোলেন, 'খুকির জন্যে একটা একশো টাকা মাইনের পাত্র! তাও কিনা আলোর ইনস্পেকটার। খুকি আমার এমনি ভেসে এসেছে নাকি?'

মহেশ্বরী জ্বলে উঠলেন, 'তবে খুকির জন্যে তুমি কি এমন হাতি-ঘোড়া চাও জিগগেস করি? এদিকে বর্ণখানা যে দুধে-আলতায় তার খেয়াল রাখো?'

'রঙ দেখে যারা মেয়ে পছন্দ করে, তাদের হয়ে তুমি কিছু বলতে এসো না।'

'বেশ তো,' মহেশ্বরী তবুও হাল ছাড়লেন না, 'একশো টাকায় মন না ওঠে, আমি তিনশো টাকার পাত্র এনে দিতে পারি। যশোর-বনগাঁতে কি সব ব্যবসা করে শুনেছি।'

'বাঙলা দেশে তুমি আর জায়গা খুঁজে পেলে না?' সর্বাণী ঠোঁট উলটিয়ে কথাটা উড়িয়ে দিলেন, 'শেষকালে পাঠাই ওকে একটা ম্যালেরিয়ার ডিপোয়!'

'জায়গা ভালো না হলে কি হবে, ব্যবসার মুনাফার দিকে তো তাকাতে হয়! দস্তুরমতো ফ্যালাও ব্যবসা!'

সর্বাণী জিগগেস করলেন, 'কি পাশ?'

'টাকা রোজগার করতে পারলে পুরুষের পাশ ফেল দিয়ে কি হবে? চিঁড়ে বলো, মুড়ি বলো, ভাতের সমান কিছু নয়।' মহেশ্বরী গলায় বিশেষ উৎসাহ পেলেন না, 'আই-এ পর্যন্ত বোধহয় পড়েছিলো।'

'রেখে দে,' বিনায়কবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, 'আর দুটি বছর অপেক্ষা করলে

বীথি তাকে অনায়াসে ছাড়িয়ে যেতে পারবে। তারপর ওর কাছে এসে তাকে পড়ে যেতে বলিস।'

মহেশ্বরী এতোতেও দমলেন না। বললেন, 'বেশ তো, পাশ-করা পাত্রই যদি তোমাদের পছন্দ, তা-ও বা না কোন যোগাড় করা যায় ইচ্ছে করলে ?'

'শুধু পাশ-করা হলেই চলবে নাকি ?' সর্বাণী টিপ্পনি কাটলেন, 'পকেটটাও একটু বেশ ভারি থাকা চাই।'

'হ্যাঁ, তা-ও দেখতে হবে বৈকি।'

আর যা-তা একটা চাকরি হলেও হয় না ঠাকুরঝি। পরে বেশ মোটা একটা পেনসন পাওয়া যায় - বুঝলে না, উঁচু-দরের গভর্ণমেণ্টের চাকুরিগুলিই বেশি মজবুত।' সর্বাণী টুপ করে একটা ঢোঁক গিলে গলা নামিয়ে আনলেন, 'ডিপুটি-ঠিপুটি হলেই বেশ মানায়, শুনতেও কেমন গাল-ভরা। আবার নাচ গানও একটু বোঝে, তরতরিয়ে কবিতার বেশ মানে বুঝতে পারে—বুঝলে না, যার-তার হাতে তো আর এমন মেয়েকে তুলে দিতে পারি না! খরচ-পত্র করে এতো সব ওকে শেখালাম!'

'থামো, ওর বিয়ে নিয়ে এখন থেকে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না,' বিনায়ক-বাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'ও তোমাদের পাঁচি-খেঁদির মতো দেহসর্বস্ব বিয়ের জন্য তৈরি হয়নি। ওর অনেক আশা, অনেক ভবিষ্যৎ,' বিনায়কবাবু চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলেন, 'এখন থেকেই ওর কেরিয়ার আমি মাটি করে দিতে পারি না। ওর মাঝে যে আগুন জ্বলছে তা দিয়ে তোমাদের উনুন ধরানোর কাজে না লাগালেও চলবে।' পাশের ঘরে মেয়ের কানে পৌঁছুবার জন্যে গলাটা তিনি কয়েক পরদা চড়িয়ে দিলেন, 'জোন অব আর্কের নাম শুনেছ, নাম শুনেছ ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের, মাদাম কুরির ?'

বাবার উদ্দীপ্ত কথাগুলি বীথিকে সুরভিত একটা নেশার মতো বিভোর করে তুললো।

দেয়ালের থেকে কান সে প্রায় তখন সরিয়ে নিচ্ছিলো, কিন্তু পিসিমা এর পরেও আবার কি বলতে যাচ্ছেন।

বিয়ে করবে না বলে বিয়ের আলোচনা শুনতে দোষ কি ?

মহেশ্বরী বাঁকা গলায় বললেন, 'তাই বলে তুমি মেয়ের বিয়ে দেবে না বলেই ঠিক করেছ নাকি ?'

'আমি মালিক নাকি বিয়ে দেবার ? কি জানি সেই কথাটা—জন্ম মৃত্যু বিয়ে, এই তিনের নেই—ইয়ে।' কথাটা সুবিধেমতো মেলাতে না পেরে বিনায়কবাবু হেসে ফেললেন, যখন হবার তা হবে। নাই হলো তো নাই হলো। তার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরবার কি হয়েছে ? সবাই কি এক গোয়ালের গরু নাকি, সবাই এসেছে নাকি চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরতে ? বিয়ের চেয়েও অনেক বড়ো কাজ মেয়েদের করবার আছে—সেই বড়ো কাজের ভার বীথির ওপর।' বিনায়ক-বাবুর পায়ের ধাপগুলো দ্রুততর হয়ে লাগলো, 'আর বিয়ে যদি একদিন হয়ও, হবে—তাতে আমার কি করবার আছে ? আমি ওর কি করতে পারলাম ? আমি

দিয়েছি ওকে এই প্রতিভা, এই ওর কবিতা লেখবার শক্তি, এই ওর গানের গলা? আমি—আমি—আমার চেষ্টায় কি হবে?'

মহেশ্বরীর তবুও যেন কি বলবার ছিলো, বিনায়কবাবু রূঢ় গলায় ফতোয়া জারি করলেন, 'ওর এই পরীক্ষার সময় বিয়ে-বিয়ে নিয়ে তোমরা এমনি কচাল করতে পারবে না বলে দিচ্ছি। ভালো করে পাশটা আগে ওকে করতে দাও।'

সত্যি, বীথি গা ভরে চমকে উঠলো, পড়ার কথা সে দিব্যি ভুলেই ছিলো এতোক্ষণ। তাড়াতাড়ি চেয়ারের মধ্যে ঘন হয়ে বসে লণ্ঠনটা উস্কে দিয়ে গভীরতর অতলতায় অক্ষরের সমুদ্রে সে ডুব দিলে।

বীথি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে উঠেছে, আর সুধীনও এসেছে কলকাতা থেকে বি-এ দিয়ে।

দগ্ধ দিন যতোক্ষণে না রাত্রিতে গলে যায়—শীতল বিশ্রান্তিতে, সুধীন চুপ করে এসে বসে থাকে বীথির এলোমেলো আলস্যের স্নিগ্ধতায়।

তাদের দুজনের মাঝে কখনো কোনোদিন বাধা বা আড়াল ছিলো না, তাদের আলাপটা ছিলো জলের মতো নির্মল, তাতে না ছিলো ঢেউ, না-বা ছিলো স্তব্ধতা। জলের যেমন বিশেষ কোনো রঙ নেই, তেমনি তাদের আলাপেরও ছিলো না বিশেষ কোনো ভাষা। শুধু প্রবহমান অনর্গলতা দিয়ে তৈরি।

কিন্তু ইদানিং তাদের এই আলাপটা সর্বাণী কেমন পছন্দ করছেন না। চোখের কোণায় চাউনিটা কেমন তাঁর তেরছা হয়ে এসেছে।

বীথির মুখে তার সেই অনাবৃত হাসি তাঁর আজকাল ভালো লাগে না, ভালো লাগে না উনুনের পাশে বেড়ালের মতো গা ঘেঁষে সুধীনের এই ঘনিয়ে বসা। বসবার ভঙ্গিটাও আজকাল বীথি শুধরে নিতে শেখেনি, আগের মতো তেমনি কেমন অগোছাল, তেমনি কেমন অন্যমনা: আঁচলটা নয় সম্বৃত, চুলগুলি রয়েছে বুকে-পিঠে ছত্রখান হয়ে। বয়েসের সীমায় আজও যেন সে পরিমিত হয়ে উঠতে পারেনি, শরীর সম্বন্ধে এখনো আসেনি তার বিন্দুমাত্র সতর্কতা। আর দেখতে-দেখতে, কয়েক দিনের মধ্যেই সুধীন কেমন অবিশ্বাস্য বড়ো হয়ে উঠেছে! মেয়েদের এই বয়েসটাই বিপজ্জনক, সর্বাণী রীতিমতো বিপদের গন্ধ শুঁকলেন চারদিকে। 'কি কেবল রাত-দিন বসে ওর সঙ্গে হ্যা-হ্যা করিস?' বীথিকে একলা পেয়ে সর্বাণী একদিন শাসনে ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

এটা তাঁর নিজের এলাকা। এখানে অন্তত বিনায়কবাবুর কাছে আপিল চলবে না।

সুধীন বাড়ি চলে গেলেও বীথির হাসির আভাগুলি তখনো একেবারে মিলিয়ে যায়নি গা থেকে। সেগুলি সে এবার শব্দের রেখায় স্পষ্ট করে তুললো, 'ভীষণ হাসির গল্প যে, মা। এক তোৎলা ছাত্র ছিলো, তার জন্যে তার বাপ উঁচু মাইনেতে এক মাস্টার রেখে দিলেন, যে দুমাসে তার তোৎলামি সারিয়ে দিতে পারবে। মাস্টার রেখে দিয়ে বাপ নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন কাশী, তীর্থ করতে। দুমাস পরে ফিরে এলেন ছেলের খবর নিতে, মাস্টারির ফল কেমন দাঁড়ালো। ও হরি, তুমি সে-কথা ভাবতেও পারবে না, মা, কি ভীষণ কাণ্ড—দুমাস সমানে

মাস্টারি করতে গিয়ে মাস্টার নিজেই বন্ধ তোৎলা হয়ে গেছে!' হাসির ঘায়ে বীথি একেবারে কাচের বাসনের মতো টুকরো-টুকরো হয়ে গেলো।

'তাই বলে তুই এমন গলা ফাটিয়ে হো-হো করে হাসবি?' সর্বাণী রুক্ষ চোখে বললেন, 'তোর এখন বয়েস হয়েছে না?'

'বয়েস হয়েছে কি, মা? বয়েস হয়েছে বলে হাসির গল্প শুনে গলা ছেড়ে হেসে উঠতে পারবো না?' ঝকঝকে দাঁতে বীথি আবার হেসে উঠলো।

'মেয়েছেলের সব কিছুতেই একটা শ্রী থাকা চাই.' মহান মাতৃত্বের দায়িত্বে সর্বাণী সমস্ত শরীরে গম্ভীর হয়ে দাঁড়ালেন, 'তাই বলে পুরুষমানুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করে হেসে গড়িয়ে পড়তে হবে নাকি?'

'পুরুষমানুষ?' বীথি চমকে উঠলো, 'এখানে আবার তুমি কা'কে পুরুষ-মানুষ দেখলে?'

'আহা, আমার সঙ্গে আর তোর ন্যাকামো করতে হবে না, খুকি। এখানে কে তবে এতোক্ষণ তোর সঙ্গে গল্প করে গেলো?'

'কে আবার গল্প করে গেলো?'

'এখনো হয়তো সুধীন বাড়ি গিয়ে পৌঁছোয়নি, ডেকে নিয়ে আসবো নাকি তাকে? কে আবার গল্প করে গেলো!' সর্বাণী ভুরু শানিয়ে বললেন, 'আমার চোখে তুই ধুলো দিতে পারবি নাকি ভেবেছিস?'

বীথির কপালে আরো একটা গলা-ফাটানো হাসি লেখা ছিলো। বললে, 'তুমি এ-সব কি বলছ, মা? ও যে সুধীন-দা।'

'আহা, সুধীন-দা বলেই চিরকাল সে একেবারে দুগ্ধপোষ্য একটি খোকা আর-কি।' সর্বাণীর কথাটা বীথির মুখের উপর বিষাক্ত একটা ছোবল মারলে, 'খবরদার, তার সঙ্গে আর অমন হাসাহাসি করতে পারবিনে। দিন-দিন তুই বড়ো হচ্ছিস না, বুড়ো মেয়ে? কি, আমাকে বল্, বলতেই হবে আমাকে,' সর্বাণী ঝল্সে উঠলেন, 'তোর সঙ্গে তার কি এতো কথা থাকতে পারে? সময় নেই, অসময় নেই, কেবল গুজগাজ, ফুটুর-ফাটুর—কিসের, কিসের এতো তোদের ঠাট্টা মসকরা জিজ্ঞেস করি?'

নিমেষে বীথির নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেলো। মা'র কথাগুলি ক্লেদাক্ত কতোগুলি কীটের মতো তার গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলো। কিছু যেন সে ধরতে-ছুঁতে পেলো না।

তবু সে স্তম্ভিতের মতো পাথুরে গলায় বললে, 'সুধীন-দা, সুধীন-দাকে নিয়ে তুমি এ-সব কি বলছ?'

'ঢঙের কথা আর বলতে হবে না আমাকে। সুধীন-দা, এতো বুড়ো বয়সেও সুধীন-দা।' সর্বাণী আবার একটা বিকৃত মুখ করলেন, 'যেই হোক সে, তার সঙ্গে খবরদার তুই মিশতে পারবিনে বলে রাখছি। তুই এখন বড়ো হয়েছিস না? নিজের দিকে কোনোদিন একটিবার দেখিসনি তাকিয়ে? আমাদের সময়ে এমন সব কেলেঙ্কারি ছিলো না—লাজলজ্জা কি মেয়েদের একেবারে উঠেই গেলো সমাজ থেকে? আমাদের সময়ে—' লজ্জায় ও অপমানে বীথি একেবারে শুকিয়ে সাদা হয়ে গেলো।

জানতো না, ইতিমধ্যে সে কখন বড়ো হয়ে উঠেছে। জানতো না, যা মাত্র একটা শারীরিক স্বাভাবিকতা, তাই এতো বড়ো একটা অন্যায়।

দুঃখে বীথির চোখে জল এসে গেলো।

মনে পড়লো সেদিনের সুধীন-দার সেই কথা। সুধীন-দা বলেছিলো, কি-রকম নরম, সিল্কের মতো নরম সুরে, 'আচ্ছা বীথি, তুমি আমার নামের পেছনে বিদঘুটে এ একটা বিশেষণ লাগাও কেন? আমিও কি এমনিতেই তোমার কাছে যথেষ্ট নই?'

বীথি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে বলেছিলো, 'তবে তোমাকে কি বলে ডাকবো?'

'আমার যা নাম, শুধু তাই বলে।'

'পাগল! তা আমি মরে গেলেও পারবো না। সেই কতো ছোট থাকতে তোমাকে দাদা বলে এসেছি।'

'কে তোমাকে বলতে শিখিয়েছে জিগগেস করি?'

'কেউ শেখায়নি। ওটা আমাদের সমাজের চলতি একটা ভদ্রতা। প্রতিবেশি-তাকে আমরা এমনি আত্মীয়তায় নিয়ে আসি।'

সুধীন উত্তেজিত হয়ে বলেছিলো, 'তার জন্যে তাকে একটা মিথ্যে বিশেষণ দিয়ে খণ্ডিত করে তুলতে হবে? তোমার কি মনে হয় না বীথি, কোনোদিন মনে হয়নি, তোমার ঐ ভদ্রতার পেছনে আমাদের কুৎসিত একটা কুসংস্কার আছে লুকিয়ে?'

বীথি জিগগেস করেছিলো, 'কি?'

'যে, পাছে আমরা কোনো অন্যায় বা অশোভন আচরণ করে বসি, বিশেষতো মেয়েদের সম্পর্কে, তাই, সেই কুৎসিত সন্দেহের থেকেই আমরা এমন একেকটা বিশেষণ আরোপ করি। তুমি এরি জন্যেই আমাকে দাদা ডাকবে, কেননা, দাদা না ডাকলে যদি আমি, বুঝলে না?'—যদি আমি—কথাটা সে আর এক নিশ্বাসে শেষ করতে পারেনি, হাসতে গিয়ে কেমন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়েছিলো।

বীথি ব্যস্ততার ভান করে বলেছিলো, 'জানি না বাপু, তোমার বিশেষণের কি বিশিষ্টতা! চুল-চেরা ওজন-করা সব মানে! যাই তুমি বলো, আমি পারবো না কিছুতেই তোমার নাম ধরে ডাকতে, আমাকে কেটে ফেললেও নয়।'

তারা যে-ভাষায় কথা বলে আসছিলো, তার মাঝে এতোদিন কোনো ব্যাকরণ ছিলো না, ছিলো না কোনো অর্থের পারম্পর্য। মা এসে এক কথায় সব মানে ধরিয়ে দিলেন।

মা'র চোখের তাপ লেগে এক নিশ্বাসে বীথি বয়েসের তাপে ফেঁপে উঠেচে। চুলগুলি এখন থেকে তার খোঁপায় উঠছে উদ্ধত হয়ে, আঁচলে এসেছে প্রখর পারি-পাট্য। তার দুই চোখ উঠেছে কৌতূহলে আবিল হয়ে। প্রতিটি পা ফেলায় সে এখন সশরীর সচেতন, মা'র কথা সে ফেলতে পারে না।

তাই বলে সুধীন-দার দিকে সে পিঠ করে বসে থাকে তার সাধ্য কি!

তার কিসের তবে আর ভয়, তার তো বয়েসই হয়েছে এখন থেকে!

কিন্তু আশ্চর্য, তার সঙ্গে-সঙ্গে সুধীনও কেমন অলক্ষিতে এসেছে বাড়িয়ে। তার গাম্ভীর্যের ছোঁয়াচ লেগে সে-ও যেন কেমন গম্ভীর হয়ে উঠলো।

আগে সে কতো গল্প করতো, তার স্ফূর্তিমান মুখরতায় প্রখর কতো গল্প,

কতো তাকে গান গাইতে বলতো, করতো কতো ছুটোছুটি, কতো ছেলেমানষি—এখন, এই কদিন যেতে-না-যেতেই সে-ও কেমন চুপ করে গেছে। সেই বীথিরই অনুচ্চারণীয় সহানুভূতিতে। গল্প-গুজব আর যেন তার ভালো লাগে না, বীথির গানের বদলে ভালো লাগে যেন তার এই অচপল স্তব্ধতা।

মা কি তবে মিথ্যে বলেননি?

এতোদিনে সুধীনের সঙ্গে মেলামেশায় কোথাও এতোটুকু তার বাধতো না, ছিলো সে মোহানার মুখে ঢেউয়ের মতো উচ্ছ্বসিত। তার চারপাশে শরীরের তখন কোনো ভাব ছিলো না, ছিলো শুধু একটা উপস্থিতি: ছিলো না এমন একটা আবহাওয়ার ঘনতা, ছিলো কতোগুলি শুধু উড়ন্ত মুহূর্ত।

আজকাল, মা'র সেই অমূল্য তিরস্কারের পর থেকে, সুধীনের এই স্তব্ধতাটা সে যেন গাঢ় একটা স্পর্শের মতো অনুভব করছে। আজকাল সুধীন যেন তার দিকে কি-রকম করে তাকায়, তাই দুই চোখের মাঝে ডেকে নিয়ে আসে তার সমস্ত আত্মা, সমস্ত আত্মীয়তা; কি-রকম অস্পষ্ট করে যেন কথা কয়, তাকে আর ঠিক ধরা-ছোঁয়া যায় না; থেকে-থেকে কি-রকম তার পায়ের পাতাটা সে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে।

মায়ের চোখ দিয়ে মানেটা যেন বীথি ঝাপসা-ঝাপসা বুঝতে পারে। তার কেমন ভয় হয়, কথা-না-বলার বন্ধ একটা গুমোটের মধ্যে বসে সে হাঁপিয়ে ওঠে।

সুধীন যেন তার মাঝে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে, দুই চোখে তার ছুরির মতো ধারালো স্নেহ: কি যেন সে বলে উঠতে চাইছে, দুই চোখে তা বলতে না-পারার অমানুষিক যন্ত্রণা।

আশ্চর্য, তবু তার পাশটি ছেড়ে উঠে যেতে বীথির চারপাশে কোনো প্রশ্রয় নেই। একদিন সুধীন সত্যি-সত্যিই কথাটা বলে ফেললে।

বৃষ্টি লেগে নীল হয়ে এসেছিলো চৈত্রের সেই অপরূপ সন্ধ্যাকাল। করুণ একটি লজ্জার মতো সুন্দর সেই ধূসরতা।

বীথির বাহুর কাছেকার শাড়ির পাড়টা নিয়ে খেলা করতে-করতে সুধীন গাঢ় গলায় বললে, 'জানো বীথি, সংসারে এমন একেকটা কথা আছে যা মুখে উচ্চারণ করলে তার আর কোনো মানে থাকে না। তবু মানুষকে তা বলতে হয়, না-বলা পর্যন্ত সে বেঁচে উঠতে পারে না—জীবনে অন্তত একবার সে এমনি বেঁচে উঠতে চায়।'

ভয়ে-ভয়ে, একটু-বা মুগ্ধের মতো বীথি বললে, 'কি কথা?'

'ঈশ্বর আছেন, এ কথা যদি কেউ তোমাকে বলে, তোমার কাছে নিশ্চয়ই কেমন খেলো শোনাবে—তেমনি ঈশ্বর নেই, এ কথা বললেও। কিন্তু দুটো কথাই দুজনের কি গভীর উপলব্ধির পরিচয় দিতে পারে এ কথা হয়তো তুমি-আমি কেউ এক নিমেষে বুঝে উঠতে পারবো না। তেমনি—'

'কি কথা, বলেই ফেল না ছাই।'

'হ্যাঁ, আমি বলবো।' সুধীন হঠাৎ হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকালো, 'কিন্তু আমার ভীষণ ভয় করচে, বীথি, আমার মুখে কথাটা না-জানি কি রকম শোনাবে!'

বীথি নিস্পৃহ গলায় বললে, 'তুমি তো আর স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছ না

যে কথাটা কি রকম শোনাবে বলে ভয় পাচ্ছ ! মনে যা আছে সোজাসুজি মুখে তা আওড়ে গেলেই তো চুকে যায় ।'

'জানো বীথি,' যেন সন্ধ্যার আকাশের প্রথম তারাটির মতো কতো দূরে থেকে সুধীনের স্বর শোনা গেলো, 'জানো বীথি, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি—'

জানলার বাইরে অন্ধকারে বীথি যেন তার মা'র মুখ দেখতে পেলো !

'সোজাসুজি বলতে গেলে কি বাজে, কি বিশ্রীই যে শোনায়,' কতোক্ষণ পরে মুখ তুলে বীথির মুখের দিকে চাইতে গিয়ে সুধীন দেখতে পেলো সে-মুখ কখন এই সন্ধ্যার মতোই নিবে গেছে, 'যেমন অক্ষর গুনে-গুনে কবিতা মেলাতে হয় ! তবু কথা—কথাই সমস্ত কবিতা নয়—কথা মানুষের একটা শাস্তি, একটা বোঝা ।'

সেই মা'র মুখ আস্তে-আস্তে বীথির মুখের মধ্যে এসে বসে গেলো । একরকম প্রজাপতি আছে যারা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে গাছের মরা পাতার অনুকরণে নিজেদের এক নিমিষে শুকিয়ে আনে । ঝোপের মাঝে গা ঢাকা দেবার সময় ক্যামিলিয়ন যেমন রঙ বদলায় । তেমনি সেই বীথিকে কোথাও যেন খুঁজে পাওয়া গেলো না । শামুকের মতো এক নিমেষে সে কেমন সন্তর্পণে তার খোলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—দুর্ভেদ্য বয়েসের খোলে ।

বিশীর্ণ, একটু বা বিস্বাদ গলায় সে বললে, 'তুমি তো আমাকে খুবই ভালোবাসো ।'

'না, না, খুব নয়, মোটেই খুব নয়,' সুধীন ব্যাকুল হয়ে উঠলো, 'আমার ভালোবাসার কোনো বিশেষণ নেই, বীথি, যেমন নেই আমার নামের । আমি তোমাকে ভালোবাসি, এমনি, এতোটুকুও কম বা বেশি নয় ।'

'এ আবার কি নতুন কথা ?' বীথি সরে বসলো ।

'নতুন কথা নয় ? সূর্য তো রোজই ওঠে, তবু একেকদিন ভোরবেলায় সূর্য দেখে তোমার মনে হয় না, এ একেবারে নতুন সূর্য, এমন সূর্য এর আগে আর কোনোদিন ওঠেনি পৃথিবীতে ?'

'ভালোবাসো তো,' খাটের প্রান্ত থেকে বীথি তার দ্রুত, দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতায় উঠে দাঁড়ালো, 'আমাকে এখন কি করতে হবে ?'

সুধীন হাত বাড়িয়ে কিছু যেন আর ধরতে পেলো না ।

বীথি অল্প একটু হাসলো, তার মা যেমন করে হাসে ; বললে, 'পরীক্ষার পর লম্বা ছুটি পেয়ে ঠেসে কতোগুলি নভেল পড়েছ বুঝি ?'

'নভেল ? কিন্তু আমার এই কথা পৃথিবীর কোন উপন্যাস লিখতে পারতো বলো ? এ একটা শুধু কথা নয়, ছাপার অক্ষরে তাকে ধরে রাখা যায় না, মুখের কথায় দেখা যায় না ফুরিয়ে ।' সুধীন তার দিকে ঘোলাটে, অসহায় চোখে চাইলো, 'তুমি কি কিছুই বুঝতে পারো না ?'

'এই প্রথম বুঝলাম । বুঝলুম তুমি কতোদূরে অধঃপাতে নেমে গেছ ।' বীরের মতো বীথি দরজার দিকে অগ্রসর হলো ।

দরজার দিকে অগ্রসর হলো কেননা মা তাকে ডাকছেন, ডাকছেন তাকে তাঁর বিশাল, বলিষ্ঠ আশ্রয়ে । ভেবে সে সত্যিই অবাক হয়ে গেলো, মা কেমন ঠিক

বুঝতে পেরেছিলেন গোড়া থেকেই। আশ্চর্য, সে কিন্তু এর একবিন্দুও বুঝতে পারেনি ঘুণাক্ষরে। তাই বলে সে হেরে যাবে মনে করেছ নাকি? মা এসে তবে সত্যি-সত্যি দেখে যান, মায়ের মুখ সে উজ্জ্বল না করেছে তো কি বলেছি! দরজার দিকে অগ্রসর হলো, কেননা নির্ভুল সে বুঝতে পেরেছে, এর মতো আর পাপ নেই সংসারে, এর চেয়ে দুর্নীতি। বুঝতে পারলো, যেমন ধোঁয়া দেখে আগুন বোঝা যায়।

'ও কি, চলে যেয়ো না, বীথি। দাঁড়াও, শোনো' সুধীনের গলায় ঘরের শূন্যতা যেন চীৎকার করে উঠলো।

বীথি দাঁড়ালো। মা যেন তাকে একটু দাঁড়িয়ে যেতে বললেন। বললেন, 'বলুক, শুনি।' বীথিও তাঁকে মনে-মনে অমনি শোনাবার জন্যে স্পষ্ট প্রখর গলায় বললে, 'এখানে দাঁড়িয়ে তোমার নভেলের নেকি নায়িকাদের মতো প্রেমালাপ করবার আমার সময় নেই। আমার অনেক সংকল্প। চাঁদের আলোয় গলে যাবার জন্যে আমি জন্মাইনি।'

'তুমি জানো না তুমি কি বলছ!' সুধীন হাত বাড়িয়ে বুঝি তাকে ধরতে গেলো।

'তুমিই জানো না কাকে তুমি কি বলছ!' ফের আমাকে তুমি এমনি অপমান করবে তো মাকে গিয়ে এক্ষুণি বলে দেবো বলে রাখছি। এ বাড়ি আসা তোমার বন্ধ করে দেবো।'

দরজাটা আছড়ে দিয়ে বীথি ঘর থেকে গেলো বেরিয়ে।

আকাশের সেই অনীল অন্ধকারে সুধীন কিছুতেই খুঁজে পেলো না, একজনকে ভালোবাসলে, তার মতো করে ভালোবাসলে, কি করে সত্যি তাকে অপমান করা হয়।

তারপরে অবিশ্যি সুধীন আর এ-বাড়ি আসেনি। তাতে তো বীথির ভারি বয়ে গেছে। সে আসে না বলে ঘড়ির কাঁটায় সময় যেন একেবারে আটকে রয়েছে আর-কি।

আশে-পাশে তার রাশি-রাশি বই, দুপুর জুড়ে তার গা-ঢালা লম্বা ঘুম, তা ছাড়া কদিন হলো শ্বশুরবাড়ি থেকে তার মেজদি এসেছে।

শাশুড়ির সঙ্গে কি-একটা তার ঝগড়া হয়েছিলো বিজাতীয় ছেলের জন্যে ফিরিয়ালার কাছ থেকে রঙিন দু'গজ ছিট কেনা নিয়ে। শাশুড়ির বক্তব্য ছিলো এই, তার ছোট দেওরের জন্যে আজ দুমাস ধরে যখন সামান্য একটা ফতুয়া হচ্ছে না, তখন সে তার ছেলের জন্যে এতো সহজে আঙুলগুলি ফাঁক করলো কি বলে? সোয়ামি আজকাল এক-আধটা পয়সা কামাচ্ছে বলে তার ঘাড়ে একেবারে কেশর গজিয়েছে, না? জবাব দিতে মেজদিও কিছু কসুর করলো না, দয়া করে বিধাতা তাকেও একখানা জিভ দিয়েছিলেন, আর সে-জিভ এখন দস্তুরমতো রক্তের স্বাদ পেয়েছে। আর, শাশুড়িই যখন তাঁর কোলের ছেলের জন্যে লড়তে পাচ্ছেন, তখন সে-ই বা কেন ছেড়ে কথা কইবে—সে-ও এখন থেকে শাশুড়ির

দিকেই পা বাড়িয়েছে। গড়াতে-গড়াতে ঝগড়াটা এসে এমন জায়গায় দাঁড়ালো যে স্বর্গ থেকে স্বয়ং নারদ পর্যন্ত জিভ কাটলেন। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে শাশুড়ির ছেলের আবির্ভাব হলো, এবং বলা বাহুল্য, মা'র অপমান সে সহ্য করতে পারলো না। আর মেয়েমানুষের মতো অকারণ বাক্যব্যয় করে সে তার আয়ুক্ষয় করতে রাজি নয়. দস্তুরমতো হাত-পা ছুঁড়ে শারীরিক ব্যায়াম করবার সে পক্ষপাতী। চুলের ঝুঁটিটা ঠিক ধরে কিনা জানা নেই, রাত্রের ট্রেনেই মেজদিকে নিয়ে তার শাশুড়ির ছেলে রওনা হলো স্ত্রীকে সরাসরি তার বাপের বাড়িতে রেখে দিয়ে আসতে। এবং গাড়ি থেকে তাকে নামিয়ে দিয়েই চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে কোথায় যে সে উধাও হলো তার আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না।

বিবরণ শুনে সর্বাণী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, 'কি সর্বনাশ! তাই বলে তুই এমনি ডংকা মেরে চলে আসতে গেলি কেন? কেন তুই দরজার চৌকাঠ ধরে বসে রইলি না?'

মেজদি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, 'আমি কি করবো, মা? আমি চলে এলুম কোথায়? আমাকে দিয়ে গেলো—জোর করে আমাকে দিয়ে গেলে আমি কি করতে পারি?'

'দিয়ে গেলো,' বীথি সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো, রাগে লাল হয়ে বললে, 'তোমার লজ্জা করা উচিত, মেজদি। আমি হলে কতো আগেই নিজে থেকে চলে আসতুম, জোর করে চলে আসতুম। কেউ দিয়ে যাবে বলে বসে থাকতুম না।' এই বিপদের মাঝে সর্বাণী ছোট মেয়ের কথার রসগ্রহণ করতে পারলেন না। আগের সুরের রেশ টেনে বললেন, 'এখন কি উপায় হবে? যদি তারা এখন ছেলেকে ধরে অন্য জায়গায় বিয়ে দেয়?'

মেজদি ঠোঁট উলটিয়ে বললে, 'ইস?'

'ইস্ কি? যদি বিয়ে দেয়, তুই কি করতে পারিস?'

'বিয়ে দিলেই হলো আর কি। তাদের ছেলে আমি পেটে ধরিনি? মেজদি নিশ্চিন্ত মুখে হাসবার চেষ্টা করলো। সর্বাণী কথাটা উড়িয়ে দিলেন, 'বয়ে গেছে তাদের ছেলে নিয়ে। পুরুষমানুষের আবার ছেলের ভাবনা!'

'দিক না বিয়ে!' মেজদি এবার বেড়ালের মতো ফোঁস করে উঠলো, 'পালাবার সে আর পথ পাবে ভেবেছ নাকি? আমি মামলা করতে পারবো না?'

'তোমার লজ্জা করা উচিত, মেজদি,' বীথি ঘৃণায় ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'সামান্য ক'টা টাকার জন্যে তুমি ঐ অত্যাচারী পুরুষের কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পাতবে? ছি ছি ছি! কেন, কিসের তোমার দুঃখ, কিসের তোমার ভয়, ত্যাগ যদি সে তোমাকে করে, তার মানে, তুমিও তাকে ত্যাগ করলে। তার মানে, তুমিও তখন স্বাধীন, তুমিও তখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজে খেটে খাবে, তবু দাঁতে কুটো করতে পারবে না।'

মেজদি তার দিকে যেন কেমন করুণ করে চাইলো।

সত্যি, বীথি বেঁচে গেছে. বেঁচে গেছে সে তার এই বয়সের ভারমুক্ততায়। বেঁচে গেছে, কেননা সে তার পায়ের নিচে অনুভব করতে পারছে পৃথিবী, দেখতে

পারছে তার পথের সূচনা। সে আর মেজদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। বেঁচে গেছে সে।

'ভয় কি, পড়তে শুরু করে দাও—আলাদা করে মেয়েদের পাশের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক সব উদার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। ক'বছর বা লাগবে, প্রাইভেটে ম্যাট্রিকটা পাশ করে ফেল—তারপরে ট্রেনিংটা দিয়ে দাও চট-পট। কোথায় কে আর তোমাকে বাধা দেয়?' বীথি শরীরে একটা লঘুতার পাখা মেললে, 'তারপরে সটান মাস্টারি, মাস্টারি মেয়েদের কে আটকায়?'

তবু, এতোতেও সর্বাণী ভিজলেন না। মেজোমেয়ের হাত ধরে একটা হতাশা-সূচক টান মেরে ভাঙা গলায় বললেন, 'কিন্তু তুই ঠাট করে চলে আসতে গেলি কেন? স্ত্রীর গায়ে স্বামী অমন এক-আধটু হাত তুলেই থাকে সময়-সময়, তারি জন্যে তুই তোর মাটি ছাড়লি কি বলে? শুধু ক'টা পয়সা পেয়ে তোর কি হবে, বোকা মেয়ে?' সর্বাণী হাপুস চোখে কেঁদে উঠলেন।

মেজদির কিছু বলবার আগেই বীথি উঠলো ঝাঁজিয়ে, 'তুমি দেখছি একেবারে গীতা আওড়াচ্ছ, মা। স্বামী দিব্যি হাতের সুখ করে নেবে, আর আমরা ভাতের সুখের জন্যে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো? পয়সা—পয়সার জন্যেই তো তোমাদের যতো ভাবনা। যার পয়সা আছে, তার পাপের পর্যন্ত ক্ষমা আছে। ভয় নেই, লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারলে মেজদিরও এই পয়সার জন্যে ভাবতে হবে না।'

মেজদিকেও দেখা গেলো বীথির কথা উপেক্ষা করে মা'র কথারই জবাব দিতে। ঠোঁটের কোণে গূঢ় একটি হাসি লুকিয়ে রেখে সে হালকা গলায় বললে, 'মিছিমিছি তুমি ভয় করছ, মা। আমাকে ফেলে সে কোথায় যাবে?'

বীথি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'গেলোই বা। তুমি অমনি ল্যাজ নামিয়ে কুকুরের মতো তার পিছু পিছু ছুটবে নাকি?'

মেজদি বাঁকা চোখে হাসলো, বললে, 'সে-ই আসবে দেখিস।'

সর্বাণী বললেন, 'আসবেই যদি, তবে অমন একটা লাফ মেরে চলে গেলো কেন?' মেজদি ঠাট্টা করে বললে, 'বীর যে। কিন্তু আমি জানি না মোল্লার কন্দুর দৌড়? যারা সসন্তান স্ত্রীকে ত্যাগ করে মা, জানো, সেই ছেলে যদি মানুষ হয়, বা যখন তার বিয়ের বয়েস ঘনিয়ে আসে, তক্ষুনি তারা এসে আবার তাদের পরিত্যক্ত স্ত্রীর সঙ্গে ভাব জমায়।'

বীথি রুখে উঠলো, 'তুমি তবে তোমার ছেলের মানুষ হওয়া অবধি কাব্যের শকুন্তলার মতো অপেক্ষা করবে নাকি?'

'তার দরকার হবে না। তার আগেই, ছেলের মানুষ হবার আগেই, তার পিতৃদেব মানুষ হয়ে উঠবেন আশা করি।' মেজদি সারা শরীরে গর্বসূচক একটা ভঙ্গি করলে।

বীথি অবিশ্যি আর কিছু আশা করতে পারলো না। নিষ্ফল রাগে সে অসহায় বোধ করতে লাগলো।

'জামাইকে তবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একখানা বড়ো করে চিঠি লিখে দে,' সর্বাণী গলাটা একেবারে রসে ডুবিয়ে আনলেন, 'আমিও ক্ষমা চেয়ে তোর শাশুড়িকে

লিখে পাঠাই। কি কপাল, একবেলা সে খেয়ে পর্যন্ত গেলো না। খুকির রেজাল্টটা এই শিগগির বেরুবে, তেমন কিছু ভালো হলে ভেবেছিলুম একটা ভোজ দেবো, ততোদিন—'

একটা ঘাই মেরে ঘর থেকে বীথি চলে গেলো।

মেজদির পতিপ্রাণতাটা মহাভারতে স্থান পাওয়ার মতো। সেই রাতেই, সেই রাত থেকেই, সে রাত জেগে-জেগে তার বীরবর স্বামীকে চিঠি লিখছে। আর কি জানি সেই অগণন চিঠি! একটার উত্তর আসে না, তাতে মেজদির দৃকপাত নেই, অমনি আরেকটা তার তৈরি। আগেরটা যদি এক পৃষ্ঠা, পরেরটা এক তা, আগেরটা যদি এক তা, পরেরটা এক দিস্তে।

'হ্যাঁ রে, বীথি, জ্যোছনায় কোন জ বলতে পারিস?' মেজদি এসে একদিন জিগগেস করলে।

বীথি অবাক হয়ে বললে, 'কেন, জ্যোৎস্না দিয়ে তুমি আবার কি করবে?'

'আজকাল কেমন সুন্দর জ্যোছনা উঠছে না?'

'সেই কথা তুমি জামাইবাবুকে লিখতে বসেছ নাকি?' বীথি গম্ভীর হয়ে বললে, 'অন্তঃস্থ য—যএ য-ফলা ওকার, চ-ছএ ন-ফলা আ।'

আরেকদিন মেজদি একেবারে একটা শ্লেট-পেনসিল নিয়ে হাজির, 'শ্লেষ্মা কথাটা কি করে লিখতে হয়, আমাকে একটু শিখিয়ে দে দিকি?' বীথি চমকে উঠবার ভান করলো, 'ও বাবা, সে আবার কি ভয়ানক কথা!'

'কেন, খোকার যে শ্লেষ্মা হয়েছে ক'দিন থেকে।'

'তোমার পায়ে পড়ি, মেজদি, কফ লেখো—ক আর ফ, আপদ চুকে যাক।' বীথি হাত দিয়ে শ্লেটটা ঠেলে দিলো।

'আহা, কতোই যেন বিদ্যানী হয়েছিস! নিজেদের বেলায় এ সব দরকারি কথা তো আর লিখবি না, লিখবি যতো কাকের ঠ্যাং আর বকের মাথা! জানি না, জানি না তোদের কীর্তি?' মেজদির চোখ দুটো ঘৃণায় কিলবিল করে উঠলো। সত্যি কথা বলতে কি, লজ্জা করতে লাগলো বীথিরই সব চেয়ে বেশি, অপমানে সে-ই শুধু এলো শীর্ণ হয়ে। মেজদির এই ব্যবহারে যে বিশেষ কিছুই গৌরব করবার নেই এ-কথা তাকে কে বোঝাবে? নেপথ্য থেকে সমস্ত সংসার তাকে উৎসাহিত করছে, দেশ থেকে পোস্টআপিস যে উঠে যায়নি এই যেন তার যথেষ্ট গৌরব। আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে বীথির গা গুলোতে লাগলো। যে একদিন নির্বিবাদে ঘাড় থেকে ফেলে দিতে পারলো স্বচ্ছন্দে, আবার তারই কাঁধে ওঠবার জন্যে পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দেয়াটা বীথি সহ্য করতে পারলো না। মেজদির এতোই যখন ভরসা ছিলো নিজের উপর, তার শারীরনিষ্ঠ সতীত্বের উপর, তবে সে চুপ করে থেকে সেই জোর খাটাতে গেলো না কেন? কেন গেলো সে ফের হাড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দিতে? লাথি মারতে গিয়ে পতিদেবতার যে-পায়ে চোট লেগেছে, সে-পায়ে সে আঁচল ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বসলো! কেন এই দীনতা, মরতে বসে কেন আর এই গঙ্গাজল চাওয়া? অথচ মেজদির এতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যে বাংলা ভাষা নিয়ে সাহসী একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করতে পারছে, তাতেই সে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখা মেলে, তাতেই তার আর মাটিতে পা পড়ছে না।

কেবল সে-ই পদ্য লিখতে পারে বলে বীথি মনে করেছে নাকি ?

সব দেখে-শুনে বীথি রাগে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। পাড়ের কাছে ঘোলা জল আর না ঘেঁটে সে চুপ করে গা ভাসিয়ে দিলে তার মধ্যসমুদ্রের মৌনে, যেখানে উন্মত্ত ঢেউ নেই, সফেন কোলাহল নেই, যেখানে তার স্বপ্নের মতো প্রসারিত একটি শান্তি, অতলায়িত একটি গভীরতা। যেখানে কে যে আকাশ, কে যে সমুদ্র, কিছুই আলাদা করে চেনা যায় না—অস্তিত্বের সেই একটা বিরাট সম্মোহনে!

কিন্তু, আ মরি, বাংলা ভাষা! তার প্রকাশক্ষমতা কি পরিমাণ বেড়ে গেছে ভাবতে বীথি স্তম্ভিত হয়ে গেলো। মাটির কলসী রেখে-রেখে ঘাটের পাথরই নাকি একদিন ক্ষয় হয়ে গিয়েছিলো—স্কুলে 'অধ্যবসায়' নিয়ে রচনা লিখতে গিয়ে বোপদেবের এ উদাহরণটা সে কতোবার লিপিবদ্ধ করেছে—আর এ তো সামান্য পুরুষের মন! শেষকালে জামাইবাবুর একখানা চিঠি এসে উপস্থিত!

'কি লো, আর নাকি চিঠি লিখবে না বলেছিলি ?' আহ্লাদে মেজদি একেবারে চারপাশে আছাড় খেয়ে পড়ছে, 'এই দ্যাখ্।'

আঙুলে করে রঙিন একটা খাম নিয়ে হাওয়ায় সে ফরফর করতে লেগেছে।

পিছলাতে-পিছলাতে সর্বাণীও ছুটে এলেন, 'জামাই চিঠি লিখেছে নাকি ? কি লিখেছে ? ভালো আছে তো ?'

জিভ ভারি করে মেজদি বললে, 'ভালো থাকবে না তো যাবে কোথায় ?'

'যাক,' সর্বাণী ছেঁড়া এক টুকরো কাগজের মতো হালকা হয়ে গেলেন, 'যাক, ভাবনা ঘুচলো। এখানে আসবে বলে কিছু লিখেছে নাকি ?'

'দাঁড়াও, ব্যস্ত কি! না এসে সে যাবে কোথায় ?' মেজদি টলতে-টলতে বেরিয়ে গেলো।

এর পর থেকে মেজদিকে আর পায় কে! সে ফের খুঁজে পেয়েছে তার নিজের জায়গা, তার নিজের জগৎ। এতোদিন পর্যন্ত তবু-বা তার একটা ধরা-পড়া অপরাধীর চেহারা ছিলো, এখন থেকে সে একেবারে উড়াল দিয়ে চলেছে। নিজের মাঝে নিজে সে আর আঁটছে না: স্ফূর্তিতে উঠেছে ফেনিয়ে। মিছিমিছি বাবা-মা এতো ব্যস্ত হয়েছিলেন, সে জানে না তার আঙুলে কি কৌশল খেলে, সে জানে না তার নিজের মূল্য! চলায়-বলায় মেজদির সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ যেন পিছলে পড়তে লাগলো। তাকে আর ছোঁয় কারুর সাধ্য কি!

এ ক'টা দিন বীথির কাছাকাছিতে সে কেমন নিস্তেজ ছিলো; আর ভয় নেই, হাতে পেয়েছে সে এখন রঙের টেক্কা, তার সংসারের খেলায় নিশ্চিত একটা পিট। এখন বীথি আর তার গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়, নিতান্তই একটা আনাড়ি খুকি, মেজদির এই চিঠি পাওয়ার পর থেকে—তার সঙ্গে মেজদি এখন মিশতে পর্যন্ত পারে না। আগে যদি বা লুকিয়ে একটু শ্রদ্ধা করতো, এখন দস্তুরমতো মুখের উপর সে শাসন করতে লাগলো। খাঁচার নিরীহ সেই পাখিটা এখন ছাড়া পেয়ে প্রবল ডানায় এখানে-সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, একে-ওকে নখ বসিয়ে দিচ্ছে। মিড়মিড়ে সেই শিখাটা বিস্ফারিত হয়ে পড়লো নির্লজ্জ দাবানলে। বীথি লজ্জায় ক্লান্ত হয়ে উঠলো—এমন একটা অশ্লীল ছবি সে আর দেখতে পাচ্ছে না চোখ মেলে।

শুয়ে-শুয়ে বীথি একটা কি বই পড়ছিলো। শিয়রের দিক থেকে মেজদি হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করলে, 'কি পড়ছিস রে ওটা?'

বইটা আঙুলের ফাঁকে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ফেলে বীথি বললে, 'ও আছে একটা। তুমি বুঝবে না।'

'বুঝবো না মানে? স্পষ্ট বাংলা অক্ষর দেখতে পেলুম স্বচক্ষে। বাংলা বই আমি বুঝতে পারবো না বলিস? তোর এতো দেমাক?'

'অক্ষর চিনলেই লোকে বুঝতে পারে নাকি?'

কি পড়ছিস তাই বল্ না।' টান মেরে বইটা মেজদি ছিনিয়ে নিতে গেলো, 'নভেল বুঝি?'

জামাইবাবুর চিঠি পাবার পর থেকে মেজদি কখন বোন থেকে দিদিতে গদিয়ান হয়েছে। সন্দিগ্ধ চোখে বীথিকে দিচ্ছে পাহারা। পান থেকে কোথায় তার চুন খসলো, তার বসাটা কোথায় ঠিক হচ্ছে না, তার শোয়া কেমন বিচ্ছিরি, ঘাড়-গলা ঢেকে কেমন সে আঁচল রাখতে পারে না সব সময়, গলা ছেড়ে কেমন নির্লজ্জের মতো হাসে, খেয়ে উঠে পিঁড়িটা কেমন দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখতে ভুলে যায়—এ-মেয়ের উপায় হবে কি, মা? শ্বশুর-বাড়িতে যে ও দুদিনও টিকতে পারবে না। সোয়ামি যে লাথিয়ে বাড়ির বার করে দেবে। খালি পাশ করলেই কি হয়, মেয়েছেলের যে সৌষ্ঠব শেখা দরকার। ইদানিং মেজদি তাই লেগেছিলো তাকে প্রতি পদে সৌষ্ঠব শেখাতে।

তারপর বিয়ে না হতে চোখের সামনে কিনা জলজ্যান্ত সে উপন্যাস পড়ছে! এর চেয়ে কদর্যতর চরিত্রহীনতা মেজদি আর কি কল্পনা করতে পারতো?

'দেখালি না কি বই? দাঁড়া, মাকে এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আসি।'

'কি আর দেখবে!' বীথি হাসতে-হাসতে উঠে বসলো, 'যা তুমি ভেবেছ। উপন্যাস। এই দেখ।'

বইর নাম দেখে মেজদির চক্ষু একেবারে চড়কগাছ। এবারও বইটা সে কেড়ে নিতে পারলো না, অসহায় রাগে বোবা গলায় সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুই এই অল্প বয়সে এমন একটা বিতিকিচ্ছি নভেল পড়তে বসেছিস?'

বীথি হেসে বললে, 'এতোদিন তো তোমার চোখে আমি একটা ধিঙ্গি, ধাড়ি, আরো কতো-কি ছিলুম, আমার বয়সের কোনো গাছ-পাথর ছিলো না, আজকে হঠাৎ একেবারে বয়েসটা আমার এক ধাক্কায় এতো নেমে গেলো, মেজদি? বলো কি অদ্ভুত কথা!'

গোলমাল শুনে সর্বাণী এ-ঘরে এসে হাজির হলেন। বীথি সম্বন্ধে সব সময়েই তিনি উদ্বিগ্ন, বীথির কথা ভেবে তিনি কাঁটার উপর হাঁটছেন; মেজোমেয়ের নিভুর্ল চোখে আবার তার কি খুঁত ধরা পড়লো জানবার জন্যে তিনি চিন্তিত গলায় বললেন, 'কি হলো?'

'কি সর্বনাশের কথা, মা,' মেজদির চোখ দুটো তখনো প্রকৃতিস্থ হয়নি; বললে, 'বীথিটা শুয়ে-শুয়ে দিব্যি একটা নভেল পড়ছে।'

'কি নভেল?' সর্বাণী ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এলেন, 'বটতলার নাকি?'

'তার চেয়েও জঘন্য, মা। মা'র সঙ্গে বসে কোনো ছেলেমেয়ে একত্র পড়তে পারে না।'

বীথি ঝলসে-উঠলো, 'আমি মা'র সঙ্গে বসে পড়ছিলুম নাকি? আর মা'র সঙ্গে বসে তুমি কি পড়তে পারো, বাল্মীকির রামায়ণ পড়তে পারো, না ব্যাসের মহাভারত পড়তে পারো? তোমার সাহিত্যচর্চাগুলিই বা কতোটা মা'র সঙ্গে হয় জিগগেস করি?'

এ-সবের উত্তর দেবার জন্যে মা বা মেজদি কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। শঙ্কাকুল চোখে সর্বাণী বললেন, 'কি নিয়ে লেখা? তুই পড়েছিস বইটা?'

'পড়িনি? বছর দুই আগে আমার একবার সেই পান-বসন্ত হয়েছিলো না, মা?' মেজদি বলতে লাগলো, 'পাড়ার লাইব্রেরি থেকে তখন বই আনিয়ে পড়তুম। এ-বইটা তেমনি একদিন হাতে এসে পড়েছিলো—তোমায় বলবো কি, মা, বলতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, ছাপার অক্ষরে কেউ তা লিখতে পারে চোখে না দেখলে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না।'

সর্বাণী বিবর্ণ হয়ে গেলেন, 'এতোদূর?'

মেজদি অবিশ্যি থামলো না, 'রোগা স্বামী ফেলে মেয়েটা নিচে এসে কাকে জানি লুচি ভেজে খাওয়াচ্ছে, আর বলছে কি না তাকে বিয়ে করো! সেই লোকটা যেই রাজি না হয়ে চলে গেলো বেরিয়ে, মেয়েটা অমনি তার ছোট ভাইটাকে নিয়ে রেঙ্গুনে ভেসে পড়লো। আর তোমায় বলবো কি মা, বলতে আমারই মাথা কাটা যাচ্ছে, জাহাজে তারা কি কেলেঙ্কারিটাই না করলে! ছি-ছি-ছি, বইয়ের নামটাও যেমনি, তেমনি তার লেখা!'

বীথি বললে, 'আমি এখনো ঐ জায়গাটায় এসে পৌঁছুইনি।'

'তার আগেই বা কিছু কম আছে নাকি? মেসের একটা ঝি নিয়ে বাবুদের কম রঙ্গরস আছে? তুমি যদি শোনো, মা—'

তাকে বাধা দিয়ে বীথি শান্ত গলায় বললে, 'সমস্ত বইয়ে টুকরো-টুকরো করে ওগুলোই তুমি মনে রেখেছ নাকি, মেজদি? আর কিছুই তুমি দেখতে পেলে না?'

'আর দেখতে হবে না,' সর্বাণী ধমকে উঠলেন, 'রেখে দে তুই ও-বই।'

'কেন, মেজদি পড়তে পারলে আমি পারবো না কেন?' বীথির সমস্ত রক্ত ফুটতে লাগলো।

'মেজদি তো তোর চেয়ে বড়ো।'

'কোথায় বড়ো? দু বছর আগে যখন ও বই পড়েছে, তখন তো ওর আমার বয়েস।'

'মেজদির বিয়ে হয়েছে না? মেজদির কি ভয়!'

'বা রে, আমার বিয়ে হয়নি বলে আমি বই পড়তে পাবো না? কোনোদিন যদি বিয়ে না করি, তবে কোনো-একখানা বইও নয়? বা রে, পড়তে পারবো বলেই তো আমার বিয়ে দিচ্ছ না!' বীথি হাসবে না কাঁদবে কিছু ঠাহর করতে পারলো না।

মেজদি মুখিয়ে এলো, 'সে সব তো পড়ার-বই, পাঠ্য পুস্তক।'

'আর এ বইটা দিয়ে উনুন ধরাতে হবে বলেই বুঝি এটার এতোগুলি সংস্করণ

হয়েছে!' কথায় জোর পাবার জন্যে বীথি উঠে দাঁড়ালো, 'বরং তোমারই তো বেশি ভয়, মেজদি। যে-মেয়েটা লুচি ভেজে খাওয়াচ্ছিলো বলছিলে, তার স্বামী ছিলো বেঁচে, আর যে ঝি-র কথায় তোমার নাকটা ইস্কুপের মতো পেঁচিয়ে উঠেছিলো, সেও এমন কিছু আর অবিবাহিত ছিলো না।'

এমন সময় বিনায়কবাবু এসে এ-ব্যাপারে নাক ঢোকালেন। মেজদি সবিস্তারে আরজিটা তাঁর কাছে পেশ করলো।

যাক, এটা শুধু একলা মা'র ও মেজদির এলেকা নয়। এখানে বাবার একটা বক্তব্য আছে। আর সেটাই হবে সব চেয়ে সারবান।

বিনায়কবাবু খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন, পরে বললেন, 'না, হ্যাঁ, পড়বে বৈকি। পড়ে কেউ কোনোদিন খারাপ হয় না সংসারে। যারা সত্যি-সত্যি খারাপ হয়, তারা কেউ কোনোদিন এ সব বই পড়ে না, আর যদি পড়েও, তবে তা না পড়লেও তারা খারাপ হতো। সেটা কোনো কাজের কথা নয়।' কাজের কথাটা বলবার জন্যে তিনি বীথির দিকে এগিয়ে এলেন।

বীথির গলা খুশিতে তরল হয়ে এলো, 'আমিও সেই কথাই বলছিলুম, বাবা। সংসারে ভালো বইর সংখ্যাই তো বেশি, মেজদির কথায় পাঠ্য পুস্তকেরই তো এখানে ছড়াছড়ি, কতো ধর্মশাস্ত্র, কতো সদুপদেশ, কতো কি হাতি-ঘোড়া। এক-মাত্র বই পড়েই মানুষে যদি ইনফ্লুএন্সড হতো বাবা, তবে আজকে আমরা পৃথিবীর অন্য রকম চেহারা দেখতে পেতুম। পৃথিবীটা বিরাট একটা ইউটোপিয়া হয়ে যেতো। গেলো মহাযুদ্ধটা অন্তত তা হলে বাধতো না! বই পড়ে ইনফ্লুএন্সড যদি কেউ হয়ও, তবে নতুন করে আরেকটা বই লেখবার জন্যে, জীবনে সেটাকে অনুকরণ করবার জন্যে নয়। কেননা কি আমার সাধ্য, তুমি নিজে না হয়ে, অন্যাকে, বইর একটা চরিত্রকে অনুকরণ করতে পারো?'

'হ্যাঁ, আমিও তো সেই কথাই বলছিলুম, বীথি, লিখতে হবে।' বিনায়কবাবু মেয়ের মুখে ইংরিজি উচ্চারণ শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন, 'কিন্তু তুমি উপন্যাস পড়বে কেন?'

দুই হাতের মধ্যে বইটা শক্ত করে চেপে ধরে বীথি স্তম্ভিতের মতো চেয়ে রইলো। 'উপন্যাস তো তোমার লাইন নয়, তোমার লাইন কবিতা, তুমি কেবল কবিতা পড়বে। হ্যাঁ, মাইকেল পড়ো, কঠিন-কঠিন শব্দ শিখতে পারবে, পড়ো পলাশীর যুদ্ধ। ও-সব জোলো উপন্যাস পড়ে তোমার কি হবে? আর রচনার জন্যে স্টাইল যদি শিখতে চাও, পড়ো কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ও-সব বাংলা উপন্যাসে আছে কি? না মানে ব্যাকরণ, না মানে বানান, রেখে দাও সরিয়ে। ডায়লগে ইনভার-টেড-কমা পর্যন্ত দেয় না।'

আস্তে হাত বাড়িয়ে বইটা মেজদির হাতে পেঁছে দিয়ে বীথি ঘর থেকে প্রস্থান করলে।

তারপরে একদিন ম্যাট্রিকের ফল বেরুলো। গত মহাযুদ্ধের পর এমন কাণ্ড আর ঘটেনি—শুধু ই-ছাড়া আর পাঁচটা বিষয়েই বীথি লেটার পেয়েছে। ছোট্ট একটি তারকা বসেছে তার নামের পাশে।

শুধু তাই নয়, মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় হয়ে পেয়েছে সে কুড়ি টাকার বৃত্তি। সেণ্ট জোন্‌এর যুদ্ধাভিযানের চেয়ে মহিমাময়।

এর পরে বীথি আর থামতে পারে না। কলকাতা তাকে ডাক দিয়েছে।

বীথির ইচ্ছা ছিলো কোনো হসটেলে থেকেই সে পড়ে—অন্তত তার চারপাশে খোলা একটু বাতাস খেলুক। কিন্তু বিনায়কবাবু কিছুতেই রাজি হলেন না, বিডন-স্ট্রিট অঞ্চলে বীথির কে-এক বৈমাত্রেয় মামা আছেন বর্তমান, থাকতে হবে তাঁর বাড়িতে, তাঁরই পরিবারের তত্ত্বাবধানে।

বীথি মুখ ভার করে বললে, 'কিন্তু আমি কি আমার নিজের ভার নিতে পারতুম না, বাবা? আমি কি যথেষ্ট বড়ো হইনি?'

সর্বাণী ততোধিক মুখ ভার করে বললেন, 'যথেষ্ট বড়ো হয়েছিস বলেই তো ভয়। না বাপু, বিপদ ডেকে এনো না গায়ে পড়ে। একা-একা থাকা কিছুতেই চলবে না বোর্ডিংঙে, এ আমি জোর গলায় বলে দিচ্ছি। ও-বাড়িতে বৌঠান আছে, বুড়ো-মতন একজন অভিভাবিকা না থাকলে কি করে চলে আজকাল? সব সময়ে নজর রাখবার জন্যে হাতের কাছে একজন কড়া-ধাঁচের লোক না থাকলে আমরাই বা এখানে কি করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?'

লজ্জায় বীথি আপাদমস্তক জমে উঠলো।

'সেইটেই শেষ কথা নয়,' বিনায়কবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, 'কখন কি অসুখ-বিসুখ হতে পারে, মেয়েছেলের একা থাকার কতো অসুবিধে, বুঝলে না, মাথার উপরে একজন গার্ডিয়ান থাকলে কোনো দিকে আর কিছু গোলমাল থাকে না। তা ছাড়া,' বিনায়কবাবু মেয়েকে কোলের কাছে আকর্ষণ করলেন, 'তা ছাড়া, কতো খরচ বেঁচে যায় বলো দিকি? কলেজের মাইনে আর হাত-খরচ নিয়ে তোমার দশ টাকাতেই চলে যাবে, আর বাকি দশ টাকা দিয়ে তুমি সংসারে সাহায্য করতে পারবে, বীথি। বলো, এটা কি কিছু কম কথা?'

এর পরে বীথি আর কিছু উচ্চবাচ্য করতে পারে না। সামান্য মেয়ে হয়ে বাপ-মা'র সে কাজে লাগতে পারবে, এর চেয়ে বড়ো মর্যাদা তার আর কি থাকতে পারে পৃথিবীতে?

'দশ টাকায় আমাদের পনেরো দিনের বাজার খরচ চলে যাবে,' সর্বাণী ঝিলিক দিয়ে উঠলেন, 'তা ছাড়া আত্মীয়স্বজনের মাঝে থাকলে সবাই তোকে চিনতে পারবে—এই তো বৌঠান তোকে কোনোদিন দেখেনি, বৃত্তি পাবার পর তোকে কাছে পাবার জন্যে কি-রকম পাগল হয়ে উঠেছে! বোর্ডিংঙে থাকলে কে তোকে চিনতো? কলকাতায় দাদার বাড়িতে ছুটি-ছাটায় হামেসা কতো লোক আসা-যাওয়া করছে, সবাই তখন তোকে দেখতে পারবে কাছে থেকে, জিগগেস করলেই জানতে পারবে ম্যাট্রিকে যে সেকেণ্ড হয়ে কুড়ি টাকার বৃত্তি পেয়েছিলো সে এ বাড়িতেই আছে, সে তুই। সেটা কি কম কথা?' সর্বাণী প্রায় ফুলে উঠলেন, 'নইলে কে তোকে চিনতো, কোন বোর্ডিংঙে না কোথায় সবাইর চোখের আড়ালে পচে মরতিস।'

সেটাও ভেবে দেখা দরকার। শুধু তাকে নয়, সঙ্গে-সঙ্গে তার মা-বাবাকেও আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দিতে হবে। নইলে তাঁদেরই বা সংসারে চিনতো কে; বীথি

ছাড়া তাঁদেরই বা আছে কি গর্ব করবার? সে শুধু তাঁদের ভাবনাই বাড়িয়ে দেয়নি, বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা, তাঁদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠা। এটুকুই যদি সে না করতে পারলো, তবে তো সে সেই মেয়ে হয়েই রইলো, মানুষ আর হতে পারলো না। না, সে তার বাবা-মায়ের দুঃখ ঘুচোবে, তাঁদের জীবনে আনবে সে নতুন মূল্যবেত্তা, তাঁদের সে প্রাণীহিসেবে সার্থক করে তুলবে।

বিনায়কবাবু বললেন, 'কি কম্বিনেশান নেবে ঠিক করেছ? আমি বলি কি, আই-এস্-সি নাও।'

'আই-এস্-সি পড়ে কি হবে, বাবা?'

'না, কিছু হবে না, তবে,' বিনায়কবাবু একটা ঢোঁক গিললেন, 'তবে, শুনতে খুব বেশ ভালো হয় না, মা? মেয়েছেলেরা হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিখছে এটা বেশ একটা নতুন কিছু নয়? আস্তে-আস্তে এমনি করে তুমি এম্-এস্-সিটা পর্যন্ত পাশ করতে পারো—বাঙালী মেয়ে এ পর্যন্ত কটা এম্-এস্-সি হতে পেরেছে? সেটা একটা তবে অসাধারণ কীর্তি হয় না?'

বীথি শুকনো গলায় বললে, 'যা শুনতে ভালো তা দিয়ে আমার কি হবে? যা পড়তে ভালো তাই আমার নেয়া উচিত। অসাধারণত্ব শুধু বিষয়ে নয় বাবা, ব্যক্তিত্বে। আমি কি নয়, আমি কে।'

'তা তো ঠিকই,' বিনায়কবাবু অনায়াসে সায় দিতে পারলেন, 'নিশ্চয়, তোমার যে-দিকে ঝোঁক, সে-দিকেই যাওয়া উচিত একশোবার। সেই দিকে মরে গেলেও তোমাকে আমি বাধা দিতে পারবো না। আমাদের দেশের শিক্ষায় সে-ই তো দোষ আগাগোড়া, অভিভাবকদের খেয়ালমতো ছেলেদের হয় ভুগতে। যে হয়তো বড়ো এঞ্জিনিয়ার হতে পারতো, তাকে আমরা ধরে-বেঁধে একটা স্কুল-মাস্টার বানাই।'

খুশিতে বীথি নরম হয়ে এলো। আবদারের গলায় বললে, 'আরেকটা আরজি আছে, বাবা। আমি ভাবছি স্কটিশে পড়বো, বাড়ির কাছেই তো স্কটিশ।'

'সে কি,' বিনায়কবাবু চমকে উঠলেন, 'সেখানে তো ছেলেরা পড়ে।'

'সঙ্গে মেয়েদের পড়ারও বন্দোবস্ত আছে। ওখানে পড়তে গেলে রেজাল্ট আরো ভালো করতে পারবো, বাবা। শুধু মেয়েদের মধ্যে কম্পিট্ করতে ভালো লাগে না, একবার দেখতুম ছেলেরা কতো আর বেশি জানতে পারে আমাদের চেয়ে।'

'সে তো বেথুনে থেকেই হতে পারে,' বিনায়কবাবুর মুখ ত্বরিত কালবোশেখির মতো ঘনিয়ে এলো, 'ও-সব বাড়াবাড়ির কোনো দরকার নেই। বুঝলে মা, কলেজটা কিছু নয়, রেজাল্ট ভালো করার পক্ষে ছাত্রই একমাত্র ইমপরট্যাণ্ট। কেন, বেথুন থেকে কি কোনো মেয়ে আর শাইন করতে পারেনি?'

তার মানে, কি পড়বে তুমি বাছতে পারো, কোথায় পড়বে তা বাছতে পারো না। স্থানদোষটা সমাজের পক্ষে একটা মস্ত বিচার। তোমার ঝোঁকটা পুরোপুরিই উস্কে দেয়া যায় না—এই পর্যন্ত, ব্যস, আর নয়, বেশি দূর আর বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে কি, তুমুল একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে যাবে।

এ সব আলোচনায় সর্বাণী এতোক্ষণ যোগ দিতে পারছিলেন না বলে ভারি অস্বস্তি বোধ করছিলেন, এতোক্ষণে যা হোক জিভে একবার নাড়া দিতে পারলেন;

বললেন, 'কি যে তুই এক একটা ঢঙের কথা বলিস্, খুকি! একেবারে ছেলেদের দলে বসে পড়বার তোর কি হয়েছে। একা কোমর বেঁধে ওদের সঙ্গেই বা তুই লড়তে যাবি কেন? ওরা তো বেশি জানবেই মেয়েদের চেয়ে।'

বীথি হেসে ফেললো; বললে, 'আমি একা নয়, মা, আরো অনেক মেয়ে পড়ছে ঐ কলেজে।'

'কি সর্বনাশের কথা! কেন, কেন,' সর্বাণী চোখে-মুখে লালায়িত হয়ে উঠলেন, 'বর পাকড়াবার মতলব বুঝি? তুই তো বিয়ে করবিনে বলে ঢেউ তুলেছিস, তোর মুখে এ আবার কি নোংরা কথা! এই বুঝি তোর বড়ো হবার নমুনা?' যা-তা! বীথি আর টুঁ-টি করতে পারলো না।

এর মাঝে, পরীক্ষার ফল পর্যন্ত যখন বেরিয়ে গেলো, মহেশ্বরী আবার কোত্থেকে এক পাত্র জুটিয়ে আনলেন। কোষ্ঠি-কুলজী তাঁর মুখস্থ। বর্মার জঙ্গলে না কোথায় মোটা মাইনেতে ঝকঝক করছে।

'চামড়া বা চেহারার দিকে নজর নেই, বৌদি, শুধু লেখাপড়া-জানা মেয়ে চাই। কার যে কি-রকম বায়না!' জনান্তিকে মহেশ্বরী একবার হেসে নিলেন, 'বীথিকে ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে দেখো। কলকাতাতেই তো যাচ্ছে, তোমার দাদা, ক্ষেত্র-বাবুকে লিখে দাও, ওকে যেন তাদের দেখিয়ে দেন একটিবার। ছেলেও এখন ছুটিতে কলকাতাতেই আছে—হাঙ্গামা নেই।'

কথাটা বিনায়কবাবু দাঁতের ফাঁক দিয়ে উড়িয়ে দিলেন, 'এমন একটা ও ভালো রেজাল্ট করলো, আর আমি জোর করে ওর কেরিয়ারটা মাটি করে দি! আমি তো বাপ নই, আমি একটা কসাই, না? জীবনের ওর সমস্ত স্বপ্ন আর সম্ভাবনা এমনি করেই অকালে নষ্ট হয়ে যাক আর কি।'

'হ্যাঁ,' কথাটা সর্বাণীরও বিশেষ মনঃপূত হয়নি, 'অমনি মাসে-মাসে কুড়িটে করে টাকা হাতছাড়া হয়ে যাক।'

'ওর বিয়ের জন্যে তোকে ভাবতে হবে না, মহেশ্বরী' বিনায়কবাবু প্রায় গর্জে উঠলেন বলা যায়, 'পৃথিবীতে একধার থেকে সব মেয়েরই বিয়েটাই একমাত্র আইডিয়েল নয়।' রাগে তাঁর মুখ দিয়ে ইংরিজি বেরিয়ে এলো।

'আর সব মেয়ের যাই হোক গে, তার খবর কে রাখতে যাচ্ছে?' মহেশ্বরী তবুও প্রতিবাদ করবেন, 'তাই বলে বীথির তুমি বিয়ে দেবে না কেন? বন্যার মতো ওর যে বয়েস বাড়ছে দিন-দিন, তার খেয়াল রাখো?'

মহেশ্বরীকে চুপ করিয়ে দেয়া দরকার। বিনায়কবাবু রুক্ষ, একটু-বা নিষ্ঠুর গলায় বললেন, 'বিয়ের আগে মেয়েদের বয়েস যতো বাড়ে, ততোই তো ভালো। ততোদিন অন্তত তারা মনের সুখে মাছ-মাংস খেয়ে নিতে পারে। বিয়ে দেবার পর দেখতে-না-দেখতে বিধবা হয়ে গেলে সব ফাক্কিকার।'

কথাটা মহেশ্বরীর মর্মমূল পর্যন্ত বিদ্ধ করলো। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে উঠে যেতে-যেতে তিনি ঝাপসা গলায় বললেন, 'তাই হোক, পেট ভরে বীথি মাছ-মাংসই খাক চিরকাল। কিন্তু সংসারে মেয়েদের মাছ-মাংস খাওয়াটাই বড়ো সুখ নয়, দাদা।'

রাত-দিন, রাত-দিন—বীথি প্রতি মুহূর্তে ক্লান্ত হয়ে উঠলো—রাত-দিন কেবল

তার এই বয়েস হয়েছে! তা যেন একটা পাপ, তা যেন একটা দুঃস্বপ্ন! ফোড়া হলে যেমন তাকে ফাটিয়ে ফেলতে হয়, তেমনি তার বয়েস হয়েছে বলে বিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। তার বয়েসটা যেন বসন্তের গুটির মতো তার সর্বাঙ্গে রয়েছে দৃষ্টিকটু হয়ে। উঃ, কবে সে এ-বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পারবে, কবে সে যেতে পারবে কলকাতায়, তার স্বপ্নে-দেখা বিশাল সেই কলকাতায়।

তবু বাবা-মা'র কাছে এক হিসেবে সে কৃতজ্ঞ। তবু তো তাঁরা দিয়েছেন তাকে এই পড়বার স্বাধীনতা, মনে-মনে এই পাখা মেলে দেবার নভতল! তার বই-খাতাগুলি জ্বালিয়ে উমাশশীর মতো তো সে ছেলের দুধ গরম করতে বসেনি। ঘরের দেয়াল দিয়ে তাকে তো তাঁরা রুদ্ধশ্বাস শূন্যতার মাঝে পিষে ধরেননি চার-পাশে, অন্তত বইয়ের পৃষ্ঠায় জানালাগুলি তো সে খুলে রাখতে পেরেছে! এই যথেষ্ট—মাটির নিচেকার ছোট একটা শিকড় থেকে এমনি করেই সে একদিন শাখায় চলে আসবে, ফলবান, সমৃদ্ধ শাখায়। সে-শাখা তখন আকাশের দিকে প্রসারিত।

তারপর এক শোকাকুল, মলিন সন্ধ্যায় বীথির কলকাতা যাবার দিন এলো।

বিনায়কবাবু তার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'খুব মন দিয়ে পোড়ো, বীথি, একেবারে গোড়া থেকেই। তোমায় কি আর বেশি বলবো, মা, তোমার এবার-কার রেজাল্ট দেখে দেশে যেন একটা নাম-ডাক পড়ে যায়। বংশের তুমি মুখোজ্জ্বল কোরো। ভুলো না তুমি বড়ো হবার দায়িত্ব নিয়েছ।'

অশ্রুম্লান চোখে বীথি তার বাবার আশীর্বাদ মনে-মনে গ্রহণ করলে। প্রতিজ্ঞায় ঋজু, দৃঢ় হয়ে উঠলো তার মেরুদণ্ড।

সর্বাণী মেয়েকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললেন, 'তুই চলে যাচ্ছিস মা, ঘর দোর আমার অন্ধকার হয়ে এসেছে। তবু, কে জানে, ছেলেটা তো আর মানুষ হলো না, তোকে দিয়েই হয়তো আমাদের দুঃখ ঘুচবে।' তারপরে গলা আনলেন নামিয়ে, 'সব সময়ে খুব সাবধান থাকবি, যার-তার সঙ্গে মিশবি না, মামিমা যখন যা বলেন একচুল তাঁর অবাধ্য হবি না। লাজলজ্জা, ছিরি ছাঁদ—বড়ো হয়েছিস, সবই তো তুই বুঝতে শিখেছিস। বেশ নরম-তরম থাকবি, এতোটুকু বেহায়াপনা যেন কেউ খুঁজে না পায়।' বিনায়কবাবু যোগ করে দিলেন, 'এখন তোমার অধ্যয়নই হচ্ছে তপস্যা। কলেজ আর বাড়ি, বাড়ি আর কলেজ—ব্যস। লোকে যাতে ভালো বলে, তারই দিকে সব সময়ে নজর রাখবে, মা। আর মনে রাখবে আমরা এতোদূরে থেকে তোমার দিকে চেয়ে বসে থাকবো।'

ভয় নেই, বীথি কখনো দূরে থাকবে না, সব সময়ে থাকবে সে তার বাপ-মায়ের কাছাকাছি।

সংসারের এই তার অবহেলিত, গরিব বাপ-মা, নিতান্ত যাঁরা ছোট, নিতান্ত যাঁরা সাধারণ, অর্থে আর অহঙ্কারে—সে কি জানে না সেই শুধু তাদের একমাত্র সম্বল? সে কি জানে না তাঁদের মরুভূমিতে সেই এনেছে শীতল মেঘছায়া!

গাড়িটা ছাড়বে, সর্বাণী বাইরে থেকে জানলার মধ্যে দিয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন, 'আর দু'তিন-দিন অন্তর চিঠি দিস খুকি, দেরি হলেই আর বিছানা থেকে মাথা

তুলতে পারবো না। বেশ বড়ো করে ভালো দেখে চিঠি দিস, তোর খবর পাবার জন্যে এ-দিককার সমস্ত বাড়ি গলা বাড়িয়ে থাকবে।'

বিনায়কবাবু বিগলিত গলায় উচ্চারণ করলেন, 'দুর্গা! দুর্গা!'

গাড়িটা ছেড়ে দিলো।

চলে এলো সে কলকাতায়।

চলে এলো সে দেয়ালের দেশে। হাড়ের মতো শুকনো একটা বাড়িতে।

কলেজ আর বাড়ি, বাড়ি আর কলেজ, ব্যস্ এর বাইরে এক নিশ্বাসে সমস্ত কলকাতা গেছে ফুরিয়ে। কেবল সার-বাঁধা কতোগুলি ইটের নিষ্ঠুরতা।

দুদিনেই তার মামা ক্ষেত্রদাসবাবুকে চেনা গেলো। ইটে এবার শ্যাওলা ধরেছে। হলোই বা তিন মিনিটের রাস্তা, কলেজে তাকে বাসেই যেতে হবে।

'কতোটুকুন বা পথ,' বীথি অল্প একটু হেসে বললে, 'আমি এক দৌড়েই চলে যেতে পারবো।'

'না, রাস্তায় নেমে আর তোমাকে দৌড়-ঝাঁপ করতে হবে না।' ক্ষেত্রবাবু গাম্ভীর্যে অটল হয়ে রইলেন।

'কিন্তু মিছিমিছি কতোগুলি খরচ হয়ে যায়, মামাবাবু।'

'খরচই যদি না হবে, তবে আর তোমাকে পড়তে দিয়েছে কেন?'

'তোর খরচের জন্যে কি ভাবনা?' মামিমা স্নিগ্ধ গলায় বললেন, 'তোর তো স্কলারশিপের টাকাই আছে।'

তার স্কলারশিপের টাকা দিয়ে কি হয়, সেই সম্বন্ধে মামিমার সঙ্গে সে আলোচনা করতে চায় না। তবু আরেকবার সে চেষ্টা করে দেখলো; বললে, 'কেন, টুকু-দা, টুকু-দা আমাকে এইটুকু রাস্তা পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে না? সেও তো ঐ পথেই রোজ কলেজ যায়।'

টুকু ক্ষেত্রবাবুর ছেলে। স্কটিশে বি-এ পড়ছে।

টুকু চোখা একটা চিপটেন কাটলো, 'তোমার রীতিমতো লজ্জা করা উচিত, বীথি। সামান্য এইটুকুন পথ, তা কিনা তুমি একটা ছেলের কাঁধ ধরে পার হয়ে যেতে চাও? ছেলেদের সঙ্গেই যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এ-কথা তুমি ভুলে গেলে এরি মধ্যে?'

বীথি বাবাকে চিঠি লিখলো। বাবা নির্বিবাদে মামার কথায় সায় দিলেন। না হয় চার টাকা গেলোই গরচা, তবু স্থানীয় যে অভিভাবক, তাঁর বিরুদ্ধে মুখ বাঁকায় তার সাধ্য কি। বাপ মায়ের মতো তাঁর সম্মানটাও তার বাঁচিয়ে চলতে হবে।

ঠিকই তো, সর্বাণীও চিঠি লিখলেন, এ-কথা তাঁরা একেবারেই ভেবে দেখেননি। ঠিকই তো, কলকাতা তো সুন্দরবনেরই কাছাকাছি, তার রাস্তাগুলি সাপে-শ্বাপদে গিসগিস করছে। না-হয় বাজার-খরচের ফর্দটা একটু সংক্ষিপ্তই হয়ে আসবে, তাই বলে রাস্তা দিয়ে বীথির হনহনিয়ে যাওয়া চলবে না।

ক্ষেত্রদাসবাবুর অবস্থাটা টঙে বসে নেই, বরং প্রায় সুড়ঙ্গে বলা যায়। ছোট দোতলা

একটা বাড়ি—বাড়ি না বলে একটা গুহা বললেই মানানসই হয়—উপরে তিনখানা মোটে ঘর, নিচের তিনখানাকে বলতে পারো তিনটে বাক্স - সমস্ত সংসার উপরের সেই তিনখানা ঘরেই হাঁটু ও কনুইয়ে ঠেলাঠেলি করে কোনো রকমে জায়গা করে নিয়েছে। একখানাতে বপুষ্মান ক্ষেত্রদাসবাবু নিজে আর মাঝারি বয়সের ছেলেপিলেরা, ও-পাশেরটাতে স্কুল-কলেজের জোয়ান ছোকরারা, আর এটাতে মামিমা, মেয়েরা, কোলের বাচ্চাগুলি আর বীথি। প্রাণীই যেখানে এতো, তখন সেই অনুপাতে তাদের উপকরণের কথা ভাবো। প্রতিটি পা মেপে-মেপে দূরের কথা, প্রতিটি নিশ্বাস মেপে-মেপে চলতে হয়। ট্রাঙ্কের কোণ লেগে তোমার কাপড়টা ছিঁড়েছে তো তুমি অল্পে সেরে গেছ, ওদিকে ঐ আলমারিটা যে তোমার ঘাড়ে এসে পড়ছিলো। ছেলেরা চেঁচামেচি মারামারি করছে তো সেটা কিছুই নয়, ওদিকে তোমার বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি ছিঁড়ে যে চৌবাচ্চায় নৌকা ভাসায়নি, তোমার বাবার ভাগ্যি।

বীথি কোনোদিকে তাকিয়ে দেখলো না—চারপাশের এই দেয়ালের মধ্যে কারা আছে বা কারা নেই, বা, সত্যি এই দেয়ালের বাইরে আর কোনো কিছু আছে কি না—কোনোদিকে চেয়ে দেখলো না, শুধু তার অক্ষরীভূত বইয়ের পৃষ্ঠাগুলিতে সে তৃষ্ণার্তের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যখনই ফাঁক পায়, তখনই সে বই নিয়ে বসে, হোক গরম, হোক ঠাণ্ডা, কামড়াক মশা, উড়ুক তেলাপোকা, না থাক তার টেবিল-চেয়ার, না থাক বা একটা ফাউণ্টেন পেন, কানের কাছে যতো খুশি ছেলেরা কামান দাগুক, ছোকরাদের ঘরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে যতো ইচ্ছে সঙ্গীতালাপ চলুক, বীথি এক ইঞ্চি টললো না। আলোর বিল বাড়ছে, বেশ, সে নিজের খরচে মোমবাতি জ্বালিয়ে নেবে; মামিমার কি কাজে বসবার টুলটা ছেড়ে দিতে হবে, বেশ, মেঝেতেই সে পড়তে পারবে পা ছড়িয়ে। ছাত্রত্ব একটা ব্রত—মনে করো ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের কথা—যতো তার বাধা, ততো তার বিস্ফারণ। বাধাই যদি না সে অতিক্রম করতে পারলো, তবে কি ছাই সে চোখের সামনে বই খুলে ধরেছে! বাবা-মাই বা কি ভাববেন, অন্য লোকেরাও বা কি বলবে? সামান্য শারীরিক কষ্ট সে সহ্য করতে পারলো না, পারলো না, পারলো না সে সাংসারিক কতোগুলো অসুবিধে এড়িয়ে যেতে, এবং তারি জন্যেই তার পরীক্ষার ফল এবার খারাপ হলো—এ-কথা সে পাঁচজনের সামনে মুখ দেখিয়ে বলবে কি করে? অসম্ভব। বীথি কোমরটা আঁট করে বেঁধে নিলে। মামিমা যতোই কেননা তাকে ফরমাশ করুন, ছেলেটাকে একটু ধর, ধোবার বাড়ির কাপড় মিলিয়ে নে, এ-বেলার রান্নাটা তুইই নামিয়ে দিয়ে আয়—বীথি কিছুতেই তার খুঁটি ছাড়বে না। পাশ—তার পাশ করে যেতে হবে ধাপে-ধাপে, আরো ভালো, আরো বেশি নম্বর পেয়ে-পেয়ে, তার বাবা-মা'র মুখোজ্জ্বল করতে হবে—তার বাবা-মা, সে ছাড়া গর্ব করবার যাঁদের আর কিছু নেই। তার দুই চোখের তারার মধ্যে তার বাবা-মা'র মুখ যে তার দিকে তাকিয়ে আছে সব সময়।

অতএব বীথি আর কোনোদিকে তাকালো না। ব্রামানটিপকে কি করে বারবারায় নিয়ে যেতে হয়, এক্ষুনি, দুধটা এই জ্বাল দিয়ে নিতে-নিতে, এই মুহূর্তে, তার শিখে ফেলা চাই।

একদিন মামিমা চোয়াল দুটো লম্বা করে বললেন, 'হ্যা রে বীথি, তুই তো নাচ জানতিস শুনেছিলুম। একবার কোন সভায় নাকি নেচে কি মেডেল পেয়েছিলি, তোর মা লিখেছিলো। আমাকে একটু দেখা না।'

বীথি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটা আছাড় খেলো, 'তোমাকেও মা লিখেছিলো নাকি ?'

'নইলে জানবো কি করে ? দেখা না একবারটি।'

বীথি লজ্জায় ম্লান হয়ে গেলো। বললে, 'পাগল !'

'কেন, সভার মধ্যে নাচতে পারলি, আর একা আমার সামনে পারবিনে ?'

'তখন আমি যে ছোট ছিলুম, মামিমা।'

'আর বড়ো হয়েই বুঝি নাচা যায় না। নাচ তো শুনেছি একটা শিল্প-বিদ্যা।' মামিমা চোখ দুটো চটুল করে তুললেন, 'আচ্ছা, দরজাটা না-হয় বন্ধ করে দিচ্ছি, ছেলে-ছোকরারা কেউ উঁকি মারতে পারবে না। আমার সামনে মেয়ে হয়ে তোর নাচতে লজ্জা কিসের ?'

মামিমার কথাগুলি তাকে টুকরো-টুকরো করে কাটতে লাগলো। বড় হয়ে যে আর ভদ্রতা বাঁচিয়ে নাচা যায় না, একটা বয়েস পর্যন্তই নাচাটা যে মেয়েদের শিল্পবিদ্যা, পরে সেটা দাঁড়ায় যে একটা শরীরের বিজ্ঞাপনে, মামিমার পরের কথাগুলোতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তার এখনকার নাচ শুধু মামিমাই দেখতে পারেন, তা-ও দরজা বন্ধ করে। সেখানে আর কারো প্রবেশাধিকার নেই—সেটা তা হলে তাদের দেখা হবে না, সেটা হবে তার দেখানো। বীথি অপমানে কালো হয়ে উঠলো !

বইয়ের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে রেখে রূঢ় গলায় বললে, 'ও-সব আমি কবে ভুলে গেছি, মামিমা।'

তার সমস্ত অস্তিত্ব বিষ হয়ে ওঠে যদি কেউ তাকে কোনো ছুতোয় এই শরীরের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। শরীরকে তার মনোহীন, পবিত্র অসম্পৃক্ততায় দেখতে সে রীতিমতো ভয় পায় ; তার ঘৃণা ধরে যায় তার সম্বন্ধে কোনো বিলোল প্রগল্‌ভতার কথা মনে হলে। কোমলতায় লতিয়ে সে একখানা ভালো শাড়ি পর্যন্ত পরে না। তার যে শরীর নামে একটা ভার বহন করে বেড়াতে হয়, সেটা যেন তার গভীর একটা লজ্জা - শরীরটাকে মুছে দিয়ে বাঁচা সম্ভব হলে সে সবাইর চেয়ে আগে বাঁচতো। তার সাধনা সুন্দর হবার নয়, সফল হবার। শরীর তার কাছে ঘৃণ্য একটা আবর্জনার সামিল, জীবনে একটা অবান্তর অত্যাচার। যতো তাকে ভুলে থাকা যায় ততোই তার মুক্তি, ততোই তার পবিত্রতা। মামিমা এবার অন্য জায়গায় ঢুঁ মারতে চেষ্টা করলেন, 'তুই তো গানও জানতিস শুনেছিলুম। কই, গানও তো এক-আধটা গাস না আজকাল !'

'সে তো সুর নয়, মামিমা,' বীথি হেসে বললে, 'সে অসুর। ছেলেবেলা সবাই অমন হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করে।'

'হলোই বা না,' মামীমা গম্ভীর চালে বললেন, 'চড়া জায়গায় গলাটা তো একটু ছাড়তেই হবে।'

'কিন্তু এবার দরজাটা বন্ধ করে দিয়েও যে পার হওয়া যাবে না।'

'আহা, গলাটা একটু নামিয়েই ধরু না। মাঝে-মাঝে চর্চাটা একটু রাখা ভালো। ছেলেদের আজকাল আবার বাই হয়েছে গান-জানা মেয়ে চাই।'

বীথি দুই চোখে লেলিহান জ্বলে উঠলো, 'ছেলেরা কি চায় না-চায় সেই অনুসারে আমাদের বাড়তে হবে নাকি?'

'তা ছাড়া আবার কি! নইলে তোরা ঝাঁক বেঁধে পড়তে এসেছিস কেন? ছেলেরা চায় বলেই তো। যেদিন আবার চাইবে না, দেখবি, আবার সেই গৌরীদান চলেছে।'

'রাখো', বীথি রাগে একেবারে ঘেমে উঠলো, 'তোমার সেই ছেলেদেরই বা কে চায়? তাদেরই বা কদ্দুর দৌড়, সব জানা গেছে, মামিমা। দেখি না,' বীথি বইর উপর তীব্র চোখে ঝুঁকে পড়লো, 'দেখি না কে কাকে চায়, কে কার মতো হয়ে ওঠে।'

'তর্ক রেখে দে, বাপু' মামিমা তাকে ভেজাতে চেষ্টা করলেন, 'ঠাণ্ডা গলায় এখন একখানা গান ধরু। কেত্তন যদি জানিস তো তোর মামাবাবুকে ডেকে নিয়ে আসি।'

বীথি একেবারে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে দিলে। বললে, 'আমার এখন ভীষণ পড়া।'

আরো একটা জিনিস বীথি জানতো। ভাগ্যিস মামিমা সেটা শোনেননি। সেই কবিতার খাতার পিছন-দিকের শাদা পৃষ্ঠাগুলিতে সে এখন বটানির নোট টুকছে।

চমকে উঠে মাঝে-মাঝে বীথি ঘরের দিকে তাকায়—যদি তাকে একটা ঘর বলতে পারো আর তার সমস্ত কবিতা চারপাশের স্যাঁতসেঁতে শাদা দেয়ালের মতো শূন্য চোখে চেয়ে থাকে। নিজের দিকে চেয়ে তুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারো তার ফাঁক কোথায়! প্রতিক্ষণে ঘরের মধ্যে চলেছে একটা শিবতাণ্ডব। কোন ছেলেটা মেঝের থেকে কখন তরকারির খোসা তুলে খাচ্ছে, কোন দুটোয় করছে কামড়াকামড়ি, কে তোমার মাথা তাক করে লাট্টু ঘোরাচ্ছে বনবনিয়ে, কখন বা এলো মামিমার হুকুম সংসারের তাঁবেদারিতে। এখানে, এ-ঘরে বসে, পরের কথাই একধার থেকে মুখস্থ করা যায়, নিজের কথা আর লেখা চলে না। যে মুহূর্তে ধরো তুমি একটা মিল ভাবছো, সেই মুহূর্তেই ধোবা এসেছে কাপড় নিয়ে, কিংবা কে চাইলো এক গ্লাশ জল, কে দিয়ে গেলো তার সার্টে বোতাম লাগাতে, কিংবা সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে কোন ছেলেটা একেবারে চিৎপটাং। সব সময়েই তুমি পায়ের ডগায় খাড়া হয়ে আছো। সব সময়েই একটা ভূমিকম্প লেগে আছে।

তার আবার আর-আর সব কথার মাঝে একটা কথা খুব বেশি মনে পড়ে আজকাল। বাবা বলেছিলেন, 'মেয়েরা কি করে কি লিখতে পারবে বল? তাদের নিজের বলে আলাদা কোনো একটা ঘর ছিলো না।'

ঘর, ঘর, ছোট, সামান্য, নিরিবিলি একখানা ঘর—নিজের জন্যে কবে সে একখানা ঘর পাবে?

উঃ, কবে সে যেতে পারবে এখান থেকে, তার মা'র কোলে, তার মাঠের

কোলে! কতোদিন সে আকাশে চাঁদ উঠতে দেখেনি, মাঝরাতের সেই হলদে চাঁদ, শেষরাতের তার সেই মৃত্যুতে লাল হয়ে ওঠা! সে ভুলেই আছে বাঙলা দেশে শরৎকাল বলে কোনো একটা ঋতু আছে কিনা, ভুলেই আছে সে দুপুরের আকাশের সেই নীল নিঃশব্দতা। ভুলেই আছে সে সব।

ছি, দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে বীথি নিজেকে শাসন করলো, তার নিজের জন্যে দুঃখ করা তার শোভা পায় না। যখনকার যা তখনকার তাই। এখন শুধু তার পড়া, কলম ঠেলে-ঠেলে পরীক্ষার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যাওয়া। তা ছাড়া আর সব তার বিলাসিতা, ছাত্রত্বের যা পরিপন্থী। পড়ো, পড়া, আরো মন দিয়ে পড়ো, ছেলেরা যে তোমাকে ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেলো।

তবু এতোতেও যেন তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয়া হবে না। মামাবাবু কোত্থেকে এক বিয়ের সম্বন্ধ কুড়িয়ে এনেছেন।

ছেলে নাকি মেডিকেল কলেজে পড়ছে, বাপের অবস্থাটা সোনা দিয়ে মোড়া—বিনায়কবাবুর কাছে চিঠি গেলো—বীথিকে পছন্দ হলে এবার আর হাতছাড়া হতে দেয়া নয়।

বিনায়কবাবু চিঠির সংক্ষিপ্ত জবাবদিলেন, মামিমার মুখেই অবিশ্যি সেটা শোনা গেলো, এবং শোনা গেলা কিছু বিস্তৃতভাবে, কিন্তু শুনে বীথি উঠলা সর্বাঙ্গে পুলকিত হয়ে। বাবা লিখেছেন: যে-ছেলে এখনো মাত্র কলেজে পড়ছে, এখনো রোজগার করতে শেখেনি, সে বীথির যোগ্য নয়। বেশ, রোজগেরে পাত্রও ক্ষেত্রবাবুর হাতে আছে। পাটনা সেক্রেটেরিয়েটে সাড়শো টাকার কাজ করছে, দাবি-দাওয়া কিছু নেই, শুধু যাতায়াত-খরচ বাবদ পাঁচশো টাকা। বললেই তারা দিন-ক্ষণ দেখে মেয়ে দেখে যেতে পারে।

বাবা এবার কি উত্তর দেন বীথি প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

বাবা লিখলেন: ছেলের সাড়শো টাকার চাইতে বীথির কেরিয়ারের দাম অনেক বেশি। তা ছাড়া, যাতায়াত-খরচ বাবদও যারা টাকা চায়, তাদের ঘরে তিনি মেয়ে দিতে পারেন না। এতো অর্থব্যয় করে তিনি মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, ফের অর্থব্যয় করে তার বিয়ে দিতে নাকি?

চিঠিটা খামের মধ্যে মুড়ে রাখতে-রাখতে মুচকে হেসে ক্ষেত্রবাবু বললেন, 'মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে পণ এড়িয়ে যেতে! বিনায়ক বুড়ো বয়সে যে এ কি ধুয়ো ধরলো বোঝা দায়। মেয়ের কেরিয়ার! মেয়ের কেরিয়ার! কেরিয়ার বলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না নাকি? মেয়েকে মানুষে ততোদিনই লেখাপড়া শেখায়, যতোদিনই তার বিয়ে না হচ্ছে। পাত্র জুটলেই পাততাড়ি গুটিয়ে ফেল। নয়তো—এ কি অন্যায় কথা! এমন সাধা সম্বন্ধ!'

আচ্ছা, কানাকড়িও দাবি-দাওয়া নেই, ক্ষেত্রবাবু টাটকা এক বি-সি-এস্ ধরে আনলেন। তার বাবা ফর্দ করে গুনে গুনে একশো মেয়ে দেখতে বেরিয়েছেন! নিরানব্বুইটি দেখেছেন, পছন্দ হয়নি বাকি একটি হতে বীথির বাধা কি! যদি তার কপালে থাকে, লেগেও যেতে পারে বা। হোক, না হোক, দেখাতে কি দোষ!

বীথি একেবারে ফাঁপরে পড়লো। এবার আর বাবা পালাবার পথ পাবেন না।

বিনায়কবাবু সত্যি এবার পথ পেলেন না। কিন্তু লিখলেন : মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমার কথাটাই চূড়ান্ত নয়, মেয়ের বয়েস হয়েছে, তারো তাই একটা মতামত আছে—তাকে একবার জিগগেস করা দরকার।

ভাগ্যিস তার বয়েস হয়েছিলো। বীথি মনে-মনে আনন্দে একটা অভ্রভেদী চীৎকার করে উঠলো।

আশ্চর্য, তাকেও কিনা জিগগেস করা হয়েছিলো তারপর!

সে কি ভয়ানক কথা! তারো একটা মতামত আছে। সেটা সূর্যের মতো স্পষ্ট, অন্ধকারের মতো ধারালো। উঃ, সে কি তীব্র উন্মাদনা! তারো একটা মতামত আছে। সেটা সে এবার, এতোদিনে, উচ্চারণ করতে পারবে। বীথি সমস্ত রক্ত চলাচলে বিভোর হয়ে উঠলো।

মামিমা এসে বললেন, 'কি লো, রাজি?'

বীথি তাড়াতাড়ি বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি ঘাঁটতে শুরু করলো। দ্রুত, ব্যস্ত গলায় বললে, 'দাঁড়াও, আমার এখন নিশ্বাস নেবারও সময় নেই, পিটিশিয়ো প্রিন্সিপাই নিয়ে মহা গোলমালে পড়ে গেছি। এ বলে এ কথা, ও বলে, আরেক। অফুল!'

মামিমা তবু খানিকক্ষণ গাঁইগুঁই করেছিলেন।

বীথি দুই চোখ স্পষ্ট, প্রখর করে তুলে ধরলো; দৃঢ়, রূঢ় গলায় বললে, 'পাত্রটিকে, ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিয়ো আমার কাছে। বুকের ছাতি ক' ইঞ্চি, ক' গজ লং জাম্প দিতে পারে, রিস্টের বেড় কতোটা? সাঁতার দিয়ে কতোক্ষণ থাকতে পারে জলে, এনডিয়োরেন্স সাইক্লিং-এর রেকর্ড কতো? বেশ তো, আসতে নেহাত লজ্জা পায় আমিই না-হয় গিয়ে দেখে আসবো একদিন। আমার সামনে চেয়ারে ঘাড় হেঁট করে বসবে, আর আমি বলবো, হাঁ করো তো, তোমার দাঁত দেখি। দেখি একটানা ক'টা বৈঠক দিতে পারো।' বীথি আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলো, 'অফুল!'

সেই থেকে ক্ষেত্রবাবু একেবারে চুপ করে গেলেন। তাঁর সেই স্থূল নিস্তব্ধতাটা বীথি কি নিদারুণ উপভোগ করছে! কেবল বিয়ে আর বিয়ে! বিয়ে ছাড়া বীথির যেন আর কোনো কাজ নেই!

শুধু বই ছাড়া আর-কাউকেও বীথি বন্ধু করেনি। এ-বাড়িতে তার সমবয়সী কোনো মেয়ে ছিলো না, আত্মীয়-অনাত্মীয় ছিলো কতোগুলি ছেলে, কিন্তু তাদের কাছে তার উপস্থিতিটা প্রায় একরকম উহ্যই ছিলো বলা যায়। মাঝপথে সিঁড়িতে কারুর সঙ্গে আচমকা দেখা হলে সে আর পাশ দিয়ে সরে দাঁড়ায় না, একেবারে সোজা উঠে যায় উপরে বা নেমে যায় নিচে, যেখানে থেকে গোড়ায় সে রওনা হয়েছিলো। ধারে-পারে পুরুষের কোনো শব্দ শুনলে সে তখুনি তার পড়ার সুরটা পর্যন্ত ছেড়ে দেয়, আর কখনো কোনো ছেলে যদি কোনো কাজে এই ঘরে ঢুকে পড়ে, ততোক্ষণ বীথি শূন্যতার একটা পাথর হয়ে থাকে, নিশ্বাস নিতে পারে না। কারু সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, কারুর সে মুখ দেখে নাম বলে দিতে পারে কিনা সন্দেহ। লক্ষ্মণ কেবল পুরুষের মধ্যেই থাকবে, এ অসম্ভব। এদের

সবাইকে সে ভয় করে, এবং যাকেই আমরা ভয় করি তাকেই করি ঘৃণা। তাই কোনোদিন কাউকে সে তার ছায়ায় এসে পর্যন্ত দাঁড়াতে দেয়নি ; কাছাকাছি যেমনি সে কারুর গলা শুনেছে, অমনি চোখের পলকে নিজেকে এনেছে নিবিয়ে, শাড়িটাকে আরো বেশি ঘন করে তুলেছে চারপাশে। মনে থাকে যেন, মা তাকে প্রতিমুহূর্তে সাবধান থাকতে বলেছেন।

কিন্তু দরজা আটকে টুকু-দাকে ঠেকায় তার সাধ্য কি! দমকা হাওয়ার মতন যখন-তখন সে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

টুকু-দার সামনে সে আর আপাদমস্তক মেয়ে থাকতে পারে না।

'কি এখনো, সন্ধের সময় বই নিয়ে বসেছ, বীথি?' টুকু একদিন একেবারে তার টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো, 'চলো, ফিল্‌ম্‌ দেখে আসি।'

টুকু-দার কথায় সমস্ত বাহির, বাঁশির সুরের মতো কলকাতার দীর্ঘ সমস্ত রাস্তা, তাকে যেন একসঙ্গে ডাক দিয়ে উঠলো। দেয়ালের বাইরে হাওয়া উঠলো মর্মরিত হয়ে। বীথি খুশিতে উছলে উঠে বললে, 'মামাবাবু নিয়ে যাবেন বলেছেন নাকি?'

'মামাবাবু কেন,' টুকু প্রায় ধমকে উঠলো, 'আমার সঙ্গে যেতে পারো না?'

'পারি, কিন্তু মামাবাবুকে বলেছ?'

'বয়ে গেছে আমার বলতে,' টুকু বিরক্ত মুখে বললে, 'এইটুকুন একটা রাস্তা পেরিয়ে আমার সঙ্গে সিনেমায় যাবে, তাতে বাবার একটা লিখিত মত নিতে হবে নাকি?'

বীথি হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলো, 'তিনি তো বাড়িতে নিচেই আছেন এখন, মুখের একটা কথাই বা নাও না চেয়ে।'

'বেশ, জানতেই তো পারবেন স্বচ্ছন্দে। আমরা তো আর তাঁর চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে যাবো না। তুমি ওঠো,' টুকু তাকে তাড়া দিলো, 'দুজনে যখন তৈরি হয়ে নিচে নামবো, আর তিনি যখন জিগগেস করবেন : কোথায় যাচ্ছিস রে তোরা? তখন, তখন বলা যাবে। নেহাত না বললে আর নয় বলে বলা যাবে। আগে থেকে মত নিতে যাবো কেন? কারো ঘরে আগুন দিতে তো আর যাচ্ছি না।'

'কিন্তু আজ থাক, টুকু-দা—' বীথি ক্লান্ত গলায় বললে।

'কেন, থাকতে যাবে কেন?' টুকু উৎসাহে ঝলমল করে উঠলো, 'খুব ভালো ফিল্‌ম্‌। ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্‌। তুমি তো তার নামও শোনোনি—কি তুমি? এতোদিন ধরে কলকাতায় এসেছ, একদিন বাড়ির বাইরে পা বাড়ালে না, দেয়ালের মধ্যে অন্ধকারে রইলে ঘুপটি মেরে। দিনে যা দুবার কলেজের বাসে চড়লে, পা দিয়ে ছুঁলে না একবার কলকাতার মাটি। দেখলে না একবার তার রাত্রের চেহারা। বেশ, বাবার মতই আমি নেবো, দেখি,' টুকু ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

ততোধিক ব্যস্ততার সঙ্গে বীথি তাকে বাধা দিলে। বললে, 'তুমি ও-সব কথা গিয়ে বললে মামাবাবু ভাববেন আমি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছি। শোনো, দাঁড়াও, আমি যাবো না।' বীথি লজ্জায় একেবারে মুষড়ে গেলো, 'একা তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারি না কোথাও।'

'কেন, আমি কি দোষ করলুম?' টুকু থেমে গেলো, 'আমি তোমাকে গাড়ি-ঘোড়া কাটিয়ে রাস্তা ঠিক পার করে আনতে পারবো না ভেবেছ?'

'তা হয়তো পারবে,' কথা বলতে গিয়ে বীথি ঘেমে উঠলো, 'কিন্তু থাক—মামাবাবু মত দেবেন না কিছুতেই, মিছিমিছি একটা গোলমাল হবে—তুমি একাই গিয়ে দেখে এসো।'

'কেন, আপত্তি করবেন কেন?' টুকু ছেলেমানুষের মতো বলে উঠলো, 'আমি তোমার দাদা না?'

বীথিও উঠলো ছেলেমানুষের মতো হেসে। বললে, 'তা তো মামাবাবুও জানেন। থাক গে, ও আমি দেখবো না,' বীথি তারস্বরে সমাপ্তির একটা রেখা টানলে, 'ফিল্‌ম্‌ দেখাটা ভালো নয় শুনেছি।'

'ভালো নয় মানে?' টুক দুই চোখে জ্বলে উঠলো, 'তোমায় কে বললে? কোন মূর্খ?'

'চারপাশে হামেসাই তো শুনতে পাচ্ছি,' বীথি অল্প একটু হাসলো, 'সংসারে মূর্খেরই তো রাজত্ব, টুকু-দা, মূর্খরাই তো সংখ্যায় বেশি শক্তিশালী।'

'ভালো নয়,' টুকু একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়লো, 'সংসারে কোন জিনিসটা ভালো জিগগেস করি? আমাদের জন্মটাই ভালো, না আমাদের মৃত্যুটাই খুব সৎ?'

বীথি আরেকটু হলে প্রায় গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিলো। তাড়াতাড়ি দাঁত দিয়ে জিভটা কামড়ে সে-হাসি সে পিষে ফেললে।

'পৃথিবীতে আমরা একজন যে মেয়ে, আরেকজন যে ছেলে—এটাই বা কোন ভালো ব্যবস্থা?' টুকু রাগে রি-রি করতে লাগলো, 'আমরা কেউ ফিল্‌ম্‌ দেখে খারাপ হচ্ছি, কেউ-বা না-দেখে খারাপ হচ্ছি, তফাতটা কোথায়? খারাপ হওয়া বলে একটা জিনিস যখন পৃথিবীতে আছেই, কারু-কারু তা না হয়ে আর উপায় কি!'

বীথি উদাসীনের মতো বললে, 'বেশ তো, তুমি যাও না একা, দেখে এসো।'

'আর তুমি?'

'আমি এখন পড়বো।'

'পড়বে? টেবিলের উপর থেকে খোলা বইটা এক টানে কেড়ে নিয়ে টুকু বললে, 'কেন তুমি পড়ছ? পড়ে তোমার কি হবে জিগগেস করি?'

'তুমিই বা কেন পড়ছ? তোমারই বা কি হবে?'

'আমি—আমি চাকরি করবো।'

'আর আমি বুঝি ঘোড়ার ঘাস কাটবো বসে-বসে?' বীথি হঠাৎ, এক মুহূর্তে, তার ব্যক্তিত্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, চাপা, কঠিন মুখে বললে, 'আমি—আমি চাকরি করতে পারবো না? তোমার মতো আমারও দুটো করে হাত-পা নেই?'

'কিন্তু আমার মতো গায়ে তোমার জোর নেই, আমার মতো মাথায় তোমার বুদ্ধি নেই।' টুকু যেন একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসলো, 'সে-কথা হচ্ছে না। কিন্তু তুমি কি চাকরি করবে জিজ্ঞেস করি?'

'যাই কেন না করি,' বীথি রাগে জ্বলে উঠলো, 'তোমার চেয়ে ভালো।

তোমারই বা কি চাকরি মিলবে শুনি ? আর তুমি যদি একটা যোগাড় করতে পারো, আমি পারবো না ? পুরুষের চেয়ে আমরা এতো ছোট ?'

'তা তো একটু ছোটই.' টুকু হেসে ফেললো।

'কিসে ?'

'দৈর্ঘ্যে, দৈহিক শক্তিতে, মৌলিকতায়। সে-কথা হচ্ছে না, বীথি,' টুকু তার মহান নির্লিপ্ততায় সরে দাঁড়ালো, 'মাস্টারি হয়তো তোমার একটা জুটে যাবে কোনোরকমে। তা নয়, আমি তাই বলতে চাচ্ছিলুম না – '

'তুমি যদি সামান্য একটা কেরানি হতে পারো,' বীথি আবার ফুঁসে উঠলো, 'আমার মাস্টারি করতে কি দোষ ? আমি তার জন্যে তোমার ছোট হয়ে গেলুম বলতে চাও ?'

'পাগল !' হাসিতে টুকুর গাম্ভীর্য গেলো গলে, 'আমার সঙ্গে তুলনা দিচ্ছ কি ! তোমার মতো গোগ্রাসে অমন মুখস্থ করা দূরের কথা, কোন পেপারে আমার কি বই, তাই আমি জানি না। আমার সঙ্গে যে তুলনা দিচ্ছ তাতেই তো তোমার ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। আমি হয়তো একটা কেরানিও হতে পারবো না কোনোদিন।'

বীথি হেসে বললে, 'তবু তো মেয়ে হয়ে সংসারে একজন পুরুষের চেয়ে অগ্রগণ্য হতে পারলুম। অন্তত সেই একজনের চেয়ে, যে সব সময়ে কেবল মেয়েদের ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণিত করবার জন্যই বেঁচে আছে। বলো, তুমিই বলো, সেটাই বা কি কম কথা !

টুকুর পুরুষত্বে ঘা লাগলো। বললে, 'আমি তো জানতুম বিয়ে হবার জন্যই মেয়েরা পড়ে, বিয়েটাই মেয়েদের একচেটে চাকরি।'

'এতো কম জেনে আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসো না, টুকু-দা।' বীথি আরেকটা বই খুলে বসলো, 'যাও, ফিল্মে ওদিকে আরম্ভ হয়ে গেলো।'

'বুঝলুম তুমি চটেছ,' টুকু টুলের উপর আরো গ্যাঁট হয়ে বসলো. 'রাগ করে থাকলে তার সঙ্গে অবিশ্যি আর তর্ক করা যায় না। মেয়েরা অমনি রেগে উঠেই তর্ক জিতে যায়, ওটা তাদের ব্রহ্মাস্ত্র। আমরা নিতান্ত উদার বলে হাসিমুখে হার স্বীকার করতে পারি।'

'তোমাদের কাছে, রক্ষে করো, আর আমরা উদারতা চাই না, পরিচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাই এখন থেকে।' বীথি গভীর মনোযোগে বইয়ের অক্ষরগুলি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো, 'পুরুষ যা পারে তা ও আমরা পারি কিনা একবার দেখতে দাও।'

'উঃ, সামান্য একটা মাস্টারির জন্যে তুমি কি অসাধ্যসাধনই না করছ বীথি,' টুকু চোখে সস্নেহ একটা বিদ্রূপের ভঙ্গি করলে, 'কিন্তু ওটা আর কেন ? তোমরা তো জন্ম থেকেই মাস্টার, তোমাদের ভেতরে আদ্যি কালের বুড়ো একটি জ্যাঠাইমা আছে লুকিয়ে। আর ওটার বিস্তৃত চর্চা কেন ? এখন অন্য-কিছুতে হাত পাকাও।'

'সে-পরামর্শ পুরুষের কাছ থেকে নিতে হবে না,' বীথি কঠিন হয়ে বললে, 'সংসারে এতো অপোগণ্ড নাবালক থাকলে জ্যাঠাইমা না হয়ে উপায় কি বলো ?

সেই জ্যাঠাইমাই এখন তোমাকে এখান থেকে উঠে যেতে বলছে। আমি পড়বো—আমাকে এখন পড়তে দাও।'

টুকুর একইঞ্চি তবু নড়বার নাম নেই। হাসিমুখে বললে, 'সেই অপোগণ্ড শিশুটি সামান্য কৌতূহলী হয়ে তোমাকে জিগগেস করছে, পড়ে তুমি কি পাও, শুধু পড়ে তুমি কি জানতে পারবে ?'

'না পড়েই বা কি জানছিলুম এতদিন ?'

'ছেলেরা তোমাদের চেয়ে কতো বেশি জানে, শুধু বই পড়ে তুমি তাদের নাগাল পাবে কি করে ?'

'কি জানে তারা ?'

'ধরো তুমি কোনোদিন রবিঠাকুরকে দেখেছ ?'

'নাই বা দেখলুম, পড়তে তো পারছি,' বীথি চোখ তুলে বললে, 'তুমি তো বঙ্কিম চাটুজ্জেকেও দেখনি। জীবন তাই তোমার একেবারে বয়ে যাচ্ছে, না ?'

'ছি-ছি-ছি, এখনো কিনা রবিঠাকুরকে দেখনি। নিতান্তই তুমি একটা মেয়ে, বীথি।'

'রাখো। তুমি তো আমাদের কলেজের বনমালী বেয়ারাকে দেখনি। তবু তোমার এখনো বাঁচতে ইচ্ছে করছে ?'

'আচ্ছা, তুমি বলতে পারো পৃথিবীতে ক'টা নামজাদা ক্রফোর্ড আছে ?'

'আর তুমি বলতে পারো আমাদের ক্লাশে ক'টা নীলিমা আছে ?'

'কার সঙ্গে কার তুলনা !' টুকু ঠোঁটের কিনারে তাচ্ছিল্যের একটা ইশারা করলে, 'পৃথিবীর কোনো খবরই তুমি রাখো না দেখি। আচ্ছা, বলতে পারো, জি-পি-ওর গম্বুজে ক'টা ঘড়ি আছে—কোনটার কি টাইম !'

'আহা, সমস্ত পৃথিবীটা তো একমাত্র ছেলেদের জমিদারি কিনা !' বীথি রুখে উঠলো, 'আর তুমি বলো দিকি আমাদের কলেজের কম্পাউণ্ডে ক'টা দেবদারু গাছ আছে ? আমার খোঁপায় ক'টা চুলের কাঁটা আছে ?' টুকু গলা ছেড়ে হেসে উঠলো, 'বলো দিকি এখান থেকে তুমি কি করে ওয়েলেসলি যাবে ?'

'আর তুমি বলো দিকি এখান থেকে তুমি কি করে জুতে যাবে, সুন্দরবনের জঙ্গলে যাবে ?'

'যতোই কেন না তর্ক করো,' টুকু টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, 'ছেলেদের সঙ্গে কোনো ফিল্ডেই তোমরা পারবে না। মিছিমিছি কতোগুলি বইয়ের পোকা হয়ে কি লাভ ?'

'উদারতায় হার স্বীকার করছো নাকি, টুকু-দা ?' বীথি ভুরুতে একটা গর্বের টান দিলে, 'একমাত্র পরীক্ষা-পাশের ব্যাপারে এসে পড়েছি বলেই তোমাদের ক্যাম্পে এমন সোরগোল পড়ে গেছে। দাঁড়াও না, সবুর করো না আরো ক'টা বছর, দেখ না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। আরো একটু ফাঁকায় এসে আমাদের দাঁড়াতে দাও না—আইন করে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে তো বঞ্চিত করেছ, হাতে আমাদের আসতে দাও না কিছু টাকা-কড়ি, দেখ না কি হয়, দেখ না আমরা কি হয়ে উঠি !'

টুকুর কিছু জবাব দেবার আগেই দোর-গোড়ায় ক্ষেত্রবাবুর আওয়াজ পাওয়া গেলো।

'এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?' গলার স্বরটা তাঁর বিরক্তিতে ঈষৎ ধারালো। সেই স্বরে তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ম বক্রতাটা আবিল একটা স্পর্শের মতো টের পাওয়া যাচ্ছে।

'এই আমার ডিক্সনারিটা খুঁজতে এসেছিলুম, বাবা।' টুকু শ্লথ পায়ে বরফের উপর দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

হায় তার দৈর্ঘ্য, তার দৈহিক বলদীপ্তি, হায় তার অসম্ভব মৌলিকতা!

হাসবে না কাঁদবে বীথি কিছু ভেবে পেলো না।

আই-এ পরীক্ষা দিয়ে যখন সে এবার বাড়ি এলো, দেখলো বাড়ি-ঘরের দিকে চোখ মেলে আর তাকানো যায় না। গোয়ালঘরটা শূন্য, গরু দুটোকে হাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যদি খদ্দের জোটে। উঠোনে জন্মেছে রাজ্যের আগাছা, মজুর লাগাবার পয়সা নেই। দৈনিক বাজার করে এসে বাবার জুতোর হাঁ-টা আর সেলাই করা হয় না। সেজদির মতো বৃত্তি পায়নি বলে সেকেণ্ড-ক্লাশে উঠে ছোট বোনটার পড়া বন্ধ। ছোট-ছোট ভাই-বোনগুলির বই জোটে তো জামা জোটে না, মা'র হাতের কব্জিতে একগাছ করে ঢিলে শাঁখা শুধু ঠকঠক করছে। আর পিসিমা সব দিকে সবাইর মনের মতো করে তার জন্যে এখনো পাত্র খুঁজে মরছেন।

বাবা দিন-দিন ধ'রে যাচ্ছেন তলিয়ে। এই সুদূর মফঃস্বলেও কার্বলিয়ালারা এসে ভিড় পাকিয়েছে।

বীথি বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলো।

'না, না, পড়া তুমি ছাড়তে পারো না, সব-কিছুর চেয়ে বড়ো তোমার এই কেরিয়ার! গ্রাজুয়েট তোমার হতেই হবে যে করে হোক—আর অনার্স নিয়ে। ছেলেটাকে দিয়ে যা করানো গেলো না, তোমাকে তাই করতে হবে, বীথি। তোমার দিকে চেয়ে সব আমি পেরিয়ে যেতে পারবো। তুমি আমার ছেলের চেয়েও বেশি।'

তার দাদা দু-দুবার বি-এতে ঘায়েল হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছে।

বীথি বলল, 'তা হলে এখন কি করবে ভেবেছ?'

'ঐ ছেলেটাকেই বিয়ে দেবো।'

'বিয়ে দেবে! তাতে এগোবে কি?'

'নগদ কিছু টাকা পাওয়া যাবে যে। বেশি নয়, হাজার খানেক—তা ঐ ছেলেকে এই যে দিতে চাচ্ছে, আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।'

বীথি বিমর্ষ হয়ে গেলো, 'দাদার বিয়েতে তুমি পণ নেবে নাকি, বাবা?'

'না, না, তোর ভাবনা নেই পাশ করা মেয়ে নয়।' বিনায়কবাবু তার কাঁধে দুটো সস্নেহে চাপড় দিয়ে তাকে যেন আশ্বস্ত করলেন, 'নিতান্তই গেরস্ত-ঘরের মেয়ে, কথামালাটাও শেষ করেছে কিনা সন্দেহ। ওটার জন্যে আবার পাশ-করা মেয়ে! ভগবান এই যে জুটিয়ে দিচ্ছেন, ওর কপাল ভালো।'

'কপাল ভালো তো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ঐ হাজার টাকায় তোমার কি হবে?'

'তবু ক'টা দিন আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারবো,' বিনায়কবাবু তাঁর মুখ-চোখ ঘোরালো করে তুললেন, 'ঘাড়ের উপর দু-দুটো বড়ো ধার বড্ড চেপে বসেছে, সে দুটোকে যা হোক করে নামিয়ে না দিলেই আর নয়। হাজার টাকাই বা আমাকে এখন কে দেয়?'

'কিন্তু দাদা রাজি হয়েছে?'

'রাজি না হয়েই বা উপায় কি? আজ হোক, কাল হোক, বিয়ে তো তাকে করতেই হবে,' বিনায়কবাবুর মুখে প্রশান্ত একটি বিজ্ঞতা ফুটে উঠলো, 'হাজার খানেক টাকা যখন এখন এসেই যাচ্ছে আচমকা, তখন বুদ্ধিমান হওয়াটাই তো তার উচিত। কোনদিন সে আর এতো টাকা একসঙ্গে দেখবে নাকি জীবনে?'

বীথি সোজা গলায় বললে, 'কিন্তু দাদার এখনো একটা চাকরির দেখা নেই।'

'বউ ঘরে এলেই তখন চাকরির চাড় হবে। চাকরি না করলে তাকে সে খাওয়াবে কি? তার তখন বেড়ে যাবে না দায়িত্ব?'

বীথির সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো দাদার উপর। জলজ্যান্ত একটা পুরুষ হয়ে এই তার জীবিকার্জনের ব্যবস্থা! আর এই সব পুরুষই কিনা মেয়েদের চেয়ে অগ্রসর বলে জাঁক করে!

বীথি সটান দাদার ঘরে ঢুকে পড়লো। হরেন তখন টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া নিচ্ছে।

'দাদা, তুমি নাকি বিয়ে করছ?'

'কাজে-কাজেই,' ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাটা সে আলগোছে ছেড়ে দিলে।

'কাজে-কাজেই মানে?' বীথি ঝলমলিয়ে উঠলো, 'সংসারে বিয়েটাই তোমার কাজ নাকি?'

'আপাততো তাই,' হরেনের গলা তেমনি নির্লিপ্ত, 'চুপচাপ বসে আছি, কাজ-কর্ম নেই, বিয়েটাই অন্তত করা যাক।'

'এই কি তোমার একটা বিয়ে করার সময় নাকি?' পিছন থেকে বীথি তার চেয়ারের পিঠটা চেপে ধরলো, 'তুমি আমার চেয়ে মোটে চারবছরের বড়ো। তুমি তো একটা শিশু।'

হরেন ভ্রূক্ষেপ করলো না। বিগলিত গলায় বললে, 'এই তো সময়। বিয়ে করতে চাওয়াটা কি তবে তুই একটা বার্ধক্যের লক্ষণ বলে মনে করিস নাকি?'

'তা করি না, কিন্তু এমন যে সেটা একটা পদার্থ অকর্মণ্যতার লক্ষণ, তা এই প্রথম টের পেলুম।'

'তুই আমাকে অপদার্থ বলতে চাস?'

হরেন ঘাড় ফিরিয়ে ঘুরে বসলো, 'তোর এতো বড়ো মুখ? জানিস বিয়ে করে আমি হাজার টাকা পণ পাচ্ছি। তুই তা পাবি কোনদিন বিয়ে করে?'

'রক্ষে করো,' বীথি ঘৃণায় জ্বলতে লাগলো, 'পণ নিচ্ছ, সে-কথা বড়ো গলা করে বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?'

হরেন হাসির একটা উড়ন্ত ঝাপটা হানলে। বললে, তুই এখনো তেমনি সেই সেণ্টিমেণ্টালই আছিস, খুকি। পণ নেবো না কেন? পণ না নেবো তো ও-মেয়েকে বিয়ে করবার আমার কি মাথাব্যথা পড়েছে?'

'তবে বিয়েকে তুমি একটা ব্যবসা ঠাওরেছ?'

'শোন্ খুকি,' হরেনের মুখ গাম্ভীর্যে নিটোল হয়ে উঠলো, 'যারা বিয়ে করে, পণটা তাদের জন্যে তৈরি হয়নি, যাদের বিয়েটা হয়, তাদের জন্যে। বিয়েটা তো আমরা এখানে করছি না, আমার বাবা ও মেয়ের বাবা মিলে বিয়েটা এখানে ঘটাচ্ছেন। অফার এ্যাকসেপটেন্স আর কনসিডারেশন—তিনে মিলে অটুট একটি কনট্রাক্ট। যদিও আমরা বলে থাকি, আমাদের বিয়েটা কনট্রাক্ট নয়, স্যাক্রামেণ্ট।'

'তবু তো এ বিয়ে!' বীথি রাগে নিজেকে দুর্বল বোধ করতে লাগলো। 'হ্যাঁ, একেই আমরা সামাজিক ভাষায় বিয়ে বলে থাকি বটে। নইলে, চিনি না শুনি না, কোথাকার কার একটা মেয়েকে ধরে এনে হৃদয়-মন একসঙ্গে সমর্পণ করে দেবো টাকা ছাড়া এ দুর্দিনে তুই তা আশা করতে পারিস না খুকি। ইকনমিকসেই পাশ করতে পারিনি, কিন্তু ডিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাই-চ্যাপটারটা জলের মতো বুঝেছিলুম। তা ছাড়া—' বীথি দুই পায়ে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

'তা ছাড়া, যে বিয়ে করে, পণটা তারই প্রাপ্য নয়, যে বিয়ে দেয়, তার উইণ্ড-ফল।' হরেন সিগারেটে একটা হালকা টান দিলো, 'বাবাকে এ-পর্যন্ত কিছুই তো সাহায্য করতে পারলুম না, অন্তত কষ্ট করে বিয়েটা তাঁকে করে দিই। একেবারে ছেলে নামের অযোগ্য হয়ে থাকবো, সেটা কি ভালো দেখায়?'

'থাক, পিতৃভক্তির চূড়ান্ত দেখিয়েছ,' শত্রুতার একটা দূরত্ব রাখবার জন্যে বীথি সরে দাঁড়ালো, 'কিন্তু ঐ টাকাটা তুমি রোজগার করে বাবাকে দিতে পারতে না এনে?'

'আমি কেন, আমার বাবাও পারতেন না। তাই না আমি এমন একটা সদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারছি। আর,' হরেন মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো, 'হাতের কাছে এমন একটা সহজ রোজগার থাকতে কেন যে সেটাকে পকেটস্থ করা হবে না, তার কোনো যুক্তিই আমি দেখতে পাচ্ছি না। পণ না নিয়ে বিয়ে করলেই কি সে-মেয়ের দাম আমার কাছে চক্ষের নিমেষে হু-হু করে বেড়ে যেতো নাকি?'

'কিন্তু হাজার টাকা কতোক্ষণ? পেতে-পেতেই বাবার ধার শুধতে যাবে মিলিয়ে।' বীথি তার গায়ে যেন একতাল কাদা ছুঁড়ে মারলো, 'তুমি পুরুষ, পুরুষ হয়ে আর কোনো ভদ্র উপায়ে তুমি বাবার এ-ঋণটা শোধ করে দিতে পারতে না?'

'যে করে হোক, তবু তো পারলুম, আর বরাতজোরে পুরুষ হয়েছি বলেই পারলুম,' হরেনও তার গায়ে এমন কিছু পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করলো না, 'তুই তো তা-ও পারবি না, বোকা মেয়ে! উঠে-পড়ে পাশ করা ছাড়া বাবার জন্যে তুই বা কি করতে পারলি?'

বীথি গম্ভীর হয়ে গেলো। প্রতিজ্ঞায় কপাল উঠলো তার উজ্জ্বল হয়ে। দুর্দমনীয় দাঁড়াবার ভঙ্গিতে এলো একটা নিষ্ঠুর বলদীপ্তি। বললে, 'কিন্তু ঘটা করে বিয়ে যে করছ, বউকে খাওয়াবে কি জিগগেস করি ?'

চেয়ার থেকে হরেন যেন মেঝের উপর টুপ করে খসে পড়লো, 'বা রে, আমি খাওয়াতে যাবো কেন ? আমার কি দায় পড়েছে !'

'তোমার নয় তো কার দায় ? নিরীহ একটা মেয়ে ধরে এনে —'

'হলোই বা তাতে কি,' হরেন অবাক হয়ে বললে, 'সে কে যে তার আমি দায় নিতে যাবো ?'

বীথি তার বিস্ফারিত চোখ দুটো যেন বিদ্ধ করে দিতে চাইলো, 'সে তোমার বউ না ?'

নির্লজ্জের মতো হরেন উঠলো হেসে, 'সে আমার বউ কোথায় ? সে সমস্ত পরিবারের বধূ। সমস্ত পরিবারের সম্পত্তি। বউ ঘরে এলে চাকরটা তুলে দেবেন বলে মা তো এখন থেকেই জল্পনা শুরু করেছেন। আমি একা তার ভার নিতে যাবো কেন ?'

'তাই বলে তোমার বউকে তুমি খাওয়াবে না ?'

'আমি খাওয়াবার কে ?' সিগারেটের টুকরোটা হরেন দু' আঙুলের চাপে ছাইদানের উপর পিষে ফেললে, সে নিজে খেটে খাবে। যতোক্ষণ সে আমার একার নয়, পাঁচজনের, ততোক্ষণ তার উপর আমার একবিন্দু দায়িত্ব নেই।'

'একা নয় মানে ?' বীথি ঝলসে উঠলো, 'বাবা আর একা সব দিক সামলাতে পারবেন নাকি ভেবেছ ? ওকালতি তাঁর নেই বললেই চলে—এই সময় সমস্ত ভার তো তোমাকেই নিতে হবে একলা ! ঘৃণায় সমস্ত মুখ তার শীর্ণ, ধারালো হয়ে এলো, 'পুরুষ বলে তো খুব বুক ফোলাও কিন্তু একা সামান্য একটা স্ত্রীর ভার নিতে পারবে না, তোমার আত্মহত্যা করা উচিত, দাদা।'

'বিয়েই তো করছি।' হাসতে হাসতে হরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু উঃ, একা যদি সেই বিয়েটা করতে পারতুম, বীথি। যদি সত্যি একা হয়ে যেতে পারতুম চারদিকে। তা হলে আর ভাবতুম নাকি কোনো কিছু ?'

দাদা যে সত্যি কি বলছে, বীথি তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো। বিয়ের গন্ধে একেবারে দিগ্বিদিক হারিয়ে ফেললো নাকি ? উঃ, ছেলেগুলি কি তাড়াতাড়িই যে বকে যেতে পারে।

দু' পা ঘুরে হরেন আবার তার চেয়ারে এসে বললো। বললে, 'যদি সত্যি কোনোদিন নিজেকে একা বলে অনুভব করতে পারি, বীথি, সেদিন আমার জীবনে আমি নতুন করে জন্ম পাবো। সেদিন সামান্য একটা স্ত্রীর ভার নিতে আমি ভয় পাবো না।'

বীথি আবার একটা ঝিলিক মারলো, 'সেই সামান্যার প্রতি যে তোমার বড়ো দয়া !'

'নিশ্চয়, সে তো সামান্যই আমাদের সকলকার কাছে, কিন্তু সে যদি আমার একা হতো দেখতিস, দেখতিস সে কখন নিদারুণ অসামান্য হয়ে উঠেছে।'

দাদার আইডিয়েলিজমে বীথি এতোক্ষণে একটু নরম হয়ে এলো। বললে, 'তাই

তো আমরা চাই। গলায় গামছা বেঁধে বিয়ে যখন নিতান্ত করবেই, তোমার বউ এসে সংসারের শ্রী ফিরিয়ে দিক। জাগিয়ে দিক তোমার দায়িত্বজ্ঞান।'

'কর্তব্যবুদ্ধি, তোমার দায়িত্বজ্ঞান।' বীথি চেয়ারের দিকে প্রায় নাটকীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে লাগলো, 'একা—একা তুমি তো বটেই! বাবা আর একহাতে কতো কাল পারবেন সংসারের জোয়াল টানতে? এবার থেকে একা তোমাকেই তো সব ঘাড় পেতে নিতে হবে। বিয়ে যখন নিতান্ত করবেই, চাকরিও তবে সেই সঙ্গে একটা যোগাড় করে ফেল।'

হরেন অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। পরে সংক্ষেপে জিগগেস করলে, 'তুই এবার আই এ দিয়ে এসেছিস না?'

'হ্যাঁ, কে না জানে!'

'তারপর তুই আবার বি-এ পড়তে যাবি না?'

'নিশ্চয়। আর, পাশও করবো একবারে।'

'কর্, কর্, যতো খুশি তুই পাশ কর্, বীথি,' হরেন আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পডলো, 'যতো খুশি তুই পড়, পৃথিবীর সমস্ত বই তুই শেষ করে দে, তবু তুই কিছু বুঝবি না, ঘরের ঐ খুঁটিটার মতোই তুই মূর্খ হয়ে থাকবি চিরকাল। সাধে কি আর লোকে বলে মেয়েরা শত বিদুষী হলেও তাদের কিছু জ্ঞান-গম্যি হয় না? যা,' শূন্যে হাতের সে একটা ঝাপটা মারলে, 'পড় গে বসে-বসে—ভালো ভালো প্যাসেজ মুখস্থ কর্ গিয়ে, খুব কোট্ করতে পারবি—একজামিনে কাজে দেবে।'

পকেট থেকে দেশলাই বার করে হরেন একটা সিগারেট ধরালো।

বাবা যে দারিদ্র্যে কতো তলিয়ে গেছেন বীথি সেটা গায়ের উপর স্পর্শের মতো অনুভব করতে পারে। তিনি আজকাল তাকে আর একটাও পড়ার কথা জিগগেস করেন না, সে সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহল যেন তিনি হারিয়ে বসেছেন। আই-এ পাশ করে সে বি-এ পড়তে যাবে, সেটা যেন ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠায় জানুয়ারির পরে ফেব্রুয়ারি আসার মতো। তার পড়াটা যেন এখন যান্ত্রিকতায় বাঁধা, নেই আর তাতে সেই প্রতিভার মৌলিকতা। যেন সামান্য একটা অভ্যেস, যেমন তার এই বয়েস। সে যেন আর পড়ছে না, তাকে পড়ানো হচ্ছে, না পড়লে তাকে আর এখন মানায় না, অ র তার মানে হয় না কোনো। বাবার এই অনুৎসাহ বীথিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলো। শুধু পরীক্ষায় ভালো করে সে আর বাবার মনোমত হতে পারছে না—নিরর্থক কীর্তিটা আর তার কৃতিত্ব নয়। নিজের উপর বীথির ধিক্কার জন্মে গেলো।

সত্যি, সে কেন ছেলে হয়ে জন্মালো না? তা হলে সে কতো কাজ করতে পারতো, জীবনকে কতো বিপন্ন করতে পারতো অনায়াসে। দেখাতে পারতো কতো সাহস, সবাইকে দিতে পারতো কতো বড়ো নির্ভর। বীরের মতো বাবার সঙ্গে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াতো পাশাপাশি, দুদিনে সংসারের ভোল দিতো ফিরিয়ে। এই কেমন অসহায় আলস্যের মধ্যে বসে আছে, পরিতৃপ্ত শূন্যতায়! তার হাত

আছে তবু হাত নেই; পা আছে তবু সে চলতে পারছে না। মেয়ে, সত্যি সে মেয়েই হয়ে রয়েছে আগাগোড়া।

ছেলেদের সঙ্গে তুলনায় অলক্ষ্যে সে তাকে নামিয়ে আনছে বলে বীথি প্রতি রক্তকণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। ঐ তো বাবার ছেলে মূর্তিমান শোভা পাচ্ছে। সংসারের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সামান্য কড়ে আঙুলটি যে তুলতে পারছে না, সমস্ত চিন্তা যে হাওয়ার সঙ্গে ধোঁয়ায় দিচ্ছে উড়িয়ে। বর্ষারাতে দীপালি-উৎসবের মতো যে ক্ষণকালিক একটা বিলাসিতার আয়োজন করেছে—চারদিকের এই শ্মশানের মাঝে শূন্যে ওড়াচ্ছে যে এখন স্বপ্নের ফানুস। মেয়ে হয়ে বীথি কি তারো চেয়ে ছোট?

প্রতিজ্ঞায় সমস্ত ভঙ্গি তার ক্ষুরের প্রান্তের মতো প্রখর হয়ে এলো। কিন্তু কি সে করতে পারে, এখুনি করতে পারে? বাবার মুখে ফিরিয়ে আনতে পারে আবার সে সেই উদ্ধত দীপ্তি, মা'র মুখে সেই উদার স্নিগ্ধতা! সংসারের অনায়াস দিনাতিবাহনের স্রোতে আবার সেই ছোট-ছোট পুরোনো কলশব্দ।

হ্যাঁ, সত্যি আর চাওয়া যায় না সংসারের দিকে। আকাশটা এসেছে মুঠোর মতো ছোট হয়ে, ঘরের দেয়ালগুলো যেন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। বাবা এখন এসে বাসা নিয়েছেন তাঁর নাকের ডগায়, মা নিয়েছেন জিভে। বাবার নাকটা আছে সব সময়েই কুঁচকে, মা'র জিভটা হয়েছে যখন জন্তুর ল্যাজের মতো। ছোট ভাইটা চ্যাঁড়সের সেরে এক পয়সা ঠকে এসেছে বলে মা তার কাঁচা মাথাটা প্রায় চিবিয়ে খাচ্ছেন, তারো চেয়ে ছোট ভাইটা হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকে চিমনিটা ভেঙে ফেলেছিলো বলে বাবার সামান্য পিতৃত্বের কথাটা আর মনে ছিলো না। পিঁপড়ের মতো এ পরিবারে তার ভাইবোনগুলি ঝাঁক বেঁধে এসেছে, কিন্তু আশ্চর্য, পিঁপড়ের মতো তারা ক্ষীণজীবী নয়। খুঁটে-খুঁটে সারাদিন তারা খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে, যদি খাবার তাকে বলো, সেই দিক থেকে তাদের অধ্যবসায়টা স্কুলের রচনায় স্থান পাবার মতো। আবার সেই খাবার ভাগ করে দিতে মা'র অপক্ষপাতিত্বের নমুনা যদি একবার দেখ! দুজনের যখন ভাগে জুটছে না, তখন বাকি তিন জনকেও উপোস করে থাকতে হবে। তোমার যখন দুটো জামা আছে, আর ওর যখন একটা ছেঁড়া, তখন কি তোমার সাধ্য বাড়তি জামাটাকে তুমি কাঁচির অত্যাচার থেকে রক্ষা করো। মিছিমিছি মারামারি করে লাভ নেই, কেননা মাঝপথ থেকে মা আর বাবা যুধ্যমান দুই পক্ষকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন সেই শল্যপর্ব থেকে একেবারে মুষলপর্বে।

আশ্চর্য, এই সংসারেরই নিশ্চিন্ত আবহাওয়ায় বসে বীথি একদিন কবিতা মিলিয়েছিলো। বাবা সে-কথা আজকাল একবার ভুলেও জিগগেস করেন না। তাঁর সেই নীরবতাটা বীথি একটা তিরস্কারের মতো অনুভব করে। সত্যি, কবিতা লিখে কি হবে, কবিতা লিখে কি পয়সা পাওয়া যায়?

আর্ট—আর্টের সঙ্গেও টাকার কি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ—শিকড়ের সঙ্গে যেমন শাখার। পকেটে যদি তোমার টাকা না থাকে, বীথির কেবল এই কথাই বারে-বারে মনে হতে লাগলো, তবে আর্ট তুমি সৃষ্টি করতে পারো না; যদি তোমার

টাকা না থাকে পকেটে, তবে সে-আর্ট তুমি উপভোগও করতে পারো না। যার বিত্ত নেই, তার কবিত্বও নেই।

দাদার উপর পুরুষ হওয়ার জন্যে রাগ বা নিজের উপর মেয়ে হওয়ার জন্যে ধিক্কারের চেয়ে বীথির বাবা-মায়ের উপরই বেশি দুঃখ হতে লাগলো, একান্ত করে তাঁরা তাদের. এতোগুলি অকর্মণ্য অধম সন্তানের, বাবা-মা হয়েছিলেন বলে। দারিদ্র্য এসে বাবার সঙ্গে তার সেই অন্তরঙ্গতাটি পর্যন্ত শুষে নিয়েছে : এখন সে আর আগের মতো ক্ষুধাতুর, রিক্ত দুটি হাত নিয়ে বাবার কাছে এগোতে পারে না। তাই সে চুপি-চুপি এসে বসে এখন মা'র পাশটিতে। শোকাকুল স্তব্ধতায় মাকে সে এখন সান্ত্বনা দেয়, বাজারের ফর্দ নিয়ে আলোচনা করে, নিজের শাড়ি কেটে ছোট ভাই-বোনদের নানা মাপের জামা বানায়, রান্না করা থেকে শুরু করে ঘাটে গিয়ে বাসন মাজতে বসে। শ্বশুর-বাড়িতে ফিরে গিয়ে মেজদির যে ফের শাশুড়ির সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না তা নিয়ে মা'র সঙ্গে উদ্বেগ বিনিময় করে, বিয়ের পর অন্তত দাদার যদি কাণ্ডজ্ঞান হয় এই বলে মাকে সে আশ্বাস দেয়। এক এক সময় দুই হাতে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে বীথি কানে-কানে বলার মতো করে বলে, 'আরো দুটি বছর মা, তারপরে আর আমাদের ভাবতে হবে না।'

সর্বাণী মেয়ের মুখের থেকে চুলের গুচ্ছগুলি কানের পিঠের দিকে একটি একটি করে সরিয়ে দিতে-দিতে বলেন, 'উনিও তো সেই কথাই বলছেন, সেই কথা ভেবেই তো আছেন বুক বেঁধে।'

একদিন সর্বাণী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তুই যে কেবল পরীক্ষা খারাপ দিয়েছিস বলছিস, উনি তো দেখি বেজায় ঘাবড়ে গেছেন. কি, ব্যাপার কি, বৃত্তি পাবি না নাকি ?'

বীথি হেসে বললে, 'কণ্টেসৃষ্টে তা হয়তো একটা পাওয়া যাবে, কিন্তু—'

'তবে আবার কিন্তু কি ?' সর্বাণী উথলে উঠলেন, 'বৃত্তি পেলেই তো হলো।'

'কি হলো ?'

'আরো দুবছর পড়বার তো সুবিধে হলো।' সর্বাণী জলের মতো বললেন, 'আমি ভাবছিলুম, মেয়েদের বৃত্তি দেয়ার নিয়মটা এবার থেকে উঠে গেলো বুঝি !'

'কেন, উঠতে যাবে কেন ?'

'বললেই হলো', সর্বাণী চোখের কিনারে তেরছা একটা টান দিলেন, 'বললেই হলো, এতোগুলি টাকা দিয়ে মেয়েরা করে কি ! ভালো কাজে, বাপ-মায়ের কাজে যে তা লাগতে পারে ও তো সবাই না-ও বিশ্বাস করতে পারে—জানিস না বুঝি টোনার শালির কাণ্ড ?'

'সে আবার কোত্থেকে এলো ?'

'টোনা, শশী-সেরেস্তাদারের ছেলে, যে দিবারাত্রি কেবল ফোঁটা কেটে নামাবলী দিয়ে ঘুরে বেড়ায়—'

'তার আবার একটা শালি আছে নাকি, মা ?' বীথি হেসে ফেললো, 'কি করলো বেচারি ?'

'সে তোর কাছে বলা যায় না।' সর্বাণী কথাটা চাপা দিতে গেলেন, 'যাক, বৃত্তি যখন পাবিই ভাবছিস, তখন আবার পরীক্ষা খারাপ দিলি কি করে ? ক'টা

মেয়ে বৃত্তি পায় জিগগেস করি ?' ঐ তো অবনীডাক্তারের ছেলে নরেশও এবার পরীক্ষা দিয়েছে—সে বৃত্তি পাবে, তার গুষ্টিতে কেউ পেয়েছে ?'

বীথি হঠাৎ ঔদাস্যে ডুবে গেলো, 'মেয়ে হলে বোধকরি পেতো, মা। আমারও এই মেয়ে-বৃত্তিতে তাই মন উঠছে না একেবারে। ছেলেদের সঙ্গে সমান প্রশ্ন জবাব দেবো, অথচ বৃত্তি নেবার বেলায় আলাদা দল পাকিয়ে দাঁড়াবো মেয়ে হয়ে, সেটাকে এমন-কিছু ভালো পরীক্ষা দেয়া বলা চলে না ?'

সর্বাণীর মুখের ছোট্ট একটি হাঁ-র মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত মূর্খতা এসে বাসা বাঁধলো।

'মেয়েদের বৃত্তিটা মা, মাথা গুনে আলাদা করে তেরো জনকে দেয়া হয়,' বীথি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সর্বাণীকে ধাতস্থ করবার চেষ্টা করলো, 'গেজেটে তুমি যে-নম্বরেই গিয়ে দাঁড়াও না কেন, তুমি যদি ঐ ভাগ্যবতী প্রথম তেরোটি মেয়ের মধ্যে চলে আসতে পারো কোনোরকমে, তা হলেই তুমি বৃত্তি পেয়ে যাবে।' বীথি অনুতপ্তের মতো বললে, 'ওটাকে শুধু বৃত্তি পাওয়াই বলে মা, পরীক্ষায় ভালো করা বলে না।'

'বৃত্তি পাওয়া হলো, অথচ পরীক্ষায় খারাপ করলি, তবে কি তুই পরীক্ষায় ভালো করবার জন্যে বৃত্তিটা উঠিয়ে দিতে বলিস নাকি ?' সর্বাণী যেন একেবারে তেড়ে এলেন।

'তা বলি না, কিন্তু পুরুষদের হাত থেকে সেই সম্মান তো জোর করে কেড়ে নিতে পেলুম না।' বীথি যেন সর্বাঙ্গে একটা কলুষিত অপমান বোধ করতে লাগলো, 'শুধু মেয়ে হয়েছি বলে করুণা করে বৃত্তিটা আমাকে যেন ভিক্ষে দেয়া হলো। সেই জন্যে, বৃত্তি পাবো জেনেও, আমি পুরোপুরি খুশি হতে পাচ্ছি না। উঃ, তোমাকে বলবো কি মা, একান্ত করে এই মেয়ে হওয়ার জন্যে সব সময়ে আমাদের এই মেকি মূল্য দেয়া—কোনো সভায় হলে : এই, সরে দাঁড়াও, মেয়েরা আসছেন ; বাস্-এ-ট্রামে হলে : এই, উঠে দাঁড়াও, ওটা মেয়েদের জায়গা ; পরীক্ষায় হলে : এই, সোজা করে দেখ, এটা মেয়েদের কাগজ—উঃ, আমরা কবে যোগ্য হবো, আরো যোগ্য হবো, মিনতি করে নয়, পরিষ্কার দাবি করে নেবো আমাদের নিজেদের জায়গা। ভিড়ে যাবো, অথচ গায়ে কারো ছোঁয়া লাগলে গায়ে তক্ষুনি চাকা-চাকা ফোস্কা পড়বে, আমাদের এই নোংরা মেয়েলিপনা কবে ঘুচবে ? মেয়ে ছেড়ে সত্যি করে আমরা মানুষ হবো কবে ?'

বীথি এক নিশ্বাসে এতো কথা অনর্গল বলে যাচ্ছিলো যে মায়ের মুখের দিকে একবারও সে চেয়ে দেখেনি ! সে-মুখ কখন পুড়ে ছাই হয়ে অন্ধকারে উড়ে গেছে।

বীথি হঠাৎ তাঁর হাতে একটা ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এ কি, তোমার কি হলো, মা ?'

সর্বাণী নয়, যেন একটা কাটামুণ্ডু কথা কইলো, 'তুই এ কি বলছিস, খুকি ? তুই ভিড় ঠেলে সভায় যাস নাকি, বাস্-এ চড়িস নাকি একা-একা, কি ভীষণ কথা, আমি গিয়ে এক্ষুনি ওঁকে বলে দিচ্ছি—পড়ে-শুনে তবে তুই কি ছাই মানুষ হতে গেলি ? এর চেয়ে ঘরের মেয়ে, তোর মেয়ে হয়ে থাকাই যে ভালো ছিলো। এই

তো টোনার শালি,' সর্বাণী কথার মাঝখানে আবার একটা বিস্ময়ের ধাক্কায় কাটা পড়লেন, 'কি কাণ্ডটাই না করছে !'

বীথি লজ্জায় একেবারে চুপসে গেলো, তবু ঠোঁটের পরিক্ষীণ হাসিটি সে অস্ত যেতে দিলো না, কাগজের মতো শাদা, পরিচ্ছন্ন গলায় বললে, 'আমার জন্যে তোমার কিছু ভয় নেই, মা। কাণ্ড দূরের কথা, সামান্য একটা বীজ আমি করতে পারবো না। এ পর্যন্ত বাড়ির বাইরে আমি পা দিইনি, আমার পা দুটো মা, খাটের পায়ার মতো। ভিড় কাকে বলে স্বপ্নে পর্যন্ত আমার কোনো ধারণা নেই, জেনানা হ্যায় বলে বাস্ থামিয়ে তাতে চড়তে হবে ভাবলে আমার রীতিমতো লজ্জা করে। আমার জন্যে মিছিমিছি কেন ভাবছ ?'

'তবে', সর্বাণী আবার ধনুকের মতো বেঁকে উঠলেন, 'তবে পুরুষদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যাবার কথা কি বলছিলি ? গায়ের জোরে পারবি নাকি ওদের সঙ্গে ?'

'তা কেউ-কেউ পারেও, মা। জামাইবাবু যখন মেজদিকে ঠ্যাঙায়, মেজদিও তখন ছেড়ে কথা কয় নাকি ?' বীথির হাসতে পর্যন্ত এখন ইচ্ছে করছে না, 'আমি গায়ের জোরে না পারলুম, মা, কিন্তু মাথার জোরে পারবো না কেন ? তাই বি-এটা আমি আরো ভালো করে পড়তে চাই—যেখানে মেয়েদের বলে আলাদা কোনো বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা নেই, যেখানে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা। সেখানে আমি একবার দেখবো তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারি কি না, তাদের যারা শ্রেষ্ঠ, তাদের যারা শিরোমণি।'

'হ্যাঁ, পড়বি বই কি,' এতোক্ষণে সর্বাণী যেন আশ্বস্ত হলেন। এলেন এতোক্ষণে মেয়ের কাছে ঘনিয়ে, 'হ্যাঁ, বি-এ পাশ না করলে চলবে কেন ?'

'ঐ তোমার গুণধর ছেলে মা, আমার পূজনীয় দাদা,' বীথি দীপ্ত মুখে বললে, 'একটা বিয়ে করা ছাড়া জীবনে আর কিছু যে করতে পারলো না, সামাজিক উপযোগিতায় অন্তত তাকে যাবো ছাড়িয়ে। অন্তত তার চেয়ে আমি দামী হবো।' কথাটা মা সাংসারিক অপভাষায় বুঝতে চাচ্ছেন মনে করে বীথি রূঢ় কণ্ঠে বললে, 'টাকা, টাকা, টাকা রোজগার করে এনে দেবো মা, পুরুষপ্রবর আমার মূর্তিমান দাদা যা পারলেন না, দরকার হলে তাঁকেও সস্ত্রীক খেতে দেবো মা, পেট ভরে—আমি একবার দেখবো, মেয়ে হয়েছি বলে একেবারেই মেয়ে হয়ে যাইনি।'

'তাই বল্,' সর্বাণী ডগমগ করে উঠলেন, 'আগে তোর কথা শুনে এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। নিশ্চয়, তুইই তো আমাদের ভরসা, বীথি—নইলে ঐ টোনার শালি, ছি ছি-ছি—তোরই মুখের দিকে আমরা চেয়ে আছি। সৎ পথে থেকে টাকা রোজগার করার মতো বড়ো কাজ আর কি আছে ?'

পুরুষ হলে শুধু টাকা রোজগার করলেই হয়তো চলতো, কিন্তু মেয়ে যখন হয়েছে, তখন হায়, সৎ পথটাও তাকে দেখতে হবে !

অপরিচিত সেই টোনার শালির জন্যে বীথির হঠাৎ মন কেমন করে উঠলো। বললে, 'কিন্তু টোনা না কার শালির কথা বলছিলে, মা, সে কি করেছে ?'

'আর বলিস নে ওর কথা,' সর্বাণী সর্বাঙ্গে ছি-ছি করে উঠলেন, 'কাল যাস

আমার সঙ্গে ও-বাড়ি, দেখে আসবি নিজের চোখে। যেমন পাপ করেছিলো, তেমনি এখন তার শাস্তি ভোগ করছে। মেয়েটার হাল যা হয়েছে, যদি দেখিস খুকি, মায়া হবে।'

কিন্তু সর্বাণীর বিশেষ মায়া হচ্ছে বলে বোঝা গেলো না। বরং 'মায়া হবে'-কথাটার মধ্যে একটা 'বেশ হয়েছে'-র ভাব যেন চকিতে উঁকি মেরে গেলো।

কি ভীষণ কাণ্ড না জানি সে একটা করেছে, সেই ভয়ে বীথি কিছু আর জানতে চাইলো না।

'তোর কাছে সেই কথাটা আজ বলবো বলেই এসেছিলুম, তোকে হুঁসিয়ার করে দিতে,' সর্বাণীর গলাটা ধুপ করে নেমে এলো, 'বিয়ে হচ্ছে না বলে মেয়েটাকে বাপ-মা শেষকালে পড়তে দিয়েছিলো ইস্কুলে, টেনেটুনে ক'বছর পড়েওছিলো বুঝি, কিন্তু ও-সব মেয়ের পড়ায় মন বসবে কেন, লেখাপড়া গেলো গোল্লায়, ধুরন্ধর মেয়ে কোন এক ছোকরার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করলেন কি যে আজকাল সব নতুন-নতুন কথা বার হয়েছে বাপু,' সর্বাণী ছোট একটি টিপ্পনি কাটলেন, 'আমাদের সময় বাংলা ভাষায় অমন একটা শব্দ আছে বলে সাতজন্মে জানতুম না। তা কর্ তো কর্, ছেলেটাকে একেবারে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে গেলো। মুখ ফুটে মেয়ে যে কখনো বিয়ে করতে চায়, এই বাবা প্রথম শুনলুম।' রুদ্ধ একটা নিশ্বাস ছেড়ে বীথি বললে, 'বা, ভালোই তো করলো, বিয়ে হচ্ছিলো না, নিজের বিয়ের একটা ব্যবস্থা করলো। বাপ মা'র সমস্যাটা এক কথায় মিটিয়ে দিলে।'

'ভালোই করলো?' সর্বাণী সমস্ত গায়ে চিড়বিড় করে উঠলেন, 'কোথাকার কে একটা অচেনা ছেলে, তার সঙ্গে গোত্রে মেলে না, গণ মেলে না, বিয়ে করবার জন্যে অমনি হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো, ভালোই করলো বলতে চাস?'

বীথি এবার নিশ্বাসটা ততো সহজে ছাড়তে পারলো না। বললে, 'তারপর কি হলো?'

'কি আবার হবে?' মাথার উপরে জলজ্যান্ত মা-বাবা তো বেঁচে আছে? ছেলেটাকে প্রায় ঘাড় ধরে শহর থেকে বার করে দিলো।'

'আর ছেলেটা অমনি হেঁট হয়ে সুড়-সুড় করে চলে গেলো, মা?'

'তাই তো হয়েছে মজা', সর্বাণী গলাটাকে রসালো করে তুললেন, 'যেই চলে গেছে, মেয়ে অমনি লম্বা বিছানা নিয়েছে। খায় না, দায় না, পড়ে-পড়ে কেবল কাঁদে।'

'কাঁদে?' বীথির মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে দুঃসহ একটা শিখা উঠে গেলো, 'যে-পুরুষ তাকে নির্লজ্জের মতো অমন ত্যাগ করে গেলো, তার জন্যে সে তারপর কাঁদতে বসেছে, মা? আর তোমরা সে-কথা জানতে পাচ্ছ?'

'জানবো না? পাপ কখনো চাপা থাকে নাকি?' সর্বাণী থরথরে গলায় বললেন, 'কাঁদবেই তো, সারা জীবন কাঁদবে—পাপ করলে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে না?'

'পাপ?' পা পিছলে বীথি যেন অথই জলে পড়ে গেলো, 'তুমি না বলছিলে সে প্রেম করেছে?'

'ও তো পাপই, এ-বয়সে ও তো পাপই একশোবার।'

'এ-বয়েসে বিয়েটা তো ওর অনায়াসে হতে পারতো, মা।'

সর্বাণী কথাটা নিজের মতো করে বুঝলেন ; বললেন, 'কি করে হতে পারতো ? প্রেম করলেই তো আর হলো না—এক গোত্রে বিয়ে হতে পারে নাকি কখনো ? আর ওর বিয়ে কোনো দিন হবে ভেবেছিস নাকি ? কেলেঙ্কারির একশেষ হয়ে গেলো না ?'

'বিয়ে যখন আর হবেই না বলছ, তখন,' বীথি আবার ভয়ে-ভয়ে বললে, 'সেই ছেলের সঙ্গেই দিয়ে দেয়া হোক না।'

'এখান থেকে সরে গেলে যদি হয়, কিন্তু যাক গে সে-কথা,' সর্বাণী আবার মেয়ের কাছে ঘন হয়ে গুটিয়ে বসলেন ; গলা নামিয়ে বললেন, 'বিয়ের আগে সুনাম ও বিয়ের পরে সতীত্ব এই দুটো নিয়েই মেয়ে—এ-কথা কোনোদিন ভুলিস নে, বীথি। দেখলি তো, ও-মেয়েটাও পড়তে গিয়েছিলো, ওকে দিয়েই হয়তো বাপ মা কতো আশা করেছিলেন।'

বিয়েই আশা করেছিলো, মা, কিন্তু,' বীথি খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'আমার জন্যে তোমার কিছু ভাবনা নেই, মা, তোমার টোনার সেই শালি আমার মতো বৃত্তি পায়নি।'

সর্বাণী তার দিকে চেয়ে অদ্ভুত করে শব্দহীন হেসে উঠলেন।

'আমার বিয়ের আগেও নেই, পরেও নেই—আমার আবার কি ভয়।'

'তবু, দিন-দিন তুই বড়ো হচ্ছিস, মনে রাখিস—'

'কি করা যাবে মা, মনে না রাখলেও দিন-দিনই আমাকে বড়ো হতে হবে। বড়ো যে হবো সেই তো আমার জোর।'

'তা তো হবি, কিন্তু তোকেও ইস্কুলে-কলেজে পড়তে দিয়েছি, দেখিস, কেউ যেন টুঁ শব্দটি না করতে পারে।'

'সবাই আর তোমার টোনার শালি নয় যে একেবারে পাড়া মাথায় করে ভ্যাবাতে শুরু করবে,' বীথি উদ্ধত দুই কাঁধের উপর চুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসলো, 'পৃথিবীতে অনেক বীজাণু আছে মা, ইংরাজীতে তাকে মাইক্রোব বলে—কিন্তু সব মাইক্রোবই ক্ষতিকর নয়, সব মাইক্রোবেই রোগ হয় না কতো-গুলিতে আবার জমির সার হয়, কতোগুলিতে আবার শস্য সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। মেয়েদের মধ্যে কেউ শুধু পাশ করে, কেউ আবার বৃত্তি পায়। অতএব আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মেয়ের গভীর বিদ্যাবত্তায় সর্বাণী আপাদমস্তক অভিভূত হয়ে বসে রইলেন।

হরেন বিয়ে করে বউ ঘরে আনলো। বীথির রেজাল্টটা তখনো বেরোয়নি বলে তাকেই নিতে হলো বরণ করে।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার উপর এমন সে একটা মুখ করে রইলো যেন চোখের উপর সদ্য-সদ্য সে একটা ফাঁসি দেখছে। আর হরেনের মুখ গোল, শুকনো একটা ভাতের গরসের মতো বিস্বাদ।

মিরকুটে একটুখানি একটা খুকি। এক গলা ঘোমটা। নিশ্বাস নিতে ফুসফুসটা যে সামান্য দুলে ওঠে সেই সম্বন্ধে পর্যন্ত তার ভয়। শরীরটা থেকে

কোথাও সে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যেতে পারলে যেন রক্ষা পায়। সামান্য দুটো হাত-পা, মুখ আর মাথা নিয়ে সে ভীষণ বিপন্ন হয়ে পড়েছে—এতো ভার, এতো আবর্জনা সে যে কোথায় লুকোবে জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। সে যে মেয়ে এই লজ্জায় তার প্রায় মারা পড়বার যোগাড়।

মা একেবারে আহ্লাদে ভিজে উঠেছেন, 'কেমন ছয়ছোট্ট চমৎকার বউ হয়েছে আমার। যেমন লাজলজ্জা, তেমনি কেমন নরম-তরম স্বভাবখানি। আজকালকার মেয়েগুলোর হায়া আছে, না চেহারা আছে! কেবল ডঙ্কা মেরে চলা। যতো বয়েস বাড়ে ততো কেবল আঁচল ফুলিয়ে পালের নৌকোর মতো পাড়ি মারা! আমাদের সময়কার সেই দু-বেড় দিয়ে পুরু করে শাড়ি পরার কায়দাটা পর্যন্ত তারা মানতে চায় না। যেমন চোয়াড়ে হাত-পা, তেমনি মেরুদণ্ডটা হয়েছে ধনুকের ছিলার মতো। উচ্চুঙ্গের মতো কেবল লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। এই তো ভালো, কেমন সব সময় ঢাকাঢুকি দিয়ে গোলগাল হয়ে চলাফেরা করা।'

নেপথ্য থেকে মা'র কথাগুলি আবছা করে শুনে বীথি বিশীর্ণ হয়ে গেলো। কবে সে আবার এখান থেকে কলকাতায় যেতে পারবে, অক্ষরের সেই বিশাল অরণ্য-লোকে, যেখানে বইয়ের সংখ্যার অনুপাতে মানুষের বয়েস নিতান্ত বাড়ছে না বলে সম্মিলিত হাহাকার উঠছে; যার সম্পর্কে এমার্সন একদিন বলেছিলেন: আমার কাছে, খবরদার, তুমি কোনো বই নিয়ে এসো না, যদি না সেই সঙ্গে আমার জন্যে তুমি তিন হাজার বছরের আয়ু আনতে পারো। বীথিও তেমনি যেতে চায় সে বইয়ের সমাধিস্থতায়, যেখানে বয়েস বাড়ছে বলে কোনো ভয় নেই, বয়েস ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে ভয়।

সংসারে মেয়েদের মধ্যে বয়েস যাদের হয়—যেমন তার এই নতুন বৌদিদিটির, তারাই জেনো ভাগ্যবতী, আর বয়েস যাদের বাড়ে, তারাই হচ্ছে 'প্যারিয়া'।

বয়েস তোমার হচ্ছে না বাড়ছে তা নির্ণয় করবে বিয়ে-নামক সেই তাপযন্ত্র! কোনো রকমে তোমার বিয়ে যদি একটা হয়, তবে মনে করতে হবে তোমার বয়েসও হয়েছে: আর কোনো উপায়ে সেটা যদি তোমার না হয়, তবে মনে করতে হবে বয়েসটা তোমার বাড়ছে বলেই তা হলো না। উঃ, কবে, সে এখান থেকে যেতে পারবে! কিন্তু কোথায়, কোথায় যে সত্যি তার যাবার জায়গা আছে তার সে কোনো পথ দেখতে পেলো না।

বীথির রেজাল্টটা শেষ পর্যন্ত বেরুলো—যা ভেবেছিলো, মেয়েদের মধ্যে বৃত্তি সে একটা পাবে, কিন্তু নাম নেমে গেছে গেজেটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়। তাতে বাবা মা'র বিশেষ কিছু অবিশ্যি এসে যাচ্ছে না, বরং ঐ টাকার ভাগ থেকে আরো দু'চার চাকতি বেশি পাঠাতে পারলে তাঁরা খুশি হতেন, কিন্তু নিজের দুরবস্থায় বীথি জীবনে এই প্রথম মুষড়ে গেলো। বুকে একটা তুফান নিয়ে এলো সে এবার বি-এ পড়তে।

শুনতে যাতে জাঁকালো শোনায় বাবার কথায় ফিলজফিতে সে অনার্স নিলে।

কিন্তু দু'দণ্ড চুপ করে বসে পড়া করে তার সাধ্য কি। পিছন থেকে মামিমা অমনি তার আঁচল ধরে টানতে শুরু করেছেন।

'তুই কেমনতরো মেয়ে লো বীথি, ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, আর তোর চোখের সামনে রেলিঙে শুকোতে-দেয়া তোষকগুলি তুই ঘরে নিতে পারিসনি ?'

বীথি অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'পড়েছিলুম, মামিমা ।'

'পড়ছিলি বলে পাঁচজনের সংসারে সব সময়ে এমনি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা চলে নাকি ?' মামিমা অভিমান করে বলেন, 'পাঁচটা শিখবি বলেই তো পাঁচজনের ঘরে বাপ-মা তোকে থাকতে দিয়েছে ।'

বীথি নিঃশব্দে একটা আর্তনাদ করে ওঠে : সত্যি যদি একজনের হয়ে থাকতে পারতুম একলা ! তা হলে, আর যাই হোক, পড়াটা অন্তত তৈরি করতে আমার বাধতো না ।

আরেকদিনের কথা ধরো । এক বসায় কতোক্ষণ তোমার পড়া সম্ভব !

'তুই কেমনধারা মেয়ে লো বীথি,' মামিমা কোত্থেকে আবার তেড়ে আসেন, 'তোর সামনে ছেলে দুটো এমন খাওয়াখাওয়ি করছে, পা দিয়ে ফুটবল খেলে তুলোর খরগোসটা অমন ছিঁড়ে ফেললো, আর তুই কিছু দেখতে পাস না ?'

বইর উপর ঝুঁকে পড়ে বীথি বলে, 'পড়ছিলুম, মামিমা ।'

'এ তোর কোন কায়দায় পড়া ? চোখের ওপর শুম্ভনিশুম্ভ থাক-যাক যুদ্ধ চলেছে, আর তুই হেঁট হয়ে বসে দিব্যি পড়া চালাচ্ছিস ?'

'ও আমার অভ্যেস হয়ে গেছে । ওদের যুদ্ধ থামাতে গিয়ে যে এনার্জিটা আমার খরচ হতো, তা দিয়ে আরো দু'পৃষ্ঠা আমি পড়ে ফেলতে পারতুম ।'

'তার জন্যে এমন একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে, তুই সামনে থেকেও হাত দিবিনে ?' মামিমা বাঁকা করে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, 'এতো পর-পর ভাব কেন, পরের বাড়ি, পরের ঘর, পরের ছেলে-মেয়ে—ভবিষ্যতে তোর উপায় কি হবে ? এই বয়সেই এতো স্বার্থপর হতে শিখলি কি করে ?'

উঃ, কবে সে নিজের বলে একখানা ঘর পাবে ! ছোট, নরম, উষ্ণ একখানি ঘর । তার আত্মার ঘনতা দিয়ে তৈরি । যেখানে চারপাশের দেওয়ালগুলি তার স্তব্ধতা দিয়ে ভরা ।

তার পড়ার জন্যে খুঁজে বেড়ায় সে একটি নিভৃতি, ঐ জানলাটার ধারে, সিঁড়ির নীচে, আঁচলের তলায় বই লুকিয়ে নিয়ে কোনো-কোনো দিন বা বাথরুমে !

এতোতেও নিষ্কৃতি নেই, এই অপ্রতিরোধ নিষ্ক্রিয়তায় । তাকে এক্ষুনি গিয়ে পায়েস জ্বাল দিতে হবে ।

'যা তো বীথি, আমি খোকাটাকে ঘুম পাড়িয়ে যাচ্ছি, তুই ততোক্ষণ পায়সের কড়ায় গিয়ে হাতাটা নাড়্ তো বসে-বসে—দেখিস, ধরে যায় না যেন, বেশ তলা ঘেঁষে নাড়িস যেন হাতাটা ।'

'আমি এখন পড়ছি, মামিমা ।'

'কতোক্ষণ আর লাগবে, পড়া তো তোর আর শেষ হয়ে যাচ্ছে না,' মামিমা তার মর্মমূলে চিমটি কাটেন, 'ওদিকে তোর মা তো দেখি কতো ঠাট করে চিঠি লেখে, মেয়ে নাকি একজামিন-দেয়া হাতে উনুন থেকে ডেকচি নামিয়ে ফ্যান গালতে পারে, দু'হাতে বাসনের পাঁজা নিয়ে একাই যেতে পারে ঘাটলায় ।'

'মা তোমাদের এই কথাও লিখেছেন নাকি ?'

বীথি অগত্যা আর বই নিয়ে বসতে পারে না, পায়েস নাড়তে নিচে চলে যায়।

কিম্বা :

'তোর মামাবাবুর মোজার এই গর্ত দুটো রিফু করে দে তো।'

যখন ধরো বীথি বের্গস'র ক্রিয়েটিভ এভোলিউশান পড়ছে।

কিম্বা :

'আচার করবো, বীথি, চালুনিতে করে আমার সঙ্গে তেঁতুল গুলবি আয়।'

যখন ধরো সে পড়ছিলো হোয়াইটহেড্-এর রিলিজান ইন দি মেকিং।

বারে-বারে ছন্দ ভেঙে-ভেঙে তাকে উঠে পড়তে হয়। আবার যখন গিয়ে সে ফের বই নিয়ে বসে, তখন সেই সুর আর সহজে জোড়া লাগতে চায় না। অমনি আবার :

'বাবাঃ, সারা দিন কেবল বই মুখে করে বসে আছিস, আমার হাত জোড়া, এ বেলার কুটনোটা একটু কুটে দে না বসে-বসে।'

'আমি এই যে একটুখানি এখন পড়তে বসেছিলুম, মামিমা।'

'কতোক্ষণ আর লাগবে! ততোক্ষণে তোর বই থেকে অক্ষরগুলি আর উড়ে যাবে না।'

বলো, কি করে তবে সে আর পরীক্ষায় ভালো করতে পারে?

অথচ টুকু-দার কতো সুবিধা। সামান্য একটা বাজার পর্যন্ত টুকু-দার করতে হয় না। চা খেয়ে পেয়ালাটা সে যেখানে খুশি ফেলে রেখে গেলো কে যে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ধুয়ে তুলে রাখবে তার খেয়াল নেই। তার স্নানের শাড়িটা পর্যন্ত বীথিকে নিজ হাতে কেচে বারান্দার তারে মেলে দিয়ে আসতে হয়, টুকু-দার কাপড়টা যে কি করে ফের শুকনো মসমসে হয়ে দেখা দেয়, একবার তাকে তা জিগ্গেসও করতে হয় না। বৃষ্টিতে তোষক ভিজছে বলে তো তার ঘুম নেই।

টুকু-দা অবিশ্যি তা মানতে চায় না। বলে, 'আমাদের কতো কাজ! আমাদের জীবনে মোহনবাগান নামে একটা প্রচণ্ড সমস্যা আছে, আড্ডায় গিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের রাজা-উজির মারতে হয়, তাস পিটতে হয় বাজি রেখে, খবরের কাগজ বলে বিংশ শতাব্দীর একটা ব্যাধিতে আমরা দিবারাত্র ভুগছি। তোমাদের কি? দুটো কুটনো কোটো, নয়তো একটু উল বোনো—পড়তে-পড়তে এই তো তোমাদের কাজ।'

'তোমাদের কাজটা পড়ার পরে, আর আমাদের কাজটা—ঐ যা বললে—পড়তে পড়তে। এই যা তফাত।' বীথি বিরক্ত মুখে বলে, 'বারে-বারে যদি উঠে পড়তে হয় তবে আর পড়বো কখন?'

'আমাদের ঠিক উলটো, কেবল যদি পড়তেই হয়, তো উঠবো কখন?'

কিন্তু এ সবের চেয়েও বীথির জীবনে ঘোরতরো আরেকটা সমস্যা ছিলো।

বিনায়কবাবু করুণ করে লিখে পাঠিয়েছেন : কোনোরকমে আরো ক'টা টাকা সে বেশী পাঠাতে পারে কিনা।

বীথি তার পৃথিবীব্যাপী বিশাল অসহায়তায় নিঝুম হয়ে গেলো।

না, না, সে পারে, এখুনি পারে—আনন্দে সে ছিঁড়ে পড়তে লাগলো, উঃ, তা

কতো সহজ—এতোক্ষণে, কেন সে এর আগে ভেবে দেখেনি—সত্যি, না, মেয়েদের বাস্-এ করে সে আর কলেজে যাবে না। নিটোল চার টাকা তার বেঁচে যাবে। হাত-খরচের আরো এক টাকা কমিয়ে মোট পাঁচ টাকা সে পাঠিয়ে দিতে পারবে বাবাকে। পাঁচ টাকা—পাঁচ টাকায় হয়তো বাবার একটা ছাতি, মা'র একজোড়া শাঁখা, ছোট ভাই-বোনগুলির এক বাটি করে দুধ, আর দাদার হয়তো এক প্যাকেট অন্তত সিগারেট হতে পারবে—পাঁচ টাকাই বা কম কিসে? এবার আর ক্ষেত্রবাবুর আপত্তি টিকলো না।

বিনায়কবাবু আমতা-অ:মতা করে লিখলেন: বাড়ির এতো সামনে কলেজ, চোখ বুজেই চলে যাওয়া যায় দু মিনিটে। সামান্য এটুকু রাস্তার জন্যে মেয়ের হাওয়া-গাড়ি চড়ার বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেবার আর তাঁর অবস্থা নেই—আজ-কালকার দিনে এক-একটা টাকা এক-এক বছরের আয়ুর সমান। তা ছাড়া, বীথি এখন বড়ো হয়েছে, ক্রমশই বড়ো হচ্ছে, অনায়াসে সে এখন পায়ে হেঁটে রাস্তাটা পার হয়ে যেতে পারবে।

ক্ষেত্রবাবু লাগামে তাই ঢিল দিলেন, কিন্তু তাঁর মুখের চেহারাটা সিদ্ধ, ছোলা একটা আলুর মতো গোল হয়ে রইলো।

ভয় নেই, সে-মুখে বীথি এক্ষুনি হাসির নুন ছিটিয়ে দেবে। পাশের বাড়ির জমিদারের ছেলের বউটি তার কাছে বিকেল বিকেল ইংরিজি পড়বার বায়না ধরেছে, তার জলখাবারের জন্যে পনেরোটি করে টাকা দিতে সে রাজি। সে যখন এখন থেকে কলেজেই যেতে পারবে পায়ে হেঁটে, তখন বউটির বাড়িতে যেতে দিতে মামাবাবু হয়তো নাকটা তাঁর ত্রিশূল করে তুলবেন না। পনেরোটি টাকা যদি সে পায়, তার থেকে দশটা টাকা সে মামিমার হাতে ধরে দেবে—হায়, তারই জলখাবারের জন্যে। আর বাকি পাঁচ টাকা জড়ো হবে এসে বাবার তহবিলে। তার স্বাধীনতার ভারে দাঁড়িপাল্লা সে দু'দিক থেকে সমান করে তুলবে।

এতোদিন ধরে তার বাস্-এ চড়ে কলেজ যাওয়াটা কিনা তারই একটা খেলো বিলাসিতা ছিলো, বাবা ও মামার এবং তাঁদের নেপথ্যে সমস্ত সমাজের বিলাসিতা ছিলো না। আজ দারিদ্র্য এসে সেই বিলাসিতার মুখোস খুলে দিয়েছে। আজ আর সেই বিলাসিতার খরচ পোষাচ্ছে না।

সত্যি, এতোদিনে তবে সে বড়ো হয়ে উঠলো! কি সাংঘাতিক কথা, এতোদিনে সে বড়ো হয়ে উঠতে পারলো সত্যি-সত্যি। তার সামান্য বড়ো হওয়ার যে এতো মূল্য ছিলো, এতো মহিমা, বীথি এর আগে এতো স্পষ্ট করে কোনোদিন যেন বুঝতে পারেনি।

সামান্য শারীরিকতার ঊর্ধ্বে কোনো মেয়ে আবার কোনো কালে বড়ো হতে পারে নাকি?

মা ওদিকে আবার একটি ল্যাজ জুড়ে দিয়েছেন, 'তুই এবার থেকে পায়ে হেঁটে কলেজ করবি, দেখিস, খুব হুঁশিয়ার থাকি, কেউ যেন কোনোদিন টুঁ-টি পর্যন্ত করতে না পায়।'

ঘাড়ের উপর একটা গাড়ি এসে পড়লেও গায়ে তার কাপড়-চোপড় যেন বেশ গোছালো থাকে, কেউ পিছন থেকে একটা ছুরি নিয়ে তাড়া করলেও যেন সে

নির্লজ্জের মতো না দৌড়োয়, জলজ্যান্ত দিনের আলোয় আকাশে একটা ধূমকেতু উঠলেও সে যেন সেদিকে চক্ষুস্ফুট না করে।

বীথিকে সে সব কথা কিছু বলে দিতে হবে না।

তারপর সতি-সত্যি সে একদিন রাস্তায় পা দিলো—স্বপ্নে-দেখা কলকাতার সেই রাস্তায়। মেয়ে দেখবার সময় মেয়েরা সব সাজে জানতো, বীথিও তেমনি রাস্তায় বেরুবার আগে সাজলো, সমান সজ্ঞানতায়। মেয়ে দেখবার সময় মেয়েদের সাজ, যাতে তারা উদ্ঘাটিত হতে পারে যতো তাদের শারীরিক সমৃদ্ধিতে; বীথির এখনকার সাজ, যতো সে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে তার এই ভারবহনের লজ্জায়। যাতে সে কণিকতমো কারুর চোখে না পড়তে পারে, চোখে পড়লেও একটা বস্তু হিসেবে, মেয়ে হিসেবে যেন নয়। শাড়িটা শুধু শাড়ি না হয়ে একটা মশারি হতে পারলে যেন সে রক্ষা পেতো। স্যান্ডেলের ফাঁকে পায়ের আঙুলগুলো যে চোখা-চোখা উঁকি মেরে থাকে, সে যেন একটা কুৎসিত কৌতূহলিতা। হাতে দস্তানা পরার নিয়মটা বাঙালী মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত হয়নি কেন? তবু ভাগ্যিস মাথায় একটা ঘোমটার মতো করে সে তার ঘাড়টা ঢাকতে পেরেছে।

তবু রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে সে তার দুই পায়ে।

রাস্তা তো নয়, গুলি-পাকানো প্রকাণ্ড একটা ফিতে- পায়ের সঙ্গে ক্রমাগতই যাচ্ছে জড়িয়ে। মনে হচ্ছে এই বুঝি সে হোঁচট খেয়ে পড়বে, এই বুঝি শাড়িটা এক ইঞ্চি কোথায় ফসকে গেলো। এই বুঝি কেউ চেয়ে রয়েছে তার দিকে, হায়, তার সুনাম বোধ করি আর রইলো না। কি মাপে যে ধাপ ফেলতে হবে সেইটেই তার কাছে একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। তাই প্রতি পদে 'ধরণী, দ্বিধা হও,' 'ধরণী দ্বিধা হও' বলতে বলতে সে অগ্রসর হয়। তার জন্যে পৃথিবীতে আর এক ফোঁটা বাতাস নেই, আপাদমস্তক সে অনড় একটা পাথর হয়ে উঠেছে। সে চলছে না, নিজেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। উঃ, কতোক্ষণে সে কলেজে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে? দু'মিনিটের রাস্তা, কিন্তু লাগছে তার এক যুগ।

তার মতো আরো দু'চারটি মেয়ে পায়ে হেঁটে কলেজ করছে। এখানে সেখানে আরো অনেককে ছিটকে পড়তে দেখা যাচ্ছে। বীথির এক-এক সময় জিগগেস করতে ইচ্ছে হয়: সবারই কি তারি মতন স্বাধীনতা? এ স্বাধীনতা কি তারা নিজের জোরে অর্জন করেছে, না, অবস্থার দুর্বলতায়? মোটরে চড়তে পারলে কি তারা আর বাস্-এ চড়তো। মাস মাস বাস্-এর ভাড়া দিতে পারলে তারা কি কখনো নেমে আসতো রাস্তায়?

টুকু একদিন বললে, 'দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

প্রস্তাবটাকে বীথি বিশেষ আমোল দিতে চাইলো না। হাসিমুখে বললে, 'তোমার কাছ থেকে সাহায্য নেবো, সেটা তো আমার অগৌরবের কথা, টুকুদা।'

'আমার সাহায্য নয়, বীথি, এবার থেকে সাহচর্য। গাইড নয়, সঙ্গী। দাঁড়াও,' টুকু ব্যস্ত হয়ে বললে, 'আমারও ও-দিকে একটু দরকার আছে।' আপত্তি করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু টুকু-দা সঙ্গে থাকলে রীতিমতো তাকে কথা বলতে হয়, দাঁত দেখিয়ে হেসে উঠতে হয় মাঝে মাঝে। সেই দিন এঁকে-বেঁকে-

একটা সাইকেল তার গায়ের উপর প্রায় এসে পড়ছিলো বলে টুকু-দা খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলেছিলো। কে যে কখন কি দেখে ফেলে কোথা থেকে টুঁ ছেড়ে হুঁ করে ওঠে, সেই ভয়েই বীথি মিইয়ে থাকে। টুকু-দা যে তার দাদা, বাইরে থেকে এ-কথা কারুর জানবার কথা নয়।

কোন মেয়ে কখন যে কি দোষ করে বসে তাই দেখবার জন্যে সমস্ত পৃথিবী ঘরে-বাইরে উৎসুক হয়ে আছে, এবং বলা বাহুল্য, তার মধ্যে মেয়েরাই হচ্ছে বেশি—মেয়েদের শত্রু হচ্ছে এই মেয়েরাই।

'আজ কার সঙ্গে আসছিলি রে রাস্তা দিয়ে?' তার ক্লাশের একটি মেয়ে ইশারায় একেবারে কিলবিল করে ওঠে 'হেসে-ঢঙে গড়িয়ে পড়ছিলি যে রাস্তার ওপর?' তারপর গলাটা তার আঠার মতো চটচটে হয়ে ওঠে, 'এতো তোদের কি হাসির কথা লো বীথি, আমায় বলবিনে?'

কথাটার উত্তর দিতে পর্যন্ত বীথি ঘৃণা বোধ করে।

আপ্রাণ কৌশল করে বীথি এড়িয়ে চলে টুকু-দার এই একসঙ্গে যাওয়ার মুহূর্তটিকে। সংসারে তার কেউ সঙ্গী নেই, সে একা। যে একা থাকতে পারে, জীবনে সে কোনোদিন খারাপ হতে পারে না।

মেয়েরা যাকে খারাপ হওয়া বলে, তাই মেয়েদের খারাপ হওয়া। সমস্ত মেয়ের মধ্যে তার মা রয়েছে বসে।

কিন্তু টুকু-দার চোখে ধুলো দেয় তার সাধ্য কি।

বড়ো-বড়ো পা ফেলে টুকু-দা কখন আবার তার পিছু নেয়। চেঁচিয়ে ওঠে গলা ছেড়ে, 'দাঁড়াও বীথি, তোমাদের কলেজটা এখুনি একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে যাচ্ছে না।' তারপর সামনে এসে দম নিয়ে বলে, 'তোমাকে দেখে ক্রমে-ক্রমে আশা হচ্ছে, বীথি, ব্যাঙের থেকে হরিণে প্রমোশান পেয়েছ। আগে-আগে যখন যেতে, যেন বুড়ির মতো গঙ্গাস্নানে যাচ্ছ, এখন এমন জোরে পা চালিয়েছ, যেন পেছন থেকে একটা বুনো মোষ তোমাকে তাড়া করেছে!'

বীথি তারপর টুকুর পায়ের সঙ্গে ধাপ মেলাতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু ঠোঁট দুটো জুড়ে রাখা ভালো কথা, সম্ভব হলে নাকের গর্ত দুটোও সে বন্ধ করে রাখতো।

বাইরে এসে সামান্য তার দাদার ছোট বোন হওয়াতেও বারণ।

একদিন টুকু-দা কলেজ থেকে বাড়ি ফেরবার সময় তাকে পিছন থেকে ধরে ফেললে। আকস্মিক তার নাম ধরে কে ডাকছে শুনে বীথি এমন চমকে উঠেছিলো, যেন বনের মাঝে কোথায় একটা বাঘ উঠেছে হুঙ্কার দিয়ে!

'ও! তুমি? টুকু-দা?' কিন্তু কথাটা সে উচ্চারণ করতে পারলো না।

'এতো শিগগির তোমাদের ছুটি হয়ে গেলো?' ভুরু তুলে টুকু অবাক হবার ভান করলে, 'মেয়ে-কলেজে পড়াশুনো কিছু তা হলে হয় না বলো?'

'মাঝে-মাঝে হয় বৈকি, ছুটিও হয়।' কথাটা এমন নয় সামান্য একটা ঘাড় হেলিয়ে শেষ করে দেয়া যায়, তাই বীথি বললে, 'আজকাল তো আর বাস-এর প্রত্যাশী নই যে কতোক্ষণে বাস বেরুবে তার আশায় হাঁ করে থাকবো। তাই আগেই নিজে বেরিয়ে পড়েছি।'

'তার তো নমুনা দেখছি না,' টুকু তার সঙ্গে দু পা এগিয়ে আসতে-আসতে বললে, 'ফিরে চলেছ তো দেখছি বাড়ির দিকে, তোমার ইঁদুরের গর্তে।'

বীথি দুই পায়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, 'তবে আবার কোথায় যাবো ?'

'না, কোথায় আবার যাবে! কাঁটা শত ঘুরিয়ে দিলেও যেমন তা ফের ঠিক উত্তরেই মুখ করে দাঁড়ায়, তেমনি যতোই কেননা তোমাদের পথ দেয়া হোক, তোমরা পা বাড়িয়ে আছো এই বাড়ির দিকে। বাড়িই তোমাদের ধর্ম, বাড়িই তোমাদের মোক্ষ। হোম, সুইট হোম।'

বীথি নিষ্ঠুর গলায় বললে, 'তবে তুমি কি বলতে চাও ?'

'বলতে চাই এতো সকাল-সকাল তোমাদের আজ ছুটি হয়ে গেলো, দুপুরের রোদে মিঠে একটি শীতের আমেজ এসেছে, চলো, কোথাও তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।' টুকুর দুই চোখে আকাশের সমস্ত আলো যেন ঝলমল করে উঠলো, 'বিশেষ কোথাও যেতে না চাও, সিনেমায় কি মিউজিয়মে চলো, ট্র্যাম-এ চড়ে কলকাতা কর্পোরেশান ছাড়িয়ে সটান বেহালায় চলে যাই, আশে-পাশে দুটো গ্রাম দেখে আসি। হায়, তুমি এখনো কলকাতাই দেখলে না, তোমার আবার গ্রাম দেখতে ইচ্ছে হবে!'

পৃথিবী যেন রসাতলে যাচ্ছে এমন একখানা নিশ্ছিদ্র মুখ করে বীথি বললে, 'তুমি কি বলছ যা-তা ?' তারপর সামনের দিকে গট-গট করে দু'পা সে এগিয়ে গেলো, 'গ্রাম আমি যথেষ্ট দেখেছি, সমস্ত জীবন কেবল এই গ্রামই দেখলুম।'

'কিন্তু শহর, শহর তো তুমি দেখনি!' টুকু আবার দুই চোখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো, 'বেশ, শহরই তুমি দেখবে চলো, বীথি। কলকাতা—এই আমাদের রাজ-ধানী। শহরের মাঝখানে এতো বড়ো একটা মাঠ, তার চৌরঙ্গি—হায়, মধ্যরাত্রের চৌরঙ্গি তো তুমি ইহজীবনেও দেখতে পাবে না।'

'তুমিও তো তেমনি দেখতে পাবে না—কতো-কিছু দেখতে পাবে না।' বীথি আরো জোরে পা চালালো।

'না, তুমি চলো', কণ্ঠস্বরে টুকু আবার তাকে আকর্ষণ করলে, 'বাড়িতে কেউ যদি কিছু জিগগেস করে, আর সত্যি বলতে যদি ভালোবাসো, তো বলবে, টুকুদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলুম।'

'কিন্তু তোমার আস্পর্ধাকে বলিহারি,' বীথি বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলো, 'তোমার সঙ্গে যাবার আমার কি হয়েছে!'

'বা, আমার সঙ্গে যাবে বলেই তো বলছি। আ-মা-র সঙ্গে যেতে তোমার কি দোষ!'

'আর সত্যি বলতেই যদি আমি ভালোবাসি—' নিজে না গিয়ে বাড়িটা হেঁটে কাছে এসে পড়লে যে বীথি বাঁচে, 'তবে আমি একদিন নিজেই বেড়িয়ে আসতে পারবো।'

কিন্তু টুকু-দার আস্পর্ধার সীমাটা সেইখানেই শেষ হয়ে যায়নি।

আরেকদিন, একসঙ্গে কলেজ যাবার সময়, টুকু হঠাৎ কাকে দেখে পেভমেণ্টের উপর দাঁড়িয়ে পড়লো।

'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি,' ঈশ্বর জানেন টুকু রাস্তার মাঝখানে কার

একটা হাত চেপে ধরলো, 'এ হচ্ছে আমার বন্ধু সমরেশ মজুমদার, খেলার মাঠে তো যাও না, গেলে নাম শুনতে—আর এ হচ্ছে আমার বোন বীথি সেন, গেজেটের পৃষ্ঠা যদি কোনোদিন ওলটাও—'

'ও! আপনি?' সমরেশ দুই হাত তুলে বীথিকে সস্মিত নমস্কার করলে। তার চেয়ে একটা কুকুরে কামড়ে দিলে বীথি খুশি হতো। এমন একটা চেহারা করে সে দাঁড়িয়ে রইলো যেন পানোন্মত্ত রাজসভায় তাকে বন্দিনী করে ধরে আনা হয়েছে। পাতাল-প্রবেশের আগে সীতা এর চেয়ে বেশি অপমানিত বোধ করেছিলো কিনা সন্দেহ।

সামান্য একটা নমস্কার করা দূরের কথা, বীথি চোখের পাতা দুটো পর্যন্ত মেলেনি। জলজ্যান্ত অহল্যা যে কি করে একদিন দেখতে-দেখতে পাথর হয়ে গিয়েছিলো, সেটা সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারে। চাণক্য শ্লোকে, এমন বিপদে পড়লে, কতো গজ দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু বীথি সোজা একটা লাফ দিয়ে যেখানে গিয়ে দাঁড়ালো সেটা তাদের কলেজ।

সমস্ত দিন রাগে সে কালো হয়ে রইলো। বাড়ি ফিরে গিয়ে কতোক্ষণে সে টুকুদাকে নখে-দাঁতে টুকরো-টুকরো করে দেবে তারই লাগলো মুহূর্ত গুনতে। "এ কি তোমার অভদ্র ব্যবহার?' ফাঁকা একটা জায়গা বাছবার পর্যন্ত সে চেষ্টা করলো না, কথাগুলি অর্জুনের বাণের মতো সে টুকুর উপর ছিটিয়ে দিতে লাগলো, 'চিনি না শুনি না, রাস্তার মাঝখানে কোত্থেকে একটা লোক ধরে এনে আমার সঙ্গে তুমি আলাপ করিয়ে দেবে?'

টুকু হাসিমুখে বললে, 'যাকে তুমি একেবারেই চেনো না, তার সঙ্গেই তো তোমার আলাপ করিয়ে দেবার কথা ওঠে। যদি তুমি চিনতে, তা হলে তো তুমি নিজেই আলাপ করতে পারতে অনায়াসে। আমাকে আর লাগতো কোথায়? বীথি রাগে একেবারে শিখায়িত হয়ে উঠলো, 'আমি যাবো আলাপ করতে, রাস্তার মাঝখানে?'

'গেলেই বা! পৃথিবীতে ঘরই বেশি নয় বীথি, রাস্তাই বেশি।' টুকু নির্লিপ্ততায় গলে গেলো, 'সমরের সঙ্গে আলাপ থাকাটা একটা ভাগ্য। ভালো একজন স্পোর্টস্‌ম্যান, এবং ভালো একজন স্পোর্টস্‌ম্যান বলে ভালো চাকরি করে, সেদিন কোন একটা পেট-মোটা মাড়োয়ারি কোন একটা কলেজের মেয়েকে ফুলের তোড়া প্রেজেন্ট দিতে চেয়েছিলো বলে সে তাকে তুলো ধুনে দিয়েছে—'

'কিন্তু', বীথির গলাটা টলতে-টলতে খাদে পড়ে গেলো, 'সে তো তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়ো।'

'বয়সে বড়ো, কি করে বুঝলে?'

'গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারি।'

'এমন বুঝলে যেন বাঘ একটা তোমাকে খেতে এসেছে!' টুকুর গলাটা ঈষৎ ধারালো হয়ে উঠলো, 'আমার চেয়ে বয়েসে বড়ো বলে বুঝি সে আর আমার বন্ধু হতে পারে না? মেয়েদের দেশে তেমন বুঝি কোনো নিয়ম নেই? যারা তাদের বয়েসে ছোট, তাদের সঙ্গেই বুঝি তারা নিশ্চিন্তে আলাপ করতে পারে? আর সময়ের সিঁড়িতে যে-ই দু'এক ধাপ এগিয়ে গেলো, অমনি তার সঙ্গে মহা-

ভারত শুদ্ধ রেখে আর কোনো সম্পর্ক রাখা চলে না, না ? তখন তার হয় দাদা, নয় কাকা, কিম্বা বড়ো জোর মামা হয়ে ওঠা চাই—কি বলো ?'

মামিমা কাছেই কোথায় ছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন, 'কি হলো, কার কথা বলছিস ?'

'আমাদের সমর, মা, সেই তোমার মর্চে-ধরা লোহার সিন্দুকের ডালাটা যে এক টানে সেদিন খুলে দিয়ে গেলো ।' টুকু বীথির দিকে একবারও চেয়ে দেখলো না, 'তার সঙ্গে রাস্তায় আজ আমাদের দেখা, বীথির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে গেলুম, তায় বীথি এমন এক চোঁচা ছুট দিলে যে পাছে একটা গাড়ি-চাপা পড়ে সেই ভয়ে আমাকেও প্রায় পিছু ছুটতে হলো । তুমি আবার ভদ্রতার কথা বলো, বীথি ?' বীথির মাথাটা এক কোপে না কেটে ফেলে সে কুচি-কুচি করতে লাগলো, 'যে তোমাকে নমস্কার করলো, তার তুমি নমস্কারটা পর্যন্ত ফিরিয়ে দিলে না ।'

মামিমা প্রশান্ত, উদার গলায় বললেন, 'আমাদের সমরের কথা বলছিস ? বা, সে তো আমাদের বাড়ি কতো আসে, খুব ভালো ছেলে, সেদিন আমার হাতে এক বৈঠকে সতেরোটা আম খেয়ে গেলো । বা, তার সঙ্গে আলাপ করতে কি দোষ !' মামিমার গলায় এতোটুকু খোঁচ নেই, 'সমরের কাছে আবার তোর লজ্জা কিসের ?'

রেখাহীন একটা আয়নার মতো বীথি তার মামিমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো । সে কি দাঁড়িয়ে আছে না বসে আছে, স্পষ্ট কিছু সে ধারণা করতে পারলো না ।

মামিমা আজকাল তার উপর ভারি সদাশয়, ভীষণ গদগদ—পাশের বাড়িতে টিউস্যানিটা সে কেন করছে মামিমা তা বোধহয় জানতে পেরেছেন ।

তারপর সেদিন কলেজ থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে সে উপরে উঠছে, মাঝপথে—পৃথিবীতে আর লোক ছিলো না—সমরেশের সঙ্গে দেখা । তরতরিয়ে সে নেমে আসছিলো, বীথিকে দেখে সমস্ত উপস্থিতিতে নিমেষে সে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়ালো । গলার আওয়াজ না পেয়েও বীথি ঠিক বুঝতে পারলো, তার রক্তের মাঝে বুঝতে পারলো, এ সমরেশ ছাড়া আর কেউ নয় ।

অবান্তর প্রশ্ন, তবু সমরেশ কথা না বলে পারলো না, 'এই বুঝি আসছেন কলেজ থেকে ?'

অবান্তর উত্তর, তবুও পাশের দেয়ালের সঙ্গে শাদা হয়ে মিশে যেতে-যেতে বীথি বললে, 'হ্যাঁ ।'

'বাবাঃ, এতো বই, সমস্ত লাইব্রেরিটা যে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিলেন কলেজে ?'

সমরেশ দিব্যি নির্ভয়ে হেসে উঠলো ।

এমন মুশকিল, সে-হাসির উত্তরে বীথিকেও চিবুকের উপর ছোট্ট টলটলে একটি টোল ফেলে হেসে উঠতে হলো ।

কিন্তু, সর্বনাশ, উপরে, সিঁড়ির মুখে মামাবাবুর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে । শত চক্ষু মেলে তিনি তার এই নির্লজ্জতা ধরে ফেলেছেন ।

সূচের মতো সূক্ষ্ম হয়ে বীথি আলগোছে পাশ কেটে উঠে গেলো । কিন্তু

সামনেই মামাবাবু, তাঁর উপস্থিতিটা কালো, ভয়ঙ্কর একটা ছায়ার মতো দুলছে, আজ আর তার নিস্তার নেই।

ক্ষেত্রবাবু চটি ফটফট করতে-করতে হঠাৎ থেমে পড়লেন ; স্নিগ্ধ, মোলায়েম গলায় বললেন, 'এ কি, তোর একটা ছাতা নেই নাকি, বীথি ? রোদে যে একেবারে কালো হয়ে এসেছিস। দাঁড়া, কালই তোর জন্যে একটা বেঁটে-হাতের ছাতা কিনে আনবো !'

বীথি এমন ভাবে চেয়ে রইলো যেন সে তার মামাবাবুর মুখে স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছে। তার পায়ের নিচে এটা সিঁড়ি না স্বর্গ, তার কিছু আর ধারণা নেই।

'আর শোনো সমর', মামাবাবু চটি ফটফট করতে-করতে নেমে গেলেন, 'তোমার গাড়িটা একদিনের জন্যে দিলে খুব ভালো হয়। বীথিকে একবার শহরটা বেড়িয়ে আনতুম। তিন বছর হয়ে গেলো ও এখনো ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়ালটা দেখেনি।

সমরেশ বললে, 'তা দেবো, কিন্তু ড্রাইভার নেই, কদিন হলো বাড়ি গেছে।'

'তাতে কি !' মামাবাবুর গলা বীথি নির্ভুল শুনতে পেলো, 'তাতে কি ! তুমিই তো ড্রাইভ করতে পারো।'

বীথি ঘরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। আশ্চর্য, ঘর-দোর, গাছ-পালা, রাস্তা-দোকান, আগের মতো সব ঠিকঠাক আছে !

মামাবাবু হঠাৎ আজকে তার উপর এতো উত্তাল কেন ?

কারণ, কারণটা বীথি হাতের রেখার মতো স্পষ্ট পড়তে পারলো, কারণ কালকে টিউসানির মাইনেটা পেয়ে দশ টাকার একখানা নোট সে মামিমার হাতে গুঁজে দিয়েছে।

বলা বাহুল্য, এবারও বীথি খুব ভালো ফল করতে পারলো না, পেলো মোটে একটা সেকেণ্ড ক্লাস।

যদি কারণটা সবাইকে সে আজ বলতে পারতো, তার নিজের বলে একখানা ঘর ছিলো না, ছিলো না নিজের বলে অনেক সময়, তারি জন্যে সে অমন নেমে গেছে, কেউই তা বিশ্বাস করতো না সজ্ঞানে। আর এ সব ব্যাখ্যা ধোপে কখনো টেঁক-সই নয়। যাই কেননা কারণ হোক, চিরকাল সে সেই সেকেণ্ড-ক্লাসই থেকে যাবে।

মামিমা বললেন, 'তার জন্যে তুই দেখছি একবারে বিছানা নিলি, বীথি। এমনিতে যারা পাশ করে, তাদের চেয়ে আরো কতোগুলি বই বেশি নিয়ে দিব্যি উৎরে গেলি শুনলুম, তবু কিনা তোর শোক ! যাই বলু, তুই একটু বেশ বাড়াবাড়ি করিস, বীথি।'

টুকু তাতে আবার একটু দার্শনিক ফোড়ন দিলে, 'যেমন কতোগুলি ছেলে তোমাকে ছাড়িয়ে গেছে, তেমনি কতোগুলি আছে আবার তলায় পড়ে। তাই চিরকাল হয়, বীথি। জীবনের কোনো পরীক্ষায়ই নিঃশেষে তুমি সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে পারো না। যেখানে তুমি এসে উঠেছ, সেই তোমার নিজের জায়গা। সবাই যদি এসে প্রথম হতো তা হলে জীবনে আর কোনো স্বাদ থাকতো না। কারু-

কারু চেয়ে কোনো-কোনো বিষয়ে নিচু হলে আমাদের কিছুই এসে যায় না, বরং মাঝে থেকে পৃথিবীটাই বিচিত্র হয়ে ওঠে।'

বীথিকে তবুও শক্ত করা গেলো না।

'বেশ তো, একজামিনে প্রথম হওয়াই যদি তোমার জীবনের প্রধান উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে, বেশ', টুকু দরাজ গলায় বললে, 'সময় এখনো একেবারে ফুরিয়ে যায়নি, বীথি। এখনো একটা এম-এ বলে জিনিস আছে, তারি জন্যে না-হয় কোমর বাঁধো।'

তাই, এখনো আরো একটা তার সুযোগ আছে, বীথি আরো দুবছর চেষ্টা করে দেখবে।

সাংসারিক বৃত্তির কি ব্যবস্থা হবে তারি জন্যে প্রথমটা সে বিশেষ জোর করতে পারেনি কিন্তু পরীক্ষা দেবার আগে ঠিক আকাশ থেকে বাবার একটা চিঠি এসে পড়েছিলো—নেত্রকোনায় হরেনের একটা চাকরি হয়েছে, পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে। অতএব, সংসারে মাস-মাস সে পনেরোটা করে টাকা দিতে না পারলেও কিছু বিশেষ অসুবিধে হবে না—বরং সেটা যেন ভাগ্যেরই একটা ইশারা, সে আরো একবার প্রাণপাত করে দেখবে, সত্যি সে তার মনের মতো অতিকায় কিছু-একটা করে ফেলতে পারে কিনা। আর একবার।

ঠাট্টায় ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে টুকু জিগগেস করলো, 'কিন্তু তারপর? এম-এ পাশ করে?'

তারপর—বীথি যেন তারপর খানিকটা শাদা শূন্য দেখলো। তারপর—তারপরের কথা মানুষ কিছু ভাবতে পারে না।

কথাগুলোকে নিয়ে টুকু যেন মুখের মধ্যে চিবোতে লাগলো, 'আবার কতোগুলি শুকনো বই নিয়ে বসবে বীথি, মানুষের চিন্তার মরা কতোগুলি কঙ্কাল! কিন্তু কি তুমি আর শিখবে, মানুষে কতো বলো আর শিখতে পারে? ধরো, এবারও যদি তুমি ফার্স্ট হতে না পারো?'

বীথি ক্লান্ত গলায় বললে, 'কিন্তু না পড়েই বা বসে বসে কি করতে পারি? সুযোগ যখন পেলুম, মন্দ কি, এম-এ-টাই না-হয় পাশ করে ফেলি।'

'আশ্চর্য', তোমার জীবনে কিনা সামান্য এম-এ পাশ করবারই সুযোগ এলো!'

'তা-ই বা ক'টা মেয়ে পায়?' বীথি করুণ করে বললে।

'কিন্তু কি তুমি পেলে? কনভোকেশানের গাউন পরে হাতে ডিপ্লোমা নিয়ে একটা ফোটো বাঁধিয়ে রাখা ছাড়া কি তুমি পাবে জীবনে?' তেতো, বিস্বাদ মুখে টুকু বলতে লাগলো, 'সমস্ত জীবন তুমি এমনি কেবল জানবে আর শিখবে, নির্বিচারে পরের মত কুড়িয়ে বেড়াবে—তোমার ঐ ফিলজফি তো শুধু কতোগুলি মতেরই মার-প্যাঁচ—নিজে তুমি কিছু জানাবে না, নিজে তুমি কিছু হয়ে উঠবে না? সংসারে এতো লোকের মত আছে, আর তোমারই একটা মত নেই? তুমি বারে-বারে কেবল পরের চিন্তার অধীনে নিজেকে নামিয়ে নিয়ে আসবে, নিজের মতো করে তুমি নিজে হয়ে উঠবে না, বীথি?'

'তুমি আবোল-তাবোল কি বকছ, টুকু-দা?'

টুকু হেসে ফেললো, 'যদি আমার মতটাও তোমার কাজে লাগে, সেই আশায় একটা বক্তৃতা করছি।'

'ভারি দুঃখিত', বীথিও অল্প একটু হাসলো, 'হাততালি দিতে পারলুম না। মানুষে তবে কেন পড়ে, কেন জানে,' বীথি আবার গম্ভীর হয়ে গেলো, 'কেন তবে মানুষ উন্নতির, সভ্যতার এই বিরাট অভিযান চালিয়েছে?'

'যেখান থেকে তারা প্রথম রওনা হয়েছিলো সেইখানে ফের ফিরে আসবে বলে, সেই তাদের সুন্দর, সুস্থ অসভ্যতায়। জানো বীথি', টুকু নির্লিপ্ততায় প্রায় অশরীরী হয়ে উঠলো, 'উন্নতিটা কখনো সরলরেখায় অগ্রসর হয় না, বৃত্তাকারে এগোতে থাকে—তা ফিরে আসে ফের ব্যর্থ একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করে—আর প্রত্যেক নতুনত্বকেই উন্নতি মনে কোরো না।' টুকু হাসলো, 'হাততালি যখন পাবো-ই না, তখন বক্তৃতাটা বন্ধ করি, কি বলো?'

গ্রীবায় একটি নরম ঢেউ তুলে বীথি বললে, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, একটা কথা এতোক্ষণ তোমার ভুল হচ্ছিলো, বীথি,' টুকু দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, 'আমি মানুষের কথা বলছিলুম না, বলছিলুম মেয়ে-মানুষের কথা।'

এই করেই টুকু আরো তাকে খেপিয়ে দিয়ে গেলো। এম-এতে সে ফার্স্ট না হয় তো কি বলেছি।

কিন্তু নিজের বলে সে যদি আলাদা একখানা ঘর পেতো, পেতো যদি নিজের বলে কতোগুলি টাকা, উঃ, সুনাম বলে থাকতো না যদি তার কোনো কুসংস্কার!

তার সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসটা বোধহয় ঈশ্বরের গায়ে লেগেছিলো—শেষ পর্যন্ত এম-এ পড়াটা তার হয়ে উঠলো না।

স্পেশাল-পেপারে লজিক নেবে না, এথিক্‌স্‌ নেবে তাই নিয়ে বীথি তখন সিলেবাস ঘাঁটছে, এমন সময় বিনায়কবাবুর একটা চিঠি এলো। খামের উপর হাতের লেখাটা দেখেই বীথি ভাবলে, সর্বনাশ!

না, তার পড়া আর হতে পারে না, ওদিকে ঘটেছে দুর্ঘটনা। দাদা চাকরি পেয়ে বউকে সটান নেত্রকোনায় নিয়ে গিয়েছে, সেখানে পেতেছে নতুন সংসার। বাবাকে একটি পাই-পয়সা দেবারও তার নাম নেই।

তারপর দু'পৃষ্ঠা ধরে তার মুণ্ডপাত। পাজি, ইতর, ছোটলোক কোথাকার!

অতএব, এ-অবস্থায় সামান্য টিউসনি করে কোনোরকমে নিজের পড়াশুনো চালিয়ে বীথির কলকাতায় থাকা আর কি করে হতে পারে? বিনায়কবাবু কোনো দিকে কিছু পথ দেখতে পাচ্ছেন না, পাটের সঙ্গে স্বয়ং রাজ্যপাটের সম্বন্ধ, এখন মক্কেল যদি বা আছে, টাকা নেই—বীথির এখন কাজে না নেমে উপায় কি! সে এখন বড়ো হয়েছে, নিজেই সব সে বুঝতে পারে আগাগোড়া। তার এখন কি কর্তব্য, বিনায়কবাবু কিছু বলছেন না, সে নিজেই ঠিক করুক।

বিনায়কবাবু যা বলেননি, বলা বাহুল্য, তা-ই বীথি ঠিক করলো।

তক্ষুনি সে চিঠি লিখে দিলো ফেরৎ ডাকে:

'দাদা অকৃতজ্ঞতা করে থাকে, তোমার কোনো ভয় নেই, বাবা, আমি আছি।'

আমি আছি—সেই স্বর, নির্ভীক উদাত্ত সেই স্বর, আকাশ থেকে আকাশে

পড়লো ছড়িয়ে। বীথি তার নির্মোকনির্মুক্ত নতুন আমিত্বে উগ্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

ঘরের দেয়ালগুলো হেঁটে-হেঁটে অনেক দূরে সরে দাঁড়ালো, এলো অনেক আলো, অনেক হাওয়া—আকাশে তার সমস্ত শূন্যতা উঠলো সঞ্চিত হয়ে। আমি আছি, আমি আছি—তার সমস্ত শরীর প্রস্ফুট হয়ে উঠলো শঙ্খের একটি নির্ঘোষের মতো।

কলকাতা তাকে ছাড়তে হলো না, এখানেই, সুমিত্রা পর্দা স্কুলে সে আশি টাকা মাইনেতে কাজ যোগাড় করলে। যে পঁয়তাল্লিশ টাকার থেকে একটা আধলাও দাদা দিতে পারেনি, পুরো সেই পঁয়তাল্লিশ টাকাই সে বাবাকে থোকে দিতে পারবে। তবে জনান্তিকে একটা মাত্র তার অনুরোধ আছে—সে মামার বাসায় আর থাকতে চায় না, সেটা সম্পূর্ণ মামার বাড়ি নয় বলে নয়, সুমিত্রা পর্দা স্কুলের থেকে অনেক মাইল দূরে বলে। তাই সে স্কুলের কাছাকাছি ছোটখাটো দুটো ঘর নিয়ে আলাদা থাকতে চায়।

খবর পেয়ে বিনায়কবাবু সপরিবার আকাশে উড়লেন। টাকার সংখ্যাটায় যতো না তাঁর তৃপ্তি হচ্ছিলো, তার চেয়ে বেশি হচ্ছিলো স্কুলের নামের পিছনে ঐ একটা পর্দার আবরণ আছে বলে। শুধু মেয়ে-স্কুল বলে তিনি ততো আশ্বস্ত হতে পারেননি, পর্দা কথাটা তাঁর মনে ভক্তির একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করলে, প্রায় একটা ডিসইনফেকটেন্টের কাজ করলে বলা যায়। রাধা বলতেই যেমন কারু-কারু কাছে কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা উদ্ঘাটিত হয়, তেমনি পর্দা শুনতেই বিনায়কবাবু এক নিমেষে সেই স্কুলের উচ্চাদর্শটা আয়ত্ত করে নিলেন।

চাকরিটা যে ভালো সে তো সবাই জানে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে স্কুলটাও যে ভালো, তা-ই বা কোথায় পাওয়া যায়?

'কিন্তু,' সর্বাণী বাসি পাউরুটির মতো শুকনো মুখে বললেন, 'কিন্তু খুকি ঐ একলা থাকতে চায়, না, কি লিখেছে বললে?'

বিনায়কবাবু উদারতায় একটু পেশল হবার চেষ্টা করলেন, 'ঠিকই তো, ক্ষেত্র-বাবুর বাড়ির চেয়ে স্কুলটা অনেক দূরে—ওখান থেকে যাওয়া-আসা করতে গেলে স্কুলই করা হবে না দেখছি। তা, আলাদা থাকতে চায়, কাছাকাছি কোনো একটা মেয়েদের বোর্ডিং বা ঐ জাতীয় কিছু একটা বেছে নিতে হবে। এতো বড়ো মেয়ে—আলাদা থাকবে কি!'

ছোট একটি নিশ্বাসে সর্বাণী বুকের থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর সরিয়ে দিলেন। সেই কথাগুলিই বিস্তারিত করে বিনায়কবাবু বীথিকে চিঠি লিখলেন। আলাদা থাকতে চায়, তার স্বাস্থ্যের দিক থেকে, সে তো ভালো কথাই, কিন্তু—

কিন্তু, মানে, এই পর্যন্ত, তার বেশি আর নয়। ক্যানিউট যেমন ঢেউকে সম্বোধন করে বলেছিলো: দাস ফার এ্যাণ্ড নো ফারদার।

কিন্তু, কাছাকাছি, সুবিধেমতো একটা মেয়ে-বোর্ডিংই যেন সে পছন্দ করে নেয়। নিজের একটা ঘর হলেই তো মেয়েদের যথেষ্ট আলাদা থাকা হলো।

বাবার চিঠি পেয়ে বীথি মনে-মনে হাসলো। আজ সে এতোটা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যাতে সে কম করে একটা মেয়ে-বোর্ডিঙে এসে উঠতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

সেই হাসি সে পুষতে পারলো না। বাইরে সে যেখানে খুশি গিয়ে মাস্টারি করে আসতে পারে, যতো বিপদ তার এই ঘরের চারপাশে. বাইরে খোলা আকাশ থাকলেও ঘরের চারপাশে আনতে হবে দেয়ালের অভিভাবকত্ব।

বীথি বাবার চিঠির সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো—অক্ষরের টানগুলিতে ফুটে উঠলো বা একটু রূঢ় অটলতা। লিখলে:

'আমার জন্যে তোমাদের কোনো চিন্তা'—'চিন্তা'-কথাটা কেটে বীথি অনেক ভেবে শেষে 'ভয়' লিখলো—'আমার জন্যে তোমাদের কোনো ভয় নেই, বাবা। বড়ো মেয়েরাই তো মাস্টার হয়। একটা বয়েস পর্যন্তই মেয়েদের নিয়ে যা ভাবনা, তারপর আর তাদের নিয়ে কোনো ভয় থাকে না। আশা করি আমি এতোদিনে ততো বড়ো হয়ে উঠেছি।'

তারপর—বীথি যা লিখলে সেটা সস্ত্রীক বিনায়কবাবুর ততো মনঃপূত না হলেও কি করা যাবে, মেয়ে যখন নিতান্ত চাকরিই করছে, এবং তা সংসার প্রতি-পালন করতে—সরেজমিনে সমস্ত অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে বিনায়কবাবু কলকাতা চলে এলেন।

বালিগঞ্জের দিকে মেয়েদের কোনো বোর্ডিং নেই, শ্যামবাজার থেকে স্কুল করার কথা ভাবাও যায় না, অতএব, বীথি লিখেছিলো: ভবানীপুর অঞ্চলে একটা প্রকাণ্ড ব্যারেকে দুখানা ঘর নিয়ে ছোট একটা সে ফ্ল্যাট নিতে চায়। সেটা আগাগোড়া টুকরো-টুকরো বাঙালী পরিবার দিয়ে ঠাসা—এমন কিছু সে একটা আফ্রিকায় গিয়ে পড়ছে না। হ্যাঁ, বাড়ি ভাড়া দিতে কিছু টাকা তার বেরিয়ে যাবে বৈকি, তার জন্যে কোনো উদ্বেগের কারণ নেই, একটা টিউসানি বীথির হাতে আছে, সংসারের ভাতায় সে টান দিতে যাবে না।

মাটিতে বসে পড়বার মতো কিছু খবর নয়, আশে-পাশে যখন অনেক বাঙালী পরিবার আছে ছিটিয়ে, আর যখন পঁয়তাল্লিশটা টাকা সুগোল পঁয়তাল্লিশটাই থেকে যাচ্ছে, তবু, কোথায় কতখানি জল, নিজের চোখে দেখবার জন্যে বিনায়কবাবু কলকাতা এলেন।

ক্ষেত্রবাবু, বলা বৃথা, প্রস্তাবটা বিশেষ সমর্থন করলেন না। কোন এক অপ-রিচিত, অনাত্মীয় লোক মাস-মাস কুড়ি টাকা করে বাড়ি-ভাড়া পাবে সেটা খুব একটা সুখবর নয়। যেন একমাত্র সেই তথ্যটাই বীথির সর্বব্যাপী কল্যাণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

বিনায়কবাবু মেয়ের দিকে ঘেঁষে দাঁড়ালেন, 'কিন্তু এখান থেকে বালিগঞ্জে গিয়ে স্কুল করার কথা তুমি বলতে পারো না। এখন ওর নিজের বলে আলাদা একটা ঘর দরকার—তোমার বাড়িতে তো পিন ফোটাবারও জায়গা দেখছি না একটা।' বাবার নতুন উদারতায় বীথি গদগদ হয়ে উঠলো।

ক্ষেত্রবাবু অনাবশ্যক রাগে ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'ঘর, শুধু একটা ঘর দিয়ে তোমার মেয়ে কি করবে? দিতে চাও তো তাকে একটা বাড়ি দাও যোগাড় করে,' মামাবাবুর কি সৌখিন শখ, 'মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও এবার। আগে তো শুনেছিলুম গ্রাজুয়েট না হবার আগে দস্তস্ফুট করবে না, এখন তো সে হাঙ্গামা চুকে গেছে, এবার পাত্রের সন্ধানে দিগ্বিদিকে বেরিয়ে পড়ো।'

নাকের উপর থেকে বিনায়কবাবু একটু হাসলেন। ভাবখানা এই, ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে এতো ভালো পাশ করে বীথিও কিনা সামান্য পাঁচি-খেঁদির মতো বিয়ে করতে বসুক। তার সমস্ত অসাধারণত্বের জৌলুস কিনা শেষকালে বিয়ের জলেই ধুয়ে যাক!

'মেয়ে বিয়ে করতে না চাইলে আমি কি করবো?' বিনায়কবাবু কান চুলকাতে-চুলকাতে বললেন. 'এখন সে রীতিমতো বড়ো হয়ে উঠেছে, তাকে তো আর জোর করে ছানলাতলায় টেনে নিয়ে যেতে পারি না।'

'মেয়ে বিয়ে করতে চায় না মানে?' ক্ষেত্রবাবু গর্জন করে উঠলেন।

'চোখের সামনে দেখতেই পাচ্ছ অহরহ।' বিনায়কবাবুর গলা যেন এবার সত্যের জোরে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'এই তো পাশ করার সঙ্গে-সঙ্গেই কেমন লাফিয়ে একটা চাকরি নিয়ে বসলো। মেয়ের এখন একটা স্বাধীন মত হয়েছে—মত হচ্ছে জানো, বড়ো হওয়ারই একটা উপসর্গ—'

ক্ষেত্রবাবু মুখের থেকে কথাটা প্রায় কেড়ে নিলেন, 'সাধ করে বড়ো হতে তবে দিলে কেন মেয়েকে?'

'বড়ো হতে দেবার আমরা মালিক নাকি?' বিনায়কবাবু বিগলিত গলায় বললেন, 'বড়ো ও নিজেই হয়ে উঠলো। কোমল একতাল মেয়েলিত্বের মধ্যে থেকে খুঁজে পেলো ও ওর কঠিন মেরুদণ্ড।'

ক্ষেত্রবাবু মুখ কুঁচকে কথাটাকে প্রায় একটা ভেঙচি কাটলেন। বললেন, 'দেখি কেমন ওর মেরুদণ্ডের জোর. ডাকি ওকে এখানে।' বলেই. বিনায়কবাবুর উচ্চ হাসির মাঝখানে, তিনি ডাক দিয়ে উঠলেন, 'বীথি! বীথি!'

ত্বরিত পায়ে বীথি এলো ছুটে। আজ্ঞাবহনের প্রস্তুতিতে সমস্ত ভঙ্গিটা তার নুয়ে রয়েছে।

মামাবাবু তাঁর মুখ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন, 'তুই নাকি বিয়ে করতে চাস না? বিয়েতে নাকি তোর মত নেই?'

বীথি থমকে গেলো।

'কি, জবাব দে, মত যখন তোর একটা হয়েইছে শুনছি, তবে সেটা স্পষ্ট করে জানাতে বাধা কি?'

দ্যূত-সভায় দ্রৌপদীও হয়তো এতোটা বিড়ম্বিত হয়নি। পাষাণকায় স্তব্ধতার খোলের মধ্যে বীথি আপাদমস্তক আড়ষ্ট হয়ে রইলো।

'কি, বিয়ে করবি তো বল্, উঠে পড়ে লেগে যাই খুঁজতে।' মামাবাবু এবার বাবার দিকে তাকালেন, 'ধরা-ছোঁয়া যায় পাত্রই একটা আনতে পারলে না এখনো. ও মত দেবে কি? ও কাকে বিয়ে করবে?'

আপ্যায়িতের ভঙ্গিতে বিনায়কবাবু স্মিতহাস্যে সায় দিলেন, 'সত্যি, কাকে বিয়ে করবে ও? ধারে-কাছে ওর যোগ্য পাত্র তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি নিয়ে আসবো যোগ্য পাত্র?' মামাবাবু লাফিয়ে উঠলেন, 'বলুক কি রকম বর ও চায়! একবার বলুক বিয়েতে ওর মত আছে। কি, তুই যে একেবারে লজ্জায় কুঁকড়ে আছিস, বীথি? এই বুঝি তোর বড়ো হবার নমুনা? সামান্য একটা হ্যাঁ বলতে তুই এতো ভাবছিস?'

বীথি তার বাবার দিকে একবার হয়তো তাকিয়েছিলো, কিম্বা তাকাবারও হয়তো কোনো দরকার ছিলো না। সেই দোদুল্যমান স্তব্ধতায় বাবার সকাতর দুই চক্ষুর মিনতি বীথি তার চামড়ার উপর যেন স্পষ্ট স্পর্শ করতে পারছে।

কিন্তু তাই বলে সামান্য একটা না-ও সে বলতে পারলো না।

বীথি অপমানে জ্বলে উঠলো, কেননা এখন অপমানে জ্বলে উঠলেই তাকে সুন্দর দেখাবে। বললে, 'তুমি এখানে হাত-পা ছেড়ে বসে আছো কি, বাবা? তোমার না আজ ওখানে গিয়ে সেই বাড়িটা দেখে আসবার কথা ছিলো? ওঠো।'

'মাস্টার, খুব মাস্টার হয়েছিস, বীথি,' মামাবাবু বিরক্তিতে রুখে উঠলেন, 'কিন্তু তোদের আবার মাস্টারি কি? তোরা চাকরানি হবি, দাসী হবি, মীরার মতো সমস্ত জীবন দিয়ে বলবি: মইনে চাকর রাখো জী। দাস্যের চেয়ে কি আর মেয়েদের সম্পদ আছে?'

বিনায়কবাবু চেয়ার ছেড়ে জয়ীর মতো উঠে দাঁড়ালেন, 'সে-সব দিন আর নেই, ক্ষেত্তর। মেয়েরা আজকাল অনেক এগিয়ে গেছে।'

বাড়ি দেখতে বেরুবার আগে মেয়েকে একটু ফাঁকায় পেয়ে বিনায়কবাবু বললেন, 'ক্ষেত্তরটা একেবারে সেকেলে। কুসংস্কারে হলদে হয়ে গেছে। বিয়ে ছাড়া আর কোনো বড়ো কাজ ও দেখতে শিখলো না। বিয়ে ছাড়া আর যেন সংসারে কিছু করবার নেই। হবেই তো, ন্যাবায় যে ভুগছে, সে চারপাশে দেখবেই তো কেবল সর্ষে-ক্ষেত। ছি, রাজধানীতে থেকেও কিনা ওর এই হাল! না, ব্যারাকটা যদি ভালো হয়, এ বাড়ি তোকে ছাড়তেই হবে, বীথি।'

বীথি নীরবে একটু হাসলো। এই নিয়ে আবার কিনা এতো আলোচনা! সংসারে যে-মেয়ে টাকাই রোজগার করতে পারলো, তার আবার ভাবনা কি। ইচ্ছে করলে সামান্য সে একটা আর বিয়ে করতে পারবে না?

বাড়িটা শেষ পর্যন্ত বাবা অনুমোদনই করে এলেন। সবগুলিই প্রায় সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবার, একজনকে তো তাঁর গ্রাম-সম্পর্কে জ্ঞাতিই বলা চলে। সময়ে-অসময়ে, তার মানে সব সময়ে, বীথির উপর তাঁরা যেন সস্নেহ, তার মানে সন্ধিৎসু দৃষ্টি রাখেন, সেই কথা তাঁদের তিনি বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন।

যাবার আগে বীথিকে তিনি কতোগুলি মহামূল্য উপদেশ দিলেন, তাদের মধ্যে একটা ছিলো গুপ্তধনের মতোই সযত্নরক্ষণীয়:

'বিয়ে করতে যখন রাজি হলি না, তখন, এবার থেকে ক্ষেত্তর কেবল তোর খুঁৎ ধরতে চেষ্টা করবে। খুব হুঁসিয়ার, মা, কেউ যেন মুখব্যাদান করতে না পারে। ইস্কুল—ইস্কুলের কাজ ফুরিয়ে গেলে বাসা, দিব্যি ছাদ আছে, সেখানেই বেড়াতে পারবি ইচ্ছে করলে। বেশ খাবি-দাবি, পড়া করবি—প্রাইভেটে এম-এটাও তো দিয়ে ফেলতে হবে—কারু কোনো ধার ধারবিনে, থাকবি মনের স্ফূর্তিতে। আর টিউসানি যদি দুটো-একটা বেশি পাস, কিছু-কিছু জমাবার অভ্যেস করবি—বিপদ-আপদে কখন কি দরকার হয় কে বলতে পারে? আর কবছর অন্তর ইস্কুলে মাইনে বাড়বারও তো কথা আছে, চারদিক বেশ একটু গুছিয়ে নিতে পারলে তোর মাকেই একদিন পাঠিয়ে দেবো'খন। মন্দ কি, সবাই মিলে কলকাতাতেই না-হয় তখন থাকা যাবে।'

তারপর সত্যি-সত্যিই একদিন ঘোড়ার গাড়ির মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে বীথি তার নতুন বাড়ির দিকে রওনা হলো। গাড়ির চাকায় মুখর হয়ে উঠেছে তার সমস্ত রক্ত।

মুখোমুখি সিটে টুকু ছিলো বসে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, জানলার বাইরে বীথি বিস্মিত চোখে বারে-বারে তাকাতে লাগলো, টুকুদার সঙ্গে একা একা গাড়িতে বসে সে ভবানীপুর যেতে পারছে, অথচ রাস্তাটা কিনা আজ চাকার নিচে বসে যাচ্ছে না!

কতোদূর এগিয়ে যেতে, যেন কি গভীর সান্ত্বনা দিচ্ছে, তেমনি স্বরে টুকু বললে, 'শেষ পর্যন্ত একটা মাস্টারই হলে, বীথি! আর কিছু নয়?'

বীথি মুচকে হেসে বললে, 'তুমি তো তা-ও হতে পারলে না। তুমি কিনা এখনো একটা ছাত্র!'

'আমার কথা কিছু বোলো না!' টুকু দীর্ঘশ্বাস ফেলবার ভান করলো, 'আমি তোমার কথা, তোমার মাঝে চিরন্তন একটি মেয়ের কথা ভাবছিলুম।'

'থাক,' বীথি খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'আমার কথা ভেবে মুখখানা অমন তোমার বুদ্ধের মতো প্রশান্ত করতে হবে না! তবু আমি, তোমার সেই ঘৃণিত মেয়েদের মধ্যে থেকে একজন, এই আমি—তবু তো একটা কিছু হলুম। তাই বা কম কি!'

'জীবিকা-নামক যন্ত্রের ক্ষুধার্ত একটা উদ্ভাবনই মাত্র হলে—হলে শুধু একটা মাস্টার,' টুকু উদাসীনের মতো বললে, 'কিন্তু তুমি সত্যিকারের তুমি হয়ে উঠবে কবে?'

বীথি দৃঢ় গলায় বললে, 'এর চেয়ে বৃহত্তরো কোনো আমিত্বে আমি বিশ্বাস করি না। আমি আমার বিপন্ন পরিবারের কাজে লাগছি, আবিষ্কার করেছি আমার স্বাধীন কর্মক্ষেত্র, এই আমার যথেষ্ট আমি, এই আমার যথেষ্ট মূল্যবান হয়ে ওঠা!'

'তোমার জন্যে যদি আমার কষ্ট হয়, বীথি, আমাকে তাহলে মার্জনা কোরো।' টুকু জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গাড়োয়ানকে গাইড করতে লাগলো।

আর কি চাই—বীথি পেয়ে গেছে তার নিজের বলে আলাদা একখানা ঘর, নিজেকে ঘিরে নিবিড় একটি নিভৃতি। তার অব্যাহত একাকীত্ব।

আর কি তার চাইবার আছে! এই ঘরে বসে সে ইচ্ছেমতো ভাবতে পারে, ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখতে পারে। ইচ্ছে করলে বন্ধ করে দিতে পারে দরজা। দরজা বন্ধ করে হাত-পা ছুঁড়ে নাচলেও কেউ আর তাকে কিছু বলতে আসছে না।

সে পেয়ে গেছে তার ঘর। তার বুকের মতো উত্তপ্ত, তার মৃত্যুর মতো উলঙ্গ এই একটি ঘর।

সে দাঁড়িয়েছে এখন তার নিজের মুখোমুখি।

কি চমৎকার—পূবের জানালা দিয়ে ঘরে যখন রোদ এসে পড়ে, মনে হয় ঐ রোদ একান্ত করে তারি জন্যেই আকাশ আজ পাঠিয়ে দিয়েছে, তার সানন্দ অভিবাদন: যখন বিছানার এক পাশে চাঁদের রূপালি একটি রেখা চুপি-চুপি এসে

শুয়ে থাকে, মনে হয় ঐ চাঁদ একান্ত করে তাকে দিয়েই তৈরি, তার শীতল নিঃসঙ্গতা দিয়ে!

আর সে কি চায়! ঘর ভরে তুলেছে সে ছোট-খাটো অস্তিত্বের আসবাবে—ছোট্ট সোফার মতো নরম, নির্মল একটি বিছানা—যতোক্ষণ খুশি না-ঘুমিয়েও সে শুয়ে থাকতে পারে। পিঠ-তোলা সে একটা চেয়ার পেয়েছে এতোদিনে, তার টেবিলে আজকাল আর খুঁজে-পেতে এনে খবরের কাগজ পাততে হয় না। শাড়িগুলি আজকাল সে একাই পরতে পারে, এ ছুটে ধোবাবাড়িতে তার কখানা কাপড় যাবে সেই বিষয়ে সে এখন একেবারে অরাজক। বইগুলি নিশ্চিন্ত হয়ে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবাস করতে পারে, চুলের কাঁটাগুলি এখন একেবারে তার ঘড়ির কাঁটায়। সব চেয়ে বড়ো কথা, তার বাথরুমের দরজার সামনে আর কেউ এখন প্রতীক্ষা করে নেই, ইচ্ছেমতো স্নান করতে পারে সে জল ঢেলে। জুজুবুড়ির মতো গ্রীষ্মকালকে সে আর ভয় করে না, তার শোয়াটা বিচ্ছিরি কি সুশ্রী, সেই বিষয়ে দেয়ালগুলি নির্বিকার। আকাশে খুব মেঘ করে বৃষ্টিই যদি নামলো ধরো, তবে না হয় সে আজ ভুলেই গেলো চুল বাঁধতে। এর বেশি আর সে কি চায়—এই মুক্তি, এই নির্জনতা! খিদে পেলে যখন-তখন সে খেতে পারে, ভাবতে পারো, মেয়ে হয়ে তাকে ক্ষুধার্ত থাকতে হয় না। কোন বেলা কি খাদ্যের জন্যে জিভটা তার সুড়সুড় করছে, ভয় কি, একটা ঝি রয়েছে তার হাতের কাছে। তারই কিনা আবার একটা দাসী। ফরমাশ করলেই হলো—এমন কি, ইস্কুল থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এসে তাকে দিয়ে পা দুটো সে টিপিয়েও নিতে পারে ইচ্ছে করলে। ইচ্ছেমতো সমস্ত টাকাই সে খরচ করতে পারে না এই কথা যদি বলতে চাও তো বলো, তবু, তারই তো টাকা, অবিমিশ্র তারই তো টাকা সে খরচ করছে। এর চেয়ে কি এমন সুখ সে স্বর্গে গিয়ে কল্পনা করতে পারতো?

বলো, আর সে কি চায়! দুই শক্ত মুঠিতে তুলে নিয়েছে সে তার আপন জীবন, দুই পায়ে দাঁড়িয়েছে সে এসে কঠিন মাটির উপর। দুই মাসে সংসারের শ্রী দিয়েছে সে ফিরিয়ে। উঠোনে আর সেই আগাছা নেই, সিঁদুর পড়লে হাত দিয়ে চেঁছে এখন তুলে নেয়া যায়। রান্নাঘরের চাল ফুঁড়ে আগে জল পড়তো, এখন নতুন করে সেটা ছাওয়া হয়েছে, নতুন করে উঠেছে ফের গোয়াল-ঘর! হাটে গিয়ে বাবা দুধেল একটা গাই কিনে এনেছেন—সেটার কি নাম রাখা হবে তা পর্যন্ত বীথির উপর ভার। সবাইর আগে মা'র চুড়ি ক'গাছ সে ছাড়িয়ে এনেছে—সেই দুটি হাত আবার কেমন চোখে এখন স্নিগ্ধ লাগছে। চোয়ালের হাড় দুটো আবার কেমন মাংসে গিয়েছে ডুবে, আবার তাঁর কোল ঘেঁষে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করে। একে-অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি, কামড়া-কামড়ি করে ভাই-বোনগুলিকে আর টুকরো-টুকরো জামা-কাপড় যোগাড় করতে হয় না, বাবার শার্টগুলির ক্রমে-ক্রমে ফতুয়া হওয়াটা বন্ধ হয়েছে। বাবা আজকাল এতো নিশ্চিন্ত যে নিয়মিত গোঁফটা পর্যন্ত কামাতে পারছেন, উদ্বেগে ঘন, বিরক্তিতে ধারালো তাঁর সেই গোঁফ। বৃত্তি না পেলেও তারই দৌলতে ছোট বোনটা ইস্কুলে পড়তে পারছে, তার বিয়ের বেলায় পণের যদি নেহাত দরকারও হয় ধরো, কিছু

আর বিশেষ ভাবতে হবে না। সমস্ত সংসারে এসেছে এমনি একটি অবকাশের সুর। ঘোলাটে মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে এখন নীল নির্মুক্তি। বীথিই তো আছে, আর তাঁদের কিসের কি ভাবনা।

হ্যাঁ, সে আছে, সত্যিই সে আছে, এই চেতনার দীপ্তিতে বীথি তলোয়ারের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে পেয়েছে তার জীবনের স্বাদ, বাঘ যেমন পায় রক্তের গন্ধ। তার মাঝে যে এই সম্ভাবনীয়তা ছিলো, এতো বিপুল বৈচিত্র্য, তার আবিষ্কার তাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। মেয়ে হয়েও এতো মহিমার সে কোনোদিন স্বপ্ন দেখেনি। সমাজে-সংসারে তার যে কোনোকালে এতো দাম হতে পারে—রীতিমতো টাকার অর্থে—এ-কথা ভাবলেও সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাবার কাছে তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই—ভাগ্যিস তিনি দিয়েছিলেন তাকে এই বিস্তীর্ণ সুযোগ, বড়ো হবার, সক্ষম হবার, চিরজীবি হবার। নইলে সে অগণ্যের মাঝে কোথায় থাকতো নগণ্য হয়ে! দাদা যা পারলো না, স্বয়ং বাবা যা পারলেন না, সামান্য মেয়ে হয়ে তাই সে অনায়াসে সম্পন্ন করলো—সামান্য আর তাকে বলে কে—সে এক, সে একাকী, সে নিজেকে নিয়ে নিজে। এতো ঐশ্বর্য সে রাখবে কোথায়? বাবা আজকাল শব্দ করে হাসছেন, মা দস্তুরমতো সেমিজ গায়ে দিচ্ছেন, ছোট ভাই-বোনগুলিকে আদর করে ছোঁয়া যাচ্ছে। সে না থাকলে কি উপায় হতো সংসারের—বিধাতার সমস্ত সৃষ্টিই যে কানা হয়ে থাকতো!

তাই বলে তার মাঝে সূক্ষ্ম চোখের এতোটুকু একটা খুঁত খুঁজে পাও তোমার সাধ্য কি! তার দৃঢ়তার দুর্গে কোথাও একটা দুর্বল ফাটল নেই। তার দিকে তাকাও, সেফটিপিনের খোঁচা লেগে চোখ তোমার অন্ধ হয়ে যাবে! সে সমস্ত শরীরে দাঁড়িয়ে আছে তার খুর-তোলা উঁচু জুতোয়, তার দৃঢ়ীভূত খোঁপার ঔদ্ধত্যে। শত হাওয়া দিক, গাছ ভেঙে পড়লেও তার আঁচলটা কখনো এক ইঞ্চি এলোমেলো হবে না, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক, ইস্কুলটা তার টিঁকে থাকলেই হলো। তার দিকে তাকাও, কিন্তু সে কোথায়, বড়ো-বড়ো অক্ষরে দেখবে শুধু একটা সুনামের বিজ্ঞাপন! অভ্রভেদী একটা আত্মরক্ষার অহঙ্কার! তার সঙ্গে কথা বলতে যাও, আর তুমি তাকে নেহাত, আইনের ভাষায় বলতে গেলে, লিডিং কোশ্চেনই জিগগেস করতে পারো, দেখবে, তার ডান দিকে 'হ্যাঁ' বাঁ-দিকে 'না'—সরাসরি, সুসমাপ্ত, তার মাঝে মাঝামাঝি কোনো মীমাংসা থাকতে পারে না। তার শুধু মতই পেতে পারো, যদি চাও, এবং সংসারে যারা মতেরই সাধনা করে, তাদের মন বলে কোনো উপদ্রব নেই। সে বাস করেছে তার এই অমলিন মনোহীনতায়।

মামাবাবু কিছু বলতে আসুন না দেখি। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে মামিমাকে সে একজোড়া শাড়ি কিনে দিয়েছে, ছেলেপিলেদের কতোরকম খেলনা আর খাবার—তাই যথেষ্ট, মামাবাবুকে কিছু আর দিতে হবে না গায়ে পড়ে। মামাতো বোনটা গান শিখতে চায়, সে রাজী হয়েছে একটা হার্মোনিয়াম কিনে দিতে। যার কিনা এতো স্নেহ, এতো শ্রদ্ধা, সে কখনো খারাপ হতে পারে নাকি? টাকা না থাকলে তার কিন্তু, হায়, স্নেহও থাকতো না, কেননা, সে তখন তা দেখতো কি করে? আর টাকা যখন তাকে নেহাত রোজগারই করতে হচ্ছে, সে

তখন ইচ্ছে করলে, মানে টাকার খাতিরে, আলাদা ঘরে থাকতে পারে বৈকি। মামাবাবু সে বিষয়ে উদার হচ্ছেন ক্রমে-ক্রমে। কেননা তিনিও বুঝতে পেরেছেন, গরিব আর বড়োলোকের সম্বন্ধে সুনীতির একই নিয়মকানুন খাটতে চায় না।

তার এই আলাদা ঘর—এই ঘরকে সে নিয়ে এসেছে, মেলে দিয়েছে, নিরন্তরাল আকাশের নিচে। ঘরেও সে, বাইরেও সে—পৃথিবীতেও সে ছাড়া কোনো লোক নেই, থাকবার কোনো কথা নয়। সূর্যের মতো সে একা। মরবার আগেকার বিন্দুতম মুহূর্তে হয়তো বা সেই মৃত্যুপথযাত্রীর মতো।

মাঝে-মাঝে টুকু-দা শুধু আসে,আর কোনো বিরলতম দিনে বা সমরেশ। টুকুদা এলে সে খুশিই হয়, কেননা টুকু-দা তার আত্মীয়,দরজাটা তখন ভেজানো থাকলেও কিছু আসে-যায় না। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, সমরেশকে সে পছন্দ করে না মোটেই, মোটেই পছন্দ করে না মানে ভয় করে, কেননা তার সঙ্গে তার কোন আত্মীয়তা নেই, কেননা সে সমাজের অনুমোদন নিয়ে আসেনি। তাই দরজাটা সে অবারিত খুলে রাখে, সমরেশের চলে যাবার জন্যে প্রশস্ত একটি ইঙ্গিত।

কিন্তু লোকটা তক্ষুনি-তক্ষুনি না উঠলে কি করা যায়? তাকে তো আর ধাক্কা মেরে তুলে দেয়া যায় না!

চলে যেতে বললেই হয়! কিন্তু কি এমন অন্যায় বা অসুবিধে তোমার করছে যে তাকে তুমি মুখের উপর 'চলে যান' বলতে পারো?

না-খুললেই হয় দরজাটা! কি করে তুমি বুঝবে যে সে এসেছে! আর যদি বোঝাও, অনবরত দরজায় ঘা দিলে চুপ করে দাঁড়িয়ে কতোক্ষণ তুমি তোমার বুকের শব্দ শুনতে পারো! তার চেয়ে সোজাসুজি দরজাটা খুলে দিলেই ফুরিয়ে যায়! তুমি তখন দুর্ভেদ্য হয়ে বসে থাকতে পারো তোমার অটল গাম্ভীর্যে। নিজের কাছে সে-ই তো কতো হালকা হয়ে যাওয়া। তোমার ভয় কি! সামান্য একটা পুরুষের কাছে তোমার ভয়? ছি!

কিন্তু তোমার সাধ্য কি তুমি সমরেশের সঙ্গে কথা বলবে, অথচ একটুও হাসবে না। সত্যি করে বলতে গেলে, সেইখানেই তো তার বেশি ভয়, তার হেসে উঠতে হয় মাঝে-মাঝে। তার মুখের হাসি শুনলে তার নিজেরই কেমন বুকের মধ্যে থেকে ঠাণ্ডা একটা ভয় করে ওঠে। সমরেশের সামনে সে যেন আশানুরূপ 'ভালো' থাকতে পারে না।

এর পর ক'টা মাস আমরা স্বচ্ছন্দে কেটে বাদ দিতে পারি। একটা মেয়ের মাস্টার-জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমির ইতিহাস নিয়ে আমরা কি করবো?

বীথি ইস্কুল যাচ্ছে, ধরো এক শুক্রবার, বাবার হাতের লেখার ভারি একটা লেফাফা এসে হাজির।

স্ফীতকায় একটা সুখবরই বলতে হবে। বাবা লিখেছেন পরোক্ষ বিবৃতিতে:

গতকল্য বীথির একটি ভাই হয়েছে। তার মাতার প্রায় জীবনসংশয় হয়েছিলো, সিভিল সার্জনকে না-ডাকিয়ে আর উপায় ছিলো না। বিনায়কবাবুর হাত একেবারে নিঃস্ব, টাকার এতো দরকার, চিঠিটা আঠা দিয়ে মোড়বার পর্যন্ত তর

সইছে না। চিঠি পাওয়া মাত্রই হাতে না থাকে, যেন সে তার সেভিংস-ব্যাঙ্কের বই থেকে (নিশ্চয়ই কিছু জমেছে) টাকা তুলে টি-এম-ও করে পাঠিয়ে দেয়। হরেনকেও লেখা হয়েছে, কিন্তু সে-কুলাঙ্গার কোনো কিছুতেই গ্রাহ্য করবে বলে মনে হয় না।

এ তো গেলো সমূহ বিপদের কথা। তারপর:

'দিন-দিন খরচ কেবল বেড়েই চলেছে আগুনের মতো। হয় তোমাকে আরো একটা টিউসনি নিতে হয়, নয় তো এতো ভাড়া দিয়ে আলাদা বাসায় তোমার থাকা চলে না। একটা মেস-টেসই দেখে নাও মেয়েদের, কি করবে, সংসারটা তো সামলাতে হবে আগে। আগে বাঁচলে তো পরে বিলাসিতা।'

তারপর আরো আছে:

'তুমি যে এই অযোগ্যের ঘরে কতো বড়ো রত্ন, তুমি যে কি কষ্টসহিষ্ণু, শ্রমনিষ্ঠ, অধ্যবসায়ী মেয়ে, তুমি যে পৃথিবীতে অসাধারণত্বের আদর্শ নিয়ে এসেছ—'

শেষের প্যারাগ্রাফটা বীথি আর পড়তে পারলো না। স্খলিত একটা ভারের মতো চেয়ারে বসে পড়লো।

টাকা—টাকা—আরো টাকা চাই। আরো একটি গ্রাস এসে আস্তে-আস্তে হাঁ করেছে।

কিন্তু, শ্রমনিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু মেয়ে, কতোক্ষণ তুমি হাত পা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারো?

না, গোটা চল্লিশ টাকা এখনো তার হাতে আছে। তার থেকে কুড়িটে টাকা সে বাবার নামে টি-এম-ও করলে। আর বাকি কুড়িটা দিয়ে—আশ্চর্য কাউকে সে জিগগেস করলে না, কারুর সে একটা মৌখিক মত নিলে না, রাস্তা দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলো।

ভয় নেই, দাদার কাছে সে নেত্রকোনা যাচ্ছে।

বাড়িটা খুঁজে পেতে দেরি হলো না। ফুলন্ত বাগানে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর।

'কে, বীথি, না? হরেন যেন আর মাটির উপর দাঁড়িয়ে নেই, 'এ তোর কি চেহার হয়েছে? আমি যে গোড়ায় তোকে চিনতেই পারিনি।'

'আমার চেহারার দিকে তোমার চাইতে হবে না।' সারা রাস্তার রোদের চেয়েও বীথি ঝাঁজালো গলায় বললে, 'কিন্তু তোমার একি চরিত্র!'

'কেন, আমি কি করলুম?'

'তুমি কি করলে মানে?' রাগে বীথি অনাবৃত, স্পষ্ট হয়ে উঠলো, 'তুমি চাকরি করছ, বাবাকে তবু এক পয়সাও পাঠাও না কেন?'

হরেন হো-হো করে হেসে উঠলো, 'বা রে, আমি পাঠাবো কেন, আমি কোত্থেকে পাঠাবো?'

'তুমি আয়েস করে বসে-বসে দিব্যি মোটা হবে' বীথি রাগে টুকরো-টুকরো হয়ে গেলো, 'আর একা খেটে মরবো কেবল আমি?'

'খাটবিনে? তুই যে বোকা, তুই যে মেয়ে। তুই যে উড়াল দিয়ে পাশ করতে গিয়েছিলি,' হরেনের গলা মমতায় জুড়িয়ে এলো, 'খেটে-খেটে হাড়সার হয়ে ভালো করে পাশ করতে গিয়েছিলি যে। ভালো পাশ করে ভালো চাকরি

না করলে তোকে মানাবে কেন? কিন্তু আমার কি? ছোট আশা, ছোট আয়, ছোট মন। পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনেতে আমি কি করবো?'

'পঁয়তাল্লিশ টাকাই যখন মাইনে' বাঁকা-বাঁকা করে কথাগুলিকে বীথি উচ্চারণ করলে, 'তখন সংসার থেকে আলাদা হয়ে গেলে কেন? বাবা মা'র দুঃখটাও তো একবার বুঝতে পারতে?'

'আমার দুঃখটাই বা কে বোঝে, বীথি?' হরেন কাতর গলায় বললে, 'আলাদা না হলে বাঁচতুম কি করে?'

'এ তোমার কি স্বার্থপরের মতো কথা, দাদা!'

'স্বার্থপর!' হরেন মুখের উপর উদাসীন একটি হাসি প্রসারিত করে ধরলো, 'স্বার্থপরতাটা জীবনের একটা চমৎকার গুণ, যদি তুই বাঁচতে চাস সত্যি-সত্যি। পরের কারণে স্বার্থ দিয়ে বলি, এ জীবন-মন সকলি দাও—এ হচ্ছে তোদের মেয়েলি কবিয়ানা!'

'তা তো তুমি বলবেই। তোমার গুণপনা যে শশিকলার মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে।' বীথি ঠাট্টায় ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'তুমি যে বিয়ে করেছ!'

'তা তো করেইছি—এতে কিছু সত্যি লজ্জিত হবার ভাব করতে পারছি না। আর বিয়েই যখন করেছি,' হরেন তেমনি লাজুক গলায় বললে, 'তখন সঙ্গে-সঙ্গে একটু কাপুরুষও হতে হয়েছে বৈকি।'

'চমৎকার তোমার পুরুষত্ব!' বীথি চেয়ারের মধ্যে ছোট হয়ে গেলো, 'এ-কথা বলতে জিভটা তোমার খসে পড়লো না, দাদা? কই তুমি বাবার এই সংসার-যুদ্ধে তাঁকে সশস্ত্র সাহায্য করবে, না, নিজের পুঁটলিটি নিয়ে আলগোছে পালিয়ে এসেছ?'

কোমল করে হরেন বীথির রৌদ্ররুক্ষ মুখের দিকে চেয়ে রইলো। হাসিমুখে বললে, 'শাস্ত্রেই তো আছে জানিস, যঃ পলায়তি, স জীবতি। পালাতে যদি পারতিস, বীথি, দেখতিস তুইও কখন বেঁচে গেছিস। যুদ্ধে প্রাণ দেয়ার মধ্যে ততো মহত্ত্ব নেই, যতো যুদ্ধ জেতার মধ্যে আছে।'

'যুদ্ধ থেকে পালিয়ে তোমার যুদ্ধজয়ের গৌরব করতে বোসো না, দাদা।'

বীথি রাগে ও গরমে ছটফট করে উঠলো, 'কিন্তু বউকে মা-বাবার কাছে রেখে মাস-মাস তাঁদের কিছু টাকা তুলে দিতে তোমার বাধছিলো কোথায়? বউকে তো সংসারের জন্যেই বিয়ে করেছিলে শুনেছিলুম।'

'ও তুই ঠিক বুঝবি না, বীথি, বিবাহিত পুরুষের স্ট্যাণ্ডপয়েণ্ট।' হরেন উঠে পড়লো, 'তার চেয়ে আগে চান-টান করে খেয়ে-দেয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নে!'

বীথি ম্লান হয়ে বললে, 'এর চেয়ে ঠাণ্ডা আর মানুষে কি করে হতে পারে?'

'তাহলে শোন।' হরেন বীথির চেয়ারের কাছে ঘেঁষে এলো, যেন কি গভীর গোপন কথা বলছে তেমনি সুরে বললে, 'আগে ভেবেছিলুম ও সমস্ত পরিবারের, কিন্তু অনুভব করে দেখলুম ও একান্ত করে কেবল আমার। পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজের পুঁটলিটি তাই খুইয়ে আসতে পারলুম না। বলেছিই তো, বিবাহিত পুরুষের স্ট্যাণ্ডপয়েণ্টটা তুই বুঝবি না, বীথি।'

'তোমার শুধু বিবাহিতত্বটাই দেখছি দাদা, পুরুষত্বের এতোটুকু পরিচয় পাচ্ছি না।'

'তাহলে আরো শোন।' হরেন এবার বীথির শ্রমনিষ্ঠ, কঠিন একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো, 'ছেলে যখন বিয়ে করলো, তখন জানবি সে বাপ-মায়ের কাছে ভীষণ অপরাধ করলো, আর ছেলে যদি বউকে ভালোবাসলো, তাহলে সে-অপরাধের তুই পার খুঁজে পাবি না। কিন্তু তুইই বল, শত বউ হলেও তাকে এক-আধটু না-ভালোবেসে মানুষে কি করে থাকতে পারে? বেলা তিনটে পর্যন্ত মুখে এক ফোঁটা তার জল যেতে না দেখলে কার না দুটো লুকিয়ে খাবার কিনে দিতে সাধ হয়? চোখের সামনে অনবরত ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় পরতে দেখলে কার না ইচ্ছে করে ভালো দেখে একটা শাড়ি এনে দি? তোরই বিছানায় শুয়ে একটা লোক যদি সারা রাত জ্বরে গোঙায়, তোর সাধ্য কি তুই পর দিন একটা ডাক্তার নিয়ে না আসিস?'

'কে তোমাকে বারণ করছিলো?'

'সমস্ত সংসার। একান্নবর্তী পরিবারে স্ত্রীকে ভালোবাসা একটা মহাপাপ। ডাক্তারের ভিজিট না দিয়ে সেই টাকায় সংসারের কয়লা হতো—বউর একখানা শাড়িতে শতছিদ্র হয়ে বেরিয়ে পড়তো সমস্ত সংসারের নির্লজ্জ উলঙ্গতা। তাই.' হরেন নিষ্ঠুরের মতো বললে, 'যখন দেখলুম, তাকে আমার ভালোবাসার পাত্রী হিসাবে শ্রদ্ধা করা হচ্ছে না, সংসারের একটা কর্মক্ষম যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন আমি তার ব্যর্থতা আর কিছুতেই বইতে পারলুম না, তার জন্যে আমার আরো বেশি মায়া করতে লাগলো। তোর কেউই নেই বীথি,' হরেন তার হাতে সস্নেহ একটু চাপ দিলে, 'তোর এই অমানুষিক ব্যর্থতা যে বুঝতে পারে।'

'থাক, এর পর আমার জন্যে আর তোমার মায়া করতে হবে না,' বীথি জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিলে।

'তখনই আমার বেড়ে গেল দায়িত্ব, আমার ভালোবাসার দায়িত্ব, আমি বিয়ে করেছি। টিউসানিটা ছেড়ে দিয়ে যে করে হোক সত্যি-সত্যি একটা চাকরি যোগাড় করে নিলুম—ভাগ্যিস বিয়ে করেছিলুম, বীথি, তাই না আমার দায়িত্ব এতো বেড়ে গিয়েছে, তাই না আমি আমার পুরুষত্ব নিয়ে অহঙ্কার করতে পারছি।'

'থাক, যথেষ্ট হয়েছে।' বীথি স্থির চোখে হরেনের দিকে তাকালো, 'কিন্তু, তুমি কেবল তোমার বউয়ের কথাই ভাবলে, বাবা, মা'র কথা ভাবলে না, ভাবলে না একবার তোমার ছোট-ছোট ভাইবোনগুলির কথা!'

'নিজে বাঁচলে বাপের নাম!' হরেন অদ্ভুত করে হেসে উঠলো, 'নিজেকে বাঁচাবার মতো মহৎ কীর্তি মানুষের আর কিছু থাকতে পারে না, বীথি। সমস্ত সংসারে অসংখ্যেয় কতোগুলি শূন্যের মাঝে আরেকটা শূন্য যোগ দিয়ে যোগফল আমি বাড়াতে পারতুম না, তাই পালিয়ে এলুম, আলদা হয়ে গেলুম, হয়ে উঠলুম এক, আর এক শূন্য নয়। হোক আমার মোট পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে, থাকুক আমার অনেক-অনেক দুঃখ আর দারিদ্র্য, তবু আমি বাঁচলুম, আমার মতো করে আমি এতোদিনে বাঁচলুম, বীথি।'

'কিন্তু,' বীথি তার গলার স্বরে যেন ভেঙে-ভেঙে পড়লো, 'তুমি, তুমি একটা পুরুষ হয়ে এমনি করে পালিয়ে এলে, আর সমস্ত সংসারের ভার কিনা আমি বয়ে বেড়াবো, দাদা?'

'বয়ে বেড়াবি নে? একশোবার বয়ে বেড়াবি। তোর কি আছে,' হরেন ক্রুদ্ধ গলায় বললে, 'কি আছে তোর জীবনে, যার জন্যে তুই দুই হাতে ফেলে দিতে পারবি এই আত্মপ্রবঞ্চনার বোঝা, দাঁড়াতে পারবি তোর নিষ্ঠুরতার ঐশ্বর্যে। সামান্য একটা ডিপ্লোমা ছাড়া তোর কি আছে?'

'তোমারই বা কি ছিলো?'

'আমার ছিলো তবু একটি স্ত্রী, একটি স্নেহ,' বীথির কাছে হরেনকে তখন যে কি কুৎসিত শোনালো তা আর খুলে বলা যায় না, 'আমার ছিলো ছোট একটি এই কুঁড়ে ঘরের স্বপ্ন। শরীরের ঐ কখানা হাড় ছাড়া তোর কি আছে?' হরেন ব্যাকুলতায় উদ্বেল হয়ে উঠলো, 'পালা, তুই-ও পালা, বীথি। যদি বাঁচতে চাস তো এই পরিবার থেকে, এই জীবন থেকে, দীপ্ত ডানায় দীর্ঘ উড়ে পালা। তোর এমনি করে ব্যবহৃত হবার কথা নয়, বীথি, তোর বিকশিত হবার কথা। এ তুই কি হয়ে গেছিস?'

'সম্প্রতি তোমার এই বাড়ি ছেড়েই আমাকে পালাতে হচ্ছে।' বীথি চেয়ার থেকে ছিটকে উঠে পড়লো।

কিন্তু ঘরের চৌকাঠ ছেড়ে পা বাড়ায় তার সাধ্যি কি। আঁচল দিয়ে বৌদি তাকে সাপটে ধরেছে। আশ্চর্য, তার বৌদি! সেই ছয়ছোট্ট, মিরকুটে একটা খুকি! কিন্তু শত হাত বাড়ালেও আজ আর তুমি তার নাগাল পাচ্ছ না। সেই সেদিনের অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ একটা মেয়ে। একান্ত মেয়ে হওয়াতেই যার পরিসমাপ্তি। একদিন যাকে দেখে তোমার করুণা করতে ইচ্ছে হয়েছিল। যার অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তুমি তার হয়ে আগেই অনুতাপ করে নিয়েছিলে। ঘৃণায় যাকে তুমি সেদিন স্পর্শ পর্যন্ত করোনি। কিন্তু আজ সে তোমাকে একটি মাত্র ধাপে কতোদূর ছাড়িয়ে গেছে। লঙ্ঘন করে গেছে কতো বিশাল সমুদ্র।

'আর এই দেখছ ঠাকুরঝি, কেমন সুন্দর একটি বাগান করেছি। কেমন নিচু করে গাছের ঝুরিতে নরম একটি দোলনা দিয়েছি দুলিয়ে। বিকেলে যখন ছায়া পড়বে, তখন এটায় বসে দোল খেয়ো, কিছু ভয় নেই, ছিঁড়ে পড়বে না—এই দেখ না, দুলতে-দুলতে দিব্যি তুমি বই পড়তে পার ঠাকুরঝি।'

আশ্চর্য, তার সঙ্গে কথা বলতে বৌদির আর সেই সভয় সম্ভ্রমটুকুও দেখা যাচ্ছে না। বরং সে-ই যেন এখন উঠে এসেছে মহিমার চূড়ায়, কোন অস্পৃশনীয় সৌন্দর্যের আকাশে।

'সব আমার নিজে হাতে করা। এই একটুকরো আনাজের ক্ষেত, এই ঘুঁটের পাহাড়। বন্দোজি না করলে চলবে কি করে?'

সে সুন্দর নয়, বলো, সে সুখী নয় তার পৃথিবীতে। বলো সে হোয়াইটহেড পড়েনি।

তালা খুলে বীথি আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকলো। গুহার আড়ালে হিংস্র একটা

পশুর মতো একতাল জমাট অন্ধকার তার জন্যে ওৎ পেতে আছে। সে-অন্ধকার কালো একটা অস্তিত্ব নয়, সে-অন্ধকার একটা সুশুভ্র শূন্যতা। সে-অন্ধকার তার ক্লান্তিহীন, দীর্ঘ একটি নির্জনতা দিয়ে তৈরি। সে-অন্ধকার তার মনের, তার গূঢ়, ঘন, অনুদ্ঘাটিত শরীরের অন্ধকার।

দেহ-মনের সেই অন্ধকারে বসে বীথির নিজেকে ভারি একা মনে হলো—ঈশ্বরের মতো একা। আর সেই নিঃসঙ্গতম মুহূর্তে, কেন কে বলবে, হঠাৎ তার আজকে একটি কবিতা লিখতে ইচ্ছে করলো—আজ এতোদিনে।

ইলেকট্রিক আলোটা নিবিয়ে সে নরম মোম জ্বালালো—তার শরীরের পাণ্ডুর একটি বিষণ্ণতা। দেয়ালের শুভ্র স্তব্ধতা দিয়ে ঘন করে তুললো তার আত্মার উপস্থিতি। দূরের জানলা একটা খুলে দিলো। দেরাজ থেকে বার করে নিলো একটা কলম আর খাতা। উপুড় হয়ে ভেঙ্গে পড়লো তার বিছানায়, তার সেই সোফার মতো বিছানায়। তারপর তার সেই স্তব্ধতার অন্ধকারে সে কলম ডোবালে।

বলতে পারো, আজ সে কি নিয়ে কবিতা লিখছে?

গ্রীষ্মের এই নীল মধ্যরাত্রি নিয়ে? তার এই অপরিমাণ নির্জনতা নিয়ে? নিয়ে তার এই অসামান্য অক্লান্তি?

নয়, নয়, তোমরা তা ভাবতেও পারো না, সে পরিপূর্ণ একটি প্রেমের কবিতা লিখলো।

আজ তাকে তা লিখতে দাও।

তোমরা ভয়ানক অবাক হয়ে যাবে, বিশ্বাস করতে চাইবে না, বলবে: জীবনে তুমি কোনোদিন কাউকে ভালোবাসলে না, বীথি, জানলে না কাকে বলে প্রেম, বা তাকেই সত্যি প্রেম বলে কিনা, এ তোমার কি অন্যায় স্পর্ধা! আন্তরিকতা নেই, সত্যানুভূতি নেই—একে তুমি কবিতা বলো কি করে?

হায়, প্রেম যারা করলো, তারাও তো প্রেমকে জানলো না।

আর তুমি আনন্দে না আন্তরিক হতে পারো, কথা দিয়ে আর্তনাদকে আড়াল করে রাখো তোমার সাধ্য কি! আনন্দে তুমি বন্য হতে পারো না, তোমার সভ্যতা, তোমার ভদ্রতা তাকে সীমার মধ্যে এনে শাসন করবে। কিন্তু যন্ত্রণার বেলায় তুমি পাশবিক। যখন তোমার মর্মমূলে তীক্ষ্ণ একটা বাণ এসে বিদ্ধ হয়, তখন আর্তনাদে তুমি একেবারে উলঙ্গ হয়ে ওঠো। কোনো সভ্যতাই তোমার সেই আর্তনাদকে তখন চাপা দিতে পারে না।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, তোমার প্রেম কোথায়?

জীবনে যা সে পায়নি তারই নাম প্রেম। একদিন তার দুয়ার থেকে যাকে সে তাড়িয়ে দিয়েছিলো, সে সেদিন তার প্রেমকেই তাড়িয়ে দিয়েছিলো।

শুধু কি তার ভাব থেকে প্রেম আসে নাকি, তার অভাব থেকে আসতে পারে না? ঈশ্বরকে দেখা যায় না বলেই কি আর সে ঈশ্বর নয়? প্রেমকে জানা গেলো না বলেই কি সে পরমতম প্রেম নয় বীথির জীবনে?

বীথি প্রেমের কবিতা লিখলে—যা কোনোদিন সে পায়নি, যা সে পেতে পারতো, যা সে হয়তো পাবে না কোনোদিন, সেই প্রেমের কবিতা।

এবং, আরো আশ্চর্য, তাতে, একটি শব্দেও, সে নিজেকে ভুলতে পারলো না, ভুলতে পারলো না তার আর্তনাদে দীপ্যমান এই শরীরের সৌন্দর্য। সে আর প্রকৃতি নিয়ে লিখছে না, মনে রেখো, সে প্রেম নিয়ে লিখছে। এতোদিনে সে তার কল্পনায় পেয়েছে মুক্তি, তার রক্তে পেয়েছে তীব্রতা। এ প্রেম তার শরীরের স্তব, তার ইন্দ্রিয়ের আরতি, এ তার রক্তের রশ্মিচ্ছটা। আকাশময় হাহাকারের মতো একে সে শব্দের তারায় বিকীর্ণ করে দেবে। এ-কথা উচ্চারণ না করা পর্যন্ত সে বাঁচবে না কিছুতেই।

কবিতা যখন সে একটা লিখেই ফেললো, তখন সেটা সে ছাপাবে, একা সে এতো সুখ সহ্য করতে পারবে না, নিয়ে যাবে সেটাকে সে অপরিচিত মানুষের সহানুভূতির তাপমণ্ডলে।

কোনো মেয়ে প্রেম একটা করতে পারলো বলে নয়, প্রেম নিয়ে মহীয়ান একটা কবিতা লিখতে পারলো—সেই বিস্ময়কর কীর্তির কাহিনী। তারপর একবার যখন বাঁধ গেলো ভেঙে, রাশি-রাশি আর্তনাদের বন্যা দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করে তুললো।

রোজ রাতে বীথির ঘরে, অপরিসর সেই বিছানার পাশটিতে, মোম-বাতির নরম, ক্ষীণ ম্রিয়মাণতায় তার অজাত প্রেম এসে দেখা দেয়। তার শরীরের সঞ্চিত নিঃসঙ্গতা থেকে আরক্তিম একটি ফুল ওঠে বিকশিত হয়ে। শরীরের স্নায়ুশিরা-গুলি বহুতন্ত্রিকা বীণার তারের মতো যন্ত্রণায় গীতিমান হয়ে ওঠে।

এতোদিনে তবু সে যেন একটা কিছু পেলো। তার নিজেকে নিয়ে এই নিরাবরণ নির্মিতি। তার এই অলৌকিক অতিক্রান্ততা।

লেখাগুলি সত্যি ভালো হয়েছে বলে, না, সে-ই নিতান্ত মেয়ে হয়েছে বলে কে জানে, কবিতাগুলি তার হু হু করে ছাপা হতে লাগলো। তার শরীরের বিদ্য-মানতার মতো নিজের নামটাও সে গোপন করলো না।

কেউ-কেউ অবশ্যি কোনো-কোনো কবিতা ফেরত দিলে, কেউ-কেউ বা সেগুলি ছাপলো পাইকা-অক্ষরে, প্রথম পৃষ্ঠায়। একের যা খেলনা, তাই আবার অপরের মৃত্যু।

কিন্তু দিন যতোই যাচ্ছে, বীথি দুই হাতে গুনে আর কুলোতে পাচ্ছে না, তার এতো আত্মীয় এতোদিন ছিলো কোথায়? এবং মায়ের পেট থেকে পড়েই সবাই এক একটি দুর্ধর্ষ অহিরাবণ!

রেঙ্গুন থেকে বড়দিদি কতোদিন বাদে বীথিকে একটা চিঠি লিখলেন।

লিখলেন:

'চাঁদের আলো'-কাগজে সেদিন একটা কবিতা পড়লুম, নিচে নাম দেখলুম তোর। সত্যি, ওটা তোর লেখা, তোর হাত দিয়ে ওটা বেরিয়েছে? তোর জামাইবাবু শত জোর দিয়ে বললেও আমি কিছুতেই তা মানতে রাজি নই। কোনো কুমারী ভদ্র মেয়ে 'আমি' 'আমি' করে অমন সব জঘন্য কথা ছাপার অক্ষরে লিখতে পারে এ আমি নিজের চোখে বহুবার পড়েও বিশ্বাস করতে পারছি না। ফেরত-ডাকে জবাব দিবি, এ যদি সত্যি তোর লেখা হয় বীথি, ঐ সংখ্যার কাগজটা আমাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।'

তার নন্তু-কাকা, কোনোদিন যিনি তাদের পরিবার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র

আত্মীয়তা দেখাননি, আজকে হঠাৎ বরিশালের কোনো গ্রামে বসে তার জন্যে ভীষণ ভাবিত হয়ে পড়েছেন :

'তোমার চরিত্রের এই অধঃপতন দেখে মর্মাহত হলুম। তোমার এখনো বিয়ে হয়নি, কিন্তু তোমার মুখে এ-সব কি কুৎসিত কাতরোক্তি! প্রেম – প্রেম ছাড়া কি মানুষের আর কিছু লেখবার নেই ?'

মামাবাবু তো মরিয়া হয়ে তার মুখের উপর রুখে এলেন : 'তোর জন্যে আমি প্রায় এক বিলেত-ফেরত পাত্র ঠিক করেছিলুম, কিন্তু এ-সব তুই কি লিখেছিস কবিতা করে ? এর পর তোর এই সব কীর্তি জেনে তোকে কেউ আর বিয়ে করতে রাজি হবে নাকি ভেবেছিস ?'

মামিমা তপ্ত তেলে ফোড়ন দিলেন, 'ধরে-বেঁধে বিয়ে একটা কেউ দিলে না বলেই তো মেয়েকে শেষকালে কীর্তি করতে হচ্ছে !' বীথির দিকে চেয়ে বললেন, 'যাকে ভালোবেসেছিস, তাকেই বিয়ে করে ফ্যাল্ না বাপু, বিয়ে হয়ে গেলে তবু যেন তা সওয়া যায়, নইলে এ কি অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড !'

'কাকে ভালোবেসেছিস ?' মামাবাবু তিক্তমুখে গর্জন করে উঠলেন।

বীথি বোকার মতো চারিদিকে চাইতে লাগলো।

'তা কি করবে বলো !' সমবেদনায় মামিমার মুখ থমথমে হয়ে উঠলো, 'বিয়ে যখন হচ্ছেই না, তখন বুদ্ধিমানের মতো কবিতায় লোক যোগাড় করতে বেরিয়েছে। উপায় কি তা ছাড়া ! তবু যদি কারুর হুঁস হয়। কি জানি লিখেছিস সেই কবিতাটা, মনেও নেই ছাই আগাগোড়া—সেই যে, তুমি এসো, তুমি এসে তোমার একটি স্পর্শে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দাও—' মামিমা হঠাৎ হাসিতে গড়িয়ে পড়লেন, 'আজকালকার মেয়েরা কতো ঢঙের কথাই যে শিখেছে !'

হাওয়ায় আর বীথির কান পাতবার জো নেই ! প্রতিটি পাতার মর্মরে, প্রতিটি মানুষের নিশ্বাসে সে তার চরিত্রহানির খবর শুনছে। মেয়ে হয়ে যখন সে প্রেমের কবিতা লিখলো, তখন তো সে শরীরে-মনে অশুচিই হয়ে গেছে ধরতে হবে। তোমার শরীরকেই শুধু আবৃত করে রাখলে চলবে না, তোমার মনকেও রাখতে হবে মৌনী করে।

তারপর বিনায়কবাবুর চিঠি এলো। বীথি উঠলো উৎফুল্ল হয়ে।

কিন্তু প্রথম লাইনেই সে প্রচণ্ড একটা হোঁচট খেলে।

বিনায়কবাবু লিখছেন :

তোমার কাছ থেকে এ আমি কখনো আশা করতে পারিনি বীথি। আগে-আগে তোমার কবিতায় কতো চমৎকার প্রকৃতি-বর্ণনা থাকতো, কতো ঐশ্বরিক ভাব, কতো সুন্দর সদুপদেশ তুমি আজকাল সে-সব মহান গুণ নির্বিবাদে বর্জন করেছ। সব চেয়ে অবাক হচ্ছি, তুমি আজকাল ছন্দ মিলিয়ে পর্যন্ত লিখছ না। তোমার ওগুলি গদ্য না কবিতা এ জ্ঞান আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। ভাষায়, ভাবে, এমন কি ছন্দে পর্যন্ত তোমার অমিতাচার দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশের বড়ো-বড়ো মহিলা-কবির নাম করো, মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায়, কেউ তোমার মতো এমন অশোভন ও অসঙ্গত বিদ্রোহ করেননি, সবাই কেমন স্বচ্ছ ভাষায় স্নিগ্ধ উপদেশ বিতরণ করে এসেছেন। তাঁদের

একজন হয়ে মাঝখান থেকে তুমি এমন হতবুদ্ধি হতে গেলে কেন? তোমার ভয় করলো না?

কেউ তোমাকে ভালো বলছে না। তোমার চোখে পড়েছে কিনা জানি না, কলকাতারই কতোগুলি কাগজ তোমার কবিতা নিয়ে যাচ্ছেতাই কটু-কাটব্য করে আমাকে কাটিংস পাঠিয়েছে। লজ্জায় আমি কাউকে মুখ দেখাতে পারছি না। তোমার সুনাম নিয়ে নানা জনে নানা রকম কথা বলতে শুরু করেছে। তোমার মা তো রাত্রে দুচোখ একত্র করতে পারছেন না। ও-সব কবিতা তুমি কেন লিখতে গেলে, বীথি?

এতো লেখাপড়া তোমাকে তবে শেখালুম কেন? তুমি কি আজও বুঝলে না পৃথিবীতে সেই কাব্যই অমর যাতে ঐশ্বরিক ভাব থাকে, যাতে থাকে সত্য শিব সুন্দরের উপাসনা। তুমি কিনা সেই উচ্চাদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিম্নস্তরের কতো-গুলি প্রবৃত্তি নিয়ে ভাষার ব্যাভিচার করছ! তোমার এই অবনতি আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতুম না, বীথি। কবিতা তুমি লেখ, কে তা বারণ করছে, কিন্তু এমন কবিতা লেখ যা পড়ে লোকে উন্নত হতে পারে, শোকতাপ ভুলতে পারে, ঈশ্বরের কাছাকাছি আসতে পারে। এমন কবিতা লেখ যা প্রতি ঘরে-ঘরে ছেলেমেয়েরা সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশান-এ যেতে পারে—আমি তা নিজের খরচে ছাপিয়ে টেক্সট-বুক কমিটি থেকে এপ্রুভ করিয়ে নেবো। সেই সব চেষ্টা না করে তুমি কিনা এমন সব অকথ্য কবিতা লিখছ যা ভদ্রলোকের পাতে দেয়া দূরে থাক, আমাদেরই মাথা কাটা যাচ্ছে।

শোনো বীথি, তোমার এই অমূল্য সময় এমনি করে অপব্যয় করবার কথা নয়—তোমার সামনে কতো বড়ো কর্তব্য পড়ে আছে। তুমি তা পালন করতে পারবে বলেই তোমাকে এতো উপযুক্ত করে তুলেছিলুম—দিয়েছিলুম তোমাকে এতো উন্মুক্ত স্বাধীনতা। এখনো বিশ্বাস করি, তুচ্ছ কতোগুলি ভাবপ্রবণ বিলাসিতায় তুমি নিজেকে ক্ষয় করবে না, সেই স্বাধীনতার সম্মান রাখতে পারবে। আমাদের দিকে মাঝে-মাঝে চেয়ে দেখো, আমরা সংসারে যাতে ছোট হয়ে যাই তুমি কি তাই কামনা করো?

যুদ্ধে যে নেমেছে তার কি কখনো বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে থাকলে চলে? তোমার জয়ী হবার কথা, যশস্বী হবার কথা। তোমার কেন এই অস্বাস্থ্যকর সম্মোহন আসবে?

আমার বেশি লেখা ধৃষ্টতা মনে করতে পারো। হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করছি, বীথি। তুমি বড়ো হয়ে উঠেছ, চিন্তা করে দেখলে তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে। পাঁচজনের কথা আমি কিছু বিশ্বাস করি না, কেননা আমি জানি তুমি সেই জাতের জলীয় মেয়ে নও, তোমার সবল একটা মেরুদণ্ড আছে, কিন্তু তবু পাঁচজনে যাতে ভালোই বলে, তাই কি আমাদের কাম্য হওয়া উচিত নয়?

চিঠি পড়া সাঙ্গ করে বীথি জানলায় এসে দাঁড়ালো। তার চোখের জলে সমস্ত আকাশ যেন হঠাৎ মুছে গেছে।

কিন্তু কতোক্ষণ তুমি কাঁদতে পারো ? তোমাকে এখন ইস্কুলে যেতে হবে না ? ছি-ছি-ছি—দেয়ালগুলো পর্যন্ত তাকে দাঁত বের করে ধিক্কার দিয়ে উঠলো। সকল কাজকর্ম ফেলে বীথি কিনা এখন কাঁদতে বসেছে ? যুদ্ধে যে নামলো তার ক্ষতমুখে অনর্গল রক্ত না বেরিয়ে চোখে কিনা সামান্য ক'টা চোখের জলের ফোঁটা! বীথি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একা ঘরে তার নিজের চোখে জল দেখতে পেয়ে তার ভীষণ ভয় করছে।

কিন্তু আশ্চর্য, মেজদির তো কই একটাও চিঠি এলো না।

না, তা-ও এল বৈকি একদিন। লিখেছে—ছোট্ট একটি পোস্টকার্ডে :

আমরা কদিন হলো বদলি হয়ে এখানে এসেছি, বীথি। সময় পেলে উপরের ঠিকানায় এসে একদিন দেখা করে যাস।

ঠিকানা চিনে বাড়ি গিয়ে বীথি দেখে—বাড়িতে মেজদিরা কেউ নেই। চাকরটা বললে, 'মা আর বাবু খোকা আর খুকুমণি সমেত বায়স্কোপ দেখতে গেছেন। ট্যাক্সি করে যখন গেছেন, তখন এই ফিরলেন বলে।'

যেন তার কবিতার চেয়েও এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার, এমনি বিস্ময়ে বীথি চাকরটার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

'মা আর বাবু খোকা আর খুকুকে নিয়ে বায়স্কোপ দেখতে গেছেন' — ঘরদোরের সমস্ত চেহারাও সেই কথাই বলছে বটে।

একটেরে ছোট্ট একখানা একতলা বাড়ি, সব মিলে তার ঘরটার চেয়েও হয়তো ছোট—বীথি খুঁটে-খুঁটে দেখে শেষ করতে পারছে না, কদিনে মেজদি সমস্ত কি রকম নিখুঁত গুছিয়ে নিয়েছে—কিন্তু দেখে ও শুনে, ছুঁয়ে ও শুঁকে, স্পষ্ট সে অনুভব করতে পারছে, জামাইবাবু আর মেজদি আজ একসঙ্গে ট্যাক্সি করে বায়স্কোপ দেখতেই গিয়ে থাকবেন।

'ওমা, বীথি যে! অনেকক্ষণ ধরে বসে আছিস বুঝি ?' শাড়িতে-গয়নায় মেজদি ঝলমল করে উঠলো, 'কি করবো ওঁর আজকে ভারি শখ হলো, কি নাকি কোথায় একটা নতুন বায়স্কোপ এসেছে, আমাকে নিয়ে যাবেন দেখাতে। কেমন আছিস তুই ?'

'যেমন দেখছ,' বীথি হাসিমুখে বললে, 'তা হলে জামাইবাবু আজকাল তোমাকে সটান বায়স্কোপ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে ?'

চোখের কোণে মেজদি তার ইশারাটা ধরে ফেললো ; লজ্জায় একটু ঝিলিক দিয়ে বললে, 'না নিয়ে গিয়ে উপায় কি! যাবে কোথায় ? দুটো লোক পাশাপাশি থেকে কতোদিন আর মারামারি করতে পারে বল ?'

'এটা কি করে সম্ভব হলো, মেজদি ?'

'দেখছিস না আমি এখন কেমন মা হয়েছি!' মেজদি তার কোলের মেয়ের দিকে বিহ্বল চোখে তাকালো, 'দেখছিস না কেমন ছোট্ট একটা আলাদা বাসা নিয়েছি দুজনে এখানে! ওঁর বদলি হওয়াতেই বেঁচে গেলুম, বীথি', মেজদি গলাটাকে ধূসর করে তুললো, 'দেখছিস না শাশুড়িদের কাউকেই আনিনি সঙ্গে করে। তুলে-তুলে মাস-মাস খরচ দেয়াও ভালো, তবু বাপু আর পাঁচজনের মধ্যে একসঙ্গে থাকা নয়। এখন বায়স্কোপ যাওয়া আমার কে আটকায় ?'

মেজদি হাসিতে উছলে উঠলো, 'এখন আর কার সাধ্যি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে? ঝগড়া করলে তাকে রান্না করে দেবে কে? এখন যদি একবার দেখিস বীথি, তার তোয়াজের ঘটা'—মেজদি টানতে-টানতে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে এলো, 'নামও শুনিনি ভাই কতো রাজ্যের গন্ধ আর তেল, স্নো আর পাউডার। একটু হেঁচেছি কি অমনি এসে গেলো ডাক্তার। তোকে বলতে লজ্জা নেই বীথি, শুধু ঐ শাশুড়ির জন্যেই এতোদিন তিনি আমাকে ভালোবাসতে পারেননি। নির্জন না হলে কখনো প্রেম জমে?'

চাকর খুকির জন্যে বোতলে করে গরম দুধ নিয়ে এলো।

মেজদি নিজেকে হঠাৎ সংশোধন করলে, 'আমি কেবল নিজের কথাই পাঁচ কাহন বলে যাচ্ছি। তারপর তোর কি খবর?'

'আমি যে কতোগুলি প্রেমের কবিতা লিখেছি তা তুমি এখনো পড়োনি, মেজদি?' বীথি আকর্ণ রঙিন হয়ে জিগগেস করলে।

'কিসের কবিতা?'

'প্রেমের।'

মেজদি হঠাৎ হেসে ছিটিয়ে পড়লো চারদিকে, 'তুই—এখনো তোর বিয়ে হয়নি, তুই প্রেমের কি জানিস, পোড়ারমুখি?'

'জানি না বলেই তো মুখ পুড়িয়ে লিখতে গেছলুম।' বীথি হাসতে পারলো না, 'তুমি পড়োনি তা? বাড়ির ছাদটা ভেঙে পড়েনি তোমার মাথার ওপর?'

বোতলের রবারটা দেখিয়ে খুকিকে লুব্ধ করতে-করতে মেজদি বললে, 'রক্ষে কর্। জলজ্যান্ত একটা প্রেম করেই সময় পাচ্ছি না, এখন আমি ঠাট করে কবিতা পড়তে বসি। তোরা বিদ্যানি হয়েছিস, তোদের কথা আলাদা—তোদের সঙ্গে আমরা পারবো কেন? আদার বেপারি জাহাজের খবর রাখবো কোত্থেকে? তুই বরং ওকে একটু ধর, বীথি, আমি তোকে চা করে দি।'

খুকিকে কোলে নিয়ে বীথি আদর করবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু দুরন্ত খুকি তাকে মোটেই চেনে না, তার কোল থেকে নেমে যাবার জন্যে সবলে সে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করেছে।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে মেজদির প্রসারিত হাতের মধ্যে ওকে ছেড়ে দিয়ে বীথি গা-ঝাড়া দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। বললে, 'বাবাঃ, আমার সাধ্যি ওকে ঠাণ্ডা করে রাখা! দেখ, কোথায় ধরতে ওর কোন হাড়টা কোথায় মটকে দিয়েছি। বাবাঃ, আমাকে কখনো এ-সব শোভা পায়? ছোট ছেলে-মেয়ে কোলে করলে আমার গা-টা এমন ঘিনঘিন করে!'

মেজদি সন্তানগর্বে গর্বিত হয়ে বললেন, 'নিজের মেয়ে হলেই দেখা যাবে।'

'রক্ষে করো,' বীথি মেজদির পাশ ঘেঁষে বসে পড়লো, 'পরের মেয়ে হয়েই চোখে-মুখে পথ পাচ্ছি না, তায় আবার নিজের মেয়ে!'

তারপর বীথি 'ভারতীয় নারীর পুণ্য আদর্শ' সম্বন্ধে অভ্রভেদী একটা প্রবন্ধ লিখলে। ভূদেব মুখুজ্জেও তার [illegible] এসে দাঁড়াতে পারলো না।

বিনায়কবাবু আহ্লাদে একেবারে গলে গেলেন। সর্বাণী শোকশয্যা নিয়েছিলেন, তিনিও উঠে বসে তুলে নিলেন মাসিক-পত্রটা। হ্যাঁ, একেই তো বলে লেখার মতো লেখা, কি ভাষার ওজস্বিতা, কি গাম্ভীর্য! এই সব ভালো-ভালো আইডিয়া ছেড়ে ও কিনা গেছলো কবিতা লিখতে। সর্বাণী খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তুমিই তো চিরকাল ওকে খেপিয়ে এসেছ।'

'সে কোন ছেলেবেলাকার কথা। আর কবিতা লিখতে উৎসাহ দিয়েছিলুম ভবিষ্যতে একদিন এমনি ভালো গদ্য লিখতে পারবে বলে। কবিতা যে লেখে. পরে সে ইচ্ছে করলেই ঝরঝর করে গদ্য লিখতে পারে, কিন্তু গদ্য যে লেখে. সে সব সময় না-ও লিখতে পারে কবিতা। দেখলে তো, ওর মধ্যে কতো জিনিস ছিলো,' বিনায়কবাবু ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলেন, 'এই আর্টিকেলটা পড়ে বার-লাইব্রেরিতে কেমন একটা বেশ সোরগোল পড়ে গেছে - সীতারাম বাবু তো তাঁর মেয়ের জন্যে শাদা কাগজে খানিকটা টুকে নিলেন—সেই জায়গাটা গো, যেখানে স্বামীর জন্যে শৈব্যা বিশ্বামিত্রের কাছে আত্ম-বিক্রয় করছে! এখন সবাই কতো প্রশংসা করছে ওকে, একবাক্যে বলছে, মেয়ে তোমার একখানা ভাষা শিখেছিলো বটে, কি ফ্লো, কি ফ্লেয়ার! আমি ভাবছি কি জানো, আমাদের এখানকার লাইব্রেরী থেকে শিশু-পালন নিয়ে রচনা-প্রতিযোগিতা হচ্ছে, মেয়েদের লেখা, যে ফার্স্ট হবে সে একটা রুপোর মেডেল পাবে—আমি বীথিকে আজই একটা চিঠি দি, ও-ও একটা লিখে পাঠাক। দেখো, নির্ঘাত ও ফার্স্ট হবে। এমন ওর ভাষা!'

বিনায়কবাবু বীথিকে সেই মর্মে একখানা চিঠি লিখলেন। খুচরো কয়েকটা পয়েন্টও দিয়ে দিলেন গায়ে পড়ে।

বিছানায় শুয়ে বীথি শূন্য চোখে চিঠিটার দিকে চেয়ে ছিলো।

'বাবাঃ, কতোক্ষণ ধরে দরজায় নক্ করছি। তোমার আর খোলবার নাম নেই,' টুকু দীপ্ত মুখে ঘরে ঢুকলো, 'কবিতা লিখছিলে বুঝি?'

বীথি আবার তার বিছানায় গিয়ে বসলো। ক্লান্ত গলায় বললে, 'শরীরটা ভালো নেই, টুকু-দা, বিছানায় এমনি শুয়ে ছিলুম, উঠতে ইচ্ছে করছিলো না।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'কেমন জ্বর-জ্বর করছে।'

'কবিদের এক আধটু জ্বর হওয়া ভালো' টুকু ভুরুটা একটু তেরছা করলো, 'গায়ে একটু জ্বর থাকলেই নাকি কবিদের মনে ইনস্পিরেশান আসে।'

'আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি, টুকুদা।'

'ছেড়ে দিয়েছ? কেন?'

'তোমার সেই নির্মম উক্তিটা চিরকালের জন্যে সপ্রমাণ করে দিতে.' বীথি ঠাণ্ডা, মরা গলায় বললে, 'যে, বাঙলা দেশে কোনো কালে সত্যিকারের মেয়ে কবি জন্মাতে পারবে না।'

'কোনো কালে পারেনি বলে তুমি হতে পারবে না কি?' টুকু চেয়ারের মধ্যে ছটফট করে উঠলো, 'তুমি লেখা ছেড়ে দিতে যাবে কেন? তোমার কি দুঃখ!'

বিমর্ষ চোখের পাতা দুটি একটু কাঁপিয়ে বীথি করুণ করে বললে, 'লোকে ভালো বলে না যে ।'

'সেই জন্যেই তো তোমাকে আরো বেশি করে লিখতে হবে ।' টুকু শিখার মতো সমস্ত শরীরে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো, 'লোকে যে ভালো বলে না সেইখানেই তো তোমার দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে, বীথি ।'

'পাগল । আমরা যে মেয়ে ।' বীথি দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে ভঙ্গিটা দুর্বল করে আনলো, 'কবিত্বের চেয়ে সতীত্ব আমাদের বড়ো জিনিস, টুকু-দা । আমাদের নামের দরকার নেই, আমাদের সুনামের দরকার । আমরা তেমন কোনো জিনিস লিখতে পারি না যাতে লোকে আমাদের চরিত্রে দোষারোপ করতে পারে । তাই আমরা মেয়েদের মতোই লিখতে পারি টুকু-দা, মানুষের মতো পারি না ।'

টুকু তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো ।

'সেই জন্যেই বাঙলা-দেশে কোনো মেয়ে-কবি জন্মালো না,' বীথি ছায়ার মতো বিবর্ণ গলায় বলতে লাগলো, 'একে তো আমাদের নিজেদের বলে আলাদা একটা ঘর নেই, তায় নেই টাকা—বাপের যদি সম্পত্তি থাকে, সে-সম্পত্তি পর্যন্ত আমি পাবো না—তায় আবার এই সতীত্বের অত্যাচার ! বড়ো কবিতা কি করে হবে, টুকুদা—টবে কখনো ফুলের মতো ফুল ফোটে, শাসন কখনো আর্ট ? আমি ভালোবাসি—এই সমস্ত কথাটা সহজ, সরল, সত্যবিশ্বাসে, বুক ভরে, সমস্ত দেহ-প্রাণ দিয়ে কোনো মেয়ে বলতে পেরেছে কোনোদিন ? কি করেই বা পারবে ? চারদিকে সতীত্ব রয়েছে যে সঙিন উঁচিয়ে ।'

বীথি আস্তে-আস্তে বালিশে ভেঙে পড়লো । বললে, 'শুধু আমাদের দেশে কেন, মনে হয় ইংলণ্ডেও একদিন ছিলো, এবং সেটা বেশি দিনের কথা নয় । মনে হয়, সতীত্বের ভয়ে সে-দেশের মেয়ে-প্রতিভাও একদিন কুঁকড়ে ছিলো, টুকুদা । নইলে বলো, শালট ব্রঁতে কেন কারার বেল নাম নিতে যাবে, মেরি ইভান্স কেন লিখতে যাবে জর্জ এলিয়াট-এর ছদ্মনামে ?'

টুকু আমতা আমতা করে বললে, 'কিন্তু সেই যুগেই এলিজাবেথ ব্যারেট নামে আরেকটি মেয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে ।'

'বোলো না, ব্যারেটের কথা বোলো না ।' বীথি বালিশে হঠাৎ মুখ লুকালো 'তার ব্রাউনিং ছিলো । দুর্দাম, দুর্ধর্ষ ব্রাউনিং । ব্রাউনিং না থাকলে সে-ও বাঁচতো না, টুকু-দা । নইলে, জানো তো তারও একজন বাপ ছিলো, আর সে কি কালাপাহাড় বাপ, মেয়ে পোর্ট খাবে না, তবু সে তাকে জোর করে পোর্ট খাওয়াবে, ডাক্তাররা তাকে হাওয়া বদলাতে ইটালি যেতে বলছে, তবু সে তাকে জোর করে উইম্পোল স্ট্রিটেই আটকে রাখবে—ব্রাউনিং ছাড়া সে মুক্তি পেতো না, প্রেম পেয়ে তার এতোদিনের একটা দুরারোগ্য অসুখ পর্যন্ত সেরে গেলো ।'

'কিন্তু তোমারও বা কি ভয় !' টুকু দৃঢ়, স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, 'তুমিও তো পেয়ে গেছ তোমার স্বাধীনতা ।'

'একে স্বাধীনতা বোলো না, টুকু-দা । ফাঁকায় গিয়ে গায়ে খানিকটা হাওয়া লাগিয়ে এলেই সেটাকে স্বাধীন হওয়া বলে না ।'

'তাই বলে তুমি আর লিখবে না, বীথি ?' টুকু ঝলসে উঠলো।

'না, লিখবো বৈকি।'

'কি লিখবে ?'

'প্রবন্ধ লিখবো।'

'তাই লেখো।' টুকু চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলো, 'এমন প্রবন্ধ লেখো যা পড়ে তোমার ঐ লোকগুলো, সেই একতার মত মূর্খতা, সমস্ত শরীরে বিছুটির বাড়ি খেয়ে চিড়বিড় করে ওঠে। রাগো, আপাদমস্তক চটে ওঠো, বীথি, রাগ একটা মানুষের স্বাস্থ্যকর সঞ্চালন, সেই রাগে, সেই ঘৃণায় তোমার কলম তলোয়ারের চেয়েও ধারালো হয়ে উঠুক। প্রেম নিয়ে না লেখো, ঘৃণা নিয়ে লেখো, ঘা মেরে-মেরে ওদের তুমি বাঁচাও।'

বীথি শান্ত, নিরুদ্বেগ গলায় বললে, 'আমি শিশুপালন নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখবো, টুকু-দা।'

প্রথম ঘা-টা টুকুকেই নিতে হলো দেখছি। শূন্য গলায় জিগগেস করলে, কি নিয়ে লিখবে ?'

'শিশু-পালন নিয়ে।'

'শি-শু-পা-ল-ন ?'

'হ্যাঁ।'

টুকু হাসবে না কাঁদবে কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। বললে, 'তুমি শিশু-পালনের কি জানো ?'

বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বীথি কী রকম করে যেন হেসে উঠলো, 'আমি প্রেমেরই বা কি জানতুম ?'

'তুমি নিশ্চয়ই ভুল বকছ বীথি।' টুকু এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো, 'তোমার জ্বরটা নিশ্চয়ই বেড়েছে।'

'মোটেই নয়,' মসৃণ দাঁতে বীথি পরিচ্ছন্ন হেসে উঠলো, 'শিশু পালন নিয়ে ভালো প্রবন্ধ লিখতে পারলে আস্ত একটা মেডেল পাওয়া যাবে, প্রেম নিয়ে কবিতা লিখলে দুর্নাম ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না।'

'যা বলেছি, বীথি,' টুকু এগিয়ে এসে বীথির কপালে হাত রাখলো, 'তোমার যে ভীষণ জ্বর। প্রায় একশো-তিন-চারের কাছাকাছি হবে। এখানে শুয়ে করছ কি ?'

'তবে আমাকে কি করতে হবে ?' পায়ের তলা থেকে মোটা চাদরটা বীথি গায়ের উপর টেনে দিলো।

টুকু ব্যাকুল হয়ে বললে, 'বাড়ি চলো। এ কি ভয়ানক কাণ্ড !'

'থাক, আমাকে নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।' ছলছলে চোখ তুলে বীথি টুকুর দিকে একবার তাকালো, 'আমি এখন স্বাধীন হয়েছি না ?'

'যাই, বাবাকে খবর দিই গে।' টুকু এক পায়ে এগোতে গেলো, আরেক পায়ে রইলো থেমে।

'খবরদার, টুকুদা,' বীথি প্রখর গলায় পরিষ্কার ধমকে উঠলো, 'তোমাকে গিয়ে সর্দারি করতে হবে না। সবাই মিলে আমাকে নিয়ে যে কেবল আলোচনা

করবে, এ আমি আর সহ্য করতে পারবো না বলে রাখছি। বাঁচবার স্বাধীনতা না থাকে, জোর করে তোমরা কারুর মরবার স্বাধীনতাও কেড়ে রাখতে পারো নাকি? যাও, বাড়ি যাও, এখানে দাঁড়িয়ে আছো কি বোকার মতো?' বীথি চাদরটা মাথার ওপর দিয়ে টেনে দিলো।

টুকু কিছুই হদিস করতে পারলো না।

চাদরের তলা থেকে বীথি আবার বললে, 'তোমাকে গিয়ে বাবাকে খবর দিতে হবে না, টুকু-দা, দয়া করে আমার ঝিটাকে এখন একটু খবর দিলেই আমি বর্তে যাই।'

টুকু এতোক্ষণে যেন তবু একটা কিছু করবার পেয়েছে।

দরজার কড়ার একটা মৃদু আওয়াজ হলো।

জ্বরো, তেতো গলায় বীথি জিগগেস করলো, 'কে?'

ও-পিঠ থেকে উত্তর দেবার যেন আর কথা ওঠে না। যেন অনুমতি নেবারও কোনো দরকার নেই, এমনি ভাবে সমরেশ ঘরে ঢুকে পড়লো।

'এই যে, আপনি।' বীথি তার বিছানার সঙ্গে লেপটে মিশে গেলো, হাঁটুর কাছেকার গুটানো চাদরটা আস্তে-আস্তে কনুই পর্যন্ত টেনে এনে নিজেকে আরো সে সঙ্কীর্ণ করে নিলে।

'শুনলুম নাকি আপনার খুব জ্বর হয়েছে?' সমরেশ এক-পা এগিয়ে এলো।

'আপনাকে আবার কে বললে?' বীথির স্বরে বিরক্তির ক্ষীণ একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

'টুকু—টুকুর কাছে শুনলুম।' তার শিয়রের দিকে সমরেশ আরো একটা পা ফেললে।

'টুকু-দার সব তাতেই বাড়াবাড়ি' বীথির স্বর গাম্ভীর্যে অস্ফুট হয়ে এলো। সমরেশকে এবার চোখের উপর স্পষ্ট দেখা গেলো। দুই কাঁধ প্রসারিত করে এমন ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে যে তাকে ভয় করতে লাগলো রীতিমতো। এতো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যেন হাতটা একটু বাড়িয়ে দিলেই তাকে ধরা যায়।

সমরেশ বললে, 'বাড়িতে খবর দিয়েছেন?'

বীথি দেয়ালের দিকে আলগোছে একটু সরে গেলো, চাদরটা কাঁধ পর্যন্ত আস্তে তুলে দিলে। বললে, 'এ আবার এমন কি একটা অসুখ যে বাড়িতে সাত-তাড়াতাড়ি খবর পাঠাতে হবে! মিছিমিছি তাঁদের ভাবিয়ে তোলা।'

'কিন্তু আপনার মামাবাড়িতে?'

'টুকু-দাকে বলে দিয়েছি মামাবাড়িতে যেন কোনো খবর না দেয়।'

'কেন?' সমরেশ অবাক হয়ে গেলো।

'কেননা,' বীথি প্রায় বালিশের কানে-কানে বললে, 'কেননা সংসারে আমার কোনোকালে অসুখ হবার কথা নয়।' বীথি সমরেশের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তা হলে মুখটা এতোখানি তুলে ধরতে হয় যে তার ভীষণ লজ্জা করতে লাগলো, তেমনি কুণ্ঠিত হয়েই বললে, 'কিন্তু সটান আপনাকে গিয়ে যে

সে খবর দিতে পারে সেটা ভেবে দেখিনি। এবার এলে তাকে শাসন করে দিতে হবে।'

'তাকে যতো খুশি শাসন করুন গে,' সমরেশ উদাসীনের মতো বললে, 'কিন্তু ডাক্তার ডেকে পাঠিয়েছিলেন?'

'কি দরকার!'

'কি দরকার মানে? আপনার আজ চার দিন ধরে সমানে জ্বর চলছে, নানা-রকম সিম্পটম শুনতে পাচ্ছি—'

'টুকু-দা ব্যস্ত হয়েছিলো বটে, কিন্তু তাকে আমি খুব কড়া করে ধমকে দিয়েছি', বীথি হাসবার একটা অপার্থিব চেষ্টা করলো, 'বলে দিয়েছি, ডাক্তারের পেছনে অযথা খানিকটা বিলাসিতা করবার আমার রুচি নেই।'

'আপনার টুকু-দার মতো পৃথিবীর সমস্ত লোককে আপনি ধমক দিতে পারেন না।' সমরেশ বুঝি খাটের ধার ঘেঁষে প্রায় সরে এলো, 'আপনার এখন জ্বর কতো?'

বীথির ভয় করতে লাগলো, ঠাণ্ডা, ভারি, নিরবয়ব একটা ভয়। এর আগে আরো অনেকবার সমরেশ এখানে এসেছে, এবং এমনিই একলা, কিন্তু, আশ্চর্য, কোনোদিন নিজেকে তার এমন একলা মনে হয়নি। আর-আর দিন সে এসেছে অনুমতি নিয়ে, অনুনয়ে স্নিগ্ধ হয়ে, প্রায় কৃতার্থ হবার ভঙ্গিতে: আজকে হঠাৎ তার গায়ে এই প্রবল জ্বরের মতো জোর করে সে এসে পড়েছে, অকুণ্ঠ অধিকারের দাবিতে, প্রায় একটা সহজ অপ্রতিরোধ্যতায়। এর আগে কোনোদিন তাদের আলাপ এতো বাস্তব, এতো ব্যক্তিগত ছিলো না, বীথি তার নির্মল, নির্মম বিচ্ছিন্নতায় প্রখর, নির্দিষ্ট হয়ে থাকতো। সে-সেদিন সে ছিলো বসে বা দাঁড়িয়ে, আজ তার শুয়ে থাকার এই নিশ্চল, সমর্পিত ভঙ্গিটাই তাকে সমস্ত শরীরে দুর্বল, অসহায় করে রেখেছে। হালকা করে একটা নিশ্বাস পর্যন্ত সে ছাড়তে পারছে না। অনড় শূন্যতাটা কেমন ভার হয়ে আছে, পাচ্ছে না যেন সে তার আগেকার সেই ব্যবধানের পবিত্রতা, সেই তার ঘন, পর্যাপ্ত পরিমিতি।

শরীর থেকে নিশ্চিহ্ন মুছে গিয়ে বীথি শাদা গলায় বললে, 'জানি না। আমার এখানে থার্মোমিটার নেই।'

'যদি কিছু মনে না করেন,' সমরেশের ডান হাতের আঙুলগুলি যেন হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো, 'আপনার হাতটা একবারটি আমাকে দেখতে দেবেন?'

বীথি চাদরটা চিবুক পর্যন্ত গুটিয়ে নিলে। কবরের তলা থেকে বললে, 'আপনি কি ডাক্তার নাকি?'

'বেশ, তবে ডাক্তারকেই দেখাবেন।' সমরেশ এক লাফে দরজার কাছে সরে গেলো।

'এ কি, কোথায় চললেন?' বীথির যেন আরো বেশি ভয় করতে লাগলো।

'ডাক্তার নিয়ে আসতে।'

'ডাক্তার?'

'হ্যাঁ,' সমরেশ হাসিমুখে বললে, 'এমন ভাবে কথা বলছেন আপনাকে এক্ষুনি টন সিল কাটাতে হচ্ছে!'

বীথি ভারি, বিস্বাদ গলায় বললে, 'তার কোনো দরকার নেই।'

'আপনার কি দরকার না দরকার আপনি কি সব বোঝেন নাকি ?'

'তবে কি সেটা আমার আপনার কাছ থেকেই বুঝতে হবে ?'

'দরকার হলে তা-ও বুঝতে হবে বৈকি,' সমরেশ দরাজ গলায় বললে, 'চোখের সামনে বিপন্ন একটা লোককে তো আর মরতে দেখতে পারি না।'

'মরতে দেখবার জন্য কে আপনাকে এখানে নেমন্তন্ন করে এনেছে ?' বীথি ঝাঁজালো গলায় বললে, 'আপনার নিজের কাজ দেখুন গে যান।'

সমরেশ হঠাৎ জোরে শব্দ করে হেসে উঠলো, 'কোনটা যে কখন চোখের নিমেষে নিজের কাজ হয়ে ওঠে কেউ বলতে পারে না। একটু শুয়ে থাকুন, এই কাছেই আমার জানা ডাক্তার আছে, আমি এখুনি গিয়ে নিয়ে আসছি। ভয় নেই।'

'সে-কথা আপনার কাছ থেকে শোনবার জন্যে আমি বসে ছিলুম না।' পাশের দেয়ালটাকে বীথি সম্বোধন করলে, 'আমার জন্যে আপনার অকারণ ব্যস্ত হতে হবে না। পৃথিবীতে আমি ঠুনকো একটা কাঁচের পেয়ালার মতো ভেঙে যেতে আসিনি।'

'বেশ তো, অটুটই না-হয় রইলেন,' সমরেশ দরজার বাইরে পা বাড়িয়ে বললে, 'কিন্তু ডাক্তার নিয়ে আসতে আমার একটুও দেরি হবে না। এই মোড়েই তো তার ডিসপেনসারি।'

যেমন সহজে সে এসেছিলো ততোধিক সহজে সে বেরিয়ে গেলো। এর মাঝে কোথাও সে একটা হোঁচট খেলো না।

বীথি চেঁচিয়ে উঠলো, 'শুনুন।'

সিঁড়িটা সবে ছুঁয়েছে, ডাক শুনে সমরেশ ফের ফিরে এলো।

কিন্তু এতে ঘরের অবস্থাটা বিশেষ হালকা হয়ে উঠলো না। বীথির গা ভরে তেমনি আবার একটা বন্য ভয় করতে লাগলো। ভয়টাও একটা চমৎকার উত্তেজনা। ভয়ের মাঝেও যে এমন একটা স্বাদু আছে বীথি তা কোনোদিন অনুভব করেনি। কিন্তু আশ্চর্য, ভয়-ই বা সে করতে যাবে কেন ?

বীথি কঠিন হবার জন্যে উঠে বসবার ভঙ্গুর একটা চেষ্টা করলো। বললে, 'মিছিমিছি আপনি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছেন। ডাক্তার এলে আমি তাকে তক্ষুনি তাড়িয়ে দিতুম, বলতুম, যিনি আপনাকে ডেকেছেন তাঁর চিকিৎসা করুন গে।'

'আমার চিকিৎসাটা পরে হবে, কিন্তু,' সমরেশ শিয়রের দিকে দূরের বন্ধ জানলার কাছে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো, 'কিন্তু দরজা বন্ধ করেছেন, বুঝি, বেচারা জানলাটা কি দোষ করলো ?'

'তবে আমি উঠে গিয়ে ওটা খুলে দিয়ে আসবো, তাই আপনি আশা করেন নাকি ?' জানলার দিকে সমরেশ এগিয়ে যাবার সময়টিতে বীথি তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরিয়ে চোখ দিয়ে তাকে একটু অনুসরণ করলে। ঢিলে পাঞ্জাবির তলায় তার স্ফীত, দৃঢ় দুই কাঁধ ও তার উপরে মাথার সেই উদ্ধত স্পর্ধা ছাড়া কিছুই সে আর দেখতে পেলো না।

সমরেশের ফিরে আসবার সময়টুকুতে সে আবার বালিশে ভেঙে পড়লো।

বললে, 'গায়ে যদি সেই সামর্থ্য থাকতো, তবে তো অনায়াসে দরজাটাই খিল দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারতুম। ডাক্তারি নিয়ে আপনার এই অন্যায় অত্যাচার আর সইতে হতো না। নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি বলেই না—' মুখের কথাটা আলতো করে তুলে নিয়ে সমরেশ বললে 'মাপ করবেন, এতো সুন্দর হয়ে উঠেছেন।' বীথিকে চোখে-মুখে একটু চটবার পর্যন্ত সে সময় দিলে না, 'দুর্বলতাটা এক-এক সময় আমাদের চরিত্রের প্রকাণ্ড একটা শোভা হয়ে দেখা দেয়।'

বীথি যে কতো দুর্বল সেই মুহূর্তে যেন তা স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো। তার মেরুদণ্ডটা যেন আজ দুর্বলতায় নেতিয়ে পড়েছে।

'বেশ তো ডাক্তার আনতে না দেন,' খাটের পাশে সমরেশ একটা চেয়ার এনে বসে পড়লো, 'আমাদের বাড়িতেই চলুন তবে।'

'কোথায় ?' বীথি যেন খাটের থেকে মাটির উপর খসে পড়লো।

'আমাদের বাড়িতে,' সমরেশ সহজ, নিখাদ, প্রসন্ন গলায় বললে।

'আপনাদের বাড়িতে ?' বীথির সমস্ত রক্ত মাথার মধ্যে এসে জমাট বাধলো বুঝি।

'হ্যাঁ,' সমরেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সেই তার স্পর্ধিত দৃপ্তিতে, বললে, 'হ্যাঁ, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আপনাকে আমি আমাদের বাড়িতেই নিয়ে যেতে এসেছি।'

দুর্বলতারও একটা সীমা আছে। আঁকাবাঁকা রেখায় টলতে-টলতে বীথি উঠে বসলো। তীক্ষ্ম, তপ্ত গলায় বললে, 'আপনি কি বলতে চান ?' রাগটা যেন তাতেও প্রাঞ্জল হলো না, তাই আরেক পরদা চড়ায় তাকে উঠতে হলো, 'হোয়াট ডু ইউ মীন ?'

'সামান্যই।' সমরেশ উঠলো হেসে, 'বলতে চাচ্ছি, এই বিচ্ছিরি একা ঘরে জ্বরে আর গরমে কতো আর আপনি পচে মরবেন ? সেবা নেই, চিকিৎসা নেই, রুগী এমনি করে কতোদিন টিকতে পারে ? তার চেয়ে আমাদের ওখানে চলুন, বেশ ভালো হবে।'

বীথি শুকনো, খসখসে দুটি ঠোঁট ধারালো করে বললে, 'আপনি কি আমার অভিভাবক নাকি ?'

'কি আর করা যাবে ! আপনার অভিভাবকেরা তো টুঁ শব্দটিও করছেন না।' সমরেশ তার অটল, উদ্দীপ্ত দৈর্ঘ্যে একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, 'অতএব, কি আর করা, আমাদের বাড়িতেই আপনাকে যেতে হবে। বাড়িটা আমার নয় আ-মা-দে-র ; সেখানে আমার মা আছেন, বোনেরা আছে, বলেন তো আমিই না হয় সেখানে থাকবো না, রোগ নিয়েও আপনাকে আর সংকোচ করতে হবে না কোনো। চলুন, মা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। সত্যি।'

'আপনার দয়াকে অনেক ধন্যবাদ।' বীথি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলো, কোলের কাছে চোখ নামিয়ে বললে, 'কিন্তু দয়া বা সহানুভূতি যাই বলুন, আমি ওটাকে ভীষণ ঘৃণা করি।'

'দয়া, সহানুভূতি, আপনি এ সব কি বলছেন মাথামুণ্ডু ?' স্বচ্ছ সরলতায়

সমরেশের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো. 'কাকে যে কি বলে তা দিয়ে আমাদের কি হবে ?' সমরেশ আবার অতি সহজেই যেন খাটের দিকে অগ্রসর হলো, 'আপনি চলুন।'

বীথি দুই হাঁটুতে কুঁকড়ে গেলো, 'আপনি কি তবে আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে চান নাকি ?'

সমরেশের মুখে সেই প্রশান্ত স্মিতহাস্য. 'যদি দয়া করে অনুমতি দেন, তাও নিয়ে যেতে পারি বৈকি অনায়াসে।'

রাগে ও দুঃখে বীথির চোখে জল দাঁড়িয়ে গেলো, 'আপনি আমাকে বাড়ি বয়ে অপমান করতে এসেছেন ?'

'অপমান ?' সমরেশ আবার শব্দ করে হেসে উঠলো, 'মাঝে-মাঝে অপমানিত বোধ করতে পারাটাও আমাদের চরিত্রের একটা মহিমা। জীবনে সম্মান তো আর এ পর্যন্ত কম পাননি, এখন একটু নিলেনই না-হয় অপমান। কি যায়-আসে !'

বীথির শরীরের শীর্ণতা তার কণ্ঠস্বরে এসে টুকরো-টুকরো হয়ে পড়লো, 'চলে যান, আপনি চলে যান এখান থেকে।'

সমরেশ এতটুকু কোথাও বিচলিত হলো না, শান্ত, স্নিগ্ধ মুখে বললে, 'গায়ে জোর নেই বলেছিলেন, কিন্তু গলার জোর তো দেখছি একতিল কমেনি। চলে যান বললেই বা কি করে চলে যেতে পারি ? শত-কণ্ঠে চেঁচিয়ে চলে যা বললেই তো জ্বরটা আপনার নেমে যাচ্ছে না।' সমরেশ অলক্ষ্যে বুঝি আরও এক পা এগিয়ে এলো। বললে, 'আপনি কিছু বুঝতে পাচ্ছেন না, আপনি চলুন আমাদের বাড়ি।'

দেয়ালটা ছিলো বলেই বীথি তার সঙ্গে মিশে যেতে পারলো। ছুরির মতো শীর্ণ, ধারালো গলায় বললে, 'আপনি আ-মা-র বাড়ি ছেড়ে দয়া করে চলে যান বলছি।'

'দয়া তো আপনি ঘৃণা করেন শুনলুম।'

'চলে যান, নইলে আমি এক্ষুনি চ্যাঁচাবো।' হাতের মুঠো দিয়ে গলার কাছেকার চাদরের অংশটা বীথি শক্ত করে চেপে ধরলো।

'চ্যাঁচাবেন ?' সমরেশ ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলো, 'কিন্তু আমার এই হাসির সঙ্গে আপনার চ্যাঁচানি কি পাল্লা দিয়ে জিততে পারবে ?'

বীথির গায়ে এতোটুকু যেন আর জ্বর নেই, মাটির মতো মরা গলায় বললে, 'পাশের বাড়ির লোকদের আমি এক্ষুনি ডেকে আনবো তবে।'

'তাতে আপনার কি সুবিধে হবে ?' সমরেশের সমস্ত মুখ সেই হাসির ঔজ্জ্বল্যে যেন কাঁপতে লাগলো, 'তার চেয়ে বলুন, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি, আমাদের বাড়িতে, আমার মা'র কাছে আপনাকে পেঁছে দি। একা থাকাটা সব সময়েই বিশেষ নিরাপদ নয়, মিস সেন, শুধু চেঁচিয়েই তার সঙ্গে কোনো লড়া যায় না।'

'না, না, আপনি চলে যান, আমি আপনার কাছে মিনতি করছি,' বীথি দুর্বহ দুর্বলতায় বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লো, 'আমি এই বেশ ভালো আছি, আমাকে এমনি থাকতে দিন দয়া করে।'

'অগত্যা।' সমরেশ দরজার দিকে নির্ভুল এগিয়ে গেলো। সেই শান্ত, সমাহিত মুখে বললে, 'দয়া নয়, আমি যে চলে যাচ্ছি, তবু এটাকে আপনি দয়া মনে করবেন না। বেশ, মাকে আর বোনেদেরই না-হয় এখানে পাঠিয়ে দেবো।' দরজার কাছে এসে বীথির সঙ্গে সমরেশের সামান্য একবার চোখাচোখি হলো, 'আমাকেই না-হয় আপনার অবিশ্বাস, কিন্তু ওঁদের কাছে তো আপনার আর কোনো সংকোচ নেই। কি বলেন মিস সেন, ওঁরা তো আপনাকে আর অপমান করতে আসবেন না।'

সমরেশ বাইরে থেকে দরজাটা আস্তে বন্ধ করে দিলে।

বীথি ভালো হয়ে উঠলো। কিন্তু ভালো হয়ে উঠতে-না-উঠতেই আবার তাকে এক্ষুনি ইস্কুল করতে হবে ভাবতে পৃথিবীতে কোথাও তার এককণা সুখ রইলো না।

শুধু তাই নয়, শরীরের যা হাল, তাকে ট্রামের রাস্তা পর্যন্ত নিয়মিত রিকসা করতে হচ্ছে দুবেলা। শরীরের মহাশয়তার জন্যে কাঁচা কতোগুলো পয়সা গুনগার দিতে হচ্ছে বলে তার শরীরটা চড়চড় করে উঠছে। ঐ পয়সায় তার ছোট-ভাইটার জন্যে মাসে আধ-ডজন অন্তত কে-সি বোসের বার্লি হতো।

সেই জন্যে বিকেলের খাবারটা সে শাদা একটা পাঁউরুটিতে শুকিয়ে এনেছে।

তেমনি একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে বীথি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে একটা পাঁউরুটি চিবোচ্ছে, উড়ে-আসা খোলা একটা চিঠির মতো তার ঘরে একটি মেয়ে এসে হাজির।

রুটির টুকরোটা তার গলা দিয়ে নামাবার পর্যন্ত সময় হলো না, বীথি উথলে উঠলো, 'এ কি, নীলিমা যে! তুই কোত্থেকে? কি খবর?'

নীলিমা সেই প্রশ্নটার ধার দিয়েও গেলো না। আঁৎকে উঠে বললে, 'এ কি মাস্টারনি চেহারা করে বসে আছিস, বীথি? তোকে যে আর চেনাই যায় না।'

বীথি লজ্জিত হয়ে বললে, 'মাঝে একটা যে খুব বড়ো অসুখ থেকে ভুগে উঠলুম।'

'তা তো শুনেছি, কিন্তু এ তো শুধু রোগে-ভোগা চেহারা নয়, এ যে দস্তুরমতো একটা ভূতে-পাওয়া চেহারা।' নীলিমা তার গায়ে একটা ঠেলা দিলো, 'আয়নায় একবার দেখেছিস নিজের মূর্তিটা?'

বীথি পাংশু মুখে বললে, 'আমার স্বাস্থ্যের চেয়ে আমার মূর্তিটাই তোর কাছে বেশি হলো?'

'তা ছাড়া আবার কি!' নীলিমা খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'বিয়ের আগে মেয়েদের স্বাস্থ্যের কথা উঠতেই পারে না। বিয়ের আগে দেখতে হয় শুধু রূপ, স্বাস্থ্যের কথা যদি নিতান্ত আসেই, তা একান্তই বিয়ের পরের পরিচ্ছেদ। বাঙলা-দেশে রূপ আর স্বাস্থ্য তো এক জিনিস নয়।'

'স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও বিয়েটাই মেয়েদের নিরিখ নাকি?'

'নিশ্চয়,' হাসিতে নীলিমা সর্বাঙ্গে পিছল হয়ে উঠেছে, 'দেখিস না আমরা

কেবল এতোদিন রূপেরই চর্চা করে এসেছি, স্বাস্থ্য কোথায়! পড়তে গেছি, জ্ঞানের জন্যে নয়, আমাদের ভালো দেখাবে বলে। কেউ কেউ লাঠি-ঘোরানো শিখছি, মাথায় কারো বাড়ি মারতে নয়, যাতে কিনা ভালো করে উনুনে বসে কাঠি ঠেলতে পারি।'

বীথি অবশ্যি সে-হাসিতে গলা মেলাতে পারলো না; বললে, 'তোকে আজকে হঠাৎ কথায় পেয়ে বসেছে দেখছি। কি খবর?'

'প্রচণ্ড খবর।' নীলিমা হাতের অঞ্জলি দুটো উত্তেজনায় একত্র আঁট করে ধরলো, 'তোকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি, বীথি। আমার বিয়ে, আসচে বেস্পতিবার আমার বিয়ে হচ্ছে।'

'বিয়ে হচ্ছে?' বীথি যেন আপাদমস্তক শীতের পাতার মতো শুকিয়ে গেলো, 'তুই না এম-এ পড়ছিলি?'

'পড়তে গেছলুম, কিন্তু,' নীলিমা খোলা আকাশের পাখির পাখার মতো হালকা হয়ে গেছে, 'বাড়ির লোক হঠাৎ আবিষ্কার করলে, এম-এ পাশ করে এলে মেয়ের তদুপযোগী পাত্র পাওয়া দুর্লভতরো হয়ে উঠবে। এমনিতেই দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যথেষ্ট। আর এম-এ নয়, এখন মেয়ে হতে পারলেই বাঁচা যায়।'

'তাই বলে পড়া তুই ছেড়ে দিলি?'

'কাঁহাতক আর পড়া যায় বাপু!' নীলিমা ঠোঁটের প্রান্তটা একটু কুঁচকোলো, 'পড়ে কি যে বা শিখলুম এতোদিন, তারা-ব্রহ্মময়ীই বলতে পারেন।'

'এই তো শিখলি।' বীথি বিদ্রূপের একটা খোঁচা মারলো, 'বুড়ো বয়সে বিয়ের নামে স্ফূর্তিতে এমন উথলে উঠেছিস।'

'তোকে বলতে বাধা নেই, বীথি,' নীলিমা ভীরু চোখে ঘরের চারদিকে একবার দেখে নিলে, 'বয়েসটা বুড়ো বলেই এতো বেশি স্ফূর্তি হচ্ছে। পরীক্ষা পাশ-করারও একটা শেষ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সময়ের কোথাও সীমা দেখতে পাচ্ছিলুম না। সেই সময়ের চুলের ঝুঁটিটা আজ, এতোদিনে, শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলতে পেরেছি।'

বীথি নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'কিন্তু পড়ার নিশ্চয়ই শেষ ছিলো না।'

'কেন চোখ ঠারছিস, বীথি? আমাদের পড়া কোথায়, আমাদের পাশ করা। ধর্, এম-এটাও না-হয় পাশ করলুম। তারপর? সাধারণতো তারপর তুই কি করতে পারিস?'

'অনেক করবার আছে।'

নীলিমা কথাটা গায়েও মাখলো না। বললে, 'ছাই। এই তো শোভনা—ইকনমিক্সে এম-এ পড়ছে। পাশ করে ও কি করবে, ও কি করতে পারে সংসারে? নিজে থেকে একটা বিয়ে পর্যন্ত করতে পারে না। এই তো তুই—এতো তো ফাস্ট-টাস্ট হলি, কিন্তু একটা মাস্টারি নেয়া ছাড়া আর কি করতে পারলি জীবনে? সব মিলিয়ে তুই হলি কি? হ্যাঁ, পরিবারের জন্যে অনেক করলি বটে, কিন্তু নিজের কি করলি জিগগেস করি?'

'থাক, আমাকে নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না।' বীথি বিজ্ঞের মতো ম্লান একটু হাসলো, 'তোর নিজের কথাই বল।'

'তার আগে শোভনার কথাটা বলে নি।' নীলিমা বীথির মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলো, 'সেদিন ও আমায় কি বললে, জানিস ?'

'কি বললে ? বললে বিয়ে করতে চাই ?'

নীলিমা হেসে ফেললো, 'মেয়েরা কোনোদিন তা মুখ ফুটে বলতে পারে না। বাপকে গিয়ে মুখ ফুটে যদি বলে, বাবা, রইলো তোমার এই খাতাপত্র, এবার আমাকে বিয়ে দাও দেখি, উঃ, সে হবে তবে তার একটা দুর্দান্ত চরিত্রহীনতা। অথচ শুনতে পাই বিয়েটাই নাকি মেয়েদের সামাম বোনাম। আর মেয়েরা তা বলতেই বা যাবে কেন, সেটা যে তাদের লজ্জা, সেটা যে তাদের অস্বাস্থ্য !'

'তোকে বক্তৃতা দিতে হবে না।' মাস্টারি গলায় বীথি তাকে একটা ধমক দিলো, 'শোভনা কি বলেছে তাই বল্।'

'সেদিন আমায় বললে,' শোভনার প্রতি সহানুভূতিতে মুখখানি নীলিমা করুণ করে আনলো, 'ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিকটা পাশ করলুম, সেটা বেশ বোঝা যায়, পড়তে এলুম কলেজে, সেটাও যা হোক বুঝতে পারছি। পাশ করলুম আই-এ, তবু কোথাও সাড়া-শব্দ শুনছি না। আই-এ যখন পাশ করেছি, তখন বি-এটাও আর বাকি থাকে কেন ? কাটলো থার্ড-ইয়ার, কাটলো ফোর্থ-ইয়ার, প্রাণপণ মুখস্থ করে বি-এটাও পাশ করলুম, বাবা-কাকারা নামের পাশে বি-এ দিয়ে চিঠি লিখতে লাগলেন। তারপর, কি আর করি, মেয়ে হয়ে কি আর করা যায়, জম-কালো ইকনমিক্স্ নিয়ে এম-এ পড়তে এলুম। তারপর আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না, নীলিমা, সিক্সথ্ ইয়ার কাটতে চললো। এই যদি শেষ পর্যন্ত হবে জানতুম—সে আমাকে স্পষ্ট হাসি মুখে বললে – আমি বাড়িতে খাটের পায়া ধরে ঠায় বসে থাকতুম, নীলিমা, গান্ধির মতো হাঙ্গার-স্ট্রাইক করতুম, আমার বিয়ে দাও, আমাকে ছোট, তুচ্ছ, সাধারণ করে রাখো।'

বীথি রাগে রি-রি করতে লাগলো, 'সেই কথাটা এখন কেঁদে-ককিয়ে চারদিকে রাষ্ট্র করে দিয়ে এলেই হয় !'

'পাগল ! পাশ-করা মেয়ে যে। পাশ-করা মেয়ের যে অনেক অহঙ্কার ! সে কি প্রাণ থাকতে অমন দুর্বলতা দেখাতে পারে ? এতো পাশ করে তুই নিজে তা বুঝতে পাচ্ছিস না ?' নীলিমা বীথির ছোট্ট বিছানাটি তার বিহ্বল, প্রসারিত আলস্যে ভরে তুললো ; বললে, 'আমার বেলায় তো ফ্যাসান করে মাঝে-মাঝে এসে মত চাওয়া হতো, বলতো : এটাতে তোর মত আছে ? আমি ঘাড়ে একটা ঝিলিক দিয়ে বলতুম : কচু। যদি বলতুম : আছে, সেটা তবে একটা নিদারুণ নির্লজ্জতার প্রমাণ দেয়া হতো ; জানিস তো, লজ্জাই মেয়েদের ঐশ্বর্য।'

বীথি আগের কথার জের টেনে বললে, 'বিয়ে যখন হচ্ছে না, তখন নিজে বেছে নিয়ে বিয়ে একটা করে ফেললেই হয়।'

'বেছে নিয়ে !' ছোট-ছোট হাসির ফুলে নীলিমা বিছানার উপর ছিটিয়ে পড়লো, 'কাকে বাছবে জিগগেস করি ?'

বীথির মুখে কোনো কথা নেই।

'তুইই বল্, এতো তো তোর বয়েস হলো, এ পর্যন্ত বাইরের কটা ছেলের সঙ্গে

তোর আলাপ হলো জীবনে ? কাদের মধ্যে থেকে কাকে তুই বাছবি, বীথি ? সে কে ? সে কোথায় ?'

'তবে এই যে শুনতে পাই,' বীথি শূন্য, নিষ্প্রাণ গলায়, প্রায় বোকার মতো মুখ করে বললে, 'অমুক ছেলে আর অমুক মেয়ে লভ্ করে বিয়ে করলো ?'

'উপন্যাসে।' নীলিমা বালিশে দুই কনুইয়ের ভর রেখে ঘন হয়ে শুলো, 'সে-প্রেম হচ্ছে বিয়ে-না-হওয়ার একটা নিরুপায় সাবস্টিটিয়ুট, সে-প্রেমিক হচ্ছে নাই-মামার বদলে কানা-মামা। একজন ছেলে, জীবনে যে হয়তো আর কোনো মেয়ে পায়নি, আর একজন মেয়ে, যে হয়তো দেখেনি বাইরেকার কোনো ছেলের চেহারা—একদিন কি সূত্রে তাদের একটু আলাপ হলো, অমনি হয়ে গেলো অন্তরঙ্গতা, অমনি হয়ে গেলো সুগভীর প্রেম ! উপায় কি, একজনকে না একজনকে ভাগ্যক্রমে চিনতে পারলেই হলো, নির্বাচন করবার সুযোগ কোথায় ? আগেকার কালে স্বয়ম্বর-সভায় অনেক-অনেক প্রার্থী এসে জড়ো হতো শুনেছি, তখন তুই চেয়ে-চিন্তে বুঝে-পড়ে একজনকে বাছতে পারতিস ; এখন যাদের কথা তুই বলছিস, এদের বেলায়, নির্বাচনের সেই প্রশস্ত ক্ষেত্র নেই, প্রথম যে এলো সে-ই হয়ে উঠলো পরম। সারা জীবনে একটি কি দুটির সঙ্গে তো আলাপ, প্রেমের জন্যে কতোক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায় ! প্রেম বলে জিনিস যখন একটা আছে, আর বিয়ে যখন শিগগির হচ্ছে না, তখন, উপায় কি, হ্যাঁ, একেই তো প্রেমে পড়ে যাওয়া বলে।' নীলিমা খাড়া হয়ে উঠে বসলো, 'একে তুই প্রেম বলিস, বীথি ? এটা তো মনের অলস রচনা মাত্র, জীবনের আশ্চর্য ঘটনা নয়, এটা তো শুধু একটা উদ্ভাবন, নয় অন্বেষণের পর আবিষ্কার। তোর অন্বেষণের জায়গাই বা কোথায়, আবিষ্কারই বা কাকে ? ও-কথায় তাই তুই অমন গম্ভীর হয়ে বিশ্বাস করিসনে, বীথি। যেখানে বিচিত্রের থেকে বিশেষকে খুঁজে নেবার স্বাধীনতা নেই, সেটাকে তুই আর যা বলু মানবো, প্যাঁচার মতো মুখ ভার করে প্রেম বলিসনে।'

বীথি শুকনো মুখে স্যাঁতসেঁতে একটি হাসি এনে জিগগেস করলে, 'তুই তবে কাকে বিয়ে করছিস ?'

'কাকে আবার ! এক ভদ্রলোকের উপযুক্ত সুসন্তানকে।'

বীথি চমকে উঠলো, 'তাকে তুই চিনিস না ? দেখিসনি কোনোদিন ?'

'জীবনে মাত্র একদিন তাকে দেখেছি।'

'কবে ?'

'যেদিন সে আমাকে দেখতে এসেছিলো।'

'তোকে সে দেখতে এসেছিলো, নীলিমা ?'

কোথাও যেন এতে অবাক হবার কিছু নেই এমনি পরিচ্ছন্ন গলায় নীলিমা বললে, 'সাপ না ব্যাঙ, ছুঁচো না গঙ্গাফড়িং, না দেখে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করে কি করে ? এর আগে স্বপ্নেও যখন আমরা কেউ কাউকে দেখিনি ত্রিভুবনে। তা ছাড়া গণ্ডার না হনুমান, রাক্ষস না খোক্কস, চোখ মেলে আমারও তো একবার দেখা দরকার।'

বীথি কাগজের মতো মুখ করে শাদা গলায় বললে, 'শেষকালে যাকে-তাকে একটা বিয়ে করবি ?'

'কি আর করা যায় তা ছাড়া!' নীলিমা পরিতৃপ্ত মুখে পরিচ্ছন্ন হেসে উঠলো, 'তাকে যখন পাবার কোনো সুবিধে নেই, তখন যাকে-তাকে দিয়েই চালিয়ে নিতে হবে। আমাদের সমাজটা এক-এক দিকে খাপছাড়া ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সংহত, সুবিস্তৃতভাবে বাড়ছে না। বাপ-মায়ের সুবিধের জন্যে বয়েসটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ নিজের সুবিধের জন্যে বয়েসটাকে ব্যবহার করতে দেয়া হচ্ছে না। আমরা এম-এ পড়তে পারছি, অথচ একটাও প্রেমে পড়তে পারছি না। সত্যি কথা তোকে বলবো কি, বীথি,' নীলিমা এবার হাসিতে বর্ষিত হতে লাগলা, 'আমার দ্বারা ওটা কোনোকালে হতোও না। আমার ঘটে অতো বুদ্ধিও নেই, কবিত্বও নেই। তোদের ঐ প্রেম-ট্রেম আমার উপন্যাসে পড়তেই ভালো লাগে, যেমন ভূগোলে পড়েছিলুম গ্রীনল্যাণ্ডের কথা, এস্কিমোদের কথা।'

বীথি সংক্ষেপে জিগগেস করলে, 'তোর ভদ্রলোকটি কি করেন?'

'কি আর করবে! বাঙালী ভদ্রলোকের যদ্দুর দৌড়! চাকরি।'

'কোথায়?'

'এইখানেই, কলকাতায়। কি জানি একটা আপিসে। অতো খোঁজে দরকার নেই, শুধু শুনেছি শ'দেড়েক টাকা নাকি মাইনে। আর যাই হোক, ইচ্ছে মতো বায়স্কোপ দেখতে পারবো, বীথি।'

'বায়স্কোপ দেখতে পারবি?'

'হ্যাঁ,' নীলিমা হাসতে-হাসতে দুই হাতে মুখ ঢাকলো, 'আর আমার খারাপ হবার ভয় নেই যে। তোকে বলবো কি, বীথি, বাবা একবার অনেক বাছ-বিচার করে আমাকে জ্যাকি কুগানের একটা ছবি দেখাতে নিয়ে গেছলেন। তারপর জ্যাকি কুগান বড়ো হয়ে বায়স্কোপ করা ছেড়ে দিলো, আমিও বড়ো হয়ে বায়স্কোপ দেখা ছেড়ে দিলুম।'

পাছে দীর্ঘশ্বাসটা শোনা যায় সেই ভয়ে দ্রুত একটি হাসি দিয়ে বীথি সেটাকে পিষে ফেললে, 'বিয়ে কবে হচ্ছে?'

'বললুম যে, এই আসচে বেস্পতিবার।' নীলিমা উঠে বসে খোঁপাটা ঠিক করতে লাগলো, 'আরো আগেই হতো, কিন্তু মাঝখানে একটা খটকা বেধেছিলো।'

বীথি সামান্য কৌতূহলী হয়ে বললে, 'কী!'

'সেই সুসন্তানের পিতৃদেব বরযাত্রীদের যাতায়াত-খরচা বাবদ বাবার কাছে হাজারখানেক টাকা দাবি করেছিলেন।'

'তার কি হলো?'

'কি আর হবে?' নীলিমা আঁচলটা কাঁধের উপর লতিয়ে দিয়ে ভাঁজ-গুলিতে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে, 'অনেক দর-কষাকষি করে সাড়ে সাত শো টাকায় রফা হয়েছে।'

'তা হলে তাঁরা পণ নিচ্ছেন বল্।' বীথি মুখিয়ে উঠলো।

'হ্যাঁ, তাকে একরকম পণ নেয়াই তো বলে। সোজাসুজি চাইলেই বা কি করা যেতো?'

'কি করা যেতো! শেষকালে পণ দিয়ে তুই বিয়ে বসবি?'

'পণ আমি দিচ্ছি কোথায়, পণ বাবাকে দিতে হচ্ছে। না দিয়েই বা তিনি কি

করতে পারেন?' নীলিমা ঝলমলিয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'আমাকে যখন প্রেম করতে দিলেন না, তখন বাধ্য হয়ে পণ তো তাঁকে দিতেই হবে।'

'তবু তুই একবার আপত্তি করলি না?'

'আপত্তি করলে লাভের মধ্যে থেকে বিয়েটাই হাত থেকে ফসকে যায়।' নীলিমা আবার একটা হাসির ঢেউ তুললে, 'কিছু ভাবনা নেই, বীথি, এমন অনেক সাড়ে-সাতশো টাকা শোষা যাবে।'

'ছি-ছি, আমি তা ভাবতেও পারছি না।' বীথিও উঠে দাঁড়ালো, 'শেষকালে পণ দিয়ে বিয়ে!'

'আজকাল,' নীলিমা সুর করে বলে উঠলো, 'যে-দিকে ফিরাই আঁখি পাশ-করা মেয়ে দেখি। রামীও পাশ, শ্যামীও পাশ—কাকে ছেড়ে কাকে বিয়ে করা যায়? আগে-আগে পাশ দিয়ে পণ এড়ানো যেতো, এখন পাশে পাশে ধুল-পরিমাণ! তাই আবার এসে যাচ্ছে সেই চেহারার কথা, রঙ উত্তম-শ্যাম না ফ্যাকাসে-ফর্সা, এই নিয়ে মারামারি। কিন্তু কোথাও প্রেমের', নীলিমা হেসে উঠলো, 'তোর সেই বহু-আখ্যাত প্রেমের দেখা নেই। নইলে বল্, আমি আর সেই ভদ্রলোকের সুসন্তানটি যদি পরস্পরের প্রেমে পড়তে পারতুম, তা হলে কোনো পক্ষ থেকে কেউ কোনো একটা টাকার কথা তুলতে পারতো? পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে, যেখানে বিয়েটা তাদের হয় না, বিয়েটা তারা করে—এমনি একটা ব্যবসাদারি কথা ওঠে? তবু তো শুনি বিয়েটা ওদের ধর্ম নয়, বিয়েটা ওদের চুক্তি। নেয়াই তো উচিত, এই সব বাপের থেকে—বিশেষ করে পাশ-করা মেয়ের বাপের থেকে পণ নেয়াই তো উচিত একশো বার। আমি ছেলে হলে, তেমন একটা উপযুক্ত ছেলে হলে, মেয়ের বাপকে শুষে একেবারে শেষ করে দিতুম, বলতুম: আগে থাকতে তোমার মেয়েকে আমার সঙ্গে প্রেমে পড়তে দাওনি কেন, এখন, হে নরাধম, তার প্রায়শ্চিত্ত করো।' নীলিমা একটা নাটকীয় ভঙ্গি করলে।

বীথি রইলো উদাসীনের মতো তাকিয়ে।

নীলিমা যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ফিরলো। বললে, 'তুইও এক কাজ কর, বীথি। তোর বাবা না পারেন, তুই তা নিজেই পারবি স্বচ্ছন্দে। কিছু-কিছু করে মাস-মাস জমাতে থাক, এমনিতে না হয়, সেই জমানো টাকায় পণ দিয়ে চোখ বুজে একটা বিয়ে করে ফ্যাল।'

'সবাইকে তোর মতো পাসনি।' বীথি নির্মম, দৃঢ় গলায় বললে 'বিয়ে আমি করবোই না।'

নীলিমা হঠাৎ জিভ কাটলে, 'ও-কথা বলিসনে, বীথি।' আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে তার একখানি ভিজা, ঠাণ্ডা হাত সে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো, 'ও-কথা বলতে নেই। ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে দেবতারা কান পেতে আছেন।'

'থাকুন। বীথি কি-রকম করে যেন হাসলো, 'তোর দেবতারা শুনতে পেলেও আমার দেবতারা বধির।'

'আমার দেবতা প্রজাপতি, আর তোর দেবতা প্যাঁচা।' নীলিমা তার হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলো, 'আমার দেবতাকে মাস কিন্তু দেখতে।'

উদাস গলায় বীথি প্রশ্ন করলে, 'কবে?'

'ভয় নেই, এই জন্মেই। এই আসচে বেস্পতিবার।' হাতটা আস্তে-আস্তে নামিয়ে নিয়ে নীলিমা দরজার কাছে সরে গেলো, 'যাস কিন্তু ঠিক।'

'দেখি।'

'আর দেখি-টেখি নয়, যেতেই হবে। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।' নীলিমা খুকির মতো আবদারে চোখের দৃষ্টিটা একটু বাঁকা করলে, 'তোরা গিয়ে আমায় সাজিয়ে দিবিনে?'

বীথি নিচে তাকে হয়তো একটু এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলো, নীলিমা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না, তোকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। ঐ দাদা হর্ন দিচ্ছে মোটরে, সেই দুপুর থেকে দুজনে নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছি, কতো জায়গা এখনো বাকি আছে। চললুম, যাস কিন্তু ঠিক।'

বীথি শূন্য একটা ছায়ার মতো ঘরের মধ্যে অনাবশ্যক দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কি করা যায়, অভ্যাসবশত চুল খুলে চিরুনি দিয়ে জট ছাড়াতে লাগলো, কিন্তু সিঁথিটা ঠিক করতে এবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে মনে করে তার আর পা উঠলো না।

সেই রাত্রে বীথি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলে।

যেন কোথায় প্রকাণ্ড একটা বাড়িতে সে বেড়াতে গেছে—ভীষণ ভিড় আর বলা বাহুল্য, কেবল মেয়েদেরই ভিড়, মেয়েদের ভিড় ছাড়া অন্য কোথাও সে স্বপ্নেও যেতে পারে না হাসিতে-পোশাকে, গল্পে-গোলমালে প্রত্যেকে এক একটি ফেনিল উত্তালতা। ঘরের মধ্যে, দূরে শ্বেত-পাথরের একটা বেদীতে পাষাণকায় এক দেবীমূর্তি—আপনার সুমহান মৌনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাতে তাঁর বলীয়ান বরাভয়। এক একটি করে মেয়ে সেই বেদীমূলে, দেবীমূর্তির পায়ের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে, আর সেই নিষ্ঠুর, স্তূপীকৃত পাথরে আস্তে-আস্তে জাগছে ভাষার অস্ফুট একটি চাঞ্চল্য, হাসির স্তিমিত একটি আভা। কি যেন তিনি তাদের একে-একে জিগগেস করছেন, আর তাদের উত্তর শুনে স্নিগ্ধ স্মিতহাস্যে করছেন আশীর্বাদ।

ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে বীথি কান খাড়া করে রইলো।

একটি মেয়ে, তাকে বীথি চেনে না, ডাক পড়তেই ধীরে-ধীরে দেবীর কাছে এলো সরে। দেবীমূর্তি তাকে জিগগেস করলেন, 'তুমি কেন বিয়ে করতে চাও?'

মেয়েটি গালের আধখানায় লজ্জার ঢেউ তুলে বললে, 'তার আমি কি জানি! বাবা-মা বলছেন বিয়েটা হোক, বিয়েটা তাই হচ্ছে।'

দেবী তাকে আশীর্বাদ করলেন।

আরেকটি মেয়ে এলো।

'তুমি কেন বিয়ে করতে চাও?'

মেয়েটি ভুরু দুটি একটু তেরছা করে বললে, 'তামাশা দেখতে। ছেলেবেলা থেকেই আমি খুব কৌতূহলী।'

'আর তুমি?'

'ভালো-ভালো শাড়ি পরতে, মোটর চড়তে, দেশ বেড়াতে। ছেলেবেলা থেকেই আমি বড়ো দুঃখী।'

'আর তুমি?'

'দিন দিন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না? এখন বিয়ে না হলে আর হবে নাকি কখনো?'

'আর তুমি?' দেবী পঞ্চমসংখ্যকাকে জিগগেস করলেন।

'যাতে আর আমার খারাপ হবার ভয় না থাকে, যাতে শত গ্রীষ্ম হলেও হাড়ে আমার বাতাস লাগতে পারে, যাতে শরীরটাকে সব সময় একটা শাস্তি মনে না হয়।'

এবার যে এসে দাঁড়ালো, বীথি ভালো করে চেয়ে দেখলো, নীলিমা।

দেবীমূর্তি তার দিকে আঙুল তুললেন, 'তুমি, তুমি কেন বিয়ে করতে চাও?'

নীলিমা অকুণ্ঠ গলায় বললে, 'যাতে ইচ্ছেমতো বায়স্কোপ দেখতে পারি, থিয়েটারে যেতে পারি, উপন্যাস পড়তে পারি খুশিমতো।'

দেবী যে এ-সব উত্তরে বিশেষ প্রসন্ন হচ্ছেন না, পরের মেয়েটি তা যেন জলের মতো বুঝতে পারলো। তার ডাক পড়তেই সে গম্ভীর মুখে বললে, 'আমি বিয়ে করছি ধর্মের জন্যে। বিয়ে করাটা চমৎকার পুণ্য কাজ।'

'আমার বাপু স্পষ্ট কথা।' পরের মেয়েটি কিছু মুখরা, হাত ঘুরিয়ে বললে, 'আমি বিয়ে করছি ছেলেপিলের জন্যে। নইলে বুড়ো হলে আমাকে খাওয়াবে কে?'

'আর তুমি?' দেবীমূর্তি আবার কাকে ইশারা করলেন।

এবার দেখা গেলো শোভনা এগিয়ে আসছে। বইয়ের পৃষ্ঠার মতো শুকনো।

'আমি?' পাছে আশে-পাশের কেউ শুনতে পায় শোভনা ফিসফিসিয়ে বললে, 'আমি ইকনমিক্‌স্ আর পড়তে পারি না।'

এমনি আরো অনেক মেয়ে আরো অনেক সব জবাব দিয়ে গেলো, বীথি সব কথা ভালো করো শুনতেও পেলো না। কেউ বললে: স্বামী হচ্ছে পুরুষবেশে দেবতা, যেমন রাবণের কাছে রাম ছিলো শত্রুবেশে নারায়ণ, আমি দেবতার সেই পাদপদ্ম আরাধনা করে বৈকুণ্ঠে যাবো। কেউ আবার বললে: স্বামী হচ্ছে আমাদের বাহন, শীতলার যেমন গাধা, তার ঘাড়ে চড়ে আমি আমার জীবিকার সমস্যাটা সহজ করে ফেলবো। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

ভিড় প্রায় হালকা হয়ে এসেছে, মেয়েরা যে যার চলে যাচ্ছে বাড়ি, দেবীমূর্তি তবু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে।

'তুমি? তুমি তো কিছু বললে না? তুমি কেন বিয়ে করতে চাও?'

রোগা, শীর্ণ একটি মেয়ে ভীরু চোখে চারদিকে তাকাতে তাকাতে দেবীর কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো।

'বলো,' দেবীমূর্তি তাকে অভয় দিলেন, 'আমাকে বলতে তোমার লজ্জা কি?'

মেয়েটি তার ব্যথিত মুখ দেবীর মুখের দিকে তুলে ধরলো।

এ কি, ঘুমের মধ্য থেকে বীথি উঠলো চমকে। এ যে সে, এ যে সে নিজে।

কি আশ্চর্য, সে এখানে এলো কি করে? তার এখানে কি কাজ? সে তো

এদের মতো কোনোদিন বিয়ে করতে চায়নি। সে চিরকাল একা থাকবার স্বপ্ন দেখেছে, অসামান্য থাকবার। এখানকার রাস্তা তাকে কে চেনালো? এ কি নির্লজ্জতা!

দেবীমূর্তি স্নিগ্ধ সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'ঘরে এখন আর কেউ নেই, শুধু তুমি আর আমি। তুমি আর তোমার আত্মা। চুপিচুপি আমাকে বলো—আমাকে না বললে আর কাকে বলবে?'

মেয়েটি ভীত, বিবর্ণ গলায় বললে, 'আমি বড়ো একা।'

'সেই জন্যে তুমি বিয়ে করতে চাও?' দেবী যেন বেদনায় একটু হাসলেন, 'তোমারও জীবনে এর বেশি আর কোনো বড়ো ব্যাখ্যা নেই, বীথি?'

বীথি তার ঘুমের অন্ধকারে জীবনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বৃহত্তর একটা ব্যাখ্যা খুঁজতে লাগলো। আর তার ঘুম গেলো ভেঙে।

জানলা দিয়ে ভোরের সূর্য রাশি রাশি সোনার লজ্জার মতো তার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

কিন্তু বীথি নিজেকে আর কি করে একা বলতে পারে?

সমরেশের বোনেরা হরদম তার বাড়ি আসে, সমরেশের বিধবা মা স্বর্ণময়ীর ডাকে হামেসাই তাকে ও-বাড়ি বেড়াতে যেতে হয়। এখন থেকে তিনি তো মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছেন, ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় বিকেলের জলখাবারটা তাকে ওখানেই খেয়ে নিতে হবে। সেদিন সন্ধ্যের সময় তুমুল বৃষ্টি এসে গেলো দেখে তিনি তো তাকে যেতেই দিলেন না, খাইয়ে-দাইয়ে নিজের পাশটিতে শুইয়ে রাখলেন।

বীথি একবার ক্ষীণ একটি প্রতিবাদ করতে গেছলো, 'ঝিটা ভাববে, মা।'

স্বর্ণময়ী কৃত্রিম শাসনের সুরে বলেছিলেন, 'তুমি কি এখন তোমার ঝি'র অভিভাবকত্বে আছো নাকি? ভয় নেই, আমাদের বাড়ির ঝিকে পাঠিয়ে তাকে ভাবতে বারণ করে দিয়েছি। মা-র চেয়ে ঝি-র ভাবনাই বুঝি বেশি হলো।'

বীথি বিমর্ষ হয়ে গেলো, 'আশে-পাশের ঘরে অনেক সব চেনাশুনো লোক আছে মা, তাদের কিছু বলে আসিনি।'

'তাদের আবার কি বলবে? তোমার যে এতো বড়ো একটা অসুখ গেলো, তারা এসেছিলো কিছু বলতে?'

না, একে আর একা বলা চলে না। মা'র পাশে শুয়ে সমস্ত বাড়িতে সে কার একজনের অনুপস্থিতির তাপ অনুভব করে।

তার জন্যে তোমার আজকাল দস্তুরমতো প্রতীক্ষা করতে হয়। সে এসে পড়লে তুমি আজকাল আর চমকে ওঠো না, শিউরে ওঠো। এক পা-র পর আরেক পা ফেলে অগ্রসর হলে তোমার গা ভরে সেই অমানুষিক ভয় করে না আর। বরং, লজ্জা কি বলতে, ফের জ্বর হলে বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে থাকতেই বুঝি তোমার ভালো লাগতো।

কথা যদি কখনো না-ই কইবার থাকে, চুপ-করে-থাকাটিও তোমার মন্দ লাগে না। কোনটা যে কথা, আর কোনটা যে কথা নয়, তাই বা তোমাকে কে বলে

দেবে? ইচ্ছা করলে তুমি চেয়ারে আর সমরেশ তোমার খাটের উপরই বসে পড়তে পারে। রাস্তা দিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে হিন্দুস্থানীদের একটা বিয়ের মিছিল চলে গেলে তুমি আর সে একই জানালায় এসে দাঁড়াতে পারো। একই জানালায় দুজনের জন্যে এখন অনেক জায়গা।

জায়গা ও সময় কেমন সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে তারই একটা ঘটনা বলি।

ইস্কুল থেকে এসে বীথি একটা চেয়ারে টুকরো-টুকরো হয়ে বসেছিলো, এলো সমরেশ—তার সেই বলিষ্ঠ দৈর্ঘ্য, সেই সমুদ্ধত দীপ্তিতে। বললো, 'এ কি, কি হলো আপনার?'

'ভীষণ ক্লান্ত,' বীথি সন্ত্রস্ত হবারও এতোটুকু চেষ্টা করলো না, 'জামা-কাপড়গুলি বদলাতে পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু ঘুমুতে হলে বিছানাটা পাততে হয়, সেই ভেবে আর উৎসাহ নেই।'

সমরেশ আরেকটা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসে পড়লো। আর কোনো কথা নেই, বলে বসলো. 'মাস্টারি আপনি ছেড়ে দিন।'

কথাটা যেন গায়ে মাখবার নয় এমনি ঔদাসীন্যে বীথি বললে, 'মাস্টারি ছেড়ে দিলে খাবো কি?'

'তা জানি না', সমরেশ প্রসন্ন গলায় বললে, 'কিন্তু নিজের মাথাটা খাওয়া ছাড়া মানুষের আরো অনেক খাদ্য আছে।'

'পাগল! মাস্টারি আমার মজ্জায়-মজ্জায় বসে গেছে।'

'বেশ তো, মাস্টারিই না-হয় করবেন, কিন্তু সাড়ে দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত একটানা ইস্কুলে নয়, প্রাইভেট টিউশান—ধরুন, কালকে থেকে যদ্দিন না ছাত্র মারা যায়।'

'ছাত্র?'

'হ্যাঁ, ছাত্ররাই তো বেশি মাইনে দিতে পারবে।' সমরেশ হেসে উঠলো, 'ইস্কুলে যা পান তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা, অনেক বেশি সম্মান। আর এ-ছাত্রটি, আমি যদ্দুর জানি, বেশ বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমানকে পড়িয়েই তো সুখ।'

'এমন ছাত্র আপনি কোথায় পাবেন?' বীথি তার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো।

'সেই বুদ্ধিমান তো আপনার কাছেই বসে আছে।'

'আপনি?' বীথি পায়ের নখমূল পর্যন্ত শিউরে উঠলো, 'আপনাকে আমি পড়াবো কি!'

সমরেশের মুখে এতোটুকু উদ্বেগ নেই, 'এই—কি করে রাঁধতে-বাড়তে হয়, ঘর দোর গুছিয়ে দিতে হয় এই সব ছোট-খাটো এক্‌সারসাইজ।'

বীথি যেন আরো ভেঙে পড়লো, এমন কি, তার কণ্ঠস্বরে। বললে, 'কাপড় যে তৈরি করে তাকে আপনি বলতে পারেন না কি করে কাপড় কাচতে হয় আমাকে শিখিয়ে দাও। যে মজুর গাঁইতি দিয়ে রাস্তা খোঁড়ে, তার কাছে দাবি করতে পারেন না, এ রাস্তায় সে আপনার মোটর চালাবার কৌশল বাৎলে দেবে। সুনীতি যে প্রচার করে, আপনি আশা করতে পারেন না সে নিজে হবে সচ্চরিত্র।'

তারপর আর তাদের কোনো কথা নেই।

কথা কি মানুষের অনেকগুলির মধ্যে আরেকটা ব্যর্থ আবিষ্কার নয় যা তার অতীত সেই ইশারাকে শুধু কথা দিয়ে বোঝাতে গিয়ে সেই অকথনীয়তা ফেলে হারিয়ে?

কে জানে, কিন্তু সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বীথি দেহ-মনের গূঢ়তম অন্ধকারে তলিয়ে হাতড়ে ফিরতে লাগল—এটা কি? এরই নাম কি ভালোবাসা? এই নিয়েই কি শেলি তার প্রমীথিউস আনবাউণ্ড লিখেছিলো? এই যদি ভালোবাসা হয়, তবে তার শরীরে সেই মহান উদ্দীপনা নেই কেন, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সেই অতীন্দ্রিয় প্যাশান, তার মনে নেই কেন সেই রহস্যের ইন্দ্রজাল, সমস্ত শরীরে সেই অশরীরী হয়ে যাওয়া! এ যেন একটা ক্লান্তি, এ যেন একটা আলস্য, এ যেন একটা সমর্পণ।

নরম মোমের আলো জেলে যখন সে সামান্য কথা দিয়ে প্রেমের কবিতা লিখতো তখন সে এরও চেয়ে মহত্তর উত্তেজনা অনুভব করেছে।

দেবীমূর্তি আবার স্বপ্নে এসে দেখা দিলেন।

ঘুমের মধ্যে বীথি অস্ফুট স্বরে কেঁদে উঠলো। যেন বললে, 'দাঁড়াও, আরো কটা দিন অপেক্ষা করো। তোমার প্রশ্নের এবার আমি একটা খুব ভালো উত্তর তৈরি করছি।'

স্বর্ণময়ীর মুখেও সেই কথা, 'খেটে-খেটে এ কি হাড়গিলের মতো চেহারা করছ, বীথি? মাস্টারিটা তুমি ছেড়ে দাও।'

বীথি ম্লান হেসে বললে, 'তার বদলে কি করবো, মা?'

'কি আবার করবে!' স্বর্ণময়ী তাকে দুই হাতে হঠাৎ কাছে টেনে নিলেন, 'নিরিমিষ্যি ঘরে গিয়ে আমার জন্যে একবেলা রাঁধবে, আমার পুজোর ঘরটা একটু গুছিয়ে দেবে, অঘোরে ঘুমুবে হাত-পা ছড়িয়ে।'

'তোমার জন্যে রাঁধতে তো আমি এখনো পারি, মা।'

'কিন্তু এখন খারাপ রাঁধলেও যে তোমাকে প্রশংসা করতে হয়, বীথি। তখন তরকারিতে একটু নুন বেশি হলে,' স্বর্ণময়ী তার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, 'তখন তোমাকে ছেড়ে কথা কইবো ভেবেছ নাকি?' তাঁর স্পর্শে বীথির মেরুদণ্ডটা সিরসির করে উঠলো।

আরো কদিন যেতে, স্বর্ণময়ী এবার তার কপালে একটি চুমু খেলেন, বললেন, 'তোমার মাকে চিঠি লিখে দিলুম, মা।'

'মাকে?' বীথি পায়ের নিচে যেন একটা সাপ দেখলো, 'মাকে আবার কি লিখতে গেলেন?'

'লিখলুম, আমার ছেলে তাঁদের এমন কিছু অযোগ্য জামাই হবে না। দিল্লিতে তার এবার দুশো টাকার চাকরি হয়েছে। আরো লিখলুম—'

বীথি তাঁর মুখের দিকে বোকার মতো চেয়ে রইলো।

'আরো লিখলুম, আমার মা,' স্বর্ণময়ী নির্বিঘ্নে বীথিকে আদর করতে লাগলেন, 'তুমি তো কেবল তাঁরই মেয়ে নও, আমারও মেয়ে—লিখলুম, মা'র আমার এতে আপত্তি নেই একটুও। বরং, মতই আছে পুরোপুরি, কি বলো?'

বীথি ঘরের শূন্যতার মতো চুপ করে রইলো।

'আরেকটা কথা কিছুতেই লিখতে পারলুম না।' স্বর্ণময়ী তাঁর দীপ্যমান শুচিতায় হেসে উঠলেন, 'ছেলের মা হয়ে তা কি করেই বা লেখা যায়? শত হলেও তো সমাজে ছেলের মা'র একটা মর্যাদা আছে! ছেলের মা হয়ে কি করে লিখতে পারি বলো, আমার ছেলে এই মেয়েকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না বলে ঠিক করেছে!'

বীথি হঠাৎ ছুরির ফলার মতো কেটে বেরিয়ে এলো; বললে, 'কিন্তু মাকে, মাকে লিখতে গেলেন কেন?'

স্বর্ণময়ী উদারতায় উদ্ভাসিত হয়ে বললেন, 'তোমার মাকে লিখতে যাওয়াই কি ঠিক নয়? তাঁরা যখন বর্তমান আছেন, আর বলতে গেলে, তাঁরাই যখন তোমার বিয়ের কর্তা। আমি লিখে দিয়েছি, বেশি দেরি করে কোনো লাভ নেই, অঘ্রানে, ওর কাজে গিয়ে জয়েন করবার আগেই, ব্যাপারটা যাতে চুকে যায়। কোনো তাঁদের হাঙ্গামা নেই, কষ্ট করে একবারটি শুধু কলকাতায় আসা—তোমার বিয়ের সব কাণ্ড-কারখানা আমিই যোগাড় করে দেবো। বলতে গেলে আমারই তো গরজ—মা হয়ে সন্তানের মুখের দিকে না তাকিয়ে তো আমি পারি না।'

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে বীথি অনেকক্ষণ কাঁদলে। মাকে—মাকে লিখতে যাওয়া হলো কেন? তার বিয়েতে তাঁদের কি কৌতূহল, তাঁদের কি কর্তব্য, তাঁদের কি মতামতের দাম! তারই যখন বিয়ে, তখন, একান্ত করে তারই মতের জন্যে আরো কটা দিন কেন অপেক্ষা করা হলো না? সে যে বহুদিন ধরে গোপনে-গোপনে 'খুব একটা ভালো উত্তর' তৈরি করছিলো। তার সেই অকুণ্ঠ উচ্চারণের আগে পৃথিবীতে আর কোনো ভাষা আছে নাকি, আর কোনো জিজ্ঞাসা আছে নাকি?

সমরেশের জন্যে দরজা দুটো খোলাই আছে সেই থেকে।

'তুমি একদিন বলছিলে না বাঙলা-দেশের বাইরে কোনো কাজের খবর পেলে তোমাকে জানাতে।' সমরেশ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'তেমনি একটা খবর পাওয়া গেছে। শুধু খবর নয়—একেবারে একটা চাকরি।'

বীথি মরা গলায় বললে, 'জানি।'

'কোথায় বলো তো?'

'দিল্লিতে।'

সমরেশ উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'কতো মাইনে বলো তো?'

'দুশো টাকা।'

'কবে জয়েন করতে হবে জানো?'

বীথি কাঁধের থেকে মুখ তুললো, 'না।'

'যতো শিগগির হয়, যতো শিগগির।' সমরেশ তার চেয়ারের কাছে সরে এলো, বললে, 'যাবে, তুমি যাবে?'

বীথি দুই হাতে মুখ ঢাকলো, বললে, 'জানি না।'

স্বপ্নের জগৎ থেকে দেবীমূর্তি একটু হাসলেন।

না, না, একে তুমি প্রেম বলতে পারো না, এ শুধু একটা দুর্বল প্রতিধ্বনি;

একে তুমি অধিকার বলতে পারো না, এ শুধু একটা অবস্থায় সমর্পণ; একে তুমি উল্লাস বলতে পারো না, এ শুধু একটু শীতল নিস্তরঙ্গতা।

দেবীমূর্তি স্বপ্নে আবার দেখা দিলেন। বললেন, 'কেন বিয়ে করতে চাও, বীথি?'

'ক্ষমা করো,' বীথি ঘুমের মধ্যে মা-হারা শিশুর মতো কেঁদে উঠলো, 'আমার সময় নেই, আমি সেই ভালো উত্তর আজও তৈরি করতে পারিনি। আমি একা— সেই একা মরবার আগেকার মুহূর্তে মানুষের মতো একা।'

বলা বাহুল্য সর্বাণী দেবী স্বর্ণময়ীর সেই চিঠির জবাব দেননি।

চিঠির জবাব দিলেন বিনায়কবাবু, আর তা বীথির কাছে।

চিঠির ওজন আর ঠিকানার হরফ কটি দেখেই বীথি কেমন অনায়াসে বুঝতে পারলে, গঙ্গায় আর একবিন্দু জল বইছে না।

আদ্যোপান্ত চিঠিটা পড়বার তার স্নায়ু নেই। গোড়ার কয়েকটা লাইনেই সে চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলো। সব গেল তালগোল পাকিয়ে।

বাবা লিখেছেন ঃ

সম্প্রতি তোমার মা কলকাতা থেকে এক উড়ো চিঠি পেয়েছেন তুমি নাকি কোন সমরেশ ঘোষকে বিয়ে করবার জন্যে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়েছ। চিঠিটাকে উড়ো-ই বা কি করে বলি—যে-মহিলার নামে চিঠি দেয়া হয়েছে, নাম-ধাম, জ্ঞাতি-গুষ্টি দেখে তাঁকে আমাদের চেনা-ই মনে হলো দস্তুরমতো। কিন্তু এ যদি সত্যি হয়, যে রকম খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তা সত্যি মনে না হবার কোনো কারণ নেই, তবে ভাবো, তোমার এ কি কাণ্ড বীথি, এ কি তোমার কলুষিত অধঃপতন!

বীথি তারপর সবটা আর এক নিশ্বাসে পড়তে পারলো না। জায়গায়-জায়গায় লাইনগুলি খোঁচা-খোঁচা কাঁটার মতো তার মর্মমূলে লাগলো বিঁধতে :

তোমার মামাবাবুকে চিঠি লিখে দিলুম, এ-সব কেলেঙ্কারির যেন তিনি না প্রশ্রয় দেন।

তারি জন্যেই বুঝি তাঁর সঙ্গে আজকাল আর সম্পর্ক রাখছ না? তারি জন্যেই বুঝি সুবিধে বুঝে আলাদা বাড়ি ভাড়া করেছিলে? তুমি যে এতোদূর নেমে যেতে পারো এ আমি বিশ্বাস করি না।

তোমার চোখের সামনে উপবাসী এক সংসার, ক্ষয়-ক্ষীণ অপোগণ্ড কটি ভাই-বোন, অক্ষম, অপদার্থ বাপ-মা, তুমি কি বিশাল দায়িত্ব নিয়েছ দুই হাতে, তোমার এ কি অকর্মণ্য চিত্তবিভ্রম, এ কি তোমার নৈতিক অবনতি!

যে যা-ই বলুক, আমি তোমাকে চিনি, আমি কখনোই বিশ্বাস করবো না, তুমি তোমার সেই মহান চরিত্র থেকে এক তিল ভ্রষ্ট হতে পারো, জীবনের মহত্তর কর্তব্যের চেয়ে বেশি মূল্য দিতে পারো খেলো এই একটা দৈনিক বিলাসিতাকে।

তুমি আমার মেয়ে, মিছিমিছি তবে তোমাকে আমরা কেন এতো লেখাপড়া শিখিয়েছিলুম, এতো বড়ো করেছিলুম, যদি তার সম্মানই না রাখতে পারবে, তবে কেন দিয়েছিলুম এই স্বাধীনতা?

সেই দিনও তো তুমি বিয়ে করবে না বলে মত দিয়েছিলে।

একবার আমাদের কথাটাও ভেবো—যারা দিন নেই, রাত নেই, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি। তুমি বড়ো হয়ে মাথা খাড়া করে উঠেছ—পরাজিত পৃথিবীতে এই যাদের একমাত্র অহঙ্কার।

সত্যি, তোমার বয়েস তো আর কম হয়নি, এখন তো তুমি নিজেই সব বুঝতে পারো!

এই তোমার পিতৃভক্তি? এই তোমার ভ্রাতৃস্নেহ? এই তোমার পরিবারের প্রতি কর্তব্য? এই তোমার বংশের মুখোজ্জ্বল করা?

লোকে বলবে কি তোমাকে? তুমি—তুমিও শেষকালে যুদ্ধ থেকে পালাবে? এই কি বীরাঙ্গনার ব্যবহার?

বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না, বীথি, তুমি এ-রকম পাশবিক স্বার্থপর হয়ে উঠতে পারো। এ-মাসে তোমার টাকা আসতে দেরি হয়েছিলো বলেই সন্দেহ করেছিলুম, কিন্তু তবু বিশ্বাস করতে পারি না, এতোগুলি ক্ষুধার্ত গ্রাসের দিকে না তাকিয়ে সেই টাকা দিয়ে, অসম্ভব, সেই টাকা দিয়ে তুমি নিজের প্রসাধন করেছ।

তুমি জানো, পৃথিবীর সকলেই জানে, তুমি বিয়ের জন্যে তৈরি হওনি। তুমি পেঁচি-খেঁদির দলে নও, তুমি অসাধারণ, বিয়ের চেয়েও বৃহত্তরো উৎসব আছে তোমার জীবনে—সে তোমার কাজ, সে তোমার চরিত্র, সে তোমার আত্মত্যাগ!

ফেরৎ ডাকে, পত্রপাঠ চিঠি লিখবে, বীথি।

তুমি যে এ-সব তুচ্ছতা, এসব অসারতার অনেক উপরে তোমার মুখ থেকে সেই কথা জানার জন্যে আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি। এ যে মিথ্যা তাই তোমার সবল ব্যক্তিত্বে নির্ঘোষিত হয়ে উঠুক।

আমি পাগলের মতো হয়ে গেছি, চারিদিকে পথ খুঁজে পাচ্ছি না, তোমার মা এ-ঘর ও-ঘর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। তুমি যদি এমন একটা কাণ্ড করো, তা হলে তিনি আত্মহত্যা করবেন, বীথি।

আর তোমার ভাই-বোনগুলির মুখের দিকে যদি একবার চেয়ে দেখ।

বীথি চিঠিটা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

* * * *

সমরেশ সেদিনও এসেছিলো জিগগেস করতে, 'কোনো চিঠি আজ এলো?'

বীথি নির্লিপ্ততায় বিচ্ছিন্ন হয়ে এলো, বললে, 'না।'

সমরেশ আজও এসেছিলো তেমনি এগিয়ে। গাঢ় গলায় বললে, 'কিন্তু চিঠির জন্যে আমরা আর কতোকাল অপেক্ষা করতে পারি? আমাদের জীবনে সামান্য একটা চিঠি দিয়ে কি হবে?'

বীথি বিস্মিত হবার ধূসর একটি ভান করলে, 'তার মানে? এ হচ্ছে সাদাসিধে একটা বিয়ে, জ্বলজ্যান্ত সামাজিক একটা কাণ্ড, এ-ব্যাপারে আমার বাবা-মাকে আমি ফেলতে পারি নাকি? কই, আপনিও তো পারেননি দেখছি।'

'হোক বিয়ে,' সমরেশ তার প্রবাহিত রক্তে যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো, 'তবু এটা আমাদেরই বিয়ে, আমাদেরই একটি অখণ্ড হয়ে ওঠা।' এর মাঝে আর কারু প্রবেশ

নেই, নেই আর কারু হস্তক্ষেপ। সমাজ-সংস্কার সমস্ত মিছে, শুধু আমরা দুজন ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো অস্তিত্ব নেই। তুমি চলো।'

'কি বাজে বকছেন।' বীথি সমস্ত ভঙ্গিতে অটল, দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ালো, 'আপনার সঙ্গে নেহাত আমার একটা বিয়েরই কথা হচ্ছে, আমি তো আর আপনার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছি না।'

'তার মানে?'

'তার মানে তাই! বিয়ের কথা কখনো ফলে, কখনো ফলেও না। না ফললেই লোকে পালিয়ে যায় না দেশ ছেড়ে।'

ছি ছি ছি, সমরেশ চলে গেলে বীথি বালিশে মুখ ঢেকে কান্নায় লুটিয়ে পড়লো। ছি ছি ছি, এর চেয়ে তার আর কোনো বড়ো উত্তর ছিলো না? সমস্ত ব্যাপারটা সে দেখতে পেলো না আর কোনো পরিপ্রেক্ষিতে? আর কোনো অনুভবের সৌরভে?

তার এটা উত্তর না হয়ে কেন হলো না একটা জিজ্ঞাসা? সামান্য প্রতিধ্বনি না হয়ে কেন হলো না প্রবল একটা আহ্বান?

তা হলে—বীথি জানালা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে।

বলা বহুলতরো হবে, বীথি বাবার সে চিঠিটার মুখোমুখি কোনো জবাব দেয়নি।

মনি-অর্ডারের কুপনে যেটুকু সে লিখতে পেরেছে ঠিক ততোটুকুই।

এবার টাকার সংখ্যাটা সাধ্যাতীত স্ফীত করে সে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাবা অনেকদিন আগে তার কাছে একখানা গরদের চাদর চেয়েছিলেন মনে হচ্ছে, পার্শেল করে সেই একখানা চাদর, সামনে শীত এসে পড়েছে, মা'র জন্য ছোট একখানা আলোয়ান, ছোট ভাইবোনদের জন্যে রঙ-বেরঙের কতোগুলি ছিট!

জিনিস-পত্রের ফিরিস্তি দিয়ে পরে ছোট একটি লাইন:

'আমি ভালো আছি। আমার জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না।'

মা-বাপের প্রাণ, চিন্তা না করলে পৃথিবী চলবে কেন?

বিনায়কবাবু হঠাৎ জরুরি একটা তার করে বসলেন:

'আমি আর তোমার মা আজ কলকাতা রওনা হচ্ছি। চিঠিটা আগেই পেয়ে থাকবে।'

কোন চিঠিটা—বীথি কিছু ঠিক বুঝতে পারলো না।

না, চিঠিটা দুপুরবেলার ডাকে এসে হাজির। কি না-জানি শুভ সংবাদ! বীথি চঞ্চল আঙুলে খামটা ছিঁড়ে ফেললো।

বেশি কিছু কথা লেখা নেই বলে বীথি উঠেছিলো উৎসাহিত হয়ে।

না, বিনায়কবাবুর বেশি কিছু লেখবার নেই:

'এবার আমরা তোমাকে নিয়ে কলকাতাতেই ছোট-খাটো একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকবো ভাবছি। কলকাতায় যেমন বড়োলোকের বাসা, তেমনি আবার গরিবেরও বস্তি আছে। গীতিকে তোমার ইস্কুলেই ফ্রি করিয়ে নিতে পারবে। তোমার পিসিমা শুধু এখানে থাকবেন, আমি মাঝে-মাঝে এসে দেখে-শুনে যাবো। এই ব্যবস্থাটা তুমি কি রকম মনে করো? একা-একা থেকে তোমার স্বাস্থ্যটা

আজকাল ভালো থাকছে না। তোমার মা তোমার কাছে যাবার জন্যে ভারি কান্নাকাটি লাগিয়েছেন। ফেরৎ ডাকে চিঠি দেবে।'

তার মতটা জানবারও তাঁদের আর তর সইছিলো না। আজ রাত্রে চিটাগং-মেলেই তাঁরা এসে পড়ছেন।

বীথি জানতো, রক্তের অক্ষরে-অক্ষরে জানতো, সমরেশ বিকেলবেলাই আজ একবার তার কাছে আসবে।

'কি, কোনো খবর এলো আজ?'

হাতের খবরের কাগজটা মুড়ে রাখতে-রাখতে বীথি বললে, 'কিসের খবর?'

'সেই ফলা না-ফলার খবর।' সমরেশ তার প্রশস্ত দুই কাঁধে উদ্ধত হয়ে দাঁড়ালো, আমি যে আজ রাতে দিল্লি যাচ্ছি, কিছু দিন আগেই আমাকে যেতে হচ্ছে।'

বীথি চোখ নামিয়ে বললে, 'এমন একটা কথা তো অনেক আগেই আমি শুনেছিলুম।'

'শুনেছিলে তো,' সমরেশ মৃত্যুর মতো তার কাছে এগিয়ে এলো, 'আমার সঙ্গে চলো।'

বীথি আগুনের মতো কেঁপে উঠলো, 'আমি যাবো কোথায়?'

'আমি যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। কোনোদিকে তুমি তাকিয়ো না, থাক যা যেখানে পড়ে আছে, তোমার জিনিসপত্র, তোমার অতীত-ভবিষ্যৎ, কোনোদিকে তোমার চাইতে হবে না। আমি আছি, তোমার কিছু ভয় নেই, বীথি, আমার সঙ্গে তুমি চলো।'

সমরেশ তার দিকে বুঝি একখানা হাত দৃঢ়তায় প্রসারিত করে ধরলো।

'পাগল! আমি যাবো কোথায়?' বীথি ভূতের মতো হেসে উঠলো, 'আজ বাবা-মা'রা সব এসে পড়েছেন।'

'এসে পড়েছেন?' সমরেশ লাফিয়ে উঠলো, 'তবে আর কি ভয়, বীথি। কেন, কেন আসছেন তারা?'

'যাতে আমি এখান থেকে কোথাও না যেতে পারি।' বীথি খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'যাতে এবার থেকে আমার স্বাস্থ্যটা আর খারাপ না হয়।'

সমরেশ এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। জীবন্ত মানুষে এমন করে কখনো হেসে উঠতে পারে সে জানতো না।

স্পষ্ট, প্রখর কণ্ঠে সে বলল, 'আসুন তাঁরা, তবু তুমি চলো। হ্যাঁ, আমি বলছি, তুমি চলো। তোমার সমস্ত সংসার যাক মুছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে, তবু তুমি এখানে এমন করে বসে থেকো না। তাঁদের বংশের মুখোজ্জ্বল করা তোমার কথা নয়, তুমি একবার আমার মুখের দিকে তাকাও, দেখ, সেইখানে তোমার মুখ আজ কি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!'

বীথি এক মুহূর্ত হয়তো দুলে উঠলো, তার আঁচলে হয়তো লাগলো একটু হাওয়ার চাঞ্চল্য, তার রক্ত উঠলো লাল হয়ে।

এক মুহূর্ত।

বীথি আবার তেমনি অদ্ভুত, অশরীরী হেসে উঠলো। শবায়িত কঙ্কালের গলায় বললে, 'না, আপনি ভুল করছেন।'

'ভুল করছি ?'

'হ্যাঁ, আমি সেই জাতের মেয়ে নই।'

'মেয়েদের মধ্যে কটা আবার জাত আছে ?' সমরেশ ব্যাকুল হয়ে বললে, 'এ কদিনে তোমার এ কি চেহারা হয়ে গেছে, বীথি ? একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ। না, তুমি চলো, আমি—আমি তোমাকে ডাকছি।'

'না,' শত গম্ভীর হয়েও বীথি তার মুখের সেই নিরবয়ব হাসি কিছুতেই মুছে ফেলতে পারলো না, 'বিকেলের ট্রেনে মেয়ের কাছে তার বাবা-মা'র আসবার কথা থাকলে সে-মেয়ে রাতের ট্রেনে শুধু-শুধু পালিয়ে যেতে পারে না।'

'শুধু-শুধু কোথায় ? তুমি কি কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না, বীথি ?'

'না,' বীথি এবার শব্দে ছিটিয়ে পড়তে লাগলো, 'বুঝতে পাচ্ছি না। এ সংসারে বিয়ের জন্যে আমি তৈরি হয়নি। আমার আরো ঢের বড়ো কাজ করবার কথা। স্টেশনে গিয়ে চিটাগং-মেলটা আমাকে আজ য়্যাটেন্ড করতে হবে।'

জোরে-জোরে পা ফেলে সমরেশ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

দরজাটা আধখানা মেলে বীথি তাকে শেষবার দেখলে।

হঠাৎ ঘরের নিঃশব্দতায় ফিরে আসতেই বীথির সমস্ত পৃথিবী যেন গেলো শূন্য হয়ে।

কি আর সে এখন করবে, আস্তে-আস্তে সেই প্রেতায়িত বিবর্ণ মুখে সে তার আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ তরতর করে নেমে এল সে সিঁড়ি দিয়ে। চিটাগং-মেল কখন আসে ইস্টিশানে ?

ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড কোথায় ? এমনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেই পাওয়া যাবে না ট্যাক্সি ? কে জানে! যখনকার যা তখন তা ঠিক পাওয়া যায় না। সব বাড়ির মোটর, একটাও ট্যাক্সি নয়। কি হবে ? হয়তো এতক্ষণে পেঁছে গিয়েছে চিটাগং-মেল!

চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করছে বীথি।

সমরেশ কাছেই ছিল যেন কোথায়! যেন তাড়িয়ে দিলেও উড়ে যেতে পারেনি। হয়তো বা পায়নি তার অবকাশ।

হয়তো ছোট্ট একটু চোখাচোখি হল।

'কি খুঁজছো ?' সমরেশ এগিয়ে এসে জিগগেস করলে।

'ও, আপনি! আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারেন ? শিগগির—'

'কেন ?'

'শেয়ালদা যাব। চিটাগং-মেলের য়্যারাইভ্যাল কখন ? সে-ট্রেনেই বাবা-মা'রা আসছেন সব। ওঁদের গিয়ে এখানে, আমার বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। আমি না গেলে বাড়ি চিনবেন কি করে ? দেখুন না একটা কিছু পান কিনা—'

'এখানে ট্যাক্সি কোথায় ? স্ট্যান্ড পর্যন্ত হাঁটতে হবে। চলো না, হাঁটি, দেখা যাক—'

'অন্দুর পর্যন্ত যাবার বোধহয় সময় নেই। ট্রেন বোধহয় এসে গেছে এতক্ষণে। ঠিক টাইমিংটা জানি না যে—'

'উড়ে তো আর যেতে পারবে না! চলো না, চলতে-চলতে পাওয়া যাবে হয়তো।'

যা বলেছে সমরেশ, চলতে-চলতেই মিলে গেল।

ট্যাক্সির দরজা খুলে ত্বরিতভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল বীথি।

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল সমরেশ, হঠাৎ বীথি বললে, 'ও কি! আপনিও আসুন না—'

'আমি কোথায় যাব?'

'যেখানে আমি যাচ্ছি—স্টেশনে।'

উঠে বসলো সমরেশ। চলতে চলতে যা মেলে, যতটুকু মেলে, তাই জীবনের পাথেয়।

শেয়ালদা যেতে হলে ট্যাক্সির ডাইনে বেঁকবার কথা, হঠাৎ বীথি নির্দেশ দিলে, 'বাঁয়ে।' তার মানে মাঠের দিকে, গঙ্গার দিকে।

'ওদিকে কি?' সমরেশ চমকে উঠলো।

'ওদিকেই আমার স্টেশন। গাড়ি ঘুরে ঘুরে শেষকালে তোমার বাড়ির দরজায় দাঁড়াবে। সেইখানেই আমার টার্মিনাস। একটু বাংলা করে বলি—আমার ইতি, আমার প্রাপ্তি—'

বিস্ময়ে পাংশু হয়ে গেল সমরেশ। পাথর হঠাৎ পদ্ম হয়ে উঠল নাকি? বীথি তার বিশাল সরল নিষ্পলক চোখ দুটি তুলে ধরল সমরেশের দিকে। বললে, 'আমার চোখের দিকে তাকাও, দেখ, সেইখানে তোমার মুখ কত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।'

উর্ণনাভ

॥ এক ॥

বার কয়েক ফুটপাতের উপর ঘোরাঘুরি করে তার দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত মনকে কুবের শাসন করলে। ভয় করবার আছে কী! ঢুকবার বেলায় যে-দরজা সংকীর্ণ, প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরবার বেলায় তা অবারিত। তার রাস্তা তো আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।

সদর পেরিয়ে খানিকটা হচ্ছে সরু একফালি প্যাসেজ; তার দু'ধারে চলে গেছে ঘরের সারি, আর তারি প্রায় মাঝখানে টুল পেতে একটা লোক বসে। দেখতে সাদাসিধে নিরীহ গোছের, কিন্তু একখানা তার গলা! কুবেরের মুখের উপর যেন একগাদা বারুদ ছুঁড়ে মারলো: কী চাই?

কুবের ছিটকে পড়লো পিছিয়ে। ঢোঁক গিলে আমতা-আমতা করে বললে,—সুশান্তবাবু বাড়ি আছেন?

লোকটাকে যতো খারাপ শুনিয়েছিলো, আসলে ততো নয়। তাড়াতাড়ি টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললে,—আছেন। আপনার কার্ড?

—কার্ড তো নেই।

—তবে কী বলবো?

—কী-বা-বলবে? শূন্য চোখে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে কুবের বললে,—এমনি বলো গে, আপনার সঙ্গে একটি লোক দেখা করতে চায়।

—আপনার নামটা তবু—

—তেমন কিছু নয়!

—যদি লেখা নিয়ে এসে থাকেন, লোকটা কুবেরের দিকে সামান্য একটু হাত বাড়িয়ে দিলো: আমার কাছে স্বচ্ছন্দে দিয়ে যান, সময়মতো আমি তাঁকে পৌঁছে দেবো। এটা এখন ঠিক অফিস-টাইম নয় কি না।

ম্লানমুখে হেসে কুবের বললে,—কাজটা সেরকম কিছু জরুরী নয়। একটু দেখাশোনার দরকার ছিলো।

—আচ্ছা দাঁড়ান, দেখে আসি বাবুর চা খাওয়া হলো কি না।

খানিকবাদে লোকটা ফিরে এলো, হাতের ইসারা করে বললে,—আসুন।

এবার কুবেরের গায়ে দিলো ঘাম, বুক টিপ-টিপ করতে লাগলো। তার চেয়ে তার সোজা ফিরে যাওয়াই অনেক সহজ ছিলো। নৈরাশ্যের সেই শূন্যতার মাঝে নিজেকে খাপ খাওয়াতে তার বেগ পেতে হতো না—কিন্তু এখন সুশান্তর মুখোমুখি বসে কথাটা তার নিতান্তই পাড়তে হবে ভেবে ভীষণ অস্বস্তিবোধ হতে লাগলো। অথচ, দেখা যদি পায়-ই, কথাটা সোজাসুজি না বলারো কোনো মানে হয় না।

সরু প্যাসেজটা বাঁয়ের বারান্দায় ঘুরে গেলো—লাল টকটকে মেঝে, প্রতিপদে জুতোর ডগাটা সামনের দিকে পিছলে পড়ে: চুনকাম-করা খটখটে দেয়ালে নানা ধাঁচের ছবি সারি-সারি টাঙানো, কোনোটা দুর্মদ অশ্বারোহী, কোনোটা বা নভোবিহারিণী স্খলদঞ্চলা অপ্সরা, কোনোটায় বা আরণ্য পার্বত্য প্রদেশে সন্ধ্যার

প্রথম ধূসর ছায়া পড়েছে। কোনোটা বা বিরাট একটা মহীরূহ, কাণ্ডে ও শাখায় এতো প্রকাণ্ড যে তাকে মুখের কথায় গাছ বলা চলে না : কোনোটা বা উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন একটি বালিকার মুখ, চোখে ও চুলে এতো করুণ যে তাকে হঠাৎ কোনো একটা পরিচিত নাম ধরে ডেকে উঠতে ইচ্ছে করে।

কতোদূর এগিয়ে এসে বাঁ-হাতি একটা ঘরের দরজায় মোটা নীল বনাতের পরদা ঝুলতে দেখা গেলো। লোকটা থামতেই কুবেরো তার নিঃশব্দ পদক্ষেপগুলি হ্রস্ব করে আনলো। পরদাটা একপাশে সরিয়ে ঘরের ভিতর কি-একটা ইঙ্গিত করে কুবেরকে সে বললে,—আসুন।

পরদার চঞ্চল অপসারণের সঙ্গে কুবেরের চোখ গিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। চারদিকে সে যেন দেখলো বন্ধ্যা মরুভূমি, তার চোখ উঠলো শুকিয়ে, জ্বালা করে! কিন্তু যখন একবার সে এসে পড়েছে, হাতের সমস্তটা সময় না কাটিয়ে সে আর উঠছে না। দেখা যাক। অভিজ্ঞতাটা নতুন, বেশ একটা জোরালো ঝাঁজের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে।

ঘরের চারদিককার উৎকট উগ্রতার সঙ্গে অন্তত তার জুতোজোড়া যে একেবারেই খাপ খাবে না এক নিমেষেই কুবের তা আঁচ করলে। ফিতে-বাঁধা জুতো বটে, কিন্তু খুলে ফেলতে এক মুহূর্তও কসরৎ করতে হয় না—পায়ের পাতায় ভর দিয়ে গোড়ালিতে আলগা দিলেই ফস করে বেমালুম খুলে আসে। কুবেরের তা মুখস্ত। তেমনি একটা সস্তা কৌশল করে কুবের খালি পায়ে ঘরের মধ্যে চলে এলো।

নিচু, নরম একটা কৌচের গভীর গদির মধ্যে ডুবে গিয়ে সুশান্ত বসে আছে,—ঘরে আর লোক নেই - মোটা-মোটা হাতলের উপর দুই কনুই খাড়া উঠে গেছে, দুই হাতের আঙুলে একটা খবরের কাগজ প্রসারিত, এতো পরিপূর্ণ প্রসারিত যে তার মুখ পড়েছে ঢাকা, তার চেতনা রয়েছে আচ্ছন্ন। সামনে হাঁটু-অবধি-উঁচু ছোট দুটো টিপয়, উপর দুটো নীলচে আর হলদেটে কাচের : একটাতে চায়ের খুচরো সরঞ্জাম, চায়ের চৌকো মতন একটা বাটি ও একটা পট ; আরটাতে সিগারেটের কৌটো, দিয়াশলাইর ষ্ট্যাণ্ড, গোটা তিনেক রকম-বেরকমের ছাইদান। দেয়ালগুলো ফিকে ডিসটেম্পার করা, মেঝের পুরু গালিচা, এখেনে-ওখেনে সোফায় আকীর্ণ। দক্ষিণের দরজায় আবার একটা পরদা ঝুলছে, তারই খানিক ফাঁকে আবার একটা প্রকাণ্ড ঘরের আভাস। নিঃশব্দ-গাঢ়, অপরিচিত আবহাওয়ায় পড়ে কুবের হাঁপিয়ে উঠলো। নিজের উপস্থিতিটা প্রচার করতেও তার লজ্জা হচ্ছে, অথচ এমনি অকারণে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাটাও বিসদৃশ।

খবরের কাগজের আড়াল থেকে শব্দ এলো : বসুন।

সামনের সোফার এক কোণে কুবের কুণ্ঠিত হয়ে বসলো। সুশান্তর মুখ খবরের কাগজে ঢাকা পড়লেও তার আসল চেহারার আন্দাজ পেতে দেরি হয় না। শুঁড়তোলা মারাঠি চটিজুতো দুটো পা থেকে শিথিল হয়ে আধখানা কার্পেটের উপর খসে পড়েছে : ওদিকে মণিবন্ধের উপর থেকে পাঞ্জাবির হাত এসেছে প্রায় কনুইর কাছে নেমে—সুশান্তর গায়ের রঙ অত্যন্ত ফর্সা, কিন্তু সেই শুভ্রতায় চোখ জ্বালা করে না, চোখ জুড়িয়ে আসে। তার বসবার এই বিস্তৃত এলানো ভঙ্গি

থেকে অনুমান করা যায় তার দৈহিক দৈর্ঘ্য ; চওড়া কব্জি ও হাত পায়ের প্রশস্ত পেশলতা থেকে সূচিত হচ্ছে তার অজস্র বলদীপ্তি ; আর তার এই অলস বিশ্রাম-সমারোহে তার অপরিমাণ ভোগলিপ্সুতা। কিন্তু মুখের থেকে কাগজটা সরিয়ে নিলেই হয়তো সে দেখতে পাবে রূক্ষ কপাল, কুটিল ভুরু, নির্বাপিত নির্লিপ্ত মুখ-ভাব। মুখের উদ্ঘাটনের সঙ্গে-সঙ্গেই হয়তো তার সমস্ত ঔৎসুক্য যাবে ধূলিসাৎ হয়ে।

কাগজের ফাঁক দিয়ে সুশান্ত এই নতুন-আগতকে দেখে নিচ্ছিলো। হেভেন্‌স, কোথাকার একটা পুঁচকে ছোঁড়া দেখছি যে। বয়েস বাইশ-তেইশ হবে হয়তো। একমাথা কোঁক্‌ড়ানো উস্কখুস্ক চুল, আঠায় মতো জট পাকিয়ে আছে, পরনের কাপড়টা নির্লজ্জ ময়লা, হাঁটুর কাছে ছেঁড়া জায়গাটা ঢেকে রাখবার দুর্বল চেষ্টা—সোফার এক কোণে সঙ্কীর্ণ হয়ে বসে নিজেকে কেমন স্তিমিত করে এনেছে। চেহারায় যেন সতেজ একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু দারিদ্র্যে তার সহজ বিকাশ হয়ে এসেছে নিষ্প্রভ। চোরা চোখে খানিকক্ষণ কুবেরকে সে দেখে নিলো বটে, কিন্তু ও-পক্ষ থেকে সাড়া-শব্দ না পেয়ে আবার খবরের কাগজের গহ্বরে সে ডুবে গেলো। ছেলেটার মুখে যেমন একটা কাতর ভীতু ভাব, নিশ্চয়ই তাদের আবির্ভাব-এর জন্যে পকেটে করে প্রেমের কবিতা নিয়ে এসেছে। ঠিক একটা প্রেমে-পড়া বা ব্রেনে-পড়া চেহারা। বিরক্তিতে সুশান্তর নাকের ডগা কুঁচকে এলো।

কথা না বলে আর পারা গেলো না। তেমনি কাগজের আড়াল থেকেই সুশান্ত প্রশ্ন করলে : কী চাই ?

নিতান্ত ঘাবড়ে গিয়ে কুবের প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়লো : আপনার কাছে একটু এসেছিলাম—

সুশান্তর মুখ এখনো আবৃত : তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কারণটা কী শুনি।

—আমার মা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কাল তাঁর চিঠি পেলাম।

মা! অপ্রত্যাশিতেরো একটা সীমা থাকা উচিত। সুশান্ত সারা শরীরে নিদারুণ চমকে উঠলো। হাতের কাগজটা কোলের ওপর ছড়িয়ে ফেলে সুশান্ত তার হেলানোর ভঙ্গিটা একটু টান করে উঠে বসলো, পীড়িত মুখে বললে—মাপ করবেন, আপনাকে ঠিক চিনতে পাচ্ছি না।

—চিনতে পারার বিশেষ কথাও নয়, কুবেরের মুখে অস্ফুট হাসির লজ্জমান একটি রেখা উঠে মিলিয়ে গেলো : আমার নাম কুবের কুমার—

দুই চক্ষু তীক্ষ্ম, শ্রুতিমান করে সুশান্ত কৌচের হাতল দুটো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বসে রইলো। একটি মুহূর্তের অণুতম ভগ্নাংশ মাত্র।

—কুবের কুমার বসু।

শিকারীর হাতে গুলি খেয়ে বাঘ যেমন সামনের দিকে লাফ দিয়ে ওঠে, সুশান্ত তেমনি এই একটা নিরীহ নামোচ্চারণে তার চেয়েও বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠলো। অকস্মাতের প্রাবল্যে সে একেবারে কৌচের প্রান্তে এসে পড়েছে, উদাসীন মুখে এসেছে স্ফুরিত প্রাণচ্ছটা, উচ্ছ্বসিত আবেগে তক্ষুনি যেন সে কথা কইতে পারছে না।

-কুবের—কুবের কুমার বসু। আপনি—যিনি লেখেন ?

সামান্য একটু ঘাড় হেলিয়ে লাজুক গলায় কুবের বললে,—হ্যাঁ।

আর সুশান্তকে পায় কে। কুবের কুমার বসু, অথচ এই হীন, জঘন্য বেশবাস। গায়ের জামাটা গলিত-ছিন্ন, ধুতির প্রতিটি সুতোয় দারিদ্র্যের বীভৎস বিজ্ঞাপন। এই যেন একরকমের অকপট আধুনিকতা—যতো দুঃসাহস এই বর্বর দারিদ্র্য-প্রচারে। কিন্তু তবুও সুশান্ত শত তার সূক্ষ্ম রুচিলাবণ্যজ্ঞান সত্ত্বেও কেন জানি মনে-মনে অখুশি হতে পারল না। বেশবাসের আবর্জনা পেরিয়ে যখন সে তার চোখ এনে কুবেরের মুখের উপর রাখলো, সেই সরল, স্নিগ্ধ, আত্মতৃপ্ত মুখ-ব্যঞ্জনায় দেখতে পেলে না সে দারিদ্র্যের এতোটুকু অন্যায় স্পর্ধা—বরং একটি প্রাঞ্জল, সলজ্জ ঔদাসীন্য। তাকে দেখে হঠাৎ তার সেই Luis Camoens-এর কথা মনে পড়ে গেলো—সেই Apollo of Portugal : সে য়্যাপোলোর মতো রূপবান তার শরীরসৌন্দর্যের জন্যে নয়, তার কবিতা—তার *Lusiad*-এর জন্যে : এতো যে গুণ-সুন্দর সে লিস্‌বনের রাস্তায় পথের একটা কুকুরের মতো না-খেতে পেয়ে মারা গেলো, তাকে সবাই না খেতে দিয়ে মেরে ফেললে। মনে পড়লো এড্‌মাণ্ড স্পেন্‌সার, শেষ বয়সে এক কামড় রুটি না পেয়ে যে মারা পড়লো এক ট্যাভার্নে ; মনে পড়লো টমাস্‌ অটোয়ে—সেই উজ্জ্বল, উন্নাসিক অটোয়ে, না-খেতে পেয়ে নিবে গেলো যে এক এইল্‌-হাউসে ; মনে পড়লো টমাস্‌ চ্যাটারটন, আঠারো বছরের সেই কবি-কিশোর, এক কণা করুণার জন্যে ভিক্ষা না করে যে আর্সেনিক খেয়ে আত্মহত্যা করলো। কুবেরের মুখেও যেন সেই মহিমা দুঃসহ দীপ্তি পাচ্ছে। সুশান্তর কল্পনায় কুবেরের এই কদর্য বেশবাস যেন তার উদ্ধত জয়পতাকার সঙ্কেত।

উত্তেজনায় সুশান্ত উঠে দাঁড়ালো। বললে,—আপনি—তুমি, আপনাকে দেখে ভারি খুশি হলাম। হঠাৎ এসে পড়লেন দেখে যে কী ভালো লাগলো। বহুদিন থেকেই ইচ্ছে ছিলো আমাদের সাহিত্যিক আড্ডায় আপনাকে একদিন নেমন্তন্ন করে পাঠাবো। আমাদের কাগজে লেখা দেন না কেন ? দিন না একটা কবিতা।

চুলগুলিতে একবার আঙুল চালিয়ে কুবের বললে,—তেমন কোনো সদুদ্দেশ্য নিয়ে হঠাৎ আসিনি। কাল মা-র চিঠি পেয়ে জানলাম—

কুবের চেয়ে দেখলো তীব্র জিগ্‌গাসায় সুশান্তর মুখের নিশ্চিহ্ন রেখাগুলি হঠাৎ তীক্ষ্ম, ধারালো হয়ে উঠেছে।

—যে, কোন্‌ সম্পর্কে তিনি আপনার মাসিমা হন। দাঁড়ান, বলতে দিন আমাকে। সোফার উপর একটু নড়ে-চড়ে বসে কুবের বললে,—নবিনগরের সারদা-কুমার বসুর নাম শুনেছেন আশা করি, আমি তাঁর ছেলে।

—খুব, খুব শুনেছি। সুশান্ত প্রায় কুবেরের গা ঘেঁষে সোফার উপর বসে পড়লো : কিন্তু সেই পরিচয় দেবার বিশেষ দরকার ছিলো না। আপনি—তোমাকে এবার আমি স্বচ্ছন্দে তুমি বলে ডাকতে পারি—তুমিই তোমার নিজের পরিচয়। এবং সেই পরিচয়েই তুমি আমার অনেক কাছে। বলেই সে গলা ছেড়ে হাঁক দিলে : লোকনাথ !

সেই টুলের লোকটি এসে হাজির।

—পট্-এ করে আরো কিছু চা নিয়ে আয় ; বৌদিদিদের কাউকে বল কিছু একটা তৈরি করে দিতে।

বাধা দিয়ে কুবের বললে,—অসময়ে এসবে আমার মোটেই অভ্যেস নেই। কথাটা সেরে আমাকে আবার এখুনি মেস্-এ ফিরে যেতে হবে। দয়া করে বারণ করে দিন।

সুশান্তর ইসারায় লোকনাথ থেমে গেলো। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের টিনটা টেনে এনে সুশান্ত বললে.—Have one please.

লজ্জায় মিইয়ে গিয়ে কুবের বললে,—আমি ও খাইনে।

—খাও না মানে ? পাগল নাকি ? সম্পর্কে আমি তোমার দাদা, দাদা বলেই বুঝি অমন স্রিঙ্গ করছ। সুশান্ত একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো : খাবার জিনিস খাবে তাতে লজ্জা কিসের ?

—ও আমার ঠিক আসে না। গলা খাঁখরে কুবের বললে, —আমার দরকারি কথাটা —

—বলো কী ! বাইরের একটা নেশা ছাড়া কি করে লেখা চলে ? লিখতে-লিখতে যখন ফাঁক পড়ে, তখন সেই ফাঁক ভরাট করবার জন্যে সিগারেটের ধোঁয়া চাই। লিখি আর না লিখি, আমার মুখে সর্বদাই এই আগুন জ্বলছে। বলে সে খানিকটা হেসে উঠলো আস্তে-আস্তে, দাঁতের ফাঁকে কিরকম একটা অদ্ভুত শব্দ করে : তোমায় বলতে কি কুবের, সিগারেটটা ছিলো বলেই আমরা ছোট-গল্পের আর্ট ঠিক বুঝতে পেরেছি। কি বলো ?

এসব কথায় কুবেরের নিরুত্তর নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করে সুশান্ত কুবেরের কথায় ফিরে গেল : তুমি কুবের বসু—আমার কাছে এই তো তোমার একমাত্র কথা। এর অতিরিক্ত কী কথা থাকতে পারে আমি ভেবে পাচ্ছি নে।

কুবের বললে,—আমি কিন্তু সেই সুবাদে আপনার কাছে আসিনি ; তাহলে অনেক আগেই আসতে পারতাম হয়তো। আমি এসেছি আজ কিঞ্চিৎ ছোট ভাইর দাবি নিয়ে—অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত দাবি।

স্বচ্ছন্দে ঘাড় হেলিয়ে সুশান্ত বললে,—বলো।

—সাহিত্যিক হয়ে এলে হয়তো এ-দাবি নিয়ে আপনার ঘরে ঢুকতে সাহস পেতাম না। ভয়বিহ্বল, গাঢ় চোখ তুলে কুবের বললে,—তাই একটা সম্পর্ক খুঁজে পেয়ে এই স্পর্ধা দেখাতে পারছি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—আপনার কাছে আমার সামান্য কটা টাকা চাই। এই শ'-দেড়েক—আমি এবার এই এম-এ দেবো ভাবছি।

হঠাৎ তার কাঁধ চাপড়ে সুশান্ত হেসে উঠলো : বাঃ, স্বচ্ছন্দে—একশো বার চাইতে পারো। এর জন্যে এতোক্ষণ ধরে এতো ভণিতা করতে হয়! টাকাটা তোমার এক্ষুনি চাই ?

করুণ, কৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে কুবের বললে,—যদি বলেন তো আরেক সময় আসবো না হয়।

—আরেক সময়। ধরো আজ বিকেলেই। কিম্বা—এখন তো প্রায় এগারোটা বাজে, খেয়ে-দেয়ে দুপুরেই একেবারে চলে এসো না।

—তাই। কুবের উঠবার একটা দুর্বল ভঙ্গি করলো।

মুঠি করে তার হাত চেপে ধরে সুশান্ত বললে,—তুমি কোথায় কোন্ একটা মেস্-এ আছো বলছিলে না? কী করে তোমার চলতো?

লজ্জায় কুবের যেন একেবারে অনাবৃত হয়ে পড়লো। বললে,—কী করে আবার! এই একটু-আধটু লিখে, টিউসানি করে। ইদানীং নিজের পরীক্ষার জন্যে সকালের টিউসানিটা ছাড়তে হয়েছে।

বেদনায় সুশান্তর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। জিগ্গেস করলে: টিউসানিতে কতো পেতে?

—যাচ্ছেতাই। মুখে উচ্চারণ করা যায় না। এতো কম যে কতোক্ষণে সময় কাটবে পড়াতে বসে এই কেবল জপমন্ত্র ছিলো। তারপর একবার যখন বলতে পারতাম, 'উঠি,' উঃ, সে যে কী শান্তি, কী সুখ—

—লিখে?

—তার চেয়েও খারাপ। মনে-মনে চিন্তা করলেও পাপ হয়। গভীর দুঃখে কুবেরের ঠোঁটের উপর হাসির একটি ক্ষীণ রেখা দেখা দিলো: গল্পের আকারে কিছু একটা গদ্য দাঁড় করাতে পারলেই যা-হোক কিছু-খানিক রোজগার হয়। আর বাঙলা দেশে সেই ভালো লেখে যে বেশি লেখে। অথচ প্রাণধারণের দাবি এতো প্রচণ্ড যে বেশি না লিখে উপায় নেই। আর এই তাড়াহুড়োয় হয় কি, জানেন? নিভৃতে বসে নিজের ভালো লেখা একটাও আর শেষ করা হয় না। দেহের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে আত্মা থাকে নিরম্বু উপোসী।

সুশান্তর গলা কেমন আর্দ্র হয়ে এসেছে: কেন, বাড়ি থেকে তোমার কিছু আসে না?

ঠোঁটের উপর হাসির সেই সূক্ষ্ম রেখাটি কুবেরের মুখে আরো গভীর দাগ কেটে বসে গেলো। বললে,—বাড়ি কোথায়, কে বা সেখানে আছে যে কিছু আশা করতে পারবো? আমি আর আমার ছোট একটি বোন নিয়ে মা বিধবা হন, বিস্তীর্ণ ঋণ ছাড়া বাবা আর সংসারে কোনো কীর্তিই রেখে যাননি, বাড়ির ভিটে-মাটি খুঁটি-বেড়া সব গেলো উচ্ছন্নে। সেসব অতি জঘন্য কথা, সেই ছোট বোনটি হঠাৎ মারা গেলো, ললাটের মতো মার হাতও হলো একদিন শূন্য। বারান্দা দিয়ে ঘরে আসতে-আসতে দেয়ালে একটি খুকির ছবি দেখলাম,—আমার সেই ছোট বোনটির কথা কিছুতেই আমি ভুলতে পারি না।

—আর তোমার মা—আমার মাসিমা?

—তিনি আছেন সেই গাঁয়েই, দূরতম এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে। গ্রাসাচ্ছাদনের পর্বটা কায়ক্লেশে কোনোরকমে সমাধা হয় বটে, কিন্তু আর কোনো আর্থিক স্বাধীনতাই তাঁর নেই। মাঝে-মাঝে তাঁকেও কিছু পাঠাতে হয়। ইচ্ছে ছিলো তাঁকে এখানে নিয়ে আসবো, কিন্তু এতো বড় সহরে নিজেরই এখন জায়গা করতে পারছি না—

—এই সামান্য আয় থেকে মাকেও পাঠাতে হয়?

—উপায় কি তাছাড়া? ওখান থেকে মা তো আর দেখতে পান না, আমাকে এখানে জীবনধারণের কী অমানুষিক আড়ম্বর করতে হচ্ছে। নিজেকে সব সময়ে

এতো ব্যাপৃত রাখার মধ্যে ঐ তো আমার একমাত্র তৃপ্তি যে মাকে সহজে ভাবতে দিতে পারছি আমার এতোটুকু দুঃখ নেই। হঠাৎ কুবের নিজের অতিব্যস্ততার প্রাবল্যকে শাসন করলে আর একবার উঠে পড়বার চেষ্টা করে বললে,—আপনার সঙ্গে সাহিত্যিক ব্যবধান পেরিয়ে আসতে পেরেছি বলেই অবান্তর এতো কথা বলতে পারলাম। বেশ দুপুরেই আবার আসবো।

ফের তাকে হাতের চাপ দিয়ে নিরস্ত করে সুশান্ত হেসে বললে,—তুমি তো উঠি বলতে পারলেই খুশি। তুমি কদ্দিন কলকাতায় আছ ?

আবার মুখ খুলতে পেয়ে কুবের হাঁপ ছাড়লো। বললে,—ম্যাট্রিকটা পাশ করেই। এই প্রায় বছর ছয় পুরতে চললো। মাকে অনেক অভয় দিয়ে এসেছিলাম যে কলকাতায় পৌঁছেই একটা অসাধ্যসাধন করে বসবো, কিন্তু কবিতা মেলানো ছাড়া আর কোনো মহত্তর কীর্তি আমাকে দিয়ে সম্ভব হলো না। চাকরি পাব ভাবলাম, পেয়ে গেলাম ভাষা, নিজেকে প্রকাশ করবার একটা অমানুষিক প্রেরণা। কোথা থেকে মনের সমস্ত রঙ গেলো বদলে, চোখে এলো নতুন মূল্য খোঁজবার ঝোঁক। কি করে যে কী হয়ে গেলাম ধরাবাঁধা কিছু বুঝতেই পারলাম না, নাকের বদলে পেলাম মাত্র একটা নরুন। অদ্ভুত।

সুশান্ত জিগ্গেস করলো : কলেজে পড়তে গেলে কেন ?

—বাকি সময়টা তাহলে কী দিয়ে ভরিয়ে তুলি ? আমার মতো অকর্মণ্য আর কী করতে পারে বলুন ? মার তবু আশা এম-এ-টা পাশ করেই আমি একটা ধনুর্দ্ধর হয়ে যাবো। তবু তাঁকে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকতে দেয়া হচ্ছে—আমার মতো অকর্মণ্যের পক্ষে এই বড়ো সান্ত্বনা।

সুশান্ত আরেকটা সিগারেট ধরালো। বললে,—তোমার এই কবিতা-লেখার অকর্মণ্যতার জন্যে তোমার অনুশোচনা হয় নাকি ?

—পাগল ! কুবেরের মুখ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো : ঐ তো আমার আসল জীবন, আমার আদিম সার্থকতা। কথাগুলো নিতান্ত কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে, না ! বলে কুবের জোর পেয়ে গলা ছেড়ে হেসে উঠলো : তা নইলে বাঁচবার কোনো যেন মানে পেতুম না। নিজেকে কোনক্রমে প্রকাশ করতে না পারার অর্থই তো হচ্ছে অপমৃত্যু। মানুষে কী আর আবিষ্কার করতে পারে জানি নে, আমি খুঁজে পেলাম আমার নিজের ভাষা, নিজের নক্ষত্র।

সুশান্ত তার মুখের দিকে নিষ্পলক পরিপূর্ণ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। কথাগুলি ছাপার অক্ষরে দেখলে নিশ্চয়ই তার গা ঘিনঘিন করতো, কিন্তু কুবেরের মুখে তা শোনালো ঠিক একটা কবিতার আবৃত্তির মতো। কুবেরের মধ্যে যেন সে দেখতে পেলো সেই বন্দী প্রমেথিউস্, ককেসাস্ পর্বতে বন্দী—গড়তো যে মাটির মানুষ, স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনে যে সেই মৃন্মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করতো। অবস্থার নাগপাশে জর্জরিত, ঘটনার চাকার তলায় নিষ্পেষিত কুবেরের মাঝে সে এক মূর্তিমান মহান মুক্তির প্রার্থনা দেখতে পেলো, তার দুই চোখে সেই অপরূপ আগুন, যে-আগুনে অরণ্য পুষ্পে দীপ্যমান হয়ে ওঠে, জলে জাগে ঢেউ, জীবনে আসে শাণিত লবণাক্ত স্বাদ। তার চোখে সেই বহ্নিমান প্রাণচ্ছটা, সেই জ্বলন্ত অতৃপ্তিপিপাসা। কুবেরকে না-দেখবার আগেই তার মনে

হয়েছিলো এক ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল্‌ প্রোটোজ্‌ন, তার ক্ষুদ্র প্রাণবিন্দুতে বৃহত্তর সৃষ্টি সমুদ্রের সঙ্গোপন সম্ভাবনা ; আজ তাকে স্বচক্ষে দেখে মনে হলো এক মহিমান্বিত অমিতবলী দৈত্য, যে তার সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে পড়ে এখনো নিজের ক্ষমতার সম্যক সম্মান করতে শেখেনি। মাত্র স্থূল দেহধারণের ক্লান্তিকর ব্যায়াম করতে গিয়ে প্রাণকে করতে বসেছে পঙ্গু, জোর করে ছন্দ ভেঙে ভাষাকে নিয়ে আসতে হয়েছে গদ্যের একঘেয়েমিতে। দৈন্যে-দারিদ্র্যে সে-দীপ্তি প্রায় ম্লান হয়ে এলো ; অভাবের আবর্জনার স্তূপে, একদিন শুনতে পাবে, সে-প্রাণশিখা কবে তার নিবে গেছে। এতো বড়ো অপচয়, এই অপরিমাণ ক্ষতি পৃথিবী বহন করবে কি করে ! সুশান্তর এতোদিনকার সতেজ আভিজাত্যবোধ আজ সহসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, তার এতোদিনকার সরস কাব্যানুরক্তি আজ যেন একটা বাহ্যিক দৃষ্টান্ত পাবার ইচ্ছায় সজাগ হয়ে উঠেছে। না, কুবেরকে সে অননুকূল সংসারের বিরুদ্ধে অনবরত ঠোকর খেয়ে খেয়ে ক্ষয় পেতে দেবে না, তাকে সে সুস্থ, সম্পূর্ণ করে তুলবে। সে হবে তার পেট্রন-সেইন্ট। তাকে সে দেবে স্থান, বিস্তীর্ণ আশ্রয়, সেই তার নিশ্চিন্ত নিভৃত অবসর। তার নিত্যযুদ্ধোন্মুখ, তীক্ষ্ম স্নায়ুশিরাগুলিকে সুমধুর আলস্যরসে নমনীয় করে আনবে, চোখে এই জ্বালার পরিবর্তে আনবে বিভা। মাত্র কতোগুলি শারীরিক সুবিধে নয়, দিনরাত্রিব্যাপী এক গভীর উদ্যোতনা। না, তাকে সে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে তার চারপাশে আরাম-রমণীয় সস্নেহ প্রকৃতি নির্মাণ করে দেবে—অজস্র আলো, অপরিমেয় আকাশ। তাকে সে সংসারের ভারবাহী স্বার্থের ভিড়ে হারিয়ে যেতে দেবে না। তাকে সে দেবে প্রতিষ্ঠা, পরিসর, তাকে সে আপন অস্তিত্বে আস্থাবান করে তুলবে। নিজেকে দিয়ে দেশ বা সাহিত্যের কী উপকার হবে কে জানে, এই একজনকে যদি সে জায়গা করে দিতে পারে সেই হবে তার শ্রেষ্ঠ রচনা—তার chef d' CEuvre.

কথাগুলো বলে ফেলে কুবেরের কানে তা অত্যন্ত জোলো শোনাচ্ছিলো। তাই, সুশান্তকে একটু অন্যমনস্ক লক্ষ্য করে সে চট্‌ করে উঠে পড়লো। চুলে আরেকবার আঙুল চালিয়ে বললে,—তবে দুপুরের দিকেই একবার আসবো !

—হ্যাঁ, তাই এসো। দেখাদেখি সুশান্তও উঠে পড়েছে : আর মেস্‌এ তোমার যা-সব দরকারি জিনিস আছে বলে মনে করো, তা-ও একটা গাড়ির মাথায় করে নিয়ে এসো। তেমন কিছু পার্সন্যাল্‌ বা দরকারি মনে না হলে কষ্ট করে বয়ে আনবার হাঙ্গামা করো না। তারপর পকেট হাতড়ে মনিব্যাগ বার করে : আর সম্প্রতি দশটা টাকা নাও, যদি কিছু ডিউজ ক্লিয়ার করবার থাকে। ধারধুর আর যা যেখানে আছে, আমার বাড়ির ঠিকানা বলে দিয়ো।

কুবের চিত্রার্পিতের মতো অবিকল দাঁড়িয়ে রইলো। বললে,—কিছুই বুঝতে পারছি না।

—দুপুর বেলা চলে এলেই ঠিক বুঝতে পারবে। নাও, নোটটা ধরো। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, তোমাকে যখন একবার পেয়েছি, আর ছাড়া হচ্ছে না—এখন থেকে এখানেই তোমাকে থাকতে হবে।

চোখ নামিয়ে ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে কুবের বললে,—তা কী করে হয় ?

অনুরোধের সুরে খানিকটা সুশান্তর আদেশের ঝাঁজ এসে পড়েছে : মালপত্র নিয়ে গাড়ি বোঝাই করে সোজা চলে এলেই হয়। এতে আবার ভাববার কী আছে ?

—আমার আবার মালপত্র কী !

—বেশ, খালি হাতেই এসো তবে। যদি বলো, এখন থেকেই থেকে যাও তাহলে। ডাকি লোকনাথকে।

—না, না, কুবের অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো : আমার একটিবার মেস্-এ ফিরে যাবার দরকার আছে বৈ কি ! কিন্তু ভাবছিলুম, আমি এলে আপনাদের অনেক অসুবিধে হবে।

—যদি হয়, সুশান্ত জোর গলায় বললে,—এক ফোঁটা হবে না তা আমি জানি, —যদি হয়,—সে-অসুবিধে তোমার এই তিল-তিল অপমৃত্যুর তুলনায় কিছু নয়। যাও, don't chop logic with me, বাজে তর্ক আমি ভালোবাসি নে। আমি তোমার দাদা—এ-সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমি আমার জোর জাহির করতে ছাড়বো না। সে-দাবি আমার তোমার ভালো দেখা, তোমাকে মানুষ করে তুলতে সাহায্য করা। আমার ঐ এক কথা, তোমার আর ঐ-সব নোংরা মেস্-এ থাকা চলবে না, বুঝলে ?

কৃতজ্ঞতায় কুবেরের দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। বললে,—আমি আরো আগে আসিনি কেন ?

—ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে পালিয়ে আসা উচিত ছিলো। Better late than never. যাও, আর দেরি করো না। আমি তোমার ঘর-দোরের বন্দোবস্ত করে ফেলছি।

দরজার চৌকাঠের কাছে পৌঁছে কুবের আবার ফিরে এলো। হঠাৎ সুশান্তর পায়ের কাছে নুয়ে পড়ে বললে,—আপনাকে এখনো একটা প্রণাম করা হয়নি !

দু' পা পিছু হটে গিয়ে সুশান্ত প্রায় অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলো : এ আমার দাদাত্বের প্রতিদান বুঝি ? তুমি তোমার ঐ টিউসানিতে এক্ষুনি ইস্তফা দিয়ে আসবে ; মাস্টারি করতে গিয়ে কতোগুলি গ্রাম্যতা তুমি অর্জন করে বসেছ। আর শোনো।

কুবের ফিরে দাঁড়ালো।

—তোমার মেস্-এর ঠিকানা দিয়ে যাও। আসতে যদি তোমার অন্যায় দেরি দেখি, তবে আমিই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বো।

নোটটা ভাঁজ করতে-করতে কুবের বললে,—না, আসবো ঠিক। এই ঘণ্টা দুয়েক।

॥ দুই ॥

কলকাতার সঙ্গে কুবেরের সেই প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। স্টেশনে নেমে কলকাতার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো চব্বিশ মিনিট তা এগিয়ে চলেছে। চারদিকে কেবল এই এগিয়ে যাওয়ার উন্মাদনা, দ্রুতধাবনের রোমাঞ্চিত অন্ধতা। তখন রাত হয়ে গেছে যখন দাঁড়ালো এসে ট্রেন, কলকাতার কঠিন অন্ধকারে রক্তাক্ত ক্ষতমুখের মতো লাখো-লাখো আলো কুবেরের কাছে তা নক্ষত্রাঞ্চিত গ্রাম্য আকাশের চেয়ে অপরূপ মনে হলো। সেই শ্যামলতার থেকে এই কুটিল রুক্ষতা, সেই স্নেহ থেকে এই বৈরাগ্য, সেই নিবিড় গৃহনীড় থেকে এই উত্তাল জনসমুদ্র। দিনে-দিনে এই সহর তার স্নায়ু-শিরায় প্রখর শিহরণ ধরিয়ে দিলো, এর একেকটি মুহূর্ত উত্তপ্ত সুরার উচ্ছল ফেনকণার মতো। কতো ভাষা, কতো পোষাক, কতো কোলাহল। কতো এর রূপ, কতো এর রীতি। কী এর বিচিত্র রঙ, কী এর অগণিত রেখা। কুবেরের আর পলক পড়তে চায় না। স্কুলের রচনায় গ্রামের সঙ্গে সহরের প্রতিযোগিতায়, শোভাবর্ণনায় গ্রামকেই সে সম্পৎশালী করেছে, কিন্তু এখন থেকে স্বচক্ষে সে দেখতে পাচ্ছে প্রাকৃতিক যথেচ্ছাচারের চেয়ে মানুষের এই করুণ কৃত্রিমতা কতো মহত্তর। ফুলে-ফুলে গ্রাম যখন বসন্তে বিহ্বল হয়ে ওঠে তাঁর তুলনায় মানুষের এই উচ্চারিত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি কতো সজীব-স্পষ্ট। তাদের গ্রাম্য আকাশে পূর্ণিমার প্রবল আত্মোদ্ঘাটনের চেয়ে অট্টালিকা-কণ্টকিত ড্যালহৌসি স্কোয়ারের উপর করুণ চন্দ্রোদয় মনকে কতো বেশি স্পর্শ করে। তাদের সেই মাঠময় তরঙ্গায়িত বিস্তারের চেয়ে প্রতি পদে এই বাধাবারিত সংকীর্ণ বন্দীত্বের মধ্যে কী বিশালতার আভাস! গ্রামের আর সেই অলস-তৃপ্ত আত্মবিস্মৃতি নয়, প্রতি দিনগণনার সঙ্গে তীব্রতরো নিঃসঙ্গতাবোধ। এর নেশায় কুবের উচ্চকিত। সহর তার কাছে শুধু একটা ভৌগোলিক তথ্য নয়, একটা দীর্ঘচ্ছন্দী অসমমাত্রিক কবিতা। তার জীবিকার্জনের কঠিন কর্মক্ষেত্র নয়, কোন দূরতীরান্তরে তার আবিষ্কারের আশ্রয়। এর রূপে ও মাতাল, এর ঔজ্জ্বল্যে চোখ গেলো ওর ধাঁধিয়ে। এর মোটরের হেড্-লাইট, এর শো-কেইসের বিজ্ঞাপন, এর জ্বলন্ত সব স্কাই-সাইন্। এর তাপ আর গন্ধ, ধুলো আর ধোঁয়া। এর ঝকঝকে দিন, ঝলমলে রাত। যাওয়া আর আসা, ওঠা আর নামা, দেখা আর ভোলা। আর সবার উপরে এর সৌম্য, বিস্তীর্ণ ঔদাসীন্য। চারিদিকে এই গতির দীপ্তি, বেগের প্রাখর্য। চাকায়-চাকায় সংঘর্ষ, পাখায়-পাখায় ক্ষিপ্রতা। সমস্ত আনন্দ-আহরণ-প্রচেষ্টার মধ্যে, কুবেরের মনে হয়, এই গতি-প্রাবল্য-স্পৃহাই হচ্ছে আধুনিক, সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। আর যতো সম্ভোগই বলো, প্রাচীনকালকে পরাভূত করা যাবে না ; সঙ্গীত বলো, সুরা বলো, প্রাণীহত্যা বলো, প্রাণধারণের নিবিড় মত্ততা বলো, ঐ কাল ছিলো অতুলনীয়, ঢের বেশি বিলাস-বিমগ্ন। যন্ত্রপাতির যতোই কেননা আধুনিক উদ্ভাবন হোক, তার থেকে আহৃত আনন্দ প্রাচীনকালের তুলনায় সূর্যের কাছে মোমবাতির মতো ফিকে। কেবল এই বেগঘূর্ণি, এই উন্মত্ত অগ্রগমনের তৃষ্ণা, এই উদ্দীপ্ত চাঞ্চল্য—এই হচ্ছে

আধুনিক কালের অননুকরণীয় আশ্চর্যজনক আনন্দ। উজ্জীবিত চেতনায় কুবের এই আনন্দ আকণ্ঠ পান করছে।

সেই জব্ চারনকের কলকাতা। জেলেদের সেই একটুকরো গ্রাম—ষোলো শ' নবুইয়ের সেই কলকাতা। বৌবাজার আর সার্কুলার রোডের মোড়ে বিশাল এক পিপুল গাছের তলায় জব্ চারনক্ তার ইংরেজ বেনে-বন্ধুদের সঙ্গে বসে তামাক খেতো—তারই থেকে এর প্রথম সূচনা। আজ তার কী বিশাল-বিসর্পিত দেহ, কী তার ক্রম-বাহু-বিস্তার। নদী যেমন ধীরে-ধীরে মাটি ভেঙে এগিয়ে চলে, তেমনি এ ক্রমশঃ রাজ্যবিস্তার করছে। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কুবের তারই সৌন্দর্য সন্ধান করে বেড়ায়। কখনো ট্র্যামে-বাসে, কখনো পদব্রজে। মফস্বলের সঙ্গীহীন ছেলের মতো, প্রথমতো সে কলকাতার যা কিছু মামুলি দ্রষ্টব্য জিনিস, একা-একা তা-ই সব দেখে ফিরতে লাগলো: যা-ই দেখে তা-ই সে শিশুর চোখে দেখে—সমস্ত দেখার অন্তরালেই তার মুগ্ধতার চেয়ে বেশি কৌতূহল। স্টিমারে করে চলে যায় শিবপুরে—বোট্যানিক্যাল গার্ডেন্স্-এ—সামনে যার এক মাইল ধরে সমানে গঙ্গা বয়ে চলেছে। একা-একা আপন মনে পাইচারি করে বেড়ায়: অর্কিড্-হাউস্, পাম-হাউস, পাম-এভিনিউ, রকারি—সেই বিশালবিস্তৃত বটগাছের তলায় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে পুরনো। প্রায় ন' শ' ফিট্ মাটির উপর দাঁড়িয়ে, শুধু কাণ্ডই তার একান্ন ফিট্—যদিও সময়ে এখন তা অনেক জীর্ণ হয়ে এসেছে। তারপর কোথায় সেই দক্ষিণেশ্বর মন্দির—রামকৃষ্ণের স্মৃতিমণ্ডিত সেই স্নিগ্ধ বনছায়া, বাঁধানো পঞ্চবটী, সে প্রশান্তবাহিনী গঙ্গা। তারপরে জু: পশু-পাখি-সরীসৃপের বিচিত্র সমাবেশ: গণ্ডার আর জল-হস্তী, হায়না আর চিতা, ক্যামিলিয়ান্ আর পেঙ্গুইন্। কখনো মিউজিয়ম্। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পতঙ্গতত্ত্ব—এমন-কি নিউমিস্‌ম্যাটিক্স—মুদ্রা-বিজ্ঞান: শুধু মাছ-মাছি-জন্তু-জানোয়ারের কংকাল নয়, আদিম অসভ্য মানুষের ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস—তাদের বাড়ি-ঘরের নমুনা, তাদের নৌকো, তাদের অস্ত্র-শস্ত্র, তাদের অঙ্গসজ্জা। তারপরে আর্ট-গ্যালারি, বর্মার শেষ রাজা থিব-র সোনার সিংহাসন। কোনোদিন বা চলে যেতো ইডেন গার্ডেন্স্-এ—তখনো সেটা ফ্যাসানের বার হয়ে যায়নি - তার আঁকা-বাঁকা রাস্তা, ফুলন্ত ঝোপ-ঝাড়। প্রোম্ থেকে অপসারিত সেই বার্মিজ প্যাগোডা। আউটরাম-ঘাট থেকে সেই দূরগামী জাহাজের মাস্তুল, নোঙর নামানোর শব্দ, অন্ধকারে উড়ন্ত কোন পাখির এলানো ডানার ঝাপট। তারপর বদ্রিদাসের সেই জৈন মন্দির—যেন কোন স্বপ্নের ভাঙ্গা একটুকরো মর্ত্যরূপ। আগাগোড়া মসৃণ মর্মর, দেয়ালগুলো মোজেইক-এ ঝকমক করছে, মন্দিরের মাঝখানে হাজার ঝালরওয়ালা স্যাণ্ডিলার। কখনো দেখতে যেতো সেই নামজাদা মার্বেল-প্যালেস—সামনেই গভীরধ্যানলীন বুদ্ধের মূর্তি, আর কাছেই এক গ্রীক দেবী। ছোটখাটো একটা চিড়িয়াখানা, খোলা জায়গায় দলে-দলে পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। বিস্তর সব ছবির সংগ্রহ—তার মধ্যে একখানি জসুয়া রেনল্ড্স্-এর, দু'খানি রুবেন্স্-এর—সেইন্ট সেবাস্টিয়ান্-এর মার্টারডম্, আর সেইন্ট কাথ্‌রিন্-এর অতীন্দ্রিয় বিবাহ। শোনা যায় শেষের ছবিখানির জন্যে নাকি দু'লাখ পঁচিশ হাজার টাকা কে দর দিয়েছিলো, তবু বিক্রি

করা হয়নি। আর কলকাতার এই একেলে তাজমহল—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল হল্। তৈরি করতে যার লেগেছিলো নাকি ছিয়াত্তর লাখ টাকা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনেক সব দলিল দস্তাবেজ, ভিক্টোরিয়ার সেই পিয়ানো আর লেখবার টেব্ল্, কতো ছবির মিছিল, মুর্শিদাবাদের নবাবের সিংহাসন। পাশ জোগাড় করে গেছে সে ফোর্ট উইলিয়াম-এ—যার প্রথম পত্তন করেছিলো ক্লাইভ—সাতটা তার প্রবেশদ্বার। আকারে খানিকটা অষ্টাগন, নদীর দিকে তিন, আর মাটির দিকে তার পাঁচ ভুজ প্রসারিত। চারদিকে চওড়া পরিখা দিয়ে ঘেরা, সময় হলে নদীর জলে তা ভরে উঠবে। তার ভেতরে সৈন্যদের জনে ব্যারেক্, বাজার, প্যারেড ও খেলার মাঠ, গির্জা। তার ভিতরে, বলা যায়, ছোটখাটো একটি নকল কলকাতা। আর কলকাতার এই গঙ্গা—সমুদ্রের মুখে সংকীর্ণ পয়োনালী। এই গঙ্গা হিন্দু-বৌদ্ধ পর্তুগিজ-ওলন্দাজ মোগল-পাঠানের কতো বিপুল রাজধানীর উত্থান দেখেছে—সব গেছে তার জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে, কেবল টিকে আছে এই কলকাতা। অমর কলকাতা। অমরাবতী কলকাতা।

এর বিশাল সব অট্টালিকা, চিম্নি-কারখানা, গথিক্ হাইকোর্ট, হেস্টিংস্ হাউস, এর ড্যালহৌসি স্কোয়ার, ক্লাইভ স্ট্রীট, এসপ্লানেড জংশান, চৌরঙ্গি, এর সব য়্যাঙ্গ্লিক্যান্ আর ক্যাথলিক্ ক্যাথিড্রেল, এর মনুমেণ্ট-সেনোটাফ, এর কর্পোরেশান, এর উন্মুক্ত ময়দান—আদমের চোখে সৃষ্টির প্রথমতম বিস্ময়ের মতো কুবেরের কাছে এই অভূতপূর্ব কলকাতা। দিনের বেলার বৈরাগিনী রাতের বেলায় নৃত্যপরা বিলাসিনী সেজেছে। তার রুক্ষ কপালে এখন মুক্তার মুকুট, তার কিণাঙ্ক-কঠিন মণিবন্ধে এখন কনক-কঙ্কন। তার হোটেলে-হোটেলে জ্বলে উঠেছে আলো, কাঁটা-চামচ-গ্লাসের কনসার্ট, কোথাও বা বিলিয়ার্ড, বক্সিং, ক্যাবারে, কস্মোপলিট্যান্ হপ্। টকিরা গান গেয়ে কথা কয়ে উঠেছে, নরম সিল্ক আর সেণ্টের ঝাঁজে সমস্ত আবহাওয়া ভারি। শীতকালে তাঁবু পড়েছে সার্কাসের, আলোর মালা দুলিয়ে জাঁকিয়ে উঠেছে কার্নিভ্যাল। ঘুরে চলেছে হুইপ্, তীর ছুঁড়ছে জুয়াড়িয়া। দেখতে-দেখতে কলকাতায় কতো বদল, কতো ছাঁদ, কতো তার অঙ্গরাগের প্রসাধন। তার বালিগঞ্জ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, তার ভিক্টোরিয়া হাউস্, নিউ এম্পায়ার, তার উইলিংডন্ ব্রিজ। কতো রকমের তার আবহাওয়া: তার বড়োবাজার, তার কলুটোলা, তার পার্ক স্ট্রীট। চীনে-পাড়ায় কতোদিন কুবের ঘুরতে গেছে। কে বলবে সে পিকিং-এর একটা ট্রলিতে এসে পড়েনি? সেই সব কিম্ভূতকিমাকার অক্ষরের সাইন বোর্ড, জুয়োর আড্ডা—পুরোদমে চলছে যেখানে ফ্যান-ট্যান, আফিঙের পাইপ, চলছে বা কোকেনের ব্যবসা। তার মাঝে আবার হোটেল—সামান্য নিরীহ ডিম থেকে শুরু করে বার্ডস্-নেষ্ট-স্যুপ। যতো কুবের ঘোরে, কলকাতার সীমা খুঁজে পায় না, তার পথ ফুরোয় না, তার ক্লান্তি হয় না কোনদিন, তার ক্ষুধামান্দ্য নেই। সব সময়েই সে নতুন, সব সময়েই সে একান্ত আজকের। কুবের তার প্রেমে পড়লো নয়, গায়ে পড়ে তাকে ভালোবাসলো। যা তুমি দেখতে চাইবে, তাই তুমি দেখবে; দেখাটা জিনিসে নয়, চোখে—তাই কুবেরের কাছে কলকাতা হচ্ছে জোরালো এক কক্টেইল্, বহুতানসমন্বিত অর্কেস্ট্রা। কলকাতাকে দেখলো সে রাজেশ্বরীর মূর্তিতে।

কিন্তু রাস্তা বেড়িয়ে রাত করে যখন সে তার মেস্‌এ ফিরে আসে, সেই নোংরা চিপা গলি, তখনই তার উৎসাহে পড়ে ভাটা। দিনের বেলায় ঢুকতে পায় না রোদ, রাতের বেলা বেরোতে পায় না ধোঁয়া। নোনা-ধরা দেয়ালে নড়বড়ে কড়ি-বরগায় নোংরা মুমূর্ষু একটা মেস্‌, সব সময়ে স্যাঁতানি একটা দুর্গন্ধ, গলি বেয়ে বরাবর কাঁচা একটা নর্দমা। ওপারে চলে গেছে বস্তির সারি, ঠেলাঠেলি ঘেঁষাঘেঁষি—মুটে-মজুর, কুলি-মিস্ত্রি, ফিরিয়ালাদের মাথা গোঁজবার গর্ত। সঙ্কীর্ণ আকাশ, অপরিচ্ছন্ন হাওয়া। এই হচ্ছে দরিদ্রতম ভারতীয় পাড়ার চেহারা। এর দিকে চেয়ে কে বলবে কয়েকটা মোড় ঘুরে যেতেই দূরে ওখানে উৎসবের সালঙ্কার সমারোহ শুরু হয়েছে? এর দিকে চেয়ে কে বলবে কলকাতা রাজ্যেশ্বরী? কলকাতার আবার এই মলিন, বিষণ্ণ চেহারা। কুয়াসাক্লিন্ন আকাশে রুগ্ন চাঁদের করুণ, পাংশু চাউনি। নিতান্ত অভাবগ্রস্ত বলেই কুবেরকে কলকাতার এমন একটা কোণে এসে উঠতে হয়েছে। যাকে সম্বল করে সে এই বিরাট জনসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলো তার জন্যে সে এর চেয়ে আর কোনো নিরাপদ বন্দর খুঁজে পায়নি। জীবনবহনের আরেকটা উন্মুক্ততরো, সুস্থতরো পরিবেশের জন্যে সে এই দেয়াল ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে অনবরত মাথা খুঁড়তো, কিন্তু কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার অনেক বৈষম্য। মনে যে পরিমাণে আশা, পকেটে সেই অনুপাতে পয়সা নেই। আকাশ যেমন দূরে, মাটি তেমনি অত্যন্ত নিকটে।

কলকাতার বাইরের চেহারাটা মোটামুটি আয়ত্ত করে কুবেরের চোখ পড়লো তার অন্তরের রহস্য-অনুধাবনে। বাইরে তার যতো জৌলুস, অন্তরালে তার ততো দারিদ্র্য। পোষাকের চাকচিক্য দেখা শেষ করে চোখ গেলো তার কঙ্কালের দিকে। ভূষণের নিক্কণের মাঝে শুনতে পেলো সে শৃঙ্খলের আর্তনাদ। দৃশ্য-সংস্থানের থেকে বড়ো বিষয় হলো তার মানুষ। বাইরের ঔজ্জ্বল্যে চোখ না দিয়ে ডুব দিলো সে নিঃশব্দ গভীরতায়। আজকাল সে দালান-বালাখানা হোটেল-সিনেমা পার্ক-স্কোয়ারে নয়, মানুষের মুখে এই সহরের ভাষা খোঁজে—সন্ধান করে মানুষ তার চেহারায় চরিত্রে এর কী নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে। যন্ত্রের জটিল রহস্যের চাইতে যন্ত্র যে ঘোরায় খোঁজ করে তার মাঝে যন্ত্রের প্রতিচ্ছায়া। মানুষ যেমন সহর তৈরী করেছে, সহর আবার ফেরাফিরতি রূপ দিয়েছে মানুষের। এই মানুষের বাইরে সহরের কোনো অস্তিত্ব নেই, অথচ তার স্থায়িত্ব শত-সহস্র মানুষের আয়ু অতিক্রম করেও। এই মানুষের মাঝেই সহরের বিস্তার, এর মাঝেই তার সংক্ষেপ সঙ্কীর্ণতা। এই মানুষ দেখেই কুবের বুঝতে পারে কোথায় এর উৎসাহ, কোথায় এর বৈকল্য। যেমন ইঁট-কাঠ লোহা-লক্কড় দিয়ে এই সহর তেমনি মাত্র কতোগুলি কেমিক্যাল য়্যাটম্‌স্‌ দিয়ে এই মানুষ। যেন একবাণ্ডিল কঠিন হাড়, একস্তূপ নিঃসাড় মাংস। মানুষের এই নতুন রূপ, নতুন আবির্ভাব। সহরের ইঁটের মাঝে যেমন নেই এক বিন্দু মাটির শ্যামলতা, তেমনি নেই যেন স্বার্থাতিরিক্ত কোনো স্নেহ। খালি মিছিল, যে-যার পথে নিরুদ্দেশ, খালি অসংলগ্ন অগণন প্রাণ-প্রবাহ। ঘূর্ণাবর্ত; কেবল এ ওকে কেটে বেরিয়ে পড়ার ব্যস্ততা। সহরের চাঞ্চল্য এই মানুষের ত্বরায়, তার ঔদাসীন্য এই মানুষের কার্পণ্যে।

এই মানুষই হচ্ছে সহর, এই সহরই হচ্ছে মানুষ। কুবের নিজের চোখে বার করলো মানুষের এই নতুন সংজ্ঞা, নতুন অভিব্যঞ্জনা।

দেখাটা বাইরের কোনো জিনিসে নয়, নিজের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে। যেমন করে তুমি দেখবে, যেমন করে দেখতে তুমি বাধ্য হবে।

তারপর একদিন—অকস্মাৎ, অন্ধকার বিদীর্ণ করে তারার জ্যোতিরুদয়ের মতো কুবেরের মনে কবিতার প্রথম জন্ম ঘটলো। কোথাও কিছু না, চিন্তার হাওয়ায় ভাবের এক-কণা স্ফুলিঙ্গ এসে তার মনে আগুন ধরিয়ে দিলে। সে এক নতুনতরো উন্মাদনা—সমস্ত রোমকূপে উত্তপ্ত প্রাণস্পন্দ। ঘরময় সে ছটফট করে বেড়াতে লাগলো, কি-একটা উগ্র চেতনা তাকে নাড়া দিচ্ছে, ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছে। মনে জমে উঠেছে কথার পর কথা, ছবির পর ছবি, অক্ষরে তাদের সাজিয়ে তুলতে না পারলে তার স্বস্তি নেই। নিজেকে আজ হঠাৎ উচ্চারিত করবার অলৌকিক সাড়া এসেছে, উচ্চারিত না করা পর্যন্ত তার নেই কোনো সার্থকতা। গৃহসীমাবদ্ধ সামান্য এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে সে অসীমপরিব্যাপ্ত বিশ্বজনীন অভিব্যঞ্জনায় নিয়ে যাবে। সে-অভিজ্ঞতাকে একা ভোগ করে, তার তৃপ্তি নেই, সে-অভিজ্ঞতাকে অবিনশ্বর একটা আবেদনের মধ্যে নিয়ে আসতে না পারলে নেই কোনো তার মূল্য। কথার প্রবল আলোড়নে তার মস্তিষ্ক ছিঁড়ে পড়ছে, আঙুলে এসেছে অসহনীয় ক্ষিপ্রতা, শরীরময় রক্তের মদিরতা। সে আর সেই ছোট-স্বার্থে-বাঁধা সাংসারিক কুবের নয়, একটা ঈশ্বরপ্রেরিত অতিকায় দৈত্য। হাতে যেন তার আলাদিনের প্রদীপ। কথাকে দিতে হবে তার মুক্তি, স্তব্ধতাকে সীমা। সে যেন তার এই প্রথম প্রকাশ-প্রচেষ্টার মাঝে ঈশ্বরের সংকেত দেখতে পাচ্ছে, তাকে দিয়ে কথা না বলিয়ে তিনি তাকে ছুটি দেবেন না। কথার মাঝেই খুঁজতে হবে তার মুক্তি, কথার মাঝেই তার পূর্ণতা যতোক্ষণ সে আপনাকে প্রকাশ করার প্রাবল্যে কথা না কয়ে উঠছে ততোক্ষণ সে মৃত, অবলুপ্ত, অস্তিত্বহীন।

সহর ও তার মানুষ—যেমন চোখে কুবের তাদের দেখতে শিখেছে—তাই হলো তার প্রথম কবিতার কথা। প্রায় ঘণ্টাখানেক কসরৎ করে সে তাকে দাঁড় করালো যা-হোক্। প্লাবনের প্রথম উচ্ছ্বাসে সে ছিলো কবি, পরে সে হলো কলাবিৎ। তখন তার দৃষ্টি আর উপাসকের নয়, বৈজ্ঞানিকের। লেগে গেলো তার প্রসাধনে: এখানে-ওখানে দুটো-একটা শব্দ বদলাতে লাগলো, লাগলো ঘষে-মেজে ওটাকে একটা পালিশ দিতে। তাতেও প্রায় আরেক ঘণ্টা।

কবিতা লেখা যখন তার শেষ হলো, রাত তখন গভীর হয়ে এসেছে, সারা মেস্ অন্ধকার, সহর ঘুমে বিভোর। ঘরের আলো নিবিয়ে চুপিচুপি কুবের ছাদে উঠে এলো। আকাশময় কোটি-কোটি ধূলিকণা, তার মাঝে এককণা এই পৃথিবী। সেই পৃথিবীর অণুতম এই তার প্রাণ—তার আজ এই ক্ষীণতম দীপ্তি। এই সুবিশাল অপরিমেয় সৌরসভায় তার অস্তিত্ব সে আজ স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো। জননীর প্রথম সন্তানলাভের মতো, ধ্যানীর চিত্তে প্রথম মন্ত্র-বিচ্ছুরণের মতো, ঘূর্ণ্যমতী নীহারিকার আকার পাওয়ার মতো সে আজ পেলো তাঁর নিজের ভাষা, নিজের পরিচয়। দেহে তার এখন অগাধ তৃপ্তি, মনে তার এখন অকূল অহঙ্কার। পায়ে সে পেলো মাটি, জীবনে পেলো প্রথম সুখস্বাদ। সে যে তা'র স্তব্ধতার

উপর জয়ী হতে পেরেছে, কল্পনাকে দিতে পেরেছে কায়া, ছবিকে রেখা—এই গর্বে সে আজ বিধাতার সমকক্ষ। তার জন্মনক্ষত্রকে নমস্কার, যে তার প্রাণে কবিতার প্রসাদ সঞ্চয় করে রেখেছে, নমস্কার এই পৃথিবীর অমেয় প্রাণময়তাকে, যার প্রতিধ্বনি আজ সে প্রথম করলে উচ্চারণ।

॥ তিন ॥

তারপর একদিন মুখ যখন গেলো খুলে, তখন কুবেরকে আর দেখে কে। গিরি-গহ্বর থেকে উচ্ছিত নির্ঝরধারার মতো তার লেখনীমুখে কেবল কথার ফোয়ারা, শব্দের স্ফুলিঙ্গ। কতো কথাই যে তার মনের গূঢ় অন্তরালে এতোদিন পুঞ্জীভূত হয়েছিলো, যতো তার মুক্তি, ততোই তার পুনরাবির্ভাব। যতোই কথাকে সে প্রকাশ করে, ততোই আবার নতুন কথা জমে উঠতে থাকে। দেখতে-দেখতে কুবেরের কলেজের রাফ্-খাতাটা কণ্টকিত হয়ে উঠলো: আবিষ্কার করলে সে তার দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। হঠাৎ কখন তার সাংসারিক শৃঙ্খলগুলি আসে শিথিল হয়ে, মনের আকাশে কবিতার জ্যোৎস্না এসে পড়ে, তখন ভাষায় তাকে রূপান্তর দিতে নিটোল অক্ষরগুলি পর-পর সাজিয়ে রাখতে সে কী শারীরিক সুখ, মনের উপর সে কী স্নিগ্ধ মুক্তিস্নান। নিজের সংকীর্ণ পরিচয়ের সীমার মধ্যে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, পরিচয়ের একটা বৃহত্তর পরিধি খোঁজবার জন্যে হঠাৎ সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তার এই কথা একাকী নিজের অবসরবিনোদের জন্যে নয়, মনে হলো এই কথায় বহুজনের অংশ আছে, এই কথার উদ্দেশ্যে আছে বহুজনের শ্রুতি-কৌতূহল। সূর্য শুধু আপন আনন্দে প্রজ্বলিত হয়নি, পৃথিবীকে সে দেবে প্রাণ, সমুদ্রে আনবে জোয়ার। এ শুধু তার তরল একটা খেয়াল নয়, তার উপর বিধাতার আরোপিত একটা কর্তব্য—বীরের হাতে যেমন অস্ত্র তার হাতে তেমনি কলম। এ-কথাকে দান করে যেতে হবে এই পৃথিবীর ভাণ্ডারে, দিতে হবে নিজেকে এই দানের যোগ্যতা। অঙ্কুরিত প্রতিভার এই প্রদীপ্ত চেতনাকে এতো বড়ো একটা ব্যাখ্যা দিতে না পারলে তার তৃপ্তি হচ্ছে না; তার অনুভূতিকে অন্যের মধ্যে সংক্রামিত করে দিতে না পারলে কেনই বা সে এতো তীব্র করে অনুভব করবে, কোন অধিকারে? এর তাপ অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবে বলেই তো তার মধ্যে এতো আলো জ্বলে উঠেছে।

শেষে একদিন অতিসন্তর্পণে এক মাসিক পত্রে সে তার কবিতা পাঠিয়ে দিলে। এতো যার অহঙ্কার, সঙ্কোচের তবু তার সীমা নেই। বাইরে লোকচোখের সামনে সে তার নিঃসঙ্গ আত্মার নগ্নতা উদঘাটিত করে ধরছে। যুদ্ধের ভীড়ের মধ্যে পাঠাতে হলো তার ভীরু নিরস্ত্র শিশুকে: চারদিক থেকে সমালোচকের আগ্নে-য়াস্ত্র, তার মাঝে তার নিঃশব্দ নিরভিমান উপেক্ষা। মাসিকপত্রে সচরাচর যে-রকম সব ফিকে, মিনমিনে কবিতা বেরোয়, তার তুলনায় কুবেরের কবিতা দিয়াশলাইর জ্বলন্ত একটা কাঠির কাছে একফালি ঝকঝকে রোদ, মর্চে-পড়া নিবু-এর কাছে ধারালো তলোয়ার। দেখতে-দেখতে কুবের মাসিকপত্রে নিজের একটি কায়েমি

জায়গা করে নিলো, পৃষ্ঠার পাদপূরণের স্থানে নয়, সম্পূর্ণ একটি অভিজাত পৃষ্ঠায়! সে মুমূর্ষু মিটমিটে আলো নয় যে তাকে ভস্মস্তূপে চাপা দিয়ে রাখতে হবে, সে হচ্ছে দেদীপ্যমান প্রাণবহ্নি—সেই দীপ্তিতে মাসিকপত্রই পাবে শোভা, অমেয় মর্যাদা; অতএব তার আসন এখন প্রায় পাদপ্রদীপের সামনে। তার কবিতায় ছিলো তীক্ষ্ম একটি ভঙ্গি, বলিষ্ঠ পৌরুষ, দৃপ্ত দুঃসাহস। এবং সব মিলিয়ে তা আবার কবিতা। সেই অজস্র-উৎসারিত আলোর বন্যায় ক্ষীণ-জীবি, শ্লথপ্রাণ সমালোচকদের চক্ষু গেলো ধাঁধিয়ে, কোটরবাসী প্যাঁচার মতো মুখ তারা অসম্ভব গম্ভীর করে তুললো, দুর্গ আক্রমণ করতে গিয়ে তারা খুঁজে ফিরতে লাগল কোথায় রয়েছে ছিদ্র. কোথায় কোন ভাষার অপপ্রয়োগ, ভাবের অব্যাপ্তি; কোথায় কোন প্রচলিত নীতির অস্বীকার, কোন ক্ষণস্থায়ী রুচির অমর্যাদা। কাব্যের কাছে নিয়ে এলো তারা ব্যাকরণ, সাহিত্যের কাছে সমাজের সংকীর্ণতা। আর যখনই বুঝবে সম্মুখে প্রতিযোগী কবির মূর্তিতে আবির্ভূত না হয়ে পেছনে জুটেছে সমালোচকের ফেউ, তখনই বুঝতে হবে তারা তোমার শক্তিকে করেছে স্বীকার, শক্তিকে দিচ্ছে মূল্য। তারা তাদের নিন্দায় তোমার প্রতিভাকে দিচ্ছে ধার, তোমার আত্মসংরক্ষণে দিচ্ছে প্রতিজ্ঞা। যারা তার উপকার করবে বলে বিনামূল্যে উপদেশ বর্ষণ করছে, তাদেরই বংশধরদের উপকার করতে কুবের লিখছে কবিতা, আরো কবিতা। তার হাত থেকে কলম কে কেড়ে নেবে, কে মুছে নেবে তার দুই চোখের এই অগাধ দৃষ্টি! নিজের কাছে সে সত্য, কেবল নিজের কাছেই তার ঋণ। পরের কাছে যদি তা না লাগে, তবে তাতে তার কী যায়-আসে। সে নিজের কাছে একা, যতোক্ষণ সে কবিতা লিখছে ততোক্ষণে কেউ আর তার সঙ্গী নয়।

কিন্তু এই অভিজাত নির্জনতা তার বেশিদিন ভোগ করা হলো না, ওদিকে ঘটলো দুর্ঘটনা। এ দুই বছর তার কাকা টায়েটুয়ে যে করে হোক তার খরচ পাঠিয়ে আসছিলেন, কিন্তু ইদানিং হঠাৎ তাঁর দক্ষিণমুখ বাম হয়ে উঠলো। স-সাঙ্গোপাঙ্গ নিজেকে নিয়েই বিব্রত, এর মধ্যে পরের বোঝা বইতে তিনি নারাজ—তার সোজা কথা। কুবেরের বাপের আমলের উদ্বৃত্ত বিষয়-আশয় বেমালুম আত্মসাৎ করতে যা তার একটু সময় লেগেছিলো, পরে হঠাৎ তার এই বৈরাগ্যোদয় হলো। কুবেরের মা আরেক আত্মীয়-বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। বিরাট রাজধানীতে কুবের পড়লো একা: তার আত্মার নির্জনতা নয়, এবার জীবনের নির্জনতা। একেক করে ডুবতে লাগলো তার তারা, আকাশ ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে।

এতোদিন তেমন সে কোনো স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলো না, কিন্তু এখন এসে পড়লো প্রাচীরাবদ্ধ সংকীর্ণ একটা অন্ধকূপে। এতোদিন ছিলো তার আকাশে উন্মুক্ত পক্ষবিক্ষেপ, এখন তার দু'হাতে মাটি মেখে উঠলো। আগে প্রধান ছিলো তার অতীন্দ্রিয় চেতনা, এখন বড়ো হয়ে উঠলো এই স্থূল, ক্ষুধার্ত মরদেহ। প্রাণোন্মাদনার চাইতে মাত্র প্রাণধারণের প্রয়োজন। আগে শরীরে বাঁচো, তবে কোরো মনের বিলাসিতা। কুবের উঠে গেলো আরো সস্তা মেসে, সকালে-বিকালে টিউসানি করতে বসলো। খাতায় পড়ার বই টুকে নিতে লাগলো, সপ্তাহান্তেও জামা বদল করবার সুবিধে করতে পারলো না। কোনো রকমে নিজেকে মাত্র টিকিয়ে রাখা

ছাড়া তার জীবনে আর যেন কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য নেই, জীবনধারণের মাত্র একটা শরীরী যন্ত্র ছাড়া সে আবার কী !

সুস্পষ্ট, বাস্তব জীবনকে সে গদ্য দিয়ে সম্বর্ধনা করলে—শাণিত, তিক্ত গদ্য ! তার সাহিত্যে এসে পড়লো এই কঠিন দারিদ্র্যের প্রভাব, তার স্থূল মুষ্টিক্ষেপ। আর কল্পনা নয়, ঘটনা : আর সুন্দর করে বলা নয়, সত্য করে বলা। কবিতা হচ্ছে অভিজাত, গদ্য গণতান্ত্রিক। কবিতা সকলের বোঝবার জন্যে নয়, সকলে তাকে বুঝে ফেললে নিশ্চয়ই তার জাত যেতো : গদ্যে তুমি সকলের সঙ্গে সমতল মাটিতে নেমে এসেছ। কবিতা হচ্ছে মাসিক-পত্রিকার একটা বাহুল্য-শোভা মাত্র, গল্প হচ্ছে তার ভিটামিন। যখন তা সকলের বোঝবার জন্যে, তখন তার একটা নিশ্চয়ই দাম আছে—দাম এখানে সাহিত্যের অর্থে বলছি না। কুবের এখন সেই গল্প-রচনায় তার প্রতিভাকে নিয়োজিত করলে। ছন্দের শাসনে ছত্রকে সঙ্কেতময় না রেখে তাকে কঠিন স্পষ্টতায় দিলে মুক্তি, তার গাঢ় সংক্ষিপ্ততা ভেঙে বহুভাষণে তাকে বিক্ষিপ্ত করে তুললে। জীবন তাকে যা দেখতে শেখালো তারই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। আগে যদি তার চোখ ছিলো সেই প্রগলভপ্রখর চৌরঙ্গির দিকে, এখন তার চোখ এসে পড়লো তাদের ঘরের দুয়ারের বন্ধ নোংরা গলির উপর। সে দেখলে দরিদ্র, সে দেখলে পঙ্গু, সে দেখলে পাপী। কোথায় রইলো ফেনিল-নীল আকাশ, বসন্ত-বিহ্বল অরণ্য। জীবন তাকে যা দেখতে শেখালো। বিষবৃক্ষ-বিয়াসু-এর তলায় বসে সে প্রকৃতির উদার স্নেহের কথা লিখতে পারলো না, কাঁটায় যে শুয়ে আছে তার কাছে ফুলের কথা শুনতে চাওয়া পাগলামি। নিজের দর্পণে পৃথিবীর সে আরেক চেহারা দেখলো, দাঁড়ালো সে আজ তার মুখোমুখি। ইচ্ছা করলেই লাইনের আঁচড় কেটে সে-বীভৎসতাকে একমুহূর্তে সৌন্দর্যে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু কেন, কিসের ভয়ে ? সত্য কথা সাহস করে না বলে জীবনকে এই হীন অসম্মান করবার মানে কী ? কুবের এই জীবনের কাছে অনুগত থাকবে। ফল হলো এই, আগে যদি বা সমালোচকরা তীর নিয়ে এসেছিলো, এবার নিয়ে এলো গদা।

গল্প লিখে কুবেরের সামান্য দু পয়সা রোজগার হতে লাগলো। তার সাধনায়ই হোক, বা সমালোচকদের পরোক্ষ বিজ্ঞাপনেই হোক, কুবের এখন একজন নামজাদা গল্পলিখিয়ে, পুজোয় ও বর্ষারম্ভে তার কাছে গল্পের জন্যে সম্পাদকদের জোর তাগিদ পড়ে। আর, এই গল্প-লেখার বেলায় নগদ কিছু দক্ষিণা মেলে বলে এর নেশা সে ছাড়তে পারে না। কোনোদিন যে সে কবিতা লিখতো এই কথা পাঠকদের সঙ্গে-সঙ্গে সেও ভুলতে বসেছে। কেবল গল্প আর গল্প। তার নানান মাপ-জোক, নানান ফরমাজ। পয়সার জন্যে সব তাকে নির্বিবাদে মেনে চলতে হয়। সেই পয়সা মাত্র তার গ্রাস আর দেহাচ্ছাদনের জন্যে। আর সেই পয়সা এতো সামান্য, তা দিয়ে বিশ্রাম কেনবার সময় নেই, এতো সামান্য যে বারে-বারে, খুঁটে-খুঁটে তা উপার্জন করতে হয়। খালি ঠেলে চলা, খালি অনর্গল কলম চালানো। কী যে সে লিখছে, কী যে তার লেখা উচিত ছিলো, কিছুই স্পষ্ট নির্ধারণ করবার আর অবকাশ নেই—নিদারুণ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এই তার একমাত্র অস্ত্র। জীবনের কারবারে এই তার মূলধন। বাইবেলের সেই গল্পের

চাষার মতো তার এই talentকে সে না খাটিয়ে বাক্সবন্দী করে রাখতে পারবে না।

এবং পালক চিনে-চিনে ঘরছাড়া পাখির মতো কুবের সেই দলে গিয়ে ভিড়লো—সাহিত্যই যাদের একমাত্র উপজীবিকা। বয়েসে কুবের তাদের সবাইর চেয়ে ছোট, কিন্তু লেখায় সবাইর চেয়ে দুর্ধর্ষ, তাই নিন্দিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সেখানে তাকে যেতে হয় রোজগারের ফিকির-ফন্দি সন্ধান করতে। সাহিত্য এদের উপজীবিকা বলে একে-অন্যে এদের গোপন শত্রুতা, কার মুখের গ্রাসে কে কখন ছোবল মারে—সব সময়ে তাই এদের সাতঙ্ক সজ্ঞানতা। টাকাই এদের জিজ্ঞাস্য বলে কে কাকে আগে ঠেলে হাত বাড়াবে তারই কেবল কুৎসিত প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতাটা লেখার মর্যাদার তারতম্যে নয়, অর্থকরী মূল্যের তারতম্যে। তারা লেখার উৎকর্ষ বিচার করে রসের মানদণ্ডে নয়, ইকনমিক্স্-এর সূত্রে : কে কেমন লিখলো না কে কতো পেলো। তারা স্রষ্টা নয়, উৎপাদক; আত্মসচেতন নয়, একেকটা অন্ধ আটা-ম্যাটন। শুধু পৃষ্ঠাপূরণ করবার কৃচ্ছ্রতা, শুধু অর্থোপার্জনের তপস্যা। চোখে এদের সেই অমর্ত্য দীপ্তি নেই, মাত্র একটা স্তিমিত ক্ষুধা : সৃষ্টির পরেরকার সেই প্রসন্ন কান্তি নেই, মাত্র একটা ম্লান নিরন্নতা। খালি ত্বরা আর ত্বরা, মনের সক্রিয়তা নয়, শারীরিক ব্যায়াম। তবু এতে উদরপূর্তি হয় না বলে কেউ দৈনিক কাগজে স্তম্ভ সাজায়, কেউ সাপ্তাহিকের জন্যে উমেদারি করে, কেউ গালাগাল দিয়ে পয়সা কামাবে বলে শানায় তার কলম। একসঙ্গে তারা ভিড় পাকায় বটে, কিন্তু একের সঙ্গে আরের মধ্যে দুই মেরুপ্রান্তের ব্যবধান, মাঝখানে টাকার দুশ্চিন্তা। আলগোছে কুবের সেই দলের মধ্যে পিছলে পড়লো। এদের সঙ্গে তাল রেখে সেও হয়ে উঠলো ধূর্ত, পাকা ব্যবসাদার। তারো মুখে পড়লো সহরের রুক্ষতার ছাপ, তার নিরানন্দ বিবর্ণতা। সেও সাহিত্যকে করে তুললো অর্থোপার্জনের একটা বিদ্যা, খাটতে লাগলো ক্যাপিটালিস্ট্ প্রকাশকদের ছোটখাটো ফুট-ফরমাজ : সেও বসে গেলো তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছতে। তার ভেতরেও একদিন যে আগুনের শিখা সে দেখেছিলো তাই দিয়ে এখন সে তার উনুন ধরাচ্ছে।

কিন্তু তা ছাড়াই বা উপায় কী! জীবনের এই হীনতরো প্রয়োজনে তার প্রতিভাকে নিয়োগ করতে হচ্ছে, ভাবতে তার মাঝে-মাঝে আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আগে শরীরে বাঁচতে না পারলে সাহিত্যে সে অবিনশ্বর হয় কি করে? নিজের ক্ষুধা আগে, পরে পরের রসতৃষ্ণা। কিন্তু এমনি করে ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে নিজেকেই সে ক্ষয় করে ফেলছে, কিন্তু তার জন্যে শোক করবার পর্যন্ত সময় নেই। খালি পৃষ্ঠাপূরণ, যেখানে মাত্র পৃষ্ঠার অনুপাতে অর্থমূল্য।

তবু মাঝে-মাঝে একেকদিন তার গুমোট আকাশে অকস্মাৎ কবিতার বিদ্যুদ্দাহ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—সেই ক্ষণদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার অন্ধকারের পরিমাণ, তার দৈন্যের গভীরতা। আবর্জনার সঞ্চিত স্তূপ ভেদ করে মাঝে-মাঝে অগ্নিশিখার ক্ষীণ জিহ্বা দেখা যায়, মুহূর্তের জন্যে কুবেরের নিস্তেজ নিষ্প্রভ মনে অনুকূল বাতাস সহসা আন্দোলিত হয়ে ওঠে কিন্তু ভাবের সেই প্রভা আবার সঞ্চারিত করবার তার দীর্ঘ সময় নেই, সময় নেই সেই তাপ স্বপ্নমধুর আলস্যে মনে-মনে লালন করবার। বাজারে তার দাম নেই, নেই তার বিনিময়ে পরিশ্রমের দৃষ্টিভঙ্গি।

তার চেয়ে খানিকটা সাদাসিধে প্রাঞ্জল গদ্য, গল্পের একটা কাঠামো, ঘটনার একটা পারম্পর্য। নিজের অনুভূতির চূড়া থেকে নিচে জনসাধারণের সহজবোধ্যতায় নেমে আসা। উপায় নেই: কেবল ত্বরা আর ত্বরা। যে-টাকাটা সে আগের গল্পের জন্যে পেয়েছিলো তা গেছে তার কলেজের মাইনে দিতে, এ-টাকাটায় মেস্-এর পাওনা আংশিক মেটাতে হবে, ক'মাস ধরে আস্ত একটা জামা নেই। কবিতা—কবিতা লেখবার বিলাসিতা আর তাকে মানায় না, এখন কেবল প্রয়োজনীয়ের পালা।

যদি এর থেকে সে মুক্তি পেতো, পেতো প্রত্যেক রচনার আগে ও পরে নিশ্চিন্ত, বিস্তৃত অবকাশ, জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ না করে তবে সে এখন থেকে যুদ্ধ শুরু করতো মৃত্যুর বিরুদ্ধে, বিস্মৃতির বিরুদ্ধে, তার এতোদিনকার সঞ্চিত এই অপচয়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু হয়তো নিরন্তর এই প্রাণপণ যুদ্ধ করতে গিয়ে শরীরে সে কোনরকমে টিঁকে থাকলেও প্রতিভার আয়ু হবে তার নিঃশেষিত, কবিকে হতে হবে একদিন কেরানি। সেই মৃত্যু সে সইবে কি করে?

। চার ।

কুবেরের ফিরে আসতে-আসতে প্রায় সন্ধ্যে। একহাঁটু ধুলো, হাতে পুরোনো একটা প্রকাণ্ড স্যুটকেস্। ভারে ডান হাতটা ছিঁড়ে পড়ছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে উপস্থিত।

টুলের উপর লোকনাথ তেমনি বসে ছিলো। তাকে দেখেই জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো; সম্ভ্রমে বললে,—আসুন।

স্যুটকেস্টা মেঝেয় নামিয়ে রেখে জামার হাতায় কপাল ও ঘাড়ের ঘাম মুছতে-মুছতে কুবের বললে—হ্যাঁ, সুশান্ত-দা বাড়ি আছেন তো?

সঙ্গে-সঙ্গে পাশের সিঁড়ি দিয়ে সশরীরে নেমে এলো সুশান্ত। তাকে দেখেই সে ঝাঁজিয়ে ধমক দিয়ে উঠলো: এই তোমার দু' ঘণ্টা? আমরা সবাই পথের দিকে চেয়ে-চেয়ে হায়রান। কী কাণ্ড বলো দিকি?

ঘাড় হেঁট করে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে কুবের বললে,—এই দেরি হয়ে গেলো।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বৌদিরা কখন থেকে তোমার জন্যে খাবার-দাবার তৈরি করে রেখেছে! তা, কবি হতে হলে এমনি বেহুঁস হতে হয় নাকি? তারপর স্যুটকেস্টার দিকে চেয়ে: এই তোমার জিনিস?

লজ্জিত হয়ে কুবের বললে—বিছানাটা আনবো ভেবেছিলাম, তা—ওটা—

—দরকার নেই। চলো। বলে সুশান্ত এক পা অগ্রসর হলো: তোমার ঘর নিচেই ঠিক করলাম। নিচেই তোমার লেখা-পড়ার সুবিধে হবে, নিচেটাই নিরালা। ওপরে ছেলেপিলেরা সারা দিনরাত কিচির-মিচির করছে, অন্য কোথাও

আর কান পাতবার জো নেই। সুশান্ত ঘুরে দাঁড়াতে দেখলো কুবেরই স্যুটকেস্‌টা টেনে আনবার আয়োজন করছে। আবার এক পা ফিরে এসে লোকনাথের মুখের উপর গরজে উঠলো : তুই তো ভারি বে-আক্কেল দেখছি।

লোকনাথের হাতে স্যুটকেস্‌টা ছেড়ে দিতে-দিতে কুবের বললে,—তা, কবি হলে এই ভারটুকু আর বওয়া যায় না নাকি ?

—না। সুশান্ত গলার গাম্ভীর্যটা পরে তরল করে আনলো : আর নিচেটা যদি শেষ পর্যন্ত সুবিধের না হয় দেখ, ওপরেই যেতে হবে তবে। তা, থেকেই দেখ না দিন কয়েক। একেবারে ঐ দিকে, পেছনে খানিকটা ফাঁকা মাঠ।

আমতা-আমতা করে কুবের বললে—তা, না আমার সবতাতেই খুব সুবিধে হবে।

বারান্দা দিয়ে ঘুরিয়ে সুশান্ত তাকে একেবারে একপ্রান্তে নিয়ে এলো। দরজার পরদা সরিয়ে বললে,—এই ঘর। কী বলো ?

চারদিকে চেয়ে কুবের বললে,—বেশ হবে। এই এক পাশে আমার জন্যে একটা তক্তপোষ পেলে আমি দিব্যি সটান ঘুম যেতে পারবো।

তাকে নিয়ে ঘরের ভিতর চলে এসে সুশান্ত বললে,—তক্তপোষ কি বলছ, কুবের ? এই সমস্ত ঘরটাই তোমার।

—সমস্ত ঘর ! কুবের উদ্‌ভ্রান্তের মতো সুশান্তর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—হ্যাঁ, ঘরটা একটু বড়ো বলেই দু'একটা ফার্নিচার আনতে হয়েছে—ঘরে একটা বেশ ঠাসা জমাট ভাব না থাকলে লেখা কেমন গাঢ় হতে পারে না, না ? যদি বড়ো বলে এটায় তোমার লেখবার অসুবিধে হয়, তবে পাশের ছোট ঘরটাও তুমি নিতে পারো ইচ্ছে করলে। ওটাও খালি পড়ে আছে। সুশান্ত পাশের ঘরের দরজা খুললে : এটাতেই না-হয় তোমার লেখবার জায়গা করো। এটাও আমি পরিষ্কার করে রেখেছি। যদি বলো তো একটা টেবুল, চেয়ার, আলমারি আর টিপয়টা এই ঘরে চালান করে দি।

ব্যস্ত হয়ে কুবের বললে,—অদরকারেরো একটা সীমা আছে। এই ঘরে আমার মতো দশটাও কুলিয়ে উঠতে পারতো না—আমাদের মেস্‌এর সমস্ত দোতলায়ো এতো জায়গা নেই। কিন্তু আমি বলছি, এতো আসবাব দিয়ে কী হবে ?

—বা, সুশান্ত বললে,—সব তোমার কাজে লাগবে দেখো। তোমার শোবার খাট, লেখবার টেবুল, বই-পত্র, জামা-কাপড় রাখবার আলমারি—সুশান্ত আরেক-দিকের আরেকটা দরজা খুললে : আর এই লাগোয়া দেখছ বাথরুম।

জীবনে কুবের কখনো এতো বড়ো বিস্ময়ের মুখোমুখি হয়নি, এ তার কবিতার প্রথম অলৌকিক অভ্যুদয়ের চেয়েও বিশ্বাসাতীত। ঘরের দিকে চেয়ে তার নিমেষ আর পড়তে চায় না। ঢালা প্রকাণ্ড ঘর, মেঝেটা আগাগোড়া মার্বেল করা। দেয়ালগুলি ফিকে নীলচে, সিলিঙে ঝুলছে পাখা, সাদা ধবধবে পাখা, যেন একটা রাজহাঁস উড়াল দিয়ে আছে। দু'ধারে দু'টো বাল্‌ব, একটা হলদেটে-সোনালী, অন্যটা সবুজ। তার ওপর সুইচ্‌-বোর্ডে টেবুল-ল্যাম্পের প্লাগ্‌-পয়েন্ট। ঘরের প্রত্যেকটি ইঞ্চি কুবের খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। একপাশে একজনের মতো নিচু একটা খাট, জাজিমের ওপর তোষক, তাতে নতুন নরম বিছানা পাতা,

এতো পরিচ্ছন্ন যে ছুঁতে পর্যন্ত সাহস হয় না। শিয়রের দিকে উঁচু একটা টিপয়, সম্প্রতি তাতে একটা ফুলের ভাজ : দরকার হলে ল্যাম্পটা তুলে এনে শুয়ে শুয়ে সে পড়তে পারবে। পায়ের দিকে একটা আলনা, তাতে জামা-কাপড় এখনো রাশীভূত হয়নি বলে বোঝা যায় এর বাণিশ কি জোরালো! আরো একটু এগিয়ে গিয়েই জানলার কাছে চৌকো সুন্দর একটা টেবল, সুমুখে মোটা গদির একটা চেয়ার টেবলের উপরে সেই ল্যাম্প, গাঢ় নীল রঙের ঘেরাটোপে ঢাকা। তারপরে হাতল-ওলা একটা ইজি-চেয়ার। শেষপ্রান্তে আবার একটা চেয়ার, বেতের মেঝের থেকে আধহাতটাক উঁচু হবে—এবং তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তেমনি একটি নিচু টেবল। ছাঁদে-ছিরিতে ওরিয়েণ্ট্যাল্। টেবলের উপর গাদা করা লেখবার প্যাড, চেয়ারের পিঠে ক্রিম-রঙের সিল্কের একটা ঢাকনা। আরো দুয়েকটা চেয়ার—তারা নানা ধাঁচের, এখানে-ওখানে ছিটিয়ে আছে। সব ফিট্ফাট্, সব সিজিলমিছিল। শুধু তার স্যুটকেসটাই বেয়াড়া-রকম বেমানান।

—আমি বলি কি জানো, সুশান্ত বলতে লাগলো : পাশের ছোট ঘরটাকে তুমি বরং তোমার ডাইনিং-রুম্ বানাও। আমাদের বাড়িতে ঘড়ি ধরে খাওয়া হয়, সে-নিয়মটা নিশ্চয়ই তোমার পোষাবে না। যখন তোমার ইচ্ছে হবে ঠাকুরকে বলে পাঠাবে খাবার দিয়ে যেতে—বুঝলে, যখন তোমার খুশি। ধরো, এদিকে খাবার ডাক পড়লো, তুমি তখন লিখছ। তা কি হয়? আর, সুশান্ত ছিট্‌কিনি টেনে আরেকটা দরজা খুলে ফেললে : আর এই যে বারান্দা দেখছ এটা সোজা গিয়ে উঠেছে আমার লাইব্রেরিতে। যখন খুশি সেখানে পড়তে চলে যাবে—তোমার অবারিত অধিকার। লোক এলে তাদের নিয়ে বসবার একটা ঘর যদি কখনো লাগে, আমারটাই ব্যবহার করতে পারবে।

কুবের সেই লাইব্রেরির উদ্দেশেই পা বাড়াচ্ছিলো হয়তো, সুশান্ত তাকে বাধা দিলো : তোমার বাক্সের মধ্যে কী?

—এই খানকতক পড়বার বই, আর কিছু জামা-কাপড়।

—খুলে ফেল, সুশান্ত হুকুম করলে : জিনিসগুলো এই আলমারিটাতে গুছিয়ে রাখি।

অপরাধীর মতো মুখ করে, কুবের বললে,—এগুলো তেমন কিছু নয়। এরা বাক্সের মধ্যেই কোনোরকমে ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে পারবে। তাই এদের চিরকেলে অভ্যেস।

—না, তুমি খোল। সুশান্ত নিজেই প্রায় নিচু হয়ে বসতে যাচ্ছিলো : এ-বাক্সটা এ-ঘর থেকে বিদেয় করে দিতে হবে।

—হ্যাঁ, যেন সুন্দর মুখের উপর কুৎসিত একটি অস্ত্রের দাগ। কুবেরের ঠোঁটের উপর পাৎলা, লাজুক একটি হাসি খেলে মিলিয়ে গেলো : কবিতার একটা উদ্ধত গ্রাম্য শব্দপ্রয়োগের মতো। বলে সে মেঝের উপর বসে পড়লো বাক্স উদ্ধার করতে।

সুশান্ত সামান্য একটু পাইচারি করে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো ; পকেট থেকে সিগারেট বার করে দু'হাতের গর্তে কাঠি জ্বালালো, নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে সিগারেটটা ধরিয়ে সে বললে—বলার সঙ্গে-সঙ্গে ঠোঁটে-আটকানো সিগারেটটা,

মৃদু-মৃদু দোল খেতে লেগেছে : চমৎকার হাওয়া আসে এ-ঘরে—দক্ষিণ একেবারে খোলা। ফাঁকা এই জায়গাটুকু থাকাতে হাওয়াটা বেশি মিঠে লাগে—তোমার রাস্তায় অ্যাশফল্‌ট্‌ আর ধুলোয় গন্ধ নয়, নিয়ে আসে মাটি আর পাতার কেমন একটা নরম গাঢ় গন্ধ। টের পাচ্ছ না?

কুবের চুপচাপ তার বাক্স ঘাঁটছে।

—হ্যাঁ, বড়ো টেবিলটায় বসে পড়বে, আর নিচুটায় লিখবে কবিতা। পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করবার সময় ভঙ্গিটা থাকবে সোজা, ঋজু, আর কবিতা লেখবার সময় শিথিল, এলানো। তেমন কিছু অবিশ্যি বাঁধাধারা কোনো নিয়ম নেই। সুশান্ত উঠে দাঁড়ালো : যখন যেখানে তোমার খুশি। অনেকে শুনেছি বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে লিখতে ভালোবাসে, কেউ বা জমিদারি সেরেস্তার নায়েবের মতো জলচৌকির অভাবে বুকের সামনে বালিস রেখে। যা তোমার যখন সুবিধের মনে হয়। পাইচারি করবার জন্যে অনেকটা জায়গা পাবে,—তোমাদের গল্প লেখবার বেলায় কী হয় জানি নে, আমার তো কখনো-কখনো দাঁড়িয়ে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে। হাঁটতে-হাঁটতে থেমে পড়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লেখা। আমাদের ঘরে তেমন একটা টেবিল আছে—উঁচুতে প্রায় চার-ফুট, অবিশ্যি ফরমাজ দিয়ে তৈরি। তোমার যদি দরকার হয়,—ও কি, কী হলো?

ডালাটা সজোরে বন্ধ করে কুবের সলজ্জ-বিরক্ত মুখে উঠে দাঁড়ালো। বললে,—না, এখন থাক। পরে একসময় গুছিয়ে নেয়া যাবে!

—বা, অন্তত পড়ার বইগুলি বার করে রাখো। তারপর মুখ গম্ভীর করে : আমি কোন রকম বিশৃঙ্খলাই বরদাস্ত করতে পারি না। ও আমার একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। খবরের কাগজ খুলে পড়ে আবার তা আমি পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখি। সেলফের যেখানে ফাঁক রেখে বই নিয়ে যাই, পড়ে সে-ফাঁক বন্ধ না করা পর্যন্ত আমার আর স্বস্তি নেই। কাজ হাতে নিয়ে ফেলে রাখাটা আমার কাছে একটা শারীরিক গ্লানির মতো মনে হয়।

কুবের বললে, ভাবছি পরীক্ষাটা আর দেবো না।

—পরীক্ষা দেবে না মানে? সুশান্ত প্রায় আঁৎকে উঠলো।

কুবেরের মুখে লজ্জায় আরক্ত একটি অস্ফুট হাসি : আমার পক্ষে জীবনধারণের সমস্যাটা তো প্রায় প্রাঞ্জল হয়ে এসেছে। ঐ সব ডাল-ভাতের কথা নিয়ে আমার তো আর মাথা ঘামাতে হবে না, আমি মনের সুখে মুখ খুলে দেবো এবার। পরীক্ষা পাশ করে আমার হবে কী? বইগুলো, একসময়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এলেই চলবে।

—কথাটা সত্যি। তোমাকে সেই প্রাণান্তকর ক্লান্তি থেকে মুক্তি দেবো বলেই তো তোমার জন্য এই অবকাশের শান্তি তৈরি করে রেখেছি। প্রখর রৌদ্রের থেকে নিয়ে এসেছি এই ছায়ার স্নিগ্ধতায়। সুশান্তর গলা গাঢ়তরো হয়ে এলো : সেই ক্লান্তিতে তোমার প্রাণ যেতো না ঠিক, যেতো প্রতিভা, আর তার দাম হয়তো তোমার কাছে প্রাণের চেয়েও বেশি। কিন্তু পরীক্ষা দেবে না কেন? পরীক্ষাটা আর যাই হোক, মনের একটা ডিসিপ্লিন—ঘনীভূত সনেটের দৃঢ় শাসনের মতো।

কুবের বললে,—সাহিত্যরচনার সঙ্গে পরীক্ষা-পাশের কোনো সম্বন্ধ নেই।

—নেই—তাই পরীক্ষা পাশ করলেও নেই। তবে একটা কথা ভুলে যেয়ো না কুবের, সুশান্ত উঠে দাঁড়ালো : সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষানুশীলনের একটা স্পষ্ট, নিকট সম্পর্ক আছে। জীবনে একমাত্র তোমার নিজের অভিজ্ঞতায় কাজ হবে না, দেখতে হবে অন্য লোক আর কী দেখেছে, এবং তাতেই বোঝা যায় কুবের, পৃথিবীতে এখনো কতো দেখবার। মুহূর্তে-মুহূর্তে নিজের দৃষ্টির সংকীর্ণতা ও স্বল্পতা এড়িয়ে যাবার জন্যই শিক্ষা—কথাটার কনোটেশান্ কিন্তু আমি এখেনে খুব ছোট করে এনেছি। তারপর ঘাড়ে একটু হালকা ঝাঁকুনি দিয়ে : তুমি নিশ্চয়ই এমন কয়েকজন নামী সাহিত্যিকের নাম জানো বাংলা দেশে, যারা এই বিদ্যেটার অভাবে নিজেদের আর বাড়াতে পারেনি, খালি পুনরাবৃত্তি করে চলেছে, ঘুঁটির মতো যারা একই বাঁধা রাস্তা ধরে পেকে আসে। লিখতে না পারার চাইতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একঘেয়ে এই একই জিনিস লেখাটা বেশি মারাত্মক। নতুন একটা কথা বলতে পেরে সুশান্ত হেসে উঠলো : তুমি জানো না এই পরীক্ষা পাশের অভ্যেসটা থেকেই ক্রমশঃ একটা-কিছু অধিরোহণ করবার উৎসাহ আসে, নতুন ক্ষেত্র অধিকার করবার উন্মাদনা। ঠিক আলেকজান্দারের মতো দিগ্বিজয়ের স্পৃহা, ইউলিসিসের মতো অভিযানের আনন্দ। কিন্তু, সুইচ্ টেনে ঘরময় সেই ঘনায়মান সন্ধ্যার কোমল ম্লানিমা এক ফুঁয়ে সে উড়িয়ে দিলো ; ব্যস্ত হয়ে বললে—চলো, এবিষয় নিয়ে পরে না-হয় আরো বিস্তারিত বক্তৃতা দেয়া যাবে,—হ্যাঁ, তুমি চান করে নেবে নাকি ?

কুবের ঘাবড়ে গিয়ে বললে,—কোথায় যাবো ?

—বা, বাড়ির ভেতরে বৌদিদিদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে না। তারা সারা দুপুর তোমার ঘর গুছিয়ে দিলো! তোমাকে দেখবার জন্য তারা কখন থেকে ওৎ পেতে আছে। নাও, চান করে নাও চট্‌পট্। বলে নিজেই সে বাথ-রুমের দরজাটা ফের মেলে ধরলো। দিলো আলো জেলে।

বাথরুমটা ওদিকে আছে এ-খবরটা সে আগেই পেয়েছিলো, কিন্তু এবার পড়লো চোখ। সামান্য স্নানের ঘর, না, রূপকথার কোন্ রাজকুমারীর বুডোয়ার, স্পষ্ট সে কিছু ধারণা করতে পারলো না। বট্‌ল্-গ্রিন্ মোজেইকে আগাগোড়া ঝলমল করছে। এনামেলের প্রকাণ্ড একটা টাব্, পাখির চোখের মতো টলমল করছে জল। শাওয়ারবাথ, গরম জলের ঝরনা। গাটাপারচার কেইসে নতুন টুথ-ব্রাশ, তাকের উপর পেইসট্। স্পঞ্জ, সাবান, ওগুলো বুঝি-বা বাথ-সল্টের শিশি। দড়িতে পাশাপাশি ঝুলছে ফুরফুরে রঙিন একখানি গামছা, জলে ভেজালে যা বর্ষার আকাশের মতো ঠাণ্ডা, আর একখানি ঘন-বুনেটের তোয়ালে, জলে-ভেজা গায়ের উপর যা শীতের দিনের মতো মোলায়েম। তেলের শিশি, স্নো-পাউডার, কামাবার সরঞ্জাম—সব একটা আয়নায় সংলগ্ন নিচেকার তাকের উপর। স্নানের আগে, স্নানের সময় ও স্নানের পরে—তিন পর্বই বিস্তৃত সমা-রোহে এঘরে সমাধা করবার স্থান ও আয়োজন। কুবেরের কাছে ঐ জল যেন লীথী-র জল,—স্বর্গের সেই নদী, বিস্মৃতিময়ী—তার গত জীবনের জ্বালার উপর কোমল শিশিরবিন্দু।

—এই বাথরুমটা দিয়েছে তোমাকে মেজবৌদি, থাকবার ঘরটা আমি আর

বড়োবৌদি ভাগাভাগি করে। সুশান্ত আবার তাড়া দিলো: নাও, সব রেডি। ঘেমেচুমে কী হয়ে আছ।

আমতা-আমতা করে কুবের বললে,—বিকেলে চান করবার আমার অভ্যেস নেই।

—বলো কী! এপ্রিল এসে গেলো, বিকেলে চান না করলে রাত্রে আইডিয়া আসবে কি করে?

অল্প হেসে কুবের বললে,—ট্রপিক্‌স্‌এও তো ফুল ফোটে। আস্তে আস্তে না-সইয়ে খামোকা বাবুয়ানা করতে গেলে হয়তো শরীরই হবে নাজেহাল। দাঁড়ান, হাতমুখটা বরং ধুয়ে নিচ্ছি।

—তাই। জামা-কাপড়টাও বদলে নিয়ো।

—এই জামা-কাপড়ে বৌদিদিদের সামনে যাওয়া যাবে না নাকি? কুবেরের হাসি গেলো উবে।

—না, তা বলছি না, তবে, সুশান্ত গলাটা পরিষ্কার করে বললে,—তবে বদলে নিলেই তো পারো।

—পারি, কুবের হাসতে গিয়ে লজ্জায় ম্লান হয়ে গেলো: কিন্তু বাক্সর ভেতরকার চেহারা আমার এই বাইরেকার চেহারার চাইতে বিশেষ ভদ্র নয়। তবে ঢোক গিলে কুবের বললে—বৌদিদিদের সঙ্গে দেখা দু'চার দিন পরেই করবো না-হয়।

—না, না, পাগল নাকি? সুশান্ত গলা ছেড়ে হাঁক পাড়লে: লোকনাথ।

লোকনাথ দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে।

—রাধাকান্ত এখনো বসে আছে রে? যা, ডেকে আন এখানে। কুবের অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে জিগ্‌গেস করলো: কে রাধাকান্ত?

—ও আমার দর্জি। বিকেলের দিকে এসেছিলো জিনিস ডেলিভারি দিতে। তুমি আসবে বলে তখন থেকে ওকে বসিয়ে রেখেছি। কিছু অর্ডার নিয়ে যাক।

চোখে চশমা-আঁটা—নাকিটা প্রায় ডগায় ঝুলে পড়েছে—কুঁজো-মতন, শীর্ণ-শুকনো, বুড়োটে একটি লোক ঘাড় উঁচিয়ে চারিদিক চাইতে-চাইতে উপস্থিত হলো। সুশান্ত কুবেরকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললে,—এর মাপটা নাও দেখি চট করে। পাঞ্জাবিই—কী বলো? সামনে গলা, ঢিলে হাতা, ডবল-ঘর, কেমন?

রাধাকান্তর চক্ষুস্থির। এই হচ্ছেন সেই মহামান্য অতিথি, যার জন্যে গুনে দু'টি ঘণ্টা সে ঠায় বসে আছে। এরি জন্যে এতো ঠাট, বাড়িময় সরগরম। নিতান্তই কলেজের একটা ছোকরা, কাঠখোট্টা গড়ন, কদাকার হাত-পা। রাধাকান্ত চলনসই একটু জ্যোতিষ জানতো। গায়ের মাপ না নিয়ে হাতের রেখাগুলি সে দেখলে পারে একবার।

পকেট থেকে গজ-ফিতে আর পেন্সিল-কাগজ বার করে রাধাকান্ত এগিয়ে এলো। আপত্তি করা বৃথা কুবেরের সুখের সূর্য zodiac cancerএ এসে আরোহণ করেছে। তার তীব্রতা গেছে সহনের সীমা পেরিয়ে। কী তার যোগ্যতা ছিলো কুবেরের তা বিচার করে দেখবার ইচ্ছে নেই। যদি পেয়েই থাকে, সেই তার একমাত্র যোগ্যতা। দুঃখই বা এতোদিন সে কেন পেয়েছিলো? মনে-মনে কুবেরের হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো। যাই বলো, সুখটা কেমন ভালগার, কেমন একটু হাস্যাস্পদ।

রাধাকান্ত তার ফিতে ও কুবেরের বুক-পিঠ নিয়ে নানারকম মাপজোক করতে লাগলো। পুট আর আস্তিন, কোমর আর পুস্তি। সুশান্ত টিপ্পনি কাটলো। ঝুলটা ওর চেয়ে অন্তত চার আঙুল বড়ো করো। খাটো জামা কী যে এক ইডিয়-টিক্ ফ্যাশান হয়েছে। স্মার্ট হওয়ার চাইতে রেসপেক্টেবল্ হওয়াই তোমার উচিত এখন। তোমার এখন ঐ র‍্যাবল্ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় হয়েছে।

কাগজে মাপজোক টুকে নিয়ে রাধাকান্ত জিগগেস করলে: কী-রকম হবে?

সুশান্ত বললে কী কাপড়ের চাও?

নির্লিপ্ত, মসৃণ গলায় কুবের বললে—আমি তার কী জানি। তারপর মুচকে একটু হেসে: আপনার ভাই, আপনার দর্জি আপনিই বলতে পারেন।

—হ্যাঁ, আধ ডজন আদ্দি, আর গোটা চারেক সিল্ক। এই যে এই স্টাফ্-এর। সুশান্ত তার গায়ের জামাটা ঘষে-ঘষে অনুভব করতে লাগলো: তোমার কাছেই তো স্যাম্পল্ আছে।

অসহায় সুরে কুবের প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো: ও যে একটা বোঝা। অতো আমি বইবো কী করে?

রাধাকান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মুখে এমন একটা ভাব করলে যার অর্থ করলে এই দাঁড়ায়, একটা চুনোপুঁটি শামলা এঁটে যেন ডেপুটি হতে যাচ্ছে! কতো সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় চুটকি দিতে!

সুশান্ত বললে—ওপরে চলো। তারপর আমি একবার গাড়ি নিয়ে বেরুবো। কিছু কাপড় কিনতে হবে তোমার।

চোখ-মুখে জলের ঝাপটা দিতে-দিতে বাথরুম থেকে কুবের বললে—তা আপনিই ভালো বলতে পারেন।

চুলগুলি তার এমন ঘন কোঁকড়ানো যে চিরুনির বশ মানতে চায় না। সেই দিকে চেয়ে সুশান্ত বললে—চুলটা আজই কাটবে নাকি?

—চুল? দু'হাতে মাথা হাট্‌কাতে-হাট্‌কাতে কুবের বললে,—কেন, আমার চুল কী দোষ করলো?

—তোমার কী যে সব উদ্ভট, আজগুবি কায়দা হয়েছে, সুশান্ত বিরক্তিতে ঠোঁট উলটে বললে,—মাথায় একটা বাবুইর বাসা করে রেখেছ। নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির শেষ-ভাগে পর্যন্ত ও ছিলো। এখানকার ধুয়ো হচ্ছে সহজ হওয়া, স্বাভাবিক হওয়া।

—স্বাভাবিক হওয়াই তো আজকের দিনে একটা প্রকাণ্ড অ-স্বাভাবিকতা। কুবের তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে বললে,—আমরা আর যাই হই, স্বাভা-বিক হওয়াটাই আমাদের ধাতে নেই। মনুষ্যত্বের আমরা কাঁচা মাল নই, আমরা আদিম নই, আমরা হচ্ছি তার একটা যান্ত্রিক উৎপাদন, আমরা আধুনিক। স্বাভাবিক হওয়া নয়, সভ্য হওয়াই আমাদের কাজ। তারপর ঈষৎ চঞ্চল হয়ে: সে-সব অনেক বড়ো কথা। এখন চলুন, বৌদিদিদের সঙ্গে আলাপ করে আসি। আমার যা একখানা আনটাচেবল্ চেহারা, তাঁরা আমার ছায়া দেখে না দূরে সরে পালান।

অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্তের মতো চারিদিকে মিট্‌মিট্ করে চাইতে-চাইতে সুশান্তকে সে অনুসরণ করলে।

। পাঁচ ।

সিঁড়ির ধাপে-ধাপে পা ফেলতে-ফেলতে সুশান্ত বললে—দাদাদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে সেই রাত্রে। বড়-দা হচ্ছেন য়্যাটর্নি, মেজ-দার হচ্ছে ইন্‌সিয়োরেন্স—দু'জনেই সমান আড্ডাধারী, দশটা-এগারোটার আগে কারো টিকি দেখবার জো নেই।

—ওরে বাবা! কুবের হেসে উঠলো: আমার তো তখন একঘুম।

সুশান্ত চলতে চলতে ঢিল দিলো: বলো কী। তুমি রাতে লেখো না, মাঝরাতে?

—কিছু ঠিক আছে? যখন ইচ্ছে হয় লিখি যখন ইচ্ছে হয় লিখি না। আপনি?

—আমার তো রাতে ছাড়া কিছুতেই মাথা খোলে না। সব নিশুতি হয়ে গেলে ঘরময় অন্ধকার করে দিয়ে ছোট, ক্ষীণ মোমবাতি জ্বালি—হ্যাঁ, ক্যাণ্ডেল, নিজেকে নিজের কাছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ করে না তুলতে পারলে লিখতে কেমন তৃপ্তি পাই না। সুশান্ত আগে-আগে উঠে যেতে লাগলো, ঘাড় ফিরিয়ে হঠাৎ জিগ্‌গেস করলে: তুমি 'আবির্ভাব'-এ আমার লেখা পড়োনি কখনো? আমার কবিতা?

লজ্জিত হয়ে কুবের বললে,—আপনাদের কাগজের যা দাম, কিনে উঠবো কি করে?

—হ্যাঁ, ওটা সাধারণ রিফ্‌র্‌য়াফের জন্যে নয় কি না, ডিস্‌পেপটিক পাঠকদের হজমের সুবিধের জন্যে দুধের পরিমাণে ওটাতে জল বেশি মেশাল দিতে পারি না। ওটা হচ্ছে সুস্থ, বলিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের জন্যে, তাদের সংখ্যা তো 'লিজান' নয়, তাই দাম একটু বেশি করতে হয়েছে। তা, তোমাদের দলে এই কাগজ নিয়ে কথা হয় না?

—বিশেষ নয়, ঠোঁটের কোণটা একটু কুঁচকে কুবের হাসলো: যে-কাগজ লেখা ছাপবার জন্যে পয়সা দেয় না সে-কাগজ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করার রীতি নেই।

ঘা খেয়ে সুশান্তর মুখ পাঁশের মতো বিবর্ণ হয়ে এলো; বললে—ছি ছি, সাহিত্যকে তোমরা আধুনিক সৌন্দর্যের মতোই একটা কমোডিটি বানিয়ে ফেলেছ দেখছি। আমার কী সাহিত্যিক কীর্তি, তা নিয়ে কেউ কোনোদিন মাথা ঘামাতে আসবে না, কিন্তু তোমাকে এই বদ্ধ, বিশ্রী আবহাওয়া থেকে আমি মুক্ত করবো—এই হবে আমার সাধনা। সুশান্তর কথা তার পায়ের শব্দের সঙ্গে মিল রেখে চলেছে: আমি দেবো তোমাকে আরাম, অবসর, অনুকূল আবহাওয়া। এই করে তোমাকে আত্মবিক্রয় করতে দেবো না। টাকাটা হচ্ছে উদ্দেশ্যের একটা উপায় মাত্র, মূল উদ্দেশ্য নয়। তোমরা সাহিত্যিকরা. দোতলার কাছাকাছি এসে পড়ে সুশান্ত চোরা চোখে চারদিক চাইতে লাগলো: সজ্ঞান, সুস্থ আনন্দের বদলে একটা মোহাবিষ্ট অভ্যেসকেই যেন বড়ো করে দেখেছ।

—হ্যাঁ, যে-কাজে আনন্দ নেই, তাই মনে হয় নিষ্প্রাণ তবু গায়ের জোরে তাদের লিখতে হয়। কুবের সায় দিলো : তাকে আর জীবন বলে না, খানিকটা galvanised activity। ইলেকট্রিক তার দিয়ে মরা পোকা খানিকটা ছটফটিয়ে তোলা। তারপর একটু থেমে গলা নামিয়ে : হ্যাঁ, আরাম চাই, অবসর চাই—অবসর না হলে কোনো ফুলই ফুটতে পারে না, আর্টই বলি, প্রেমই বলি, বা পাপই বলি!

ততোক্ষণে সুশান্ত দোতালায় পা ফেলেছে। সঙ্গে-সঙ্গেই গলা দিলো ছেড়ে : ওঃ মেজবৌদি, দেখে যাও এসে, কবি এসেছে।

বিয়ে-বাড়িতে বর এসে পৌঁছুলেও এমন একটা কেলেঙ্কারি হয় না। নাম ঘোষিত হওয়া মাত্র সামনের দালানে রাজ্যের ছেলে-মেয়ে বউ-ঝি ঝাঁক বেঁধে তাকে ছেঁকে ধরলো। কুবেরের লজ্জা করতে লাগলো দস্তুরমতো। সে যেন দু' লাইন বাঙলা লিখে কী ঘোরতর অপরাধ করে বসেছে। যতো না অপরাধ তার ছাপার অক্ষরে তা বার করে, তার চেয়ে বেশি তার এই নিতান্তই একটা জলজ্যান্ত মানুষের চেহারা বলে। তারা সবাই আশা করেছিলো হয়তো অক্টোপাস বা হিপোপটেমাসের মতো কিছু-একটা দেখতে পাবে, তার বদলে কিনা বলা-কওয়া-নেই একটা ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা একরতি নিরীহ একটা ছেলে। তার জন্যে এতো ডামাডোল! নৈরাশ্যে সকলের মুখ চিবুকের দিকে খানিকটা ঝুলে পড়লো, চোখের বিস্ফারিত ভাবটা এলো স্তিমিত হয়ে।

চেহারা দেখেই কুবের বুঝতে পারলো ইনিই বড়োবৌদি হবেন। চেহারায় আভিজাত্যসূচক মার্জিত একটু স্থূলতা, ভারিক্কি হালচালে বেশ একটু আত্মকর্তৃত্বের অহঙ্কার। সাজ-সজ্জায়, চলনবলনে বড়োমানুষির ঝাঁজ পাওয়া যাচ্ছে। আর পরদার অর্ধেক আড়ালে যিনি ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়ে আছেন, তিনিই মেজবৌদি, নির্ঘাত। গোলগাল, দুধ-ঘি-খাওয়া, দুপুরে-ঘুমোনা চেহারা—মুখে একটা ঢলোঢলো আহ্লাদি-আহ্লাদি ভাব। দুজনেরই রূপ দেখতে আটপৌরে, অর্থাৎ বাংলাদেশের জল-মাটির তৌলে সুন্দরী হয়েও মুখে নেই এমন একটি ব্যক্তিত্বের রেখা বা প্রতিভার আভা যার বিশেষত্বে বলা যেতে পারে এদের সুন্দর। দু'জনেই বড়োলোকের ঘরের মেয়ে, এবং বড়োলোকের ঘরে বিয়ে হওয়া ছাড়া দু'জনের জীবনে আর কোন কাম্য নেই - সমস্ত শরীরের ছাঁচে সেই একটা মসৃণ, নিটোল নির্লিপ্ততা। সুখের উপর দিয়ে অনায়াসে গড়িয়ে যাবার জন্যেই তাদের মেধার চেয়ে মেদ একটু বেশি মনে হচ্ছে।

বড়োবৌদি এগিয়ে এলেন : এই, এই তোমার কুবের কবি? একেবারে বাচ্চা যে।

কুবের হেঁট হয়ে তাঁকে প্রণাম করলো, শুনলো সুশান্ত বলছে : কুবের-কবি নয়, কবি-কুবের। মাটি কোপাতে হলে শরীর লাগতো বটে, কিন্তু এ নেহাৎই কবিতা লেখা। ও কি মেজবৌদি, মুখ লুকোচ্ছ কেন?

মেজবৌদি হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এলেন : আমার তো কাছে আসতে ভয়ই করছিলো,—ওঁর সেই যা-একখানি উপন্যাস। আমি ভাবছিলাম কি-জানি-কী একটা হবে।

কুবের তাঁকেও প্রণাম করতে ঘাড় নোয়ালো, শুনলো বড়োবৌদি বলছেন : হ্যাঁ,

আমারো তাই ; ভাবতাম জাঁদরেল চেহারা, ইয়া গোঁফ, প্রকাণ্ড একটা ভুঁড়ি-টুঁড়ি কিছু হবে, কিন্তু এখন দেখি পুঁচকে, গোবেচারা চেহারা। নাক টিপলে দুধ পড়ে। দিব্যি হেঁট হয়ে প্রণাম করে পর্যন্ত। বড়োবৌদি সুশান্তর দিকে বাঁকা চোখে চাইলেন : কি হে, কারো নাম ভাঁড়িয়ে আসেনি তো ?

কুবেরের মুখের পেশীগুলি লজ্জায় কুঁচকে উঠলো, চারদিকে মিটমিট করে চাইতে-চাইতে বললে—কই, বৌদিরা আমার এরি মধ্যে ফুরিয়ে গেলেন নাকি ? আর নেই ?

—না, তৃতীয়া এখনো কেবল কল্পনার নেপথ্যেই বেশবাস করছেন। বড়ো-বৌদি ঠোঁট টিপে বললেন : রঙ্গমঞ্চে আর তাঁর পা পড়ছে না। রঙ্গমঞ্চে তার আবির্ভাব হতে না-হতেই নাকি ঠাকুরপোর সমস্ত কল্পনা কাচের গুঁড়োর মতো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

টলটলে চোখ নাচিয়ে মেজবৌদি শুধোলেন : কাল তোমাদের আড্ডায় বেবি এসেছিলো, তার মা ?

সুশান্ত ফ্যাকাসে গলায় বললে,—হ্যাঁ, মিসেস সোম এসেছিলেন। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে : চলো, ঘরে চলো ওকে কিছু খেতে দেবে না ?

কোথা থেকে ছোট একটি ছেলে এসে কুবেরের হাত চেপে ধরেছে : তুমি এতো সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই লেখ, আমাদের জন্যে একটা গল্প লিখে দিতে পারো না ?

—হ্যাঁ, ঐ সব পরী-রাজপুত্তুর, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প নয়, ছেলে-মেয়ের দল চারিদিক থেকে চাক-ভাঙা মৌমাছির মতো তাকে ছেঁকে ধরলো আষ্টেপৃষ্ঠে : সত্যি-সত্যি কেউ বাঘের মুখে পড়েছে, ডাকাতের হাতে, তলিয়ে গেছে কেউ সমুদ্রের তলায়। লেখো না একটা ?

সুশান্ত মারলো এক ধমক, তারই ধাক্কায় ছেলের দল ছত্রখান হয়ে পড়লো।

ঘরের মধ্যে গিয়ে কুবের দেখলো এক বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন চলেছে। ঘরময় সৌখিন আসবাব-পত্রের বাহুল্যে ততো নয়, যতো সব খাবারের প্লেটে। এবং সব, প্রত্যেকটি কণা নাকি তারি জন্যে। অপচয়ের এ একরকম উদ্ধত সমারোহ। পরকে খাওয়াবার যে স্পৃহা তার মধ্যে তৃপ্তির চাইতে গর্বের ভাবটাই প্রবল। তুমি খাচ্ছ না, আমি তোমাকে খাওয়াচ্ছি। পর—পর নিশ্চয়ই, পর না হলে জাহাজ-বোঝাই খেতে দেয় নাকি কেউ ?

কুবের প্লেটের উপর আলগোছে তার আঙুলগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

মেজবৌদি বললেন,—ঐ তো সরু-সরু ক'টি চিমসে আঙুল, কলম ধরে ওরাই এমন সব আগুন বর্ষণ করতে থাকে ? মাথার মধ্যে বুঝি বারুদ পুঁজি করা। তারপর আহ্লাদির ঢঙে গলা দুলিয়ে : সত্যি, কী যে তুমি লেখ ভাই, ছাপার অক্ষরে দেখতে পর্যন্ত গা শিউরে ওঠে।

মুখের চিবোনোটা শেষ না করেই কুবের বললে,—অক্ষরের আকারে দেখতেই আমরা ভয় করি, জীবনের আকারে নয়।

বিস্ময়ে দুই ভুরু তেরছা করে মেজবৌদি বললেন,—বাবাঃ, কী হেঁয়ালি করে কথা ! আমরা তো তার বুঝবো মাথা আর মুণ্ডু। কিন্তু তোমার উপন্যাসে—সেই যে কি-জানি ছেলেটার নাম—মেয়েটাকে ভালোবাসছে, অথচ বলছে তাকে

বিয়ে করবে না,—কী সাংঘাতিক কথা, একবার ভাবো দিকি? তুমি তাই মনে করো? যদি বিয়েই করবে না, তবে ভালোবাসতে যাবে কেন?

কুবের স্মিতমুখে বললে,—মাঝখান থেকে আমি নিজে কেন কিছু মনে করতে যাবো? আমার চরিত্ররা কে কী করছে না করছে তাতে আমার হাত কী! আপনার মেয়ে যদি বড়ো হয়ে বিলেত গিয়ে এক সাহেব বিয়ে করে বসে, তাতে আপনাকে কে দায়ী করতে যাবে?

গাল ফুলিয়ে মুখ গম্ভীর করে মেজবৌদি বললেন,—তাই বলে তো তুমি আর হিন্দু-মেয়েকে দিয়ে সাহেব বিয়ে করাতে পারো না।

—জীবনে ঘটলেও না?

—যদি কোথাও ঘটে-ও, মেজবৌদি সতীত্বতেজে সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন: তবে তোমাকে তার শতমুখে নিন্দে করতে হবে, দেখাতে হবে এ অত্যন্ত কুৎসিত কাজ, দেখাতে হবে এই পাপের পরিণাম কি ভয়ানক!

কুবের ঢোঁক গিলে বললে,—সে হয়তো যদি আমি আমার নিজের কথা বলতে যাই। কিন্তু যদি আমার ওদের হয়ে ওদের কথাই লিখতে হয়, তবে আমি কী করতে পারি বলুন। আমার হাত-পা যে তখন বাঁধা। আমি-আপনি যাকে পাপ বলছি, ওরা হয়তো তাকে পাপ বলবে না। তাই পাপের পরিণামটা ওদের পক্ষ থেকে ভয়ানক না-ও হতে পারে।

—থাম, ওকে এখন খেতে দে দিকি। বড়োবৌদি আপত্তি করে উঠলেন: তর্ক করবার সময় ঢের পড়ে আছে।

—তর্ক না কাঁচকলা! মেজবৌদি আহ্লাদে গলে গেলেন: আমরা ওর বুঝি তো কতো। আমরা একটা সুগোল গল্প পেলেই খুশি। তোমার চরিত্ররা কী ভাবলো তা নিয়ে মাথা ঘামাতে আমাদের বয়ে গেছে, কী করলো জানতে পারলেই আমরা খালাস। তোমরা তো আজকাল আর গল্প লেখো না, হাত নেড়ে মেজবৌদি বীর-রসের একটা ভয়াবহ ভঙ্গি করলেন: ছাড়ো কেবল কতোগুলি বোমা।

কুবের গলা ছেড়ে হেসে উঠলো।

কিন্তু সেই হাসির উপর নেমে এলো সুশান্তর গলা, শোনালো শুকনো একটা শাসনের মতো: যাই বলো, কুবের তোমার গল্প ততো ভালো জমে না। তোমার ঐ প্রথম উপন্যাস—ঐ সব সামাজিক কারণে নয়, সাহিত্যিক কারণেই অনেকটা খেলো হয়ে পড়েছে। সাহিত্যিক বিচার করবার পদ্ধতিটাও সাহিত্যিক রসবোধের মাপকাঠিতে, সমাজের হিতাহিতের দোহাই পেড়ে নয়। আমি তাই সেসব বাজে আপত্তি তুলছি না। আমি বলছি,—কুবের হাত গুটিয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে—যেন খানিকটা সন্তর্পণে, ভয়ে ভয়ে কথাগুলি তার খোলা মুখের উপর বৃষ্টির ছাটের মতো একসঙ্গে কোমল ও তীক্ষ্ণ হয়ে ছিটিয়ে পড়লো: আমি বলছি, উপন্যাস বা গল্প তোমার পয়েন্ট নয়, তোমার পয়েন্ট হচ্ছে কবিতা, যাকে বলা যেতে পারে point d' appui। 'ফালক্রাম'-এর উপর যেমন 'লিভার' ঘোরে, তেমনি তোমার সমস্ত চেতনা ঘুরছে এই কবিতাকে কেন্দ্র করে। কবিতাই হচ্ছে তোমার ধ্রুবতারা। তোমার দেবী হচ্ছে calliope। এটা মনে

রাখবে, তোমার গল্প এসেছে নিজের তাগিদে নয়, অবস্থার তাগিদে : তোমার জীবিকার একটা সস্তা কৌশল হিসেবে তাকে ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু সে-সমস্যা আর নেই, সে-আবর্জনার স্তূপ আমি দু'হাতে সরিয়ে ফেলবো—এবার তুমি সমস্ত বাধার বাইরে চলে এসেছ। এখন থেকে পেলে তুমি অখণ্ড অবসর, অজস্র আকাশ, তোমার কবিতাকে আবার উদ্ধার করো। কবিতাই তোমার entheasm, কবিতায়ই তুমি full of the God।

কুবের যেন একেবারে মিইয়ে গেলো ; কথা কইলেন মেজবৌদি—ঘাড় বেঁকিয়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে হাতের সুগোল মুঠি ঘুরিয়ে : রক্ষে করো ঠাকুরপো, গল্প হলে বরং দু'পৃষ্ঠা উলটে যেতে পারবো, দুপুর বেলা খানিক গড়াবার আগে অন্তত চোখে একটু ঢুল এনে দেবে—কিন্তু কবিতা, বাবাঃ! দন্তস্ফুট তো দূরের কথা, পড়তে বসলেই আধ-কপালে মাথা ধরে থাকবে।

—তাই তো, সুশান্ত যেন গর্বে খানিকটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো : তাই তো কবিতায় আজো আভিজাত্য আছে—তোমাদের, মেয়েদের বুদ্ধির ক্ষেত্রে এখনো নামেনি। গল্প তোমরা বুঝতে চাও বলেই তো তার এই অধোগতি হয়েছে। দয়া করে এর পর আর তোমরা কবিতা বুঝতে চেয়ো না। তোমরা যদি কবিতা কিনতে শুরু করো দেখা যায়, তাহলে কবিতারো হাট বসে যাবে।

মেজবৌদি ফোঁস করে উঠলেন : বটে আর কি! তবে তোমার বৌদি যে এত পদ্য মেলাচ্ছেন—তার বেলায় কী?

বড়োবৌদি প্লেট সাজাতে-সাজাতে মুখ টিপে হাসলেন : তা, ও কি আর মেয়ে আছে নাকি?

—সত্যি কথা বলতে কি, সুশান্ত ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো : মেয়েলোক বলতে যে-যে সব বিশেষ গুণপনার একটা জীবন্ত সমাহার বোঝায়, ও তা চেষ্টা করে অনেক ঘষে-মেজে মানানসই একটা ভদ্রলোকের চেহারা নিয়েছে। তোমাদের মতো অসার সমালোচনা না করে অন্তত সৃষ্টি করছে কিছু-একটা, মেয়েলোকের এই অলৌকিক সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাস সংসারে কই আর বেশি দেখা যায় বলো! এইখেনেই তো তারা স্থূল দৈহিকতা, তাদের সীমা-সংকীর্ণ animality—বাঙলা করে বললে ভারি বিশ্রী শোনাবে—এইখানে সুশান্ত একটু হাসলো : এইখানেই তারা তাদের সমস্ত ক্ষুদ্র সাংসারিক স্বার্থপরতা অতিক্রম করে আসতে পেরেছে। এ কি কম কৃতিত্বের কথা?

মেজবৌদির জিভ যেন ফণা মেললো : বৌদির কথা কিছু বলতে গেলেই বুঝি কশায়ের আঁতে ঘা পড়ে—ভাষার ফোয়ারা ছোটে? যাকে দেখতে পারি তার চলন ছেড়ে তার পদ্য লেখাও ভালো লাগবে এতোটা বাড়াবাড়িতে কিছু ভদ্রতা নেই।

নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা-বার্তা এসে যাচ্ছে। মেয়েদের সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনায় এই হয় অসুবিধে। অরা উপন্যাসের চরিত্র ছেড়ে উপন্যাসের লেখক সম্বন্ধেই বেশি কৌতূহলী।

সুশান্ত কুবেরের দিকে ফিরলো : তুমি পড়েছ ওর কবিতা? ও কিন্তু তোমার লেখার খুব admirer।

অতএব যেরূপ কবিতা তাকেও ওর কবিতার সুখ্যাতি করতে হবে। সমস্ত

নামের পরিবর্তে সর্বনামের প্রয়োগটা কুবেরের কাছে মোটেই প্রাঞ্জল বোধ হলো না। যে রকম গলায় সে উত্তর দিলো তা নিজের কাছেই শোনালো কেমন অভিমানে ভার: না। কিছু পড়বারই আমার সুবিধে হয়নি, এবার হবে আশা করি।

—নিশ্চয়। সুশান্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলো: গোটা লাইব্রেরিটাই তোমার জন্যে পড়ে আছে।

—কিন্তু, কুবের খাবারের প্লেটের উপর প্রায় ঘাড় গুঁজে পড়লো: সংসারে সকল লোককে সমান খুশি করা যায় না। সাহিত্যিক হয়েই এ-প্রবাদের মূল্য আমরা বেশি বুঝতে পারি। আপনি আমার গদ্যরচনা পছন্দ করেন না, কিন্তু এমন লোকও ঢের দেখলাম যাঁরা আমার কবিতা-লেখার ওপর censor লেলিয়ে দিতে চান। আমার কবিতা নাকি কিছু হয় না, যা উৎরোয় ঐ গল্প।

—মিথ্যে কথা। সুশান্ত বসার থেকে খাড়া হয়ে উঠলো: তোমার লেখা নিয়ে কালই তো আমাদের আড্ডায় তুমুল তর্ক হয়ে গেছে। প্রায়ই হয় অবিশ্যি। তাকে তর্ক বলতে পারি না, কেননা প্রতিপক্ষ কেউ উপস্থিত ছিলো না। সব আমরা ভীষণ ভাবে একমত। তাই ওটাকে বলতে পারো, ঠিক তর্ক নয়, বিশ্লেষণ। গল্পের চেয়ে কবিতার অনুপ্রাণনাই তোমার জেনুইন, এ-রায়ই একবাক্যে পাশ হয়ে গেছে। এবার আমাদের কাগজের জন্যে তোমার কবিতা চাওয়া হবে কিনা এমনো একটা কথা উঠলো। আর ভাবনা কী!

কুবের আমতা-আমতা করে বললে,—আপনাদের এ-তর্কে প্রতিপক্ষ কেউ আছেন নাকি?

—একজন। ঐ বেবি। কথাটা বিশদ করে বলতে যেন বাধছে: তা ওর ঐ এক ধরন। যাতেই ও একটা ঝাঁজালো নতুনত্ব পাবে, তাই ওর কাছে swell। ওর কথায় কান দিতে গেলেই হয়েছে আর কি।

—কেন? মেজবৌদি আবার ফোঁস করে উঠলেন: ও তো মেয়েছেলের চৌহদ্দি দিব্যি পেরিয়ে এসেছে বললে, তবে ওর কথাটাই বা গ্রাহ্য হবে না কেন?

—হ্যাঁ, মেয়েরা তো হচ্ছে ভাবের এক কুণ্ডলী ধোঁয়া। সুশান্ত যেন আশানুরূপ স্ফূর্তি করে কথাগুলি বলতে পারছে না: ওদের মাঝে শুকনো স্যানিটি কই? কোনো যুক্তি নেই, কেবল পক্ষপাতিত্ব—নিজের নিজের সংস্কার দিয়ে তারা ব্যাখ্যা। তোমাদের কথা আর বোলো না। তুমি ঘরের বউ, তাই এ-গল্প লাগে তোমার কাছে তেতো, আর ও—ও—

মেজবৌদি বললেন,—একগাল সিগারেটের ধোঁয়া।

—ও বাইরের জগতের সঙ্গে চোখ-কান খুলে একটু পরিচয় রাখছে বলে ওর কাছে মনে হচ্ছে জলো, নিতান্ত ফ্যাকাসে। সেটা হচ্ছে ওর একটু বিদ্যাবত্তার অহঙ্কার। কিন্তু, সুশান্ত অল্প একটু অন্যমনস্ক হয়েছে: রসবিচারে সেইটেই কি আদর্শ?

হাত ঘুরিয়ে মেজবৌদি বললেন,—অতো ফুটুনি করো না, ঠাকুরপো, ঐ ধোঁয়ার জোরেই তো আকাশে বেলুন উড়িয়েছ। ধোঁয়া কমে গেলেই তো মাটির উপর ঠাস করে ফেটে পড়বে।

চাপা হাসিতে ঘরের আবহাওয়া কেমন ভারি হয়ে উঠলো।

কোনো একটা কথা বলা দরকার। কুবের মুখ তুলে বললে,—কিন্তু সমস্ত রসবিচারই কি ব্যক্তিগত ভালো-মন্দ-লাগা দিয়ে ধার্য হয় না? সমস্তটাই কি সমালোচকের রুচি আর শিক্ষার তারতম্যের উপর দাঁড়িয়ে নেই? সুশান্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কি-একটা বই ঘাঁটতে শুরু করেছে. তাকে উৎসাহিত করার জন্যে কুবের আবার বলতে লাগলো: সেই ব্যক্তিগত রুচির সমষ্টিই কি অতিকায় হয়ে যুগধর্মের নাম নিয়ে বসে না? আর প্রাচীনতরো হয়ে এলেই যে আগের যুগকে আমরা গদগদ হয়ে প্রশংসা করি, সেটা কি আমাদের একটা ফ্যাসান ছাড়া আর কিছু? এ যুগের সম্পর্কে তার সামান্য একটা ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আর কিছু কি তার অস্তিত্ব বা প্রয়োজন আছে? আমরা কি আর তেমন করে দেখেই কোনো তৃপ্তি পাই?

সুশান্ত গম্ভীরমুখেই বললে—সে সব অনেক কথা। আসচে রোববার আমাদের অ ড্ডায়ই তা বিচার করা যাবে।

কুবের লজ্জিত হয়ে বললে,—না, বিচারের কথা নয়, আপনাকে এমনি জিগ্গেস করছিলাম।

—সে ভাই ঐ বিচারই হলো। বড়োবৌদি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: ও তোমার রোববারের জন্যেই ধামাচাপা থাক। ফ্রাই আর দুখানা দি, কেমন?

—রক্ষে করুন। চেয়ার থেকে কুবের লাফিয়ে উঠলো।

—হ্যাঁ, চলো, তোমাকে আমার লাইব্রেরিটা দেখাই। নিচে। কয়েক পা এগিয়ে এসে সুশান্ত বললে,—রাত্রে তুমি কি খাও, কুবের? বৌদিদিদের জেনে রাখা দরকার।

কুবের হেসে বললে, কেন, আমার চেহারা দেখে সাধারণ দুটো ভাত খাই বলে কি মনে হয় না? কিন্তু আজ এইখেনেই ইতি। এতো খাওয়ার কোনো-দিনই আমার অভ্যাস নেই। অচেনা পেটে গিয়ে খাবারগুলো সহসা উৎপাত শুরু করতে পারে।

তারপর দুজনে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো।

সুশান্ত বলছে: তোমার আর কোনো ভাবনা নেই, কুবের। কোনো তাড়া নেই, কোনো বাধা নেই। এবার থেকে মনের মুক্ত হাওয়ায় বসে কবিতা লিখতে শুরু করো—কবিতা, কবিতাই তোমার elan vital। তোমার তো আর গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা নেই—আশা করি থাকবেও না,—কেন আর তোমাকে ঐ সব সস্তা গল্প-উপন্যাসের trikeryর মধ্যে যেতে হবে—যখন তা তোমার ground নয়। ঈশ্বর ইচ্ছায়, আমার একটা মোটা আয় আছে—সেটা অবিশ্যি বলতে গেলে বাবারই কীর্তি, তোমার কিছু ভাবতে হবে না। তোমাকে আমি মানুষ করে তুলবো, আর অন্যের পক্ষে আর যাই হোক, তোমার পক্ষে কবিতাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব।

॥ ছয় ॥

কোথা থেকে কোথায়। এক মুহূর্তে কোথায় যেন কী ভোজবাজি হয়ে গেলো। মৃত্যুর আগে জীবনে হঠাৎ এতো বড়ো একটা পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে সজ্ঞানে একথা কে কবে কল্পনা করতে পারতো। গীতায় মাত্র কাপড় বদলাবার কথা আছে, কিন্তু বেঁচে থাকতে-থাকতেই যে নিঃশেষে এমন ভোল ফিরে যেতে পারে এমন কথা কোনো তত্ত্বজিজ্ঞাসুরই মাথায় আসেনি। অপরিমাণ মহাশূন্যে অগণন তারকাকণার মাঝে একমাত্র এই পৃথিবীতেই মনুষ্য-প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের মতোই যেন এ আকস্মিক।

এর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে প্রতিপদে কুবের হোঁচট খাচ্ছে। পথে সব গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো, কোমল সমতল জায়গায় পা যাচ্ছে পিছলে। বিছানা এতো নরম যে সহজে তার ঘুম আসে না। গা ছড়াবার এত জায়গা যে শুধু বিশ্রামের ভারই তার স্তূপে-স্তূপে সঞ্চিত হয়ে উঠছে। হাত একবার বাড়িয়ে দিতেই তার যখন যা চাই, যেখানে যা দরকার, যতোবার তার খুশি। কষ্ট করে কিছু আর তার চাইতেও হয় না—না-চাইতে আকাশের অবিরল অজস্রতার মতোই তার চারদিকে দানের সমুদ্র উথলে উঠেছে।

এতোদিন যা সে চেয়েছিলো। তার অনুভূতির চারদিকে একটি গাঢ়, নিঃশব্দ পরিবেশ, তার প্রকাশের পিছনে বিশ্রামের একটি কোমল পটভূমি। গোটা কয় স্থূল শারীরিক সুবিধে, উন্মুখ সংগ্রামের থেকে একটু ক্ষণিক নির্লিপ্ততা। তার লেখায়ো ফুটে উঠেছিলো সেই কান্না, হয়তো সেই প্রচ্ছন্ন প্রার্থনার সুর। সেই চাওয়ার একটা সীমা ছিলো হয় তো, সেই দুঃখেরো ছিলো একটা পার। কিন্তু তাই বলে তাকে এই সুখের উত্তাল ফেন-সমুদ্রে পাল উড়িয়ে দিতে হবে এটা তার কাছে যেন তার অস্তিত্বেরো অতিরিক্ত ছিলো। কূল বোধহয় তার কাছে এসে পড়েছে, পথ হয়ে এসেছে তা'র সুগম-সুকোমল। আর ভয় নেই।

আগে লেখবার জন্যে সারা মেস খুঁজে সে একটা শান্ত-শিষ্ট জায়গা পায়নি, ওর নিজের জায়গাটা একটা দৈনিক খবরের কাগজের অগ্নিকুণ্ড - অপেক্ষা করেছে সে কতোক্ষণে দেশের এই সব রাজনীতি-বিশারদরা পাশ-বালিশ জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। কখনো কখনো সেই তুমুল তর্ক-আবর্তের মধ্য দিয়েই লগি ঠেলে তাকে তার কল্পনার নৌকা চালিয়ে নিতে হয়েছে, যায় যাক রঙীন পাল ঝড়ের আক্রমণে ছিঁড়ে-ফেঁসে টুকরো-টুকরো হয়ে। আজ তার চারপাশে দিনে-রাতে সমান স্তব্ধতা—সমান বিরতি। লেখবার সময় প্রতি মুহূর্তে দেশের উত্তরোত্তর অধোগতির কথা স্মরণ করা দূরে থাক, কোনো শিশুকণ্ঠের দুর্বল, অস্ফুট একটা শব্দ পর্যন্ত তার কানে আসে না। শুধু সামনের জমিটুকুতে দীর্ঘ দেবদারু গাছটাতে পাতারা ফিস্‌ফিস করে, কয়েকটা চড়ুই ঠোঁটে করে খড়কুটো নিয়ে ফর্‌ফর্ করে উড়ে বেড়ায়। এ ক'টি শব্দ যেন স্তব্ধতারই হৃৎস্পন্দনের শব্দ, তার

অনুভূতিকে আরো ঘন করে আনে। ঘরভরা তার আজ এতো জায়গা, নিজেকে নিয়ে যে সে কী করবে কিছু বুঝে উঠতে পারে না। দু'তিন রকম কলম—রকমারি তার মেইক্। অনুভূতিকে যদি সুক্ষ্ম করে তুলতে হয়, অন্তর্দৃষ্টিকে যদি করতে হয় তীক্ষ্ম, তার জন্যে আছে ফাইন-পয়েন্ট নিব ; যদি করতে হয় দ্রুত, ভাষায় যদি আনতে হয় গতির দীপ্তি, বেগের ছটা, তার জন্যে মিডিয়াম্। টেবুলের একধারে স্তূপীকৃত প্যাড্—সবুজ আর বেগুনি, সোনালী আর সাদা। যে-রঙের সঙ্গে কবিতা যখন সায় দেবে—যে-রঙের সঙ্গে তার কথার হবে সখীত্ব। যদি প্রকৃতি কথা কয়ে ওঠে, তবে সবুজ ; যদি মানুষের সুখ-দুঃখের ঢেউ আলোড়িত হয়ে ওঠে, তবে বেগুনি ; যদি কখনো দেয় প্রেমের দক্ষিণ বাতাস, তবে সোনালি ; আর সাদা ? -প্যাডের সব পৃষ্ঠাই তার সাদা থেকে গেলো। অনেক, অনেক উপকরণ! মাথার উপর ধীরে ঘুরে চলেছে ঠাণ্ডা অস্লার, জানলার খস্‌খসের বেড়া—নতুন চাকর, তার জন্যে নতুন চাকর, পিচ্‌কিরি করে জল দিয়ে গেছে। পাশেই তার সুশান্তর প্রকাণ্ড লাইব্রেরি—তার জন্যে আলমারিতে আর চাবি লাগানো নেই। দু'হাতে বই করো এলোমেলো, নতুন-নতুন নামের দিকে হাঁদার মতো হাঁ করে চেয়ে থাকো। পৃষ্ঠা উলটে যাও, গোগ্রাসে ক্যাটালগ গেলো। তাতেও স্বস্তি নেই—দেরাজ-ভরা তার জামা-কাপড়। সব সময়েই ময়লা হয়ে যাবার ভয়, ভাঁজ কুঁচকে যাবার শারীরিক লজ্জা। এসব জামা-কাপড় তার যেন নিজের বলে মনে হয় না, তার চেয়ে বেশি মায়া পড়ে যে-শেষ আস্ত লংক্লথের পাঞ্জাবিটা সেদিন তাকে সজ্ঞানে বিদায় দিয়ে দিতে হয়েছে। নিজেরো চেহারা গেছে তার বদলে—আরসিতে চেহারা দেখে নিজেকেই যেন সহজ ঔদাসীন্যে চিনতে পারে না। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো, সামান্য চুল ফেরাবার জন্যে পৃথিবীতে যে এতো সোরগোল হতে পারে প্রসাধনের আসবাবের দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে থাকে। গায়ে নিভাঁজ মস্‌মস করছে সিল্ক, কখনো বা গায়ের সঙ্গে হাওয়ার মতো থাকে লেপটে, লম্বা করে কোমরে না বেঁধে কোঁচা তাকে আজকাল পায়ের পাতার উপর লুটিয়ে দিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টার বেশি গালে তার দাড়ি গজাবার সময় দেয়া হবে না, কারো মুখ দেখে ঘুম ভাঙবার আগেই তার নিজের মুখকে চেঁছে-ছুলে একেবারে শ্মশান করে তোলা চাই। সুশান্তর সঙ্গে অনেক তর্ক করেও সে গোঁফের সুক্ষ্ম রেখাটি বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। উপায় কী বলো ? রোমে এসে রোম্যানদের মতোই ব্যবহার করা উচিত।

এতো সব উপকরণ-ঐশ্বর্যের মর্যাদা সে রাখে কি করে ? নিজেকে এর যোগ্য করে তোলবার জন্যে কী না-জানি তাকে এখন লিখতে হয়, সেই লেখাকে কী ভীষণ, কী আশ্চর্য না-জানি হতে হবে, কী অদ্ভুতই না-জানি তার হওয়া উচিত। তার আগের লেখার চেয়ে অনেক বেশি নতুনতরো, আরো অনেক বেশি তার ঝাঁজ, তার স্বাদ, তার নেশা। নইলে তার দেহ-মনের এই বায়ু-পরিবর্তনের অর্থ কি ? কিন্তু কী যে লিখবে কুবের তা ঘরের চারদিককার খট্‌খটে মেঝে-দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কিছুরই সন্ধান পায় না, মনে তার কোনো কথা নেই ; নেই কোনো প্রকাশ করবার অনুপ্রাণনার সুর—যে-সুরে কথায় সহসা আগুন ধরে যায়, দেহ হয়ে ওঠে বীণার মতো ঝঙ্কৃত, জীবনে আসে ক্ষণকালের জন্য প্রাণযাপনের মত্ততা। আজ আর

অতো ব্যস্ত হবার তাড়া নেই, দুয়ারের সামনে আগামী কালের বিশীর্ণ প্রেতমূর্তি দীর্ঘ ছায়া ফেলে নেই আর দাঁড়িয়ে. কুবের অনায়াসে আজ পাশ ফিরতে পারে, সময়ের স্রোতের উপর দিয়ে গড়িয়ে দিতে পারে তার অনেকগুলি নিশ্চিন্ত দিন-রাত্রি। কিছু এসে যায় না, এই সে দিব্যি আছে। " বেঁচে যে আছে এই তার যথেষ্ট কাজ, আলস্য করে মুহূর্তযাপন করতে পারছে এই তার যথেষ্ট কবিতা। কোনো দিন যে সমস্ত শরীরে অনুভূতির তীব্র তাপ অনুভব করে সে কবিতায় নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়েছে, আজকের দিনে সেই চেতনা তার কাছে সুদূর তারকার মতো এক অনায়ত্ত স্বপ্ন, কিছুতেই যেন তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। না, নিজেকে আর মিছিমিছি ব্যস্ত করবার দরকার নেই, কিছু লিখতে না পারার ঠান্ডা অন্ধকারে সে কিছুকাল বিশ্রাম করুক।

সুশান্ত তার মাঝে কী অমেয় রহস্য আবিষ্কার করেছে কে জানে, কুবের দেখছে তার নিজের নির্জনতা, নিজের দারিদ্র্য। বিশ্রাম নয়, শূন্যতার শান্তি। এ বিরতি নতুন কর্মপ্রবণতাকে ধারালো করে না, তার উপরে এনে দেয় যেন তন্দ্রার জড়িমা, তলিয়ে নিয়ে যায় যেন আরো গভীর মোহের মধ্যে। দেহ-মনের এই অপার স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতার মধ্যে থেকে সে আর কোন কান্না শুনতে পাবে তার, কোন তীব্রতা? এর পর চুপ করে যাওয়াই তো সমীচীন, পৃথিবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর করবার কিছু নেই, অভাব জানাবার নেই কোনো আর প্ররোচনা। সুশান্তর মুখের উজ্জ্বলতা সেঁকি করে আর টিঁকিয়ে রাখে না-জানি? অন্তত সুশান্তকে খুশি করবার জন্যেই তো তাকে লিখতে হয়—নিজেকে তো সে আশার অতিরিক্তই সুখী মনে করতে পারছে, এতো পরিপূর্ণ যে তার সকল কথাই ফুরিয়ে গেছে হয়তো।

তবু কিছু-একটা না করে এমন জড়ের মতো বিশ্রামে স্তূপাকার হয়ে বসে থাকাটাও তার অভ্যেসে বাধছে। কুবের ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। টেবিল টেনে বসে গেলো কবিতা লিখতে নয়, পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে। তবু এতো সময় ঐ অপ্রয়োজনীয় রাবিশে সে ভরে তুলতে পারে না। হাতে এতো আলগা সময় টুকরো টুকরো হয়ে ছিটিয়ে আছে যে তাদের আর কোনো ক্রমান্বিত ব্যবহার নেই, ক্রমশই যাচ্ছে মরচে ধরে। পুরানো আড্ডার দিকে বেরিয়ে পড়লে পারে, কিন্তু সুশান্তর বারণ—ঐ সব সাহিত্যিক-র‍্যাগামাফিনদের সঙ্গে মিশে নিজেকে সে আর যেন খেলো না করে, সুশান্ত অন্তত তাকে সম্মানবোধ বলে একটা পার্থিব পদার্থের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। তাদের সঙ্গ-সান্নিধ্যে কিছু সঞ্চয় করা তো নয়ই, বরং নিজেকে ক্ষয় করা, নামিয়ে নিয়ে আসা। তার চেয়ে বাড়িতে তার প্রকাণ্ড লাইব্রেরি, সুশান্ত তার ডাইনের ঘরে। রোববার-রোববার এমন জাঁকালো আড্ডা, একবার যোগ দিলে বহুদিনের খোরাক মেটে। বেশ তো, সুশান্তই তাকে যেখানে খুশি বেড়িয়ে নিয়ে আসবে, যতো এলিটদের সোসাইটি আর ফ্যাশানেবল রেন্ডে-ভূতে। সুশান্ত তাকে অন্য আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিতে দেবে না—এই ঘর থেকে পা বাড়ালেই সুশান্ত। তবু যদি তার টাকার দরকার হয়—দেরাজের ড্রয়ার টানো। আবার টাকা! এর পরে এ-টাকা ব্যয় করতে হলে দস্তুরমতো পাপ করতে হয়, কিন্তু কবিতা লেখা ছাড়া অন্য কোনো পাপ করবারো তার স্বাধীনতা নেই।

নিঃশব্দে পেছনে কখন সুশান্ত এসে দাঁড়িয়েছে কুবের খেয়াল করেনি। সামনের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছে সে বইয়ের পৃষ্ঠায়। মনোনিবেশের আগ্রহে ভঙ্গিটা তার তীক্ষ্ণ।

সুশান্ত হটে দাঁড়ালো। প্রায় স্বগতোক্তির মতো বললে,—না, এখন তুমি লেখ, থাক্, তা পরে আরেকদিন হবে খন।

কুবের আর ঘাড় ফেরালো না। আরেকটা আক্রমণ সে কৌশল করে হটিয়ে দিতে পারলো। হয়তো সুশান্তর কোনো বন্ধু এসে জুটেছে, তাকে দেখাতে হবে তার এই অদ্ভুত কিউরিয়ো। কিম্বা হয়তো জুটেছে কোনো দোকানের মালিক, কুবেরের জন্যে যাবে এক্ষুনি পছন্দসই ফরমাজ। কিম্বা আর কারো কাছে কোনো নতুন বাঁদর-নাচ।

কিন্তু সুশান্তকে সে আর কতোকাল বঞ্চিত রাখবে? ভোর হলেই সে হাসিমুখে জিগ্‌গেস করবে: কিছু আজ লিখলে, কুবের?

কুবের আধোমুখ হয়ে বলবে: না।

—কেন বলো তো? লিখতে পাচ্ছো না কেন? হজম-টজম—

কুবের বলবে: এমনি। গা মেলে কয়েক দিন আগে বিশ্রাম করে নি।

সুশান্ত তক্ষুনি সায় দেবে: হ্যাঁ, যতো তোমার খুশি।

কিন্তু কতো আর সে বিশ্রাম করতে পারে? এ নির্জনতা আবার কতোদিন তার মুখর হয়ে উঠবে? আবার কবে পাবে সে তার ভাষা? না, এই তার জীবনের সম্পূর্ণতা, তার জীবনের সমাধি?

॥ সাত ॥

কুবেরের আসবার প্রথম রোববার আড্ডা জমেনি, সেদিন বৃষ্টিতে কলকাতার রাস্তা ছিল এক-কোমর। সপ্তাহ ঘুরে আবার এক রোববার এলো।

কুবেরের আর সাজগোজ হয়ে ওঠে না—এখন যতো নিরীহ পোষাকই সে করতে যাক্ না কেন, তার কাছে তাই একটা উৎকট উপসর্গের মতো মনে হয়। সুশান্তর সঙ্গে-সঙ্গে তার কাপড় চাকর কুঁচিয়ে দেয়, রোজ জুতো রাখে বুরুশ করে, এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চুল করতে হয় পরিপাটি। হাতের মুঠোয় উপকরণের এতো কৌটো শিশি যখন এসে পড়েছে, তখন তাদের একটু-একটু ভারমুক্ত না করার কোনো মানে হয় না।

লোকনাথ এসে জানিয়ে গেলো ভদ্রলোকেরা সব এসে গেছেন—তাঁর এখন সময় হলে, ছোটবাবু খবর দিতে বললেন কিনা—সেই লোকনাথ তাকে এখন কী ভীষণ সমীহ করে চলে, সেলাম বাজিয়ে কথা কয়।

পায়ের পাতার উপর কোঁচা লুটোতে লুটোতে বারান্দা পেরিয়ে কুবের অগ্রসর হতে লাগলো। দূরে থেকে আড্ডার দু'একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো, এবার তার জুতোর শব্দ পেয়ে গেলো তারা ডুবে। কুবের মনে-মনে হাসলো, সে যেন প্রায় বাসর-ঘরে যাচ্ছে আর-কি।

ঘরে ঢুকেই তার চক্ষু স্থির। পুরুষে যে এতো সাজতে পারে এ নিদারুণ কথা সে মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারতো না। উইগ্ পরার মতো সাজাটা যেন কলকাতার এ-অঞ্চলের সাহিত্যিকদের একটা করোলারি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাণী আন্-এর সময় উইগ্ পরতো নাকি টাক ঢাকতে, আর এদের এতো এই সাজসজ্জার ঘটা—সে যেন লুকিয়ে রাখতে এদের অন্তঃসারশূন্যতা।

কুবের তাদের কাছে কী! ইচ্ছা করছিলো যদি তার পুরোনো ছেঁড়া একটা পাঞ্জাবি এখন পরে আসতে পারতো। যদি এদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারতে পারতো তার দারিদ্র্য! এদের কাছে কিছুই কিনা তার স্পর্ধা করবার নেই। এদেরই অনুকরণে কি না সে মেক্-আপ্ করতে গেছে!

সুশান্ত সোৎসাহে উঠে দাঁড়ালো: এই যে কুবের। আর ইনি হচ্ছেন ভাস্কর রায়, প্রফেসার; উমাপতি ঘোষ, ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল; সুবিমল সিকদার, বার-য়্যাট্-ল; আর ইনি প্রদ্যুম্ন চ্যাটার্জি – কী বলবো,—পৌলট্রি-ফার্মার, আর ইনি অমৃত মিটার, শহরের একজন বড়ো গাইনোকোলজিস্ট্।

সবাই সাটে-সোটে হাঁ-হুঁ করলে; অনেকগুলি নমস্কার সেরে কুবের বসলো এক কোণে খালি একটা চেয়ারে। তাদের সবাইর কাছে কুবের একটা আলপিন, প্রায় ঘাসের একটা ডগা। এমন কুণ্ঠিত হয়ে বসলো যেন তার দামি জামায় খানিকটা গরম চা পড়ে গেছে।

কেউই বিশেষ উত্তেজিত হবার ভাণ করলো না, যে-যার পকেট থেকে কেউ রুমাল বা সিগারেট বার করে যথাক্রমে ঘাড় ও ঠোঁট ঘষতে লাগলো। সবাই দেখলো নেহাৎ পুঁচকে একটা ছোঁড়া, মুখে মফস্বলের একটা হাবা-গোবা ভাব, দেখলে মায়া করতে ইচ্ছা করে। তাদের সঙ্গে অনেক ব্যবধান, বয়সে, জ্ঞানে, সাহিত্যিক আদর্শে। 'ঈশ্বর, একে পথ দেখাও, হাত ধরে নিয়ে চলো।'—সবাইর মুখে তেমনি একটা প্রশান্ত নির্লিপ্ততা। একে নিয়ে এতো উৎসাহ দেখাবার যে কী আছে, সুশান্তকে হঠাৎ এই নেশায় যে কেন পেয়ে বসলো বোঝা কঠিন। ঠোঁট ফুলিয়ে সবাই ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো।

এই তাদের conversazione। এদের সকল নামই কুবেরের চেনা—'আবির্ভাব'-এ এদের সবাইর পাণ্ডিত্য সসমারোহে শোভা পাচ্ছে। এ ক'দিন বহু অধ্যবসায় করে কুবের এদের ভিতরের পরিচয় সংগ্রহ করছিলো, বাইরের অঙ্গ-সজ্জার সঙ্গে কোথাও কিছু পার্থক্য আছে বলে মনে হলো না। লেখাতেও দেহের এই এদের স্ফীতি, পোষাকের এই কুৎসিত আড়ম্বর, আন্তরিক উত্তেজনার অভাব। জীবন বা প্রেম, ইতিহাস বা শাস্ত্র, সব এদের কাছে কোয়াড্র্যাটিক ইকোয়েশান্-এর মতোই সমান প্রতিপাদ্য। গালভরা জাঁকালো কথা না বলতে পারলে এবং সেই কথা বোধের অগম্য করে বলবার কৌশল না দেখাতে পারলে এদের স্বস্তি নেই। একেকটি যেন বিদ্যের বস্তা, রেফারেন্সের ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল। ক্যাটালগ এদের মুখস্ত, বইয়ের ফ্ল্যাপের বিজ্ঞাপন পড়েই বইয়ের এরা রসগ্রাহী। তাদের লাইব্রেরিতে যে-বইয়ের পৃষ্ঠা এখনো কাটা হয়নি, সে-বইয়েরো আগাপাশতলা এদের নখাগ্রে। বই কেনাই তাদের ব্যসন ও একে-অন্যের সঙ্গে সেসব বইয়ের আদান-প্রদান করাই তাদের স্ফূর্তি। নিজেদের কি করে কতো বড়ো হেড্-লাইনে

বা স্টিমারে জাহির করবে এতেই সচেষ্ট সব সময়। এদের এই পুঁথির পৃথিবীর বাইরে আর যা-কিছু আছে, আর যে কিছু আছে, আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ—সবাইর প্রতি এদের গা-ঘিনঘিন ভাব, কোথাও কিছু নিয়ে উত্তেজনা দেখালে এদের মিষ্টি-মিষ্টি তেতো হাসি, ঠোঁট বাঁকিয়ে অল্প-অল্প ধোঁয়া ছাড়া।

সুশান্ত জিগগেস করলে: তুমি আগের আড্ডায় আসোনি যে উমাপতি?

উমাপতি গালে হাত বুলোতে-বুলোতে বললে,—মুখে একটা ছোট পিম্পল উঠেছিলো।

—সে-জন্যে আসতেই পারলে না একেবারে?

কথা কইলো প্রদ্যুম্ন: তাছাড়া আবার কি। যার সাবানের এতো বড়ো কারখানা, মুখে তার পিম্পল উঠলে ব্যবসাই যে যাবে ফেল্ পড়ে। তার সাবান তবে লোকে কিনবে কেন?

কথা শুনে সবাই একটু হাসলো বটে, কিন্তু সে-হাসি না হাসলে নেহাৎ নয় এমনি ঢঙের। বেশি উত্তেজনা দেখাতে গেলে এদের জামার ভাঁজ যাবে কুঁচকে।

অমৃত মিটার সুবিমলকে জিগগেস করলেন: আপনার সেই থি-ডেকার উপন্যাসের কি হলো? সেই টি-বি স্যানাটোরিয়াম্ না অব্সটেট্রিক্স্ নিয়ে কী মহাকাব্য ফাঁদছিলেন আজ বছর দুই?

সুবিমল বিতৃষ্ণ মুখে বললে,—সেই য়ুরোপ থেকে এসেই। প্ল্যান তো ক'তাই করেছিলাম, কিন্তু যা আপনাদের দেশ, সব যায় ড্যাম্প মেরে। লিখে কী হবে, কে বুঝবে?

কুবের উৎসুক হয়ে ব্যারিস্টারের মুখের দিকে তাকালো, যা সে বলছে সত্যিই তা সে বোঝাতে চাইছে কি না।

সুশান্ত বললে,—লেখা একবার শুরু করে দাও না।

—বাঙলা ভাষায় কী ছাই লিখবো। সুবিমল গলায়-চিবুকে কতোগুলি ভাঁজ ফেলে তার বিতৃষ্ণাকে আরো ঘন করে আনলো: সে-আইডিয়া খাপ খাইয়ে নেবার কোনো ক্যাপাসিটিই নেই তোমাদের বাঙলার। ছিঁচকাঁদুনে কবিতা লেখো, দু'চারটে মিঠে-মিঠে গল্প—ব্যস্।

—তা যা বলেছ! গালে হাত বুলোতে বুলোতে উমাপতি বললে, বাঙলা ভাষায় একটা ক্রিয়াপদ নেই। যেমন নিষ্ক্রিয় জাত, তেমনি তার ভাষা। ভদ্র-লোকে লেখে কি করে?

—আর বানান? গাইনোকোলজিস্ট্ সাহেব ঝাঁজিয়ে উঠলেন: এক উর্ধ্ব বানান করতে গেলেই তো উর্ধ্বশ্বাস। তবু লোকে যে লিখছে নেহাৎ একটু সভ্য হচ্ছে বলে।

সভ্যতার খাঁটি একটা নিরিখ পাবার জন্যে কুবের উৎসুক হয়ে মিটারের মুখের দিকে তাকালো।

—কী ছাই লেখা হচ্ছে শুনি? প্রদ্যুম্ন গর্জন উদগার করলে: যতো সব ট্র্যাশ্ গল্প আর থার্ড-রেইট্ কবিতা। হালকা, হালকা, যতো দূর হালকা হতে পারে। আমাদের 'আবির্ভাব'-ই সাহিত্যকে যা একটু সিরিয়াস্‌লি নিয়েছে, ব্যবসাদারি গল্প যে বাদ দিতে পেরেছে সুশান্ত, এ একটা ট্রায়াম্ফ্। আমরাই যা সাহিত্যের একটু

সংস্কার করছি, ভাষাকে মর্যাদা দিচ্ছি, তাকে নর্দমা থেকে তুলতে চেষ্টা করছি সিংহাসনে।

—তা হয়তো ঠিক, সুশান্ত আপত্তি করলে না : কিন্তু কোথাও-কোথাও দু'-একটা ভালো লেখা বেরুচ্ছে বৈ কি।

—চলনসই। মেয়েদের মতো ঠোঁট উলটে ভাস্কর বললে,—কিন্তু সংখ্যায় তারা কতো কম।

—এই যে নতুন একদল unemployed ছোঁড়া বেরিয়েছে, বিতৃষ্ণায় সুবিমলের মুখ প্রায় হাঁড়ি হবার জোগাড় : কালি-কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করছে একাধটু—

ভাস্কর হেসে বললে,—যেমন তুমি তোমার ব্রিফ্‌ নিয়ে।

—হ্যাঁ, সুবিমলের তাতে কুণ্ঠিত হবার কিছু কারণ নেই : কিন্তু কী পাও তুমি তাদের লেখায়, কী পেতে আশা করো ? বিদ্যেয় সবাই এক একটি ঢু ঢু, পেটে বোমা মারলেও একটি দামি কথা কারো মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে না—

উমাপতি টিপ্পনি কাটলে : সবাই মা-সরস্বতীকে জলযোগ করে বসেছে যে।

—নিশ্চয়। সুবিমল বললে : সাহিত্য করতে হলেও ক্যাপিট্যাল চাই—সকল প্রফেশানের গোড়ার কথাই হচ্ছে ঐ। আর এরা সব উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে কলম শানায়, and they sell their copyright for a mess of pottage. ওদের থেকে কিছু আশা করো না সুশান্ত।

গম্ভীর অথচ মৃদু স্বরে প্রদ্যুম্ন বললে,—স্পার্ক দেখা গিয়েছিলো বটে, কিন্তু all—all gone to pot. আর কি করে কী হবে ? সাহিত্যের কোনো একটা আদর্শই এদের সামনে খাড়া নেই, সাহিত্য হচ্ছে এদের কাছে একটা vocation মাত্র। কেউ যেমন সতরঞ্চি, বেতের ঝুড়ি বুনতে পারে, তেমনি এরা পারে দু'চার লাইন গল্প ফাঁদতে। মাথার কাজ নয়, হাতের কাজ।

সকলেই একমত ; তাদের এই গোষ্ঠির গণ্ডি পেরিয়ে আর কোথাও যে কারো জীবনকে দেখবার সাহিত্যিক দৃষ্টি থাকতে পারে না সে বিষয় তাদের বিবৃত করে বলাই কিছু বাহুল্য হবে। কেবল সুশান্তই একটু বেসুরো : কিন্তু কবিতা—কবিতা কিন্তু কুবের বেশ ভালো লেখে। নতুন কিছু লিখেছ নাকি, কুবের ?

কুবের যেন হঠাৎ নিজের অস্তিত্বে ফিরে এলো। এতোক্ষণ সে ভুলেই ছিলো যে এদেরি মতো সে-ও লেখে, আর লেখে কি না এই বাংলা-ভাষাই। তার মুখে গাঢ় করে কে এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিলে, মাথা ঝাঁকিয়ে বললে,— না।

কিছু যে সত্যিই লিখতে পারেনি কুবের যেন তাইতেই খুব পরিচ্ছন্নতা অনুভব করছে।

উমাপতি গালে হাত বুলোতে-বুলোতে ভাস্কর রায়ের দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বললে,—লেখে নাকি ভালো কবিতা, কই, কোনোদিন পড়েছি নাকি হে, রায় ? মনে পড়ে না তো দেখি।

—দু'-একটা কবিতা চমৎকার উৎরেছে। সুশান্তর মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো : বিশেষ করে সেই আফ্রোদিতে কবিতাটা। যাই বলো, আমাদের অপ্সরী উর্বশী তার তুলনায় অনেক ভালগার। কবিতার ফাইলটা নিয়ে এসো না, কুবের। ছাপা

হয়েছে মফস্বলের কোন একটা রোখো কাগজে। মুখস্ত আছে? বলো না—পায়ের উপর পা তুলে সুশান্ত চেয়ারে হেলান দিলো।

কবিতার নাম শুনে গাইনোকোলজিস্ট্ সাহেব দাঁড়িয়ে মূর্চ্ছা গেলেন, অর্থাৎ এতো চঞ্চল হয়ে পড়লেন যে উঠে দাঁড়ালেন একলাফে: রক্ষে করো বাবা। একে এই গুমোট, তায় কবিতা। তবু যদি পড়তে হয়, ধীরে-সুস্থে সময় করে ছাপার অক্ষরে—পৃষ্ঠা উলটে যাবার তখন একটা স্বাধীনতা আছে; আর আবৃত্তি শোনা? Torture? একেবারে শেষ না করে উনি থামবেন নাকি ভেবেছ?

নাকের মধ্যে দিয়ে সামান্য একটু হেসে উমাপতি বললে—তারপর কতো বড়ো না জানি কবিতা। সমস্তক্ষণ stiff হয়ে বসে থাকো। Soul-killing?

গাইনোকোলজিস্ট্ সাহেব তাঁর লাঠি ও টুপির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, পরদা সরিয়ে লোকনাথ দু'হাতে কাঠের একটা প্রকাণ্ড ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। আহ, গুমোট কেটে দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিয়েছে।

সুশান্ত পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে লাগলো, এগিয়ে দিতে লাগলো একেক করে প্লেট্। চামচ দিয়ে চা ঘাঁটতে ঘাঁটতে এরা তখন অন্য কথায় এসে পড়েছে: হাই-টি, আইস্‌ড্ বিস্কিট, কস্‌মেটিক্‌স ও ব্লনড্‌ব্রুনেটের রাজ্যে। তারপর কথা উঠলো মদের—তার রঙ ও গাঢ়তার তারতম্য, প্রদ্যুম্ন ঠোঁট পাকুলে বললে: I prefer creme de menthe to green chartreuse তারপর তারা ঘুরতে লাগলো দেশে-দেশে: সাংহাইতে কিরকম শীত, মেক্সিকোতে কিরকম গরম, ইটালিতে কেমন সস্তা! নতুন কিছু একটা বলে আলোচনাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য উমাপতি বললে: I've had a hell of a time in Paris. Most ***dullest***. আলোচনা আবার অন্য পথ নিচ্ছিলো, গাইনোকোলজিস্ট্ সাহেব প্রস্তাব করলেন: না হে সুশান্ত, গরম এসে গেছে, কোথাও দু'দিন টহল দিয়ে আসি।

সুশান্ত একবাক্যে সায় দিয়ে উঠলো: চলো, কার্সিয়াঙ চলো।

প্রদ্যুম্ন বললে,—দার্জিলিঙ কী দোষ করলো?

—না, না, দার্জিলিঙ অত্যন্ত ন্যাস্‌টি, ঠোঁটের বাঁ কোণ কুঁচকে উমাপতি বললে,—যতো রাজ্যের ভিড়, নসিয়েটিঙ। তারপর জিভের ডগাটা সে চুলকে নেবার মতো করে বললে, - তার চেয়ে কুরুসিয়াঙ অনেক হাই-ব্রাউ।

গাইনোকোলজিস্ট্ সাহেব তাইতেই গদগদ হয়ে উঠলেন: তাই সই। বেশ, কবে যাওয়া হচ্ছে? তুমি চুপ করে রইলে যে, রায়? বেশি দিন নয়, say দিন তিনেক। যাবো আর আসবো।

ভাস্কর লজ্জিত মুখে বললে—অতো পয়সা কোথায়?

—বা, পয়সা আর কতো লাগবে? আঙুল দিয়ে আপেলের একটা টুকরো নাড়তে-নাড়তে সুশান্ত বললে,—বেশ, তোমার যদি অসুবিধে হয়, আমরা সবাই সেকেণ্ড ক্লাসেই যাবো না-হয়।

আলোচনাটা শেষ হবার আগেই দরজার পরদা সরিয়ে কে-একজন ঘরের মধ্যে উঁকি মেরেছে। এমন লোকটার আস্পর্ধা যে সরে না গিয়ে আধখানা শরীর প্রায় ঢোকাতেই এদিকে নিয়ে এলো। সুশান্ত মুখিয়ে উঠলো: কী চাই আপনার?

কথা বলার চেয়ে আগন্তুকের পক্ষে মাটিতে সেঁধিয়ে যাওয়া অনেক সহজ ছিলো। কথা বলার প্রেরণায় গলার কাছে হৃৎপিণ্ড তার ধুক্‌ধুক্‌ করছে। চারিদিকে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে চাইতে-চাইতে—সমস্তগুলি চোখ তখন তার মুখের উপর ততোগুলি ছুরির ফলার মতো এসে বিদ্ধ হয়েছে—অনেক কষ্টে সে বলতে পারলো : আমার সেই গল্পটা—

সুশান্ত ধমকে তার প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দিলো : তা এখন কী? দেখছেন না এটা একটা প্রাইভেট্‌ মিটিং।

প্রদ্যুম্ন বললে, অফিস-টাইমে আসবেন।

আগন্তুক ঢোঁক গিলে বললে,—লেখাটা আপনার মনোনীত হয়েছিলো বলেছিলেন, কিন্তু মাস ছয়েক হয়ে গেলো এখনো ছাপা হলো না। ওটা ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম।

সুশান্ত গম্ভীর হয়ে বললে,—আমাদের কাগজে personally এসে লেখা ফিরিয়ে নেবার রীতি নেই। উপযুক্ত স্ট্যাম্প পাঠিয়ে দিলেই ফেরৎ পাবেন ঠিক।

আগন্তুক তবু যেন ইতস্ততঃ করছিলো, তবু যেন তার চোখের ঘোর কাটেনি। উমাপতি বললে,—আবার কী!

আগন্তুক ফিরে যাচ্ছিলো, কুবের হঠাৎ উঠবার একটা আপ্রাণ চেষ্টা করে বললে,—দাঁড়াও, অবনী।

সুশান্ত চাপা গলায় গুমরে উঠলো : Sit quiet.

স্পঞ্জের মতো কুবের গেলো চুপ্‌সে ; হাতে-পায়ে যেন আর বশ রইলো না।

সুবিমল জিগ্‌গেস করলে : এই তোমাদের অবনী মুখুজ্জে নাকি হে? সেই বস্তি-সম্রাট ?

—আহা, প্রদ্যুম্ন প্রায় শোকাকুল হয়ে উঠেছে : এক পেয়ালা চা দিয়ে খানিকটা লেগ্‌-পুল্‌ করা যেতো। Sort of a diversion.

—রক্ষে করো, উমাপতি ঠোঁট কুঁচকে বললে,—we'd be bored to death.

গাইনোকোলজিষ্ট্‌ সাহেব বললে,—যাই বলো, তোমার সাহিত্যিক অশ্লীলতার চাইতে শরীর ও তার ব্যবহারের minor immoralityগুলি অনেক বেশি কুৎসিত। কী বলো হে, সুশান্ত ? Dirty face or dirty finger nails are more repugnant than all your literary intemperance.

ভাস্কর বিস্মিত হবার ভাণ করলে : লেখা মনোনীত হয়েছে, তবু ফিরিয়ে নেবার এতো তাগিদ কেন ?

—বুঝলে না, সুবিমল সহাস্য ঔদ্ধত্যে বার কয়েক চোখ নাচিয়ে বললে,—হাঁড়ির জল গেছে ফুটে, এখন দুমুঠো চালের দরকার হয়েছে। কোন মুদির দোকানের সন্ধান পেয়েছে হয়তো, এসেছে একেবারে ঘোড়ায় চড়ে। যাদের পাতেরই সম্বল নেই, তারা আর জাতে ওঠে কি করে বলো ?

বাইরে কুবের নিঝুম হয়ে থাকলেও ভিতরে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিলো। একটা-কিছু কঠিন প্রতিশোধ নেবার জন্যে তার সমস্ত রক্ত আগুন হয়ে উঠেছে,—কিন্তু সাহিত্য ছাড়া তার উত্তর দেবার কী আছে ? সকল সমালোচনা, সকল বিদ্রুপের প্রত্যুত্তরই হচ্ছে সাহিত্য—তার একমাত্র অস্ত্র, একমাত্র সহায়। এই

আবহাওয়ার থেকে তাকে কবিতা লিখে যেতে হবে সুশান্তর এই ছিলো ফতোয়া, কিন্তু কবিতা, কবিতা থাক্ অন্তরের শীতল অন্ধকারে, তার আঙুল নিস্পিস্ করছে গদ্যের শাণিত, সূক্ষ্ম তলোয়ার চালনা করতে। ধার দিয়ে কাটবে সে সকল আধিক্য, ভার দিয়ে গুঁড়ো করে দেবে সকল কৃত্রিমতা। কবিতা, কবিতা থাক্ অন্য আকাশের নিচে অন্য পৃথিবীর জন্যে. এখন চাই কঠিন, প্রত্যক্ষ গদ্য, তীক্ষ্ম তীব্র স্পষ্টতা। চেয়ারের উপর আড়মোড়া ভেঙে কুবের তার সমস্ত নিস্তেজতা এক মুহূর্তে ঝেড়ে ফেললে।

আবার তারা আলোচনা শুরু করেছে—আধুনিক বাঙলাদেশে সেই ফরাসি salonর প্রবর্তন করা যায় কি না, তেমন কোন social queen আছে নাকি কোথাও? 'কি বলো হে উমাপতি, তোমার তো অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম শুনতে পাই।'

এই তাদের conversazione! এই তাদের সাহিত্যিক আবির্ভাব। কুবেরের গা বমি-বমি করতে লাগলো। এই সব কৌটো-করা তুলোর বিছানায় বিলাসী আঙুরের জীবন, এই সব পাতাবাহার! এদেরই সংস্পর্শে এসে তাকে অভিজাত সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে—এদেরই আলোচনা থেকে নিতে হবে প্রকাশের প্রেরণা ধরিয়ে। কুবেরের মনে পড়লো কতোদিন সে এই অবনীর সঙ্গে নিরালায় বসে আপন-আপন অনুভূতি দিয়ে সাহিত্যের রস খুঁজে ফিরেছে। বহরে তাদের বিদ্যে অনেক ছোট, বুদ্ধির দৌড় সামান্য, বোধশক্তিও হয়তো আশানুরূপ সতেজ ও সূক্ষ্ম নয়, কিন্তু পরস্পরের অনুভূতির তাপে মনে আসতো নতুন উত্তেজনার স্বাদ, দুই গ্যাসের সংমিশ্রণে জলের সৃষ্টির মতো মনে নামতো নির্মল কবিতা। তৈরী হয়ে উঠতো নতুন আকাশ, সাত রঙের অতীত আরেক রঙ, সুস্থ শরীরে বিশ্বাস করা যায় না এমন চেতনা। সেসব দিন যেন কবে চলে গেছে। এখন এসে পড়েছে সে একটা জীবন্ত মিউজিয়ামের মধ্যে—জীবন নয়, জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে। এখানকার সবাই এরা নেমে এসেছে যেন সুন্দর চন্দ্রলোক থেকে, সেই মৃত, নিস্পন্দ নির্মম নীহারস্তূপ—যেখানে সামান্য ঘাসও জন্মায় না, যেখানকার মেঘে ফলে না সূর্যোদয়ের কোনো রঙ। নিরুত্তেজ নিরুত্তাপ, সেই চাঁদ।

॥ আট ॥

লোকনাথ আরেক দফা চা দিয়ে গেলো।

সভায় আবার একটা মৃদু চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়তে-না-পড়তেই দরজার ওপিঠে কার পড়লো ছায়া, সবাই উঠলো সন্ত্রস্ত হয়ে, এবং মহিলাটি যখন ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন, সবাই জায়গা ছেড়ে একেবারে দু'পায়ে উঠে দাঁড়ালো। দেখাদেখি কুবেরকেও একটা উঠবার ভঙ্গি করতে হলো বৈ কি।

চোখ মেলে কুবের চেয়ে দেখলো সাজ-সজ্জায়, আকারে-আয়তনে মহিলাটি

একটি বার্থলোমিউ ডল : মুখে বয়সের দুর্বল রেখাগুলিকে গাঢ় প্রসাধনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। মহিলাটিকে সম্ভ্রম করবার আগে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় তাঁর শাড়ির কতো দাম, স্বাভাবিক সৌজন্য দেখাবার আগে জোরে নিশ্বাস নিয়ে সেণ্টের মাদকতায় হতে হয় আচ্ছন্ন। সারা শরীরে বয়েসকে পরাস্ত করবার একটা প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা, চারপাশে একটা রোমাণ্টিক আবহাওয়া আনবার চেষ্টা। আভিজাত্যের পরমতম চূড়ায় এসে যে উঠেছেন তাঁর নাসিকায় সেই ঔদ্ধত্য; দয়া করে নিচের দিকে চোখ নামাতে গেলেই তার অগ্রভাগ বিরক্তিতে তীক্ষ্ণ, কুঞ্চিত হয়ে উঠবে। তাঁর ভার যে পৃথিবীকে বহন করতে দেয়া হয়েছে এ যেন তাঁর দিক থেকে কতো বড়ো দয়া, বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে তিনি সানুকম্প ঔৎসুক্য দেখতে চান বাংলাদেশের তা সুপ্রভাত। সব বিষয়ে তাঁর স্ফীতি ও স্থূলতা নিক্ষেপ করবার জন্যেই তাঁর হয়েছে জন্ম।

তবু যা হোক এরা খানিক হাত-পা ছড়িয়ে বসে ছিলো, এবার সবাই এমন একটা কঠোর ঋজুতা ধারণ করলে যে তাদের মুখের চেহারা দেখে কুবেরের দস্তুরমতো কষ্ট হতে লাগলো। সব পা তখন জুতোর গহ্বরে এসে ঢুকেছে, কোঁচা নেমে এসেছে একেবারে মেঝের উপর ; পাঞ্জাবির ঝুল সটান হাঁটু ছাড়িয়ে। যেন সবাই নিদারুণ বাধিত হয়েছে মুখে সেই আধো-সলজ্জ আধো-সানন্দ ভাব।

মহিলাটি একটি সোফার মধ্যে গা ঢেলে দিলেন, হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগটা নাড়াচাড়া করতে করতে, চিবুকে গোটা তিনেক ভাঁজ ফেলে, একপাশে ঘাড় হেলিয়ে, চাঁছা, মিহি গলায় বললেন,—কী খবর আবির্ভাব-এর ? আসবার সময় করে উঠতে পারিনি অনেকদিন।

সুশান্ত অমনি দীপ্তি বিকীরণ করলো : আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি, মিসেস সোম। এই হচ্ছে কুবেরকুমার বসু, সম্পর্কে আমার ভাই—আর ইনি মিসেস ভগীরথ সোম, আমাদের কাগজের সবচেয়ে বড়ো পেট্রন।

নমস্কার করবার জন্যে কুবের হাত তুলে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু পর্বতগাত্রে এতোটুকু একটা কমনীয় রেখা ফুটলো না। তাঁর মাথা ও ঘাড়ের মধ্যে হঠাৎ তাঁর গলা গেলো ডুবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে।

বিরক্তিতে তাঁর নাকের ডগা কুঁচকে মিসেস সোম মুখ বাঁকিয়ে জিগগেস করলেন : এই সেই ভেজাল সওদার লেখক ? Good Gracious ! দু'-চারবার কপালের উপর মৃদু-মৃদু ছোট্ট রুমাল বুলিয়ে তিনি বললেন,—এ যে দেখছি একেবারে একটা kid। তার এতোদূর সর্বনাশ হয়ে গেছে এরি মধ্যে ?

সবাই কুবেরের মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসতে লাগলো ; সুশান্ত অপরাধীর মতো মুখ করে কুবেরের হয়ে গেলো ক্ষমা ভিক্ষা করতে : হ্যাঁ, ওটা বিশেষ সুবিধের হয়নি। Every bean has its black.

—Black মানে ? মিসেস সোম তেতে উঠলেন : Black as soot. Bitter as gall. এমন বই কোনো ভদ্রলোক লেখে ?

কুবের নিজেকে আর নিরস্ত করতে পারলো না ; বুক ধুকধুক করছে, তবু সে বলে ফেললো : সাহিত্য লিখতে হলে একটু অভদ্র হতে হয় বৈ কি।

সুশান্ত উঠলো ধমকে : তুমি চুপ করো, কুবের। মিসেস সোম-এর কাছে তাঁর

ক্ষমা চাওয়া তখনো শেষ হয়নি : হ্যাঁ, ও-বইটা বড্ড বেশি bald, বড্ড বেশি rude। নভেল ওর লাইন নয়। কবিতাই হচ্ছে ওর পয়েন্ট। আমি তাই ওকে kidnap করে নিয়ে এসেছি।

মিসেস সোম তবু খুশি হলেন বলে মনে হলো না, সোফার উপর নড়ে-চড়ে বসে নিজেকে খানিকটা ঠাণ্ডা করে নিয়ে বললেন,—অভদ্রতা *ad libitum.* তার চেয়ে রাস্তার একটা ডাস্টবিন ঢের বেশি স্বাস্থ্যকর। যা-খুশি কতগুলো উগরে গেলেই তো আর সাহিত্য হলো না।

উমাপতি প্রদ্যুম্নের কানে ফিস্‌ফিস করে জিগ্গেস করলে : পড়েছ নাকি হে ঐ নামের কোনো বই ?

প্রদ্যুম্নও তেমনি খাটো গলায় বললে—বিজ্ঞাপন দেখেছিলুম বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু অতো ওঁর চটবার কী হয়েছে। বেশ intrigued হচ্ছি যে হে ঘোষ।

সুশান্ত চা ঢালতে-ঢালতে বললে,—হ্যাঁ, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ওর কবিতায়। কবিতাই ওর পয়েন্ট্।

মিসেস সোম তখনো রাগে গরগর করতে লেগেছেন স্বয়ং গ্রন্থকর্তা যে সামনেই উপস্থিত এ তাঁর একমাত্র দৈহিক স্ফীতি দিয়েই তিনি অস্বীকার করলেন : বেবি একবার এক কপি এনেছিলো কিনে। মেয়েটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কৌতূহল হলো, হওয়াই স্বাভাবিক। গোগ্রাসে পড়ে ফেললুম বইটা। লিউড্, লিউড্! নিচের ঠোঁট উলটে মিসেস সোম মুখ বিকৃত করে বললেন : রাগে তখন সমস্ত শরীর দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে, ক্যাণ্ডেল জেলে আগুন ধরিয়ে দিলাম বইটায়—

—তারপর ছাইগুলো গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলেন তো ? কুবের একটু হেসেই কথাটা বলেছিলো, কিন্তু সম্মানিতা ভদ্রমহিলার মুখের উপর দিয়ে পেশীর কয়েকটা ছোট-ছোট ঢেউ খেলে গেলো। তবু কুবের দমলো না, টেনিস-খেলোয়াড়দের মতো সে জানতো কি করে হার্ড স্ট্রোকের বিনিময়ে নরম, মৃদু রিটার্ণ দিতে হয়, তাই সোফার এক কোণে লজ্জায় একটুখানি কুঁচকে গিয়ে সে বললে,—কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি, আপনি কী করে ধৈর্য ধরে সমস্ত বইটা পড়লেন।

—নিশ্চয়, মিসেস সোম মাথা ঝাঁকিয়ে উঠলেন : সমস্ত বই না পড়ে জাজমেণ্ট দিই কি করে ?

মুচকে হেসে কুবের বললে,—কিন্তু সমস্ত বই পড়বার আপনার হয়তো কোনো অধিকার ছিলো না, কেননা বইয়ে যা আপনি পেয়েছেন বললেন, তা একেবারে প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে। ঐখেনেই আপনার থেমে যাওয়া উচিত ছিলো। যদি দয়া করে সবটা পড়লেনই, তবে তা তো আপনার মনেই থেকে গেলো।

কিন্তু প্রফেসার ভাস্কর রায় এতোক্ষণে কথা বললে। কুবেরের হুল যেন তারই গায়ে এসে বিঁধলো। সে উঠলো তেলে-বেগুনে জ্বলে : কিন্তু অপরিণত-মতি ছেলেমেয়েদের হাতে পড়বার সম্ভাবনা ছিলো তো। তাদের তো অন্তত অক্ষত রাখা গেলো।

মুখের হাসিটি অম্লান রেখেই কুবের বললে,—এবং তারা গেলো দল বেঁধে বিলিতি সিনেমা দেখতে। আমি আশা করি ওঁদের সেল্‌ফে একমাত্র আমারই

একখানা বই ছিলো না—আরো হয়তো অনেক সব সদুপদেশের ধর্মপুস্তক ছিলো। আমার বইয়ে যতটুকু খারাপ হওয়া যেতো, তার চেয়ে ঢের বেশি বইয়ে সাধু-সচ্চরিত্র হবার ঢের বেশি নির্দেশ আছে।

উমাপতি বললে, তাহলে আপনার সঙ্গে সাহিত্য ছেড়ে সাইকো-য়্যানালিসিস্ নিয়ে তর্ক করতে হয়।

—কতকটা তাই। কুবের লজ্জার চাপে ভেঙে গিয়ে বললে,—হ্যাঁ, যারা সত্যি খারাপ হয়, তাদের জন্যে বই কতোটা দায়ী সে একটা জিজ্ঞাসা বটে। কিন্তু তর্কের আমি কি জানি।

মিসেস সোম গজগজ করতে-করতে স্বগত বললেন,—সামান্য ভদ্রতা জানে বলে'ও তো মনে হয় না।

কুবের মুখের হাসিটি আরো গাঢ় করে বললে,—জীবন নিয়ে যে কারবার করবে, যে সাহিত্যিক, সৌখিন ভদ্রতা তার কী করে পোষায় বলুন।

সুশান্ত কুবেরের মুখের উপর প্রায় গর্জন করে উঠলো: সাহিত্য-সমালোচনার তুমি বোঝ কী! সে একটা টেক্‌নিক্যাল্ বিদ্যা, তাঁর একটা আলাদা ট্রেনিং আছে। যে-কথা তোমার মুখে সাজে না, তা তোমাকে আর বলতে হবে না, তুমি চুপ করো।

খুশি হয়ে মিসেস সোম সুশান্তকে জনান্তিকে ফিস্‌ফিস করে বললে—ওকে তোমরা নেড়ে-চেড়ে একটু মানুষ করো, একটু ঘষে-মেজে শিখিয়ে-পড়িয়ে নাও। ছোক্‌রার কিছু পার্টস্ আছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু একেবারে গোঁয়ার-গোবিন্দ। যেমন লেখায়, তেমনি দেখছি কথা-বার্তায়। তোমার আপন ভাই নয়, নিশ্চয়।

সায় দেবার জন্যে সুশান্ত প্রস্তুত হয়েই ছিলো; অনায়াসে সে ঘাড় হেলালো: হ্যাঁ, যতো-সব সাহিত্যিক-র‍্যাগামাফিনদের সঙ্গে মিশে-মিশেই তার বুদ্ধিশুদ্ধি সব ঘুলিয়ে গেছে। না গ্রাম-সম্পর্কে আমার কিরকম ভাই হয় যেন। ওকে মানুষ করবার জন্যেই নিজের কাছে ধরে নিয়ে এলাম। চায়ের বাটিটা মিসেস-এর দিকে আস্তে একটু ঠেলে দিয়ে সে একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল,—অমনি ঝড়ের মুখে রাশ ছেড়ে দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চাইতে—বুঝলেন না, যদি ওকে পথ চিনিয়ে দেয়া যায়, নিন্, কিছু—নির্ভুল কায়দায় সুশান্ত খাবারের একটা প্লেট দিলো বাড়িয়ে।

নাকের ডগা কুঁচকে মৃদু-মৃদু ঘাড় হেলাতে-হেলাতে মিসেস সোম বললেন,—My! ও আমি ছোঁব না। চা-টা দু'-sip না-হয়,—বলে তিনি পেয়ালার হাতলটা ধরে অর্ধ পথে থেমে পড়ে চারদিকে একবার চোখ বুলোলেন: আজ আপনাদের সভা দেখছি যে প্রায় জমজমাট। ভালোই হলো।

ঠোঁট দুটোয় চায়ের রঙ একটু বুলিয়েছেন, গাইনোকোলজিস্ট্ সাহেব আবদার করে বললেন,—কিছুই খাবেন না কী! অন্তত এক টুকরো আপেল। কথাই আছে, An apple a day, keeps the doctors away. বলে তিনি খাবারের প্লেটটা আরেক ইঞ্চি ঠেলে দিলেন।

হাসিতে সমস্ত মুখ ঢলোঢলো করে মিসেস সোম বললেন,—তার চেয়ে ভালো খাবার আমার এই ব্যাগে আছে, মিস্টার মিটার। দাঁড়ান, তা আপনাদের একটু

পরিবেশণ করি। পরে ব্যাগ ঘাটতে-ঘাটতে : সে একটা ট্রিট্, সুশান্ত। বেবি একটা ওয়াণ্ডারফুল সনেট লিখেছে—তোমাদের 'আবির্ভাব'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় অনায়াসে জায়গা পেতে পারে। কে কোথায় দাঁড়ায়!

সুবিমল-প্রদ্যুম্ন উমাপতি-ভাস্কর ঝাঁক বেঁধে সবাই যেন পাখা বিস্তার করলে। সুশান্তর মুখে ফুটে উঠলো প্রায় কুমারী-কিশোরীর সব্রীড় রক্তিমা। এমন কি গাইনোকোলজিষ্ট সাহেব পর্যন্ত উৎসাহে উথলে উঠলেন : That's the card. এতোক্ষণ এই তো আমরা চাইছিলাম। সাহিত্যসভা, তা না যত সব ভেজাল সওদা আর মেকি মাল। টাইটার ফাঁস একটু আলগা করে তিনি নড়ে-চড়ে বসলেন : এতোক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো।

চোখে ফিতে-বাঁধা চশমা লটকে মিসেস সোম একটা রঙিন কাগজ থেকে কি-খানিকটা পড়তে লাগলেন। গদ্য না পদ্য—শত কান খাড়া করেও পড়ার ধরন থেকে কুবের এক বর্ণ ধরতে পারলো না। তবে আগেই সনেট বলা হয়েছে, শেষ হতে বেশিক্ষণ নিশ্চয়ই লাগবে না। Pause মেপে, মনে-মনে লাইন গুনে-গুনে সে কায়মনোবাক্যে এর সমাপ্তি কামনা করতে লাগলো! শুধু ঢাকের বাজনা নয়, মাঝে-মাঝে কবিতা থামলেও কবিতারই মতো মিষ্টি লাগে।

আর দু'লাইন হয়তো বাকি, এখুনি সমস্ত ঘর হয়তো উৎসাহের অমিত-প্রাবল্যে ভেঙে পড়বে—সবাইর চোখে-মুখে তেমনি একটা তীক্ষ্ম অসহিষ্ণুতা, নিখুঁত নিটোল গাম্ভীর্য,—এমনি সময় ঠিক এমনি সময়, পরদা সরিয়ে ঘরের মধ্যে হলো একটি মেয়ের আবির্ভাব। আবির্ভাব যদি বলতে চাও তো একে, মাত্র উপস্থিতিতে এতো তেজ ও প্রখরতা এমন কি মিসেস সোমের পর্যন্ত গলায় কথা এলো আটকে, তিনি তোৎলাতে লাগলেন।

মেয়েটি দমকা হাওয়ার মতো ঝাপটা দিয়ে উঠলো : এ কী মা, এইখানে তুমি আমাকে অপদস্থ করছ—এতোগুলি গণ্যমান্য ভদ্রলোকের সামনে?

হোঁচট খেতে-খেতে মিসেস সোম তখন পৌঁছে গেছেন। ঢোঁক গিলে বললেন, —বেবি? জিগ্‌গেস করে দ্যাখ্ এঁদের, কী চমৎকার হয়েছে!

চাকভাঙা মৌমাছির মতো সবাই অস্ফুট প্রশংসায় গুনগুন করে উঠলো। সুবিমল হঠাৎ টিপয়ে একটা অসমানুপাতিক ঘুষি মেরে চেঁচিয়ে উঠলো : I can lay a bet, সুশান্ত, এমন সনেট তোমার এলিজাবেথ্ ব্যারেটও লিখতে পারেনি।

মায়ের সোফাটার এক পাশে বসে বেবি সুশান্তর দিকে চেয়ে বললে,—আপনাদের কাগজে লেখা কি এমন একটা কঠিন টেষ্ট পেরিয়ে তবে ছাপা হয় নাকি? তার মর্যাদা ধার্য হয় কি সভ্যদের ভোটের ওপর? আপনি সম্পাদক, আপনি একাই কি যথেষ্ট নয়?

সুশান্ত সামান্য মুরুব্বিয়ানা করে বললে,—তোমার প্রতিভাকে তুমি ইচ্ছে করলেই চেপে রাখতে পারো নাকি? আর ভাবছ সে-মিষ্টান্নে ইতরজনের অধিকার নেই?

রুমালে ঘাড় রগড়াতে-রগড়াতে উমাপতি বললে,—এর আর কোনো টেষ্ট নেই, মিস্ সোম। আমরা সবাই নির্বাক হয়ে একবাক্যে এর প্রশংসা করছিলাম। *Really.*

ডাক্তার সাহেব গদ্‌গদস্বরে বললেন,—Supreme. আপনার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে correspondence করা উচিত।

মিসেস সোম অবিশ্যি তাঁর মুখমণ্ডল আহ্লাদে আটখানা করে রইলেন, কিন্তু বেবির মুখে রাগের ছিটে তাকে কলঙ্কিত চাঁদের মতোই সুন্দর করে তুলেছে। খানিকটা মাকে নেপথ্যে ও খানিকটা জনতাকে পরোক্ষে সম্বোধন করে বললে,—না, এ ভয়ানক অন্যায়, ভয়ানক কুৎসিত। কৌরবের সভায় আমার কবিতার মতো দ্রৌপদীও স্বয়ং লাঞ্ছিত হয়নি। আমি চললাম, মা। বলে তখ্‌নি আবার উঠে পড়বার একটা অসহিষ্ণু ভঙ্গি করলে।

কুবের দেখলে এতোক্ষণ এই সব বাক্‌বিতণ্ডা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিনয়ের মাঝে বেবির এই রাগটাই হচ্ছে সত্য, অকৃত্রিম। কিন্তু এখ্‌নি সে চলে গেলে ঘর আবার অন্ধকার হয়ে যাবে, নির্বাত, নিষ্প্রাণ আবহাওয়ায় আর নিশ্বাস নেয়া যাবে না।

তাকে সত্যি-সত্যি দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সুশান্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো : যেয়ো না, বেবি। তোমার সঙ্গে একজন নতুন কবির আলাপ করিয়ে দি। ইনি মিস্‌ ব্রততী সোম, আর এ কুবেরকুমার বসু।

অপ্রত্যাশিততার আক্রমণে বেবি এতো অভিভূত হয়ে পড়লো যে সে একটা অনায়াস, অভ্যস্ত নমস্কার পর্যন্ত করতে পারলো না। আর কুবের তার সিটের মধ্যে শরীরটাকে বেঁকে-চুরে দুমড়ে-মুচড়েও তার লজ্জা পারলো না লুকোতে।

তবু লজ্জা-পরিপূর্ণ, প্রগাঢ় চক্ষু তুলে কুবের দেখলো ঘরভরা এতোগুলি লোকের মধ্যে একমাত্র এই মেয়েটির দিকেই সহজ করে তাকানো যায়, হয়তো বা দু'চোখ ভরে তাকানো যায়। এই মেয়েটিই একমাত্র জ্যান্ত একটা মিউজিয়াম নয়। মিসেস সোমের দুহিতা, তায় কবিতা লিখে, দেখতে পেলে দু' চোখ না-জানি কেমন ঝলসে যাবে। কিন্তু এ যেন মিসেস সোমের মেয়ে নয়, বাঙলাদেশের মেয়ে। দীর্ঘ একহারা চেহারা, অলেখমলিন কবিতার নিঃশব্দ ভাবের মতো পবিত্র। পরনে সাদাসিধে আটপৌরে একখানা শাড়ি, হাতে-গলায় স্বল্প দু'টি গয়না, মাথার ফাঁপানো চুলের বোঝাটা ঘাড়ের উপর আলগোছে একটু নেমে এসেছে। সব মিলিয়ে নিজের শরীরটার বিজ্ঞাপন দিতে সে নারাজ, তার আত্মার পরিচয় তার নিবিড়াভ কালো-অতল দুই চক্ষুতে। তার মার চেয়ে সে কতো আধুনিক। বাইরের সে 'পিপাসার্ত', রুক্ষ রৌদ্র নয়, ঘরে-এসে-পড়া খানিকটা জ্যোৎস্নার মতো শীতল, পরিতৃপ্ত। এই তৃণশষ্পহীন বালুকার মাঝে সে যেন একরতি একটা ঝিনুক। ধুনোর গন্ধে যেমন ভূত পালায়, তেমনি তার এই প্রখর পরিচ্ছন্নতায় ঘরময় সমস্ত আড়ম্বর এলো বিবর্ণ হয়ে। এই দুর্গম অরণ্যের শিয়রে চাঁদের এই উদয়ের পথ তৈরি হলো কি করে? এতো নির্মল, এতো নিরীহ, তবু তাকে কুবেরের মনে হলো Horace-এর সেই যাদুকরী Canidia, হাতে করে যে আকাশের চাঁদ ধরে আনতে পারতো। এদের সভায় সে সহজ জীবনের স্বাদ ও সুর নিয়ে এসেছে। কুবেরের লেখা তার ভালো লাগে এই মোহে সে দেখলো তাকে অনেক সুন্দর করে। তবু মিসেস্‌ সোমের কন্যারূপিনী replica হলেই বোধহয় সে বেশি আশ্বস্ত হতে পারতো, তাহলে নিজেকে করতে পারতো সে বিচ্ছিন্ন, নিয়ে যেতে পারতো আত্মার গহন নির্জনতায়। কিন্তু আর তার চুপ করে থাকা যেন সম্ভব নয়; বেবির বাসা

যেন একান্ত করে তারই ঘরের কাছে। সে যেমন অগাধ চোখে তার দিকে চেয়ে রয়েছে তার মনে হলো বলে ওঠে : তুমি কেন আর পাঁচজনের মতো কবিতা লিখতে যাবে? তুমি লেখাবে, তুমিই হবে মৃন্ময়ী কবিতা।

বেবি অবশ্যি তখনই বসে পড়লো, কিন্তু উপস্থিতিটা মার আড়ালে চাইলো না আর লুকিয়ে রাখতে। রাগ পড়ে গিয়ে চেহারায় এলো নরম একটা আভা, আয়ত চোখের দৃষ্টি দু'টি আরো গভীর হয়ে উঠলো। এই কুবের! ভেবেছিলো কি-না জানি ষণ্ডা-গণ্ডা-গোছের লোক—এখন দেখছে বয়সে তার চেয়ে কতোই বা আর বড়ো হবে! এরি কলমে কিনা ঝক্‌ঝক্‌ করছে তলোয়ার, ঐ হাড়-মাংসের স্তূপের অন্তরালে এতো আগুন! এতো কিনা তার শক্তি যে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কার, ধর্ম সব পাঠাতে বসেছে রসাতলে। এর কাছে সমস্ত প্রৌঢ়ত্ব মুহ্যমান। না, তখন তাকে উপযুক্ত প্রশংসা করা হয়নি যখন মা'র সঙ্গে, তাঁর সহমর্মীদের সঙ্গে করেছে সে তর্ক; সে ইচ্ছে করেই হয়তো তখন হেরে গেছে - তখন কুবেরকে সে চোখে দেখেনি, তখন জানতো না সে তার বয়েস, জানতো না এই তার দুর্বল, শিশুর মতো সরল চেহারা। এই কুবের—শেলির কথায় কীট্‌সের মতো যে 'had gazed on Natures naked loveliness Actaeon like'! এ এই কঙ্কালের স্তূপের মধ্যে, হাওয়ায়-ওড়া বীজকণার মতো কোত্থেকে এসে ছিটকে পড়লো? কোথায় পাবে এ জল, কোথায় খুঁজবে এ মাটি?

তারপর, সেদিনের সভা যখন ভাঙলো, জামার ভাঁজ টান করতে-করতে সবাই যখন উঠে পড়েছে, লোকনাথ যখন সবাইর জুতো এগিয়ে দিতে ব্যস্ত, দরজার এপারে বেবি কুবেরের সঙ্গে কথা বললে; বললে—আপনি এখানেই আছেন তাহলে?

কুবের সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে বললে,—হ্যাঁ।

—এখানেই থাকবেন?

—আশা করি। যাবার আর জায়গা নেই।

আর কি বলা যায় কিছু ভেবে না পেয়ে বেবি হঠাৎ বলে ফেললে,—আপনার লেখা আমার খুব ভালো লাগে।

দরজার ওপারে চলে আসতে আসতে কুবের সস্মিত মুখে বললে,—আর অনেকেরই আবার লাগে না। কোন পক্ষ নেবো নিজেরই বুঝে ওঠা কঠিন।

—কোন পক্ষ আবার নেবেন? বেবি হেসে উঠলো: সব সময় নিজের পক্ষ। নিজের বিবেক যা বলবে তাই সত্যি। তার ওপর আর কোনো কথা নেই।

ঘুরে গিয়ে সে বললে,—তুমি আরো কোথাও যাবে নাকি, মা? সোফারু তোমার জন্যে গাড়ি নিয়ে এসেছে। আমি চললাম বাড়ি। বলে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে সে এই বাড়িরই দোতলায় উঠে গেলো।

॥ নয় ॥

এই বাড়িরই দোতলায় উঠে গেলো, এই বাড়িরই পাশের দিকের বিস্তৃত একটা অংশ মিসেস সোমরা ভাড়া নিয়েছেন। মিসেস সোমকেই বেশি করে প্রাধান্য দিচ্ছি, কেননা সংসাররঙ্গনাট্যে এই অঙ্কে মিস্টার সোমের মাত্র এখন কাটা-সৈনিকের পার্ট। ছিলেন এক্‌জিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনিয়ার, বছর খানেক হলো রিটায়ার করে কলকাতায় এসে বসেছেন থিতিয়ে। বালিগঞ্জের দিকে বাড়ি হাঁকাবার সরঞ্জাম চলছে, তারি বিলিব্যবস্থায় যা তিনি একটু সচেতন। সংসারের বল্‌গা মিসেস সোমেরই দুই হাতে ধরা, তিনি তাঁর চেহারায় ও কণ্ঠে ইচ্ছেমতো সবাইকে ওঠ-বোস করাচ্ছেন। স্বামী তাঁর হাতে ক্রিকেটের একটা বল মাত্র—যেমন খুশি স্পিন্‌ করে, ব্রেক দিয়ে তিনি সে-বল্‌এর ডেলিভারি দিতে পারেন। উইকেটে কেউ দাঁড়িয়ে তাঁকে বাধা দেবার নেই বলেই প্রতি বল-এই আউট। এমন-কি নতুন বাড়ির প্ল্যান পর্যন্ত তিনিই দিয়েছেন ছকে। নৌকোর হাল তিনি কোন দিকে বেঁকাবেন তাতে নদী-স্রোতের পর্যন্ত কোন নির্দেশ থাকবে না—এমনি উদ্দাম তুলে দিয়েছেন তিনি পাল। মিসেস সোম দ্বিতীয় পক্ষের, স্বামীর সঙ্গে তাঁর প্রায় পনেরো-কুড়ি বছরের ব্যবধান। সময়টা তখনো এ-যুগে সরে আসেনি, তাই অনায়াসে মিস্টার সোম পঞ্চদশী পাত্রী পেয়ে গেলেন, ধরতে গেলে তাঁর বয়েসই বা তখন কতো! পাত্রী পেলেন গরীবের ঘরের, সেই আঙুলই এখন ফুলে এমন কলাগাছ হয়েছে। সবতাতে তাঁর সমান দাপট।

মিসেস সোমের ছেলে, ঐ একমাত্র ছেলে,—কী হবে তার নামে—গ্লাসগোতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, এ-গল্পে সে উহ্য রইলো। আর মেয়ের মধ্যেও এই বেবি। তাঁরা মফস্বলে ঘুরেছেন, কিন্তু বেবিকে রেখেছেন ডায়োশেশানে আগাগোড়া। দিয়েছেন তাঁর হাতে অবাধ স্বাধীনতা – ডায়োশেশানের মেয়ের পক্ষে স্বাধীনতা যা বোঝায়। বোর্ডিঙের দেয়াল দিয়ে সে ঘেরা, তার স্বাধীনতা বেশভূষার পেখম-বিস্তারে বিস্ফারিত না হয়ে মনে এনেছে উদ্দাম মৌলিকতা, নতুনত্বের ছটা, অভাবনীয়তার গমক। তার নতুনত্ব শাড়ি-ব্লাউজের বিকট-প্রকট প্যাটার্নে নয়, কায়দা-কানুনের সদ্য ও উগ্র আধুনিকতা নয় – নতুন সে নিজে: নতুন তার একেকটা ভাব, একেকটা চিন্তা, একেকটা আকস্মিকতা। তার একেকটা কথায় যেমন দ্যুতি, তেমনি ধার, একেকটা কাজে সমস্ত পারিপার্শ্বিকতারই রঙ যায় বদ্‌লে। তাকে নিয়ে মিসেস সোম হাঁপিয়ে উঠেছেন। ছুটি-ছাটায় টুকরো-টুকরো করে তিনি তার দেখা পেতেন বটে, কিন্তু সে-দেখায় তিনি তাঁর নিজেরই আত্মতৃপ্ত অহঙ্কার-রঞ্জিত চেহারাটাই দেখতেন শুধু, কোনোদিন বিষয়বস্তু হিসেবে মেয়েকে তাঁর নেড়ে-চেড়ে দেখবার সুবিধে হয়নি। কলকাতায় এসে তিনি প্রথম আয়ত্ত করলেন মেয়ে তাঁর সে-যুগের ফ্যাসানের আদর্শকে কতো দূরে ফেলে এসেছে। এরা এখন বিলাসের অর্থ করেছে দেহের জড়তা নয়, দেহের ব্যবহার। এদের অস্তিত্ব শুধু আর শরীরে পর্যবসিত নয়, তাতে মন-নামক এক ব্যাধি দিয়েছে

দেখা,—সেটা কিন্তু তাঁদের যুগে অচল ছিলো। এদের দিন শুধু কাটে না, এরা দিন কাটায়; এরা শুধু নিশ্বাস ফেলে না, বাঁচবার জন্যে ছটফট করে। এরা একান্ত করে মেয়ে হবার আগে মানুষ হবার জন্যে করে তপস্যা। হাত বাড়িয়ে এ-মেয়ের তিনি নাগাল পান না, যতোই তার পাখা কাটবার জন্যে তিনি নানারকম অস্ত্র নিয়ে আসেন, চঞ্চল একটা পাখির মতো কোন ফাঁকে আবার সে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়।

পড়ে সে থার্ড-ইয়ারে, তা পড়ুক, কিন্তু শুভক্ষণ এসে গেলেই তিনি তার বিয়ে দিয়ে দেন। এবিষয়েও মেয়ে আধুনিক, বিয়ে করতে সে দস্তুরমতো সম্মতির ঘাড় হেলায়। তার এতো অস্বাস্থ্য নয় যে সে বলবে জীবনের অতিরিক্ত কোনো মহত্তর উদ্দেশ্যের জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছি বা জীবনের ঊর্ধ্বে শূন্যগগনে বিচরণ করবার জন্যে আমার সহজাত একটা প্রবৃত্তি আছে: জীবন ও জীবনের আনুষঙ্গিক সব অনুষ্ঠানের সহজ সমন্বয়ের মাঝেই মানুষের সম্পূর্ণতা। বিয়ে সে করবে, কিন্তু দরজার গোড়ায়ই পাত্র দাঁড়িয়ে আছে, দোতলার পার্টিশানের দরজাটা খুলে একটা বারান্দা পেরোলেই সুশান্তর ঘর। রক্তের মাঝে টক্সিনের মতো এ-আইডিয়াটা মিসেস সোম তাঁর মনে-মনে পোষণ করছেন অনেক দিন থেকে। মেয়ের রাশটা তাই তিনি আলগা করে দিয়েছিলেন এই সুশান্তরই ঘরের মুখে। চারদিক থেকে এমন একটা আবহাওয়া তৈরি করে এনেছিলেন যে কথাটা কেবল যেন একটা মৌখিক উচ্চারণের অপেক্ষা রাখছে। মিসেস সোম দেখলেন সংসারে তাঁদের বড়লোকিত্ব আর-আর কারুর তুলনায় লণ্ঠনের কাছে সামান্য একটা জোনাকি, এবং এই আর-আর কারুর মধ্যে সুশান্ত একেবারে সামনের লাইনে এসে বসেছে। উপর-উপর যাচাই করে দেখলেন দু'জনে বেশ খানিকটা কাছাকাছি ঘেঁষে এসেছে—সুশান্তর আঁচে বেবির কলমে ফুটেছে কবিতা, আর বেবির ছোঁয়াছে সুশান্তর কাব্যে এসেছে নারী। শুধু পরস্পরকে তাড়া দেবার মতো দু'জনের মধ্যে একটু-খা উত্তাপের অভাব: মেয়ের দিক থেকে বি-এটা কাটিয়ে ওঠবার যা একটু দেরি, আর সুশান্তর দিক থেকে তার কাগজটা উঠে যাবার যা একটু সময়। মিসেস সোম হিসেব করে রেখেছেন বড়ো জোর আর এক বছর। কোনো নেশা নিয়ে মাতামাতি করা কোনো সুস্থ ভদ্রলোকের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

কথার সূচীমুখে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে মা বেবির মনে আস্তে-আস্তে এই মদির বিষ সংক্রামিত করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, বিয়ে যখন তার করতে হবেই (আসলে করবেই-র একটা সবিনয় মেয়েলিপনা), তখন, সুশান্ত এমন কী মন্দ পাত্র। বিদ্যায় বিলেত-ফেরত, টাকা পয়সার একটা আস্ত বাণ্ডিল। আর চেহারা? পুরুষ-মানুষের অতো রূপ দেখলে সহসা কেমন-একটা ভ্যাবাচাকা ভাব আসে, তা, সে তার নখাগ্র পর্যন্ত ভদ্রলোক। মনে টাটকা একটা ঝাঁজ আছে, সেটা ছিপিখোলা শিশির এসেন্সের ঝাঁজ নয়, বিলিতি উগ্র একটা ফুলের, এবং সে-ফুল, বলতে গেলে, স্বাভাবিকই। কবিতায় তার ভাবের চেয়ে শব্দসম্পদ যদিও বেশি, তবু কিছু সে একটা নিজে সৃষ্টি করে, পরের সঞ্চিত কথার পুনরাবৃত্তি করে না! ব্যাপারটা বিয়ে বলেই বেবিকে একটু খুঁটিয়ে দেখতে হচ্ছে—তা, সব নম্বর যোগ দিলে সুশান্ত অবলীলায় ফার্স্ট ক্লাশেই উঠে আসে বৈ কি। তবে একটা কথা বেবির

খুব মনে হয়, সুশান্ত এমন পাত্র, যার সঙ্গে ঘটনাচক্রে বিয়েটা ঘটে গেলে কিছুই আপত্তি করবার থাকে না। ঘটে গেলে ; সাধ করে গায়ে পড়ে নিজে ঘটালে নয়। মনের থেকে তেমন-একটা কিছু মত্ততা আসে না, কিন্তু বিয়েটা একবার হয়ে গেলে আর বলবার কিছু নেই—নিটোল, পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা। আর, আসলে এই নিশ্চিন্ততাই হচ্ছে বিয়ের লক্ষ্য। বেবি দেহে-মনে এখন এতো নিশ্চিন্ত যে সুশান্তর ঘনতরো সান্নিধ্যেও তা সে ভুলে থাকে, মনে পড়ে, মা যখন মাঝে-মাঝে হঠাৎ মনে করিয়ে দেন।

খানিক আগে সুশান্ত এসেছিলো বেরোবার পোষাকে। বারান্দায় ইজিচেয়ার টেনে পড়ন্ত দিনের আলোয় বসে বেবি বই পড়ছে। অদূরে আরেকটা চেয়ারে মিসেস সোম একটা-কি সেলাই নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন—এখুনি উঠে পড়বেন ক্ষিপ্র আঙুলে সেই আভাস।

—চলো, নিউ-এম্পায়ারে আজ শ'র Mrs. Warren's Profession দিয়েছে। এলানো চাদরের একটা প্রান্ত বাঁ হাতে ফাঁপাতে ফাঁপাতে সুশান্ত বললে,—তোমার টিকিট কেটেছি। পরের উইকে আবার Apple Cart, যাবে তো, ওঠো।

সেলাই রেখে মিসেস সোমই আগে উঠলেন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবে বৈ কি।

চেয়ারের উপর হাত তুলে দিয়ে ও মেঝের ওপর পা টান করে হাসিমুখে বেবি বললে,– আর কেউ যাচ্ছেন ?

সুশান্ত বললে,—দেখি আর-আর কে আসে। অনেকেই তো কথা দিয়েছে যাবে বলে।

চোখে লজ্জার একটু আভা এনে বেবি জিগ্‌গেস করলে : কুবেরবাবু যাচ্ছেন না ?

—না, না, ও যাবে কী ! ক'দিন পরেই ওর পরীক্ষা।

—কে যাবে না যাবে তাতে তোর মাথাব্যথা কেন ? মিসেস সোম নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে তাঁর মুখ গম্ভীর করে তুললেন : তোকে সুশান্ত নিয়ে যেতে চাইছে, ব্যস্। নে, চট্‌পট তৈরি হয়ে নে।

—বলো কী মা ! বেবি তার ভুরু বাঁকিয়ে বললে,—ও-বই যে মা, এককালে suppressed হয়েছিলো।

খবরটা বেবি জানে বলে সুশান্ত বরং প্রথমটা খুশিই হয়েছিলো। বললে,– সে-ban আর এখন নেই !

—তবে আর কি। মিসেস সোম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : আর দেরি করে কাজ কি তবে ?

হেলানো ভঙ্গি ছেড়ে বেবি উঠে বসলো ; বললে,—সে ban উঠে গেলে কী হবে মা, বই তেমনি আছে। বার্নাডশ'র ভারি ঝাঁজ, গরম মশ্‌লায় গিস্‌গিস্ করছে। (সুশান্তর দিকে চেয়ে) আসছে উইকে Apple Cartও নয়। সেখানে রাজামশায় মেঝের ওপর গড়াগড়ি দিয়ে যে গোলমাল সুরু করেছেন, অসহ্য।

—বলো কী বেবি ! সুশান্ত এখন থেকে অখুশি হতে শুরু করলো : শ' হচ্ছেন যাকে বলে ঋষি।

—তবু বই তো তাঁর banned হয়েছিলো। হাসির ছটায় বেবির দাঁত এবার

ঝকঝক করে উঠলো : এখন হ্যাভলক্ এলিসও তো ঋষি। ক'দিন বাদে লরেন্সও হয়তো ঋষি হয়ে যাবেন।

মিসেস সোম মুখিয়ে উঠলেন : তোর আর অতো বিদ্যে ফলাতে হবে না। তোকে বলছে, তুই যাবি। নে, ওঠ, তুই এসবের কী বুঝিস ?

—এসব কিছু বুঝি না, বুঝতে যাবো সিনেমা ! এবার বেবি শব্দ করেই হেসে উঠলো। তারপর সুশান্তর মুখের দিকে চেয়ে মুখের আভা সে অনুনয়ে স্তিমিত করে আনলো : আজ হাতে আমার একটু কাজ আছে, আরেক দিন যাবো না-হয়। আজ বন্ধুরাই তো আপনার সঙ্গে আছেন। আমি আজ—গলাটা ছোট করে মুখখানি সে প্রায় করুণ করে তুললো।

সুশান্তর পক্ষে তাই যথেষ্ট। ছোট্ট একটি বেশ বলে তক্ষুনি সে চলে যাচ্ছিলো, মিসেস সোম একটা অতিকায় ঘাই মেরে উঠলেন তোর আবার আজ কাজ কী শুনি ? বসে-বসে তো একটা বই পড়ছিস শুধু। তবু সুশান্ত সত্যি চলে যায় দেখে তিনি দু পা তার পিছু নিলেন : এক পেয়ালা চা খেয়ে যাবে না, সুশান্ত ?

সুশান্ত ম্লান হেসে, কব্জির ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে,—আজকে আর সময় হবে না।

সুশান্ত নিচে নেমে গেলে মিসেস সোম আবার আলোড়িত হয়ে উঠলেন : কী এমন তোর ঢেঁকিতে পাড় দিতে হচ্ছে যে যাওয়ার তোর সময়ই হলো না একেবারে ? বসে-বসে কী এমন তুই দেশোদ্ধার করছিস ? কী তোর কাজ শুনি ?

ইজিচেয়ারে পিঠটা ছেড়ে দিয়ে বসবার ভঙ্গিটা বেবি ততোক্ষণে শিথিল করে এনেছে। তেমনি শিথিল সুরেই সে বললে,—হাতের বইটা শেষ না করে কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না, মা।

—কী এই বইটা ? কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস সোম ছোঁ মেরে বেবির হাত থেকে বই কেড়ে নিলেন। বইয়ের বাইরেটা যাতে তাঁর চোখে না পড়ে সেই জন্যে তাকে একটা কাগজের মলাট দিয়ে নিয়েছিলো, কিন্তু ভিতরের নাম-ধাম দেখেই তাঁর চক্ষুস্থির।

—হ্যাঁ মা, কুবেরবাবুর সেই বইটা। ভয়ের চেয়ে লজ্জাই তার বেশি হচ্ছে।

—এ আবার তুই পেলি কোথায় ? মিসেস সোম অতি কষ্টে কথা কইতে পারলেন : এ না আমি সেদিন পুড়িয়ে ফেললাম।

বেবি গম্ভীরমুখে বললে,—সেটা আর কোথায় পাবো বলো, এ আমি কিনে এনেছি।

—কিনে এনেছিস ? পয়সা খরচ করে ? এই নোংরা, অপদার্থ, রাবিশ বইটা ? নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে মিসেস সোম বইটা মেঝের উপর ছুঁড়ে মারলেন।

বেবি উঠে পড়লো। বই কুড়িয়ে নিয়ে বললে,—হ্যাঁ, বইটা এবার খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ছিলাম—আমি বিশেষ কী আর বুঝি বলো, তবু কতোগুলি মারাত্মক ত্রুটি আমার চোখে পড়ছিলো। কিন্তু পুড়িয়ে ভস্মসাৎ করে দেবার মতো নয়।

—নয় ? মিসেস সোমের সর্বশরীর আতঙ্কে শিউরে উঠলো : ছুঁলে পর্যন্ত মন অশুচি হয়ে যায়।

—কিন্তু মা, বেবির ঠোঁটে দুষ্টু একটি হাসি উঁকি মারলো : এই বইটি যদি হুবহু বায়োস্কোপে দেখাতো, তবে আমাকে যেতে দিতে তুমি কক্‌খনো আপত্তি করতে না।

মিসেস সোম এবার অন্যদিক থেকে আক্রমণ করলেন : এ তো তোর পড়া বই, আবার কিনতে গেলি কোন আক্কেলে? পয়সা তোর বেশি হয়েছে ? হাতির তুই পাঁচ পা দেখেছিস ?

—যাই বলো মা, সুশান্তবাবুর ঐ বায়স্কোপের সিটের চেয়ে কম দাম। বইয়ের কোণমোড়া পৃষ্ঠাগুলি সযত্নে ঠিক করতে-করতে বেবি বললে : একটা বই দু-দুবার পড়ানো লেখকের কম কৃতিত্বের কথা নয়, মা।

—একবার পড়তেই প্রাণান্ত, তায় আরেকবার ! মিসেস সোম প্রায় একটা মূর্চ্ছা যাবার ভঙি করলেন।

বেবি বললে,—হ্যাঁ, এবার লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আরেকবার বইটা ভারি পড়তে ইচ্ছে করলো, মা। মনে হলো সেবার যেন ততো তলিয়ে পড়িনি। সেবার পড়েছিলাম, বেবি এইখানে একটু হাসলো : প্রধানতো প্রশংসা করবার জন্যে, এইবার খুঁজে দেখছি নিন্দে করার কিছু পাই কি না।

—তার জন্যে কষ্ট করে আবার আগাগোড়া পড়তে হয় নাকি ?

—হ্যাঁ, নিন্দার অস্ত্রগুলিই আগে শানিয়ে রাখা উচিত। বেবি সামান্য চঞ্চল হয়ে উঠলো : যদি কখনো তাঁর সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ হয়, ভদ্রলোককে যেন প্রথমে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে পারি। পরে না হয় একটু প্রশংসার প্রলেপ দেয়া যাবে।

—যে এ-রকম বিচ্ছিরি বই লেখে তার সঙ্গে তুই যাবি তর্ক করতে ?

যে-বইর কোনোরকম সাহিত্য-ভাণ আছে, মা, সে-বই কখনো বিচ্ছিরি হতে পারে না, বাজে হ'তে পারে, একশো বার বাজে হতে পারে। বেবি বিজ্ঞের মতো মুখ করে বললে,—কিন্তু আমার মতে, যদিও আমার মত আমারই মত, এ-বই কক্‌খনো বাজে নয়, মা।

—বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি, smutty, stenchy—একশোবার বাজে। মিসেস সোম যেন একটা শারীরিক জ্বালা অনুভব করছেন : যার লেখার সংযম নেই, সৌন্দর্যবোধ নেই--

বেবি অসহিষ্ণু হয়ে বললে,—ও-দুটো কথার মা, কোনো খাঁটি অর্থ নেই, নিছক মন-গড়া দুটো সাহিত্যিক slogan। সমালোচনায় ওদের প্রয়োগ এতো সঙ্কীর্ণ যে ওদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা চটে গেছে।

মিসেস সোম ঝামটা মেরে উঠলেন : আবোলতাবোল তুই কী বকছিস, বেবি ?

—বলছি, চুরি করো, জোচ্চুরি করো, মিথ্যে কথা বলো, লোক ঠকাও, চরিত্র কথাটার যেমন একটা প্রাদেশিক অর্থ, সংযমেরো তাই। তুমি উপন্যাসে পাঁচ পাতা ধরে প্রকৃতি বর্ণনা করো, গল্প লিখতে বসে তাকে একটা ইতিহাস বানিয়ে তোলো, সংযম নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠবে না। আর যদি এক লাইন তুমি কোথাও —বেবি একটা প্রকাণ্ড ঢোক গিললো : আর সৌন্দর্যবোধ ? আমরা আমাদের

সংস্কারের জালে জড়িয়ে গিয়ে যা অত্যন্ত কুৎসিত, সঙ্কীর্ণ করে দেখছি, তারি মধ্যে একেকজন দ্রষ্টা কী সৌন্দর্য, কী মহিমা আবিষ্কার করে গেছেন, মা। মনে করো সেই বৈষ্ণব কবিদের, মনে করো আমাদের এই প্রাচীন হিন্দু ধর্ম আর সভ্যতা।

কথার দীপ্তিতে মিসেস সোমের দুই চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেলো। তিনি আর কথা পেলেন না, চোখ কপালে তুলে বললেন,—তাই বলে তুই এসব নিয়ে ঐ ছোঁড়াটার সঙ্গে তর্ক করতে যাবি নাকি ?

—গেলাম-ই বা। আমি কি যথেষ্ট বড়ো হইনি, মা ? বেবি তার মায়ের দিকে দু পা এগিয়ে এলো : তোমাদের যুগ থেকে ভাগ্যক্রমে সরে এসেছি বলে কি আমার বয়েস বাড়েনি ? মনে করো তো তোমাদের যুগে আমার এই চেহারা। বেবি খিলখিল করে হেসে উঠলো : চোখ দুটো খুলে রাখতে আর দোষ কী ? জীবনকে আমরা ভয় করবো কেন, মা ? আর যে সমস্তক্ষণ এই জীবনের বিরুদ্ধে মুঠো উঁচিয়ে আছে তাকেই বা কেন আমরা সম্মুখযুদ্ধে হারিয়ে দেবো না ?

—Rot ! Rot ! Squeamish nonsense ! মিসেস সোম গরগর করতে-করতে চলে গেলেন। নিবন্ত দিনের আলোয় বেবি আবার বই নিয়ে বসলো।

॥ দশ ॥

পরীক্ষার আর মোটে এক সপ্তাহ বাকি, কিন্তু, পড়বার সময়ের কোনো অভাব নেই পৃথিবীতে। যদি হৃদয় একবার কথা কয়ে ওঠে, তার মুখ বন্ধ করে রাখে কার সাধ্য ?

গদ্য—গদ্যই ছিলো কুবেরের এখনকার পৃথিবী : তার চারপাশের অনাবৃত, রুক্ষ বাস্তবতার প্রতিরূপ। জীবনকে সে দেখতে শিখেছিলো এই নির্লজ্জ ও অতিব্যক্ত স্পষ্টতার মধ্যে। গদ্যই ছিলো তার হাতে নিষ্ঠুর শাণিতাস্ত্র—অমোঘ—ও অদম্য, তাই চালিয়ে সে জীবনের চারদিককার স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনটা দিচ্ছিলো ছিঁড়ে, যেখানে যেটুকু সে মিথ্যার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিলো, তাই সে দিচ্ছিলো টলিয়ে। যা কিছু কৃত্রিমতা, যা কিছু অস্বাস্থ্য, তাই ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্যে সে তার তীরগুলি কটু তীক্ষ্ণ বিষতিক্ত করে তুলছিলো। এবং তারি নেশায় সে নিজে ছিলো জর্জর। তাই যখন সে আবির্ভাব-এর চারপাশে জীবনের এমন চমৎকার কতোগুলি আবির্ভাব দেখলে, তার তূণীরের সবগুলি বাণ একসঙ্গে নিসপিস করে উঠলো। চীনেমাটির কতোগুলি ঝকঝকে বাসন, রঙচঙে কতোগুলি ঠুনকো ক্ল্যারেট-জাগ—ইচ্ছে হচ্ছিলো শক্ত মাটির উপর ছুঁড়ে মেরে তাদের সে দেয় গুঁড়িয়ে : বহুরূপীর মুখোসের তলা থেকে বার করে দেয় তাদের স্বাভাবিক বীভৎসতা। সুশান্ত, তার সাহিত্যিক অভিভাবক, আবার তার গদ্যের উপর চটা—সে-গল্পে কুবের স্বয়ং সুশান্তকেও ক্ষমা করতো না হয়তো।

কিন্তু আকস্মিক, ঘটলো আবার আকস্মিক দুর্ঘটনা। সুশান্ত যা চেয়েছিলো হলো তাই। বহুদিন পরে, কুবের আবার বহুদিন পরে তার সর্বাঙ্গের স্নায়ুতে-শিরায় কবিতার কান্না শুনতে পেলো—সে-কান্না একেবারে ঊর্ধ্বরেখ বহ্নিশিখার মতো লেলিহান। দেহ উঠলো কান্নার মতো কেঁপে, মনে ধরে গেলো কল্পনার দাবাগ্নি। তার চোখের সমস্ত চাওয়াই গেলো বদলে, জীবনের দিকে না চেয়ে চোখ পড়লো তার প্রাণের দিকে। পরের কথা আবৃত্তি করতে না গিয়ে আবিষ্কার করলো সে তার নিজের ভাষা। পরকে বিশ্লেষণ করতে না চেয়ে চাইলো সে নিজেকে উদ্ঘাটন করতে। আর ক্ষুধার তীব্রতা নয়, প্রাপ্তির পরিপূর্ণতা। কুবেরের হৃদয় বসন্তবিহ্বল অরণ্যের মতো মর্মরমুখর হয়ে উঠলো—সেই শব্দান্দোলনে নিজেরই হলো যেন তার মদির মূর্চ্ছা। কুবের যেন এতোকাল সাগর-পাখির মতো লবণাক্ত সমুদ্রের ঢেউয়ে পাখা ঝাপ্টে বেড়াচ্ছিলো, হঠাৎ সে যেন পেলো নীড়ের আশ্রয় আশ্রয়ের উত্তাপ। ঝড়ে টোল খেতে-খেতে জাহাজ যেন বন্দরে এসে দাঁড়ালো—এতোদিনে। সে একটা অভাবনীয় বিস্ময়ের কথা—এই অপ্রত্যাশিত বিলাস-সমৃদ্ধির চাইতেও তা বড়ো সম্ভার। চারদিককার এই স্তূপীকৃত সুখ-সজ্জার চাইতে মনের এই প্রকাশদৈন্যে অনেক, অনেক মাধুর্য। প্রকাশের তাড়নায় তার মস্তিষ্কে ফুটে উঠছে ভাববুদ্বুদ—তাদের উপযুক্ত রূপ দেয়া আর তার মনের মতো হয়ে উঠছে না। এতো কথা, অথচ উচ্চারণে তারা এতো অসম্পূর্ণ। মনের গুহায় তারা এতো অনর্গল, অথচ প্রবাহে এতো ক্ষীণ, এতো সংকীর্ণ। কুবের সেই উচ্ছ্বসিত প্রকাশের তাড়নায় দিনে-রাত্রে বিহ্বল, ফেনিল হয়ে উঠতে লাগলো, অথচ মানুষের ভাষার শাসনে, তার অসম্পূর্ণ অস্ফুটতায় পায় না সে একটা অবারিত বিস্তার, একটা উদরপূর্তির শারীরিক তৃপ্তি। না পাক্, সমস্ত আগুন থাক তার মনে, সে শুধু দেবে তাপ : সমস্ত কথার সমুদ্র দুলে উঠুক তার মনে, সে শুধু দেবে একটা সঙ্কেত।

একটা কবিতা শেষ করে বার-বার আবৃত্তি করে প্রায় তা মুখস্ত করে ফেলে কুবের ক্লান্ত হয়ে ইজিচেয়ারটায় এসে বসেছে। প্রায় বিকেল, দিয়েছে একটু ঝিরঝির হাওয়া, তার স্বাদ পাবার জন্যে ঘুরন্ত পাখাটা সে দিয়েছে তখন বন্ধ করে। ঝাঁজালো রোদে বাইরে যখন রাস্তার পিচ্ উঠেছে প্রায় কাদার মতো নরম হয়ে, তখন খসখসের বেড়ায় রেই রোদ ঢেকে, গরম আবহাওয়াটা পাখার ঝাপ্টায় ঠাণ্ডা করে সারাক্ষণ বসে সে লিখেছে কবিতা—প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চল্লিশটি মোটে লাইন। কতো তার কথা, তার অনুপাতে কতোটুকু তার পরিচয়। তবু সব নতুন কথার স্বাদে কুবেরের শরীর-মন তৃপ্তির লাবণ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, সব নতুন কথা, নতুন দেশে এসে নতুন সূর্যোদয়।

হঠাৎ পরদাটা আলগোছে একটু সরিয়ে কে জিগ্গেস করলে : আসতে পারি ?

কণ্ঠস্বরে যতো নয়, কুবের তাকে চিনতে পারলো পরদার উপর তার আঙুলের ক'টি বিশীর্ণ শিখা দেখে। তক্ষুণি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুবের বললে,—আসুন।

বেবি ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে—কী, আজ সভায় যাবেন না ?

কুবের একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে,—বসুন। আপনি কি তারি জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন নাকি?

—আমার চেহারায় তেমন একটা কিছু উৎকট ঘটা দেখছেন নাকি? চেয়ারটা জানলার দিকে টেনে বেবি বসে পড়লো।

প্রসাধনের মধ্যে বেবি বিকেলের দিকে আবার নতুন করে স্নান করে এসেছে—এবং আশ্চর্য, মাথার চুল ভিজিয়ে। শিগ্‌গির শুকোবার কথা নয়, চুলগুলি পিঠের উপর রয়েছে ছড়িয়ে, পাখার হাওয়ায় হচ্ছে এলোমেলো। মুখে-গায়ে অম্লান, শীতল একটি পরিচ্ছন্নতা—পরনে সেই একটি সাদা, কুণ্ঠিত শাড়ি। বেবি যেন একই সময়ে উজ্জ্বল ও বিষণ্ণ, শুভ্র ও ধূসর—একই সময়ে সে যেন খানিকটা শূন্য হয়ে আবার মাটি, খানিকটা মানুষ হয়ে আবার মায়া। মেয়ের পক্ষে তার দৈর্ঘ্য একটু বেশি, তাঁর শরীরের কৃশতা পুষ্টির ক্ষীণতা নয়, লাবণ্যের ধারা. এবং গ্রীবার ভঙ্গিটি তাঁর উদ্ধত, প্রায় ক্ল্যাসিক্যাল। মুখের ডৌলটি নিষ্ঠুরতায় তীক্ষ্ণ, চোখে যেন ঠিকরে পড়ছে ধারালো উপহাস। বেবির সামনে থেকে নিজেকে কুবেরের ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিলো, প্রায় ঈগলের থাবায় নিরীহ একটা পাখির মতো। তার জীবনে এ হচ্ছে এমন এক মেয়ে যাকে দেখে মনে পড়ে মৃত্যুর কথা, জীবনের অগাধ অপরিপূর্ণতার কথা। এমন এক মেয়ে, যাকে, একে একে দুই, এমন একটা অঙ্কের তথ্যের মধ্যে নিয়ে আসা যায় না: যাকে দেখতে হলে নিজেরই অচরিতার্থতা আগে পড়বে চোখে।

কি করবে কিছু বুঝতে না পেরে কুবের একটু ইতস্তত করছিলো, বেবি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বললে—আপনি যাবেন? চলুন।

কুবের ইজিচেয়ারে বসে হাসিমুখে বললে,—না, আমার এখন পরীক্ষা। আমার এখন বাজে কাজে মন দেওয়া উচিত হবে না—সুশান্ত-দা হুকুম দিয়েছেন।

—বলেন কি! বেবি চোখ বড়ো করে বললে,—সুশান্তবাবু বলেছেন আবির্ভাব-এ যাওয়া আপনার বাজে কাজ?

—পাগল! তার চেয়ে বলতে পারেন বেদ ভ্রান্ত, মহাভারত মিথ্যে।

—তবে আপনিই বুঝি নিজে ওটাকে বাজে বলছেন? কৌতুকে বেবির চোখের তারা দু'টি নাচতে লাগলো মৃদু-মৃদু।

আমতা-আমতা করে কুবের বললে,—সাধ্য কী সে কথা বলি? সুশান্ত-দার এমনি হুকুম যে পাছে যার-তার সঙ্গে মিশে যাই আমাকে বাড়ির মধ্যে বসে একটার পর একটা কবিতা লিখতে হবে।

—কবিতা? আবার ওসব হাঙ্গাম কেন? হাওয়ায়-ওড়া চুলগুলি কানের পিঠের দিকে ঠেলে দিতে-দিতে বেবি বললে—আপনার উপন্যাস কী হলো?

—উপন্যাসের ওপর সুশান্ত-দা প্রসন্ন নন, তিনি চান কবিতা। কুবের ঢোক গিলে বললে,—আগে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে গদ্য লিখতে হতো, দেশের লোক তাইই চায় বলে। দেশের লোক কি চায় না চায় এখন তা আর আমার দেখবার নয়, সুশান্ত-দা কি চান না চান তাই আমার লক্ষ্য।

—রাজা-মহারাজাদের দরবারে স্টেট-আর্টিস্ট থাকে বলে জানতাম, বেবি কথায় সামান্য ঝাঁঝ দিয়ে বললে,—আপনি কি তেমনি সুশান্তবাবুর কারখানায় ফরমাইসি

কবি নাকি? শুধু টাকা-পয়সা দামের অতিরিক্ত কি সাহিত্যের কোনো মূল্য নেই মনে করেন?

—পাগল! কুবের হেসে ফেললো: পৃথিবীতে যা কোনো দিন লুপ্ত হবার নয় এমন সাহিত্যের টাকা-পয়সায় কখনো দাম হয় নাকি? টাকা-পয়সাই যদি তার শেষ সার্থকতা হতো, তবে অতো বড়ো-বড়ো জমিদার হয়েও কেউ আর রাত-দিন বসে কবিতা মেলাতো না।

—নিশ্চয়। বেবি ফুলন্ত একটা ডালের মতো হাওয়ায় উঠলো কেঁপে: লিখে মন যদি খুশি হয়, তবে সেই তার দাম। অন্য কেউ ফরমাজ করে বা গাল দেয়, তাতে কী যায়-আসে লেখকের? যা তার মন চায়, তাই সে লিখবে। একটা তার money-value পাওয়া যায়, ভালো, না পাওয়া যায় তো এসে গেলো ভা -- রি!

তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কুবের বললে,—যেমন আপনি লেখেন।

—ও সর্বনাশ! যেন ভয় পেয়েছে এমনি একটা ভঙ্গি করে বেবি উঠলো লাফিয়ে, বললে—মা'র মুখে আপনি সেদিন শুনেছেন নাকি? Awful trash. নাক-মুখ সিঁটকে বেবি একটা চমৎকার ভাবের অভিব্যক্তি দেখালো: ও আমার নিজের তাগিদে লেখা বলে ভেবেছেন নাকি? ও হচ্ছে অসৎসঙ্গের ছোঁয়াচ লেগে একটা কু-অভ্যাস।

—সঙ্গ ভালো কিনা জানিনে, কিন্তু অভ্যাসটা নিশ্চয়ই ভালো।

—হতো, ভালো হতো, যদি আমি তা মনের থেকে লিখতাম। বেবি ফের চেয়ারে বসে পড়লো: মা একদিন সুশান্তবাবুর কবিতার এক আঠারো পর্বী প্রশংসা শুরু করে দিয়েছিলেন, অসহ্য লাগছিলো। বললাম: অভিধানটা নিয়ে এসো মা, পাঁচ মিনিটে আমি অমন একটা কবিতা লিখে ফেলছি। বেবি হাসতে লাগলো: আপনাকে বলবো কী, কুবেরবাবু, ছোট-খাটো একটা পয়ার না ত্রিপদী কী বলে—একটা পদ্য ফাঁদতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগলো না। তারপর কেমন একটা মজা পেয়ে গেলাম। কথা যেই ফুরিয়ে যায়, অমনি অভিধানের একটা পৃষ্ঠা ওলটাই। বেবির হাসি ক্রমশ উচ্চগ্রামে উঠতে লাগলো: যে-পৃষ্ঠাটা হাতের কাছে পড়ে তারি থেকে বেছে-বেছে দু-চারটে জমকালো শব্দ কুড়িয়ে নিই—অমনি পদ্য গড়্গড়্ করে দু'চার লাইন গড়িয়ে যায় সামনের দিকে। দেখলাম, এ ভারি সোজা ব্যায়াম, ভাতের গরস-পাকানোর চেয়েও সোজা। দেখতে-দেখতে খাতার পৃষ্ঠা উঠলো ভরে। মা দেখলেন মেয়ে তাঁর চমৎকার একটা ফ্যাশান আয়ত্ত করে বসেছে!

—ফ্যাশান? কুবের চমকে উঠলো।

—হাঁ, তাছাড়া আবার কী! বেবির মুখের হাসি এবার কিঞ্চিৎ বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো: গান গাওয়া বা নাচা—যে দুটো ফ্যাশান আজকাল খুব চালানো হয়েছে, তার চেয়ে কবিতা লেখাটা অনেক বেশি নতুন, অনেক বেশি একেলে। আর যাই বলুন, গান বা নাচ—এ দুটোর চেয়ে কবিতা লেখাটা ঢের সোজা, ইচ্ছে মতো কাটাকুটি করা যায়। ঢের—ঢের সোজা আর, বুঝতেই

তো পাচ্ছেন. যা লিখতে একেবারে জলভাতের মতো সোজা, তার কী দাম!

কুবের বললে, আপনার কবিতা তো আবির্ভাব-এ ছাপা হয়েছে দেখেছি!

—তবে ও-কবিতা আর কোথায় ছাপা হবে বলুন? বেবি চোখে একটি তরল স্ফূর্তি নিয়ে বললে,—ওটা আপনার সুশান্তদার কাগজ না? সোজা কথা যতো কঠিন করে বলতে পারেন ততোই সেখানে তার দাম। সোজা করে কথা বলতে গেলে কাগজের আর হাই-ব্রাউত্ব থাকে কি করে? খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছেন তো কাগজখানা?

ইলেকট্রিক্ শ্যক্ খাওয়ার মতো হাতের একটা ভঙ্গি করে কুবের বললে,—ভীষণ। ছুঁতে আমার তো ভারি ভয় করে ব্রততী দেবী।

বেবি হেসে ফেললো। বললে,—ঐ যেমন আমার সোজা বেবি নামটাকে আপনি একটা কটমট বিকটাকার নাম দিলেন—এরাও তাই। বাঙলা যে এদের মাতৃভাষা হয়েছে, এটা একটা পাঁচপেয়ে বাছুর বা দোমাথা-ওলা পাখির মতোই প্রকৃতির একটা খেয়াল। আপনি তো তবু ছোঁন, বেবি চেয়ারের উপর জড়োসড়ো হয়ে বসে বললে, আমার তো দেখলেই গা বমি-বমি করে, গলা ফোলে. মাথা ধরে,. চোখে সর্ষে ফুল দেখি। মা তো আমাকে ধরে-ধরে তাই গেলাবেন। উঃ, হেভেন্স্, সে কী যন্ত্রণা! আমি তার কী বুঝবো বলুন দেখি, বাঙলা দেশের পাঠক হনলুলিয়ান ভাষার বইয়ের দুর্বোধ সমালোচনা পড়ে কী বা বোঝে, কে বা তার সত্যাসত্য যাচাই করে দেখে বলুন। সে এক হনলুলিয়ান কাণ্ড। বলে বেবি হাসির ঘায়ে একেবারে চুর-বিচুর হয়ে গেলো।

কুবের অবাক হয়ে বললে,—আপনি আবির্ভাব-এর একজন মেম্বার হয়ে তার নিন্দে করছেন?

—নিন্দে? বেবি তার মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করবার চেষ্টা করলে: আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। ও-ই তো ওঁদের প্রশংসা, একথা ওঁরা নিজেরাও জানেন। ইংরিজি বিদ্যের এতো বড়ো একেকটা মানোয়ারি জাহাজ হয়ে যে ওঁরা বাঙলা লিখে দেশমাতৃকাকে কৃতার্থ করছেন—এ তো তাঁদেরই মুখের কথা। Ignorance-snobbery বলে একরকম snobbery আছে, ওঁদের হচ্ছে omniscience-snobbery, -aristocracy-snobbery। এই snobberyই তো এঁদের ক্যাপিটেল। কাগজ থেকে এই snobbery টুকু তুলে নিয়ে যান. তবে আর ওর কী থাকবে? এখনই বরং কাগজটা খুলতে গেলে দাঁত কন্‌কন্ করে, চোখ টন্‌টন্ করে—তখন তো হবে ওটা নিতান্ত আটপৌরে, একেবারে ডাল-ভাত। Aristocratরা কি কখনো ডাল-ভাত ছোঁন? বেবি আবার খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো।

কুবের বললে,—আর যা সব ওঁরা বইয়ের সমালোচনা করেন—

বেবি কথাটা তাকে আর শেষ করতে দিলো না: তা এভারেস্টের চেয়েও দুরধিগম্য। কথাকে জাঁকালো করে না বললে ওরা স্বস্তি পান না, তাই আমিও তেমনি করে বললাম। যে-বই কেউ কোনোদিন সাধারণতো পড়ে না, ওঁরা তারই করবেন সমালোচনা, লোকের চোখ খুলে দেবার জন্যে নয়, নিজেদের pedantry

জাহির করতে। পাণ্ডিত্য বলতে পারতাম কিন্তু কথায়-কথায় ইংরিজি বলাই ওঁদের ফ্যাশান। বলে বেবি ঠাট্টায় একটু ঠোঁট কুঁচকোলো। ফের বললে,—আর বই যতো বিদেশী হবে তাঁরা করবেন তার ততো প্রশংসা। আর বই যদি কখনো বাঙলা হলো তো, সর্বনাশ। বাঙলা, অতএব তাতে আছে অসংখ্য ত্রুটি, অগুণতি লুপ্-হোল্। বাঙলা বইকে প্রশংসা করতে গেলে তাঁদের যে defamation হবে। প্রশংসাই যদি করবেন, তবে বই আর বাঙলা হয় কি করে? বেবি হাসিতে একেবারে ভেঙে পড়লো। হঠাৎ হাওয়ার উপর ডান হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলো: Drat, drat that magazine.

কুবের গম্ভীর গলায় বললে, আপনি যে দেখছি বেচারিদের উপর ভীষণ চটা।

—নিদারুণ! বেবি আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো: বেচারি বলে বেচারি। ধরুন ঐ উমাপতি ঘোষ, প্যারিস থেকে টয়লেটে এক্সপার্ট হয়ে এসেছেন, অতএব আর কি, তিনি সাহিত্যিক না হয়ে যান কোথায়? ধরুন সুবিমলবাবু, নিজের বলতে কিছু বিশেষ না থাক্, তাঁর বাপের পয়সা আছে; তাঁর পিতৃদেবের যদি বিশেষ উৎসাহ না থাকে, তাই বলে তিনি তো আর সাহিত্যিক না হয়ে পারেন না। অবস্থা তাঁদের একেকটা লাইফ্ ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানির মতো বিশাল, ইচ্ছে মতো বই কিনতে পারেন, আর বই-ই যখন যা-খুশি কিনতে পারেন, তখন প্রায় law of gravitation-অনুসারেই তো তাঁদের লিখতে পারা উচিত। হাওয়ায় চুলগুলি এতোক্ষণে শুকিয়েছে দেখে দু হাত তুলে, নাচের ঠমকের মতো সেই দু হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফাঁস একটা খোঁপা জড়াতে লাগলো: আমরা মেয়েরা যেমন নিত্য-নতুন ব্লাউজস্পিস-কিনি, তেমনি ওঁরা বই। পড়বার তাগিদে নয়, ঘর সাজাবার। লোককে সুন্দর দেখাবার জন্যে যেমন আমরা পোষাক করি, তেমনি ওঁরা কেনেন বই—নিজে সুন্দর হই যেমন আমাদের উদ্দেশ্য নয়, নিজে পড়েন তেমন তাঁদের সময় নেই। আমরা যেমন শাড়ি ব্লাউজের একটা বস্তা, তেমনি ওঁরা বই-ম্যাগাজিনের একটা ক্যাটালগ্। আঠারো-পর্ব মহাভারতেও ওঁদের গুণকীর্তন শেষ হয় না। বলে বেবি একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ছাড়লো।

অন্ধকারে ঘরের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে বেবির এই স্তব্ধ, স্তিমিত উপস্থিতিতে। আলো এখন জ্বালালে হয়, কিন্তু আলো জ্বালালেই যেন সমস্ত আবহাওয়ার ছন্দচ্যুতি ঘটবে, দু'জনের নিতল, নিবিড়াভ স্তব্ধতায় যেন তারই ইসারা। বেবির নোয়ানো, নরম দু'টি পা থেকে সুরু করে স্নিগ্ধ কপালটিতে পর্যন্ত লীলায়িত, তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে স্তব্ধতার এই গান যেন চক্ষু দিয়ে শোনবার কথা।

বেবি মুচকে একটু হেসে বললে—এতোক্ষণে ওঘরে বহুরূপীদের হাট বসে গেছে। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, নইলে এই সন্ধ্যাটা আমার কী ভয়ঙ্কর যে কাটতো।

দুঃসাহস করে কুবের বললে—ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, তবু পনেরো দিন অন্তর একটা রবিবার একজন মানুষকে দেখতে পাবো বলে আশা করতে পারি।

বেবি গাঢ় গলায় জিগ্গেস করলে: এখানে কেমন আছেন?

—চমৎকার। কুবের উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবার ভাণ করলে: যেন সেই land of

Cockaigne. আলস্য আর বিলাসিতায় কাটাছি সাঁতার। সেই লোটাস্-ইটারদের ঘুমন্ত দেশ।

ঠোঁট টিপে হেসে বেবি বললে ও-ঘরের হাওয়া যে আপনারো গায়ে লেগেছে দেখছি।

—উপমা দিয়ে না বললে কথাটা ভালো বোঝানো যেতো না। একেক সময় কথার চেয়ে তার একটা উপমাই বেশি প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে।

বেবি অন্তরঙ্গ স্বরে প্রশ্ন করলে: আপনার পড়া কেমন তৈরি হলো?

কুবের হেসে বললে,—পরীক্ষায় গিয়ে না বসলে ঠিক তার উত্তর দেওয়া যাবে না। আজ সমস্ত দুপুর তো বসে-বসে একটা কবিতা লিখেছি।

—বলেন কী! আর দু'দিন বাদে পরীক্ষা। বেবি চোখ প্রায় কপালে তুললো: আমরা - মানে, মেয়েরা হলে তো আহার-নিদ্রা সব ভুলে যেতো। পরীক্ষার আগে, তাদের দেখলে আপনার মনে হবে না, তারা মানুষ, না একেকটা প্রেতিনী।

—আপনার পরীক্ষার সময়, কুবের জোরে উঠলো হেসে: আশা করি স্বচক্ষে একটি প্রেতিনী দেখতে পাবো। কিন্তু বেবির দিকে প্রাণপূর্ণ চোখে চেয়ে থেকে কুবের বললে—কিন্তু কবিতার muse হচ্ছে ভারি কঠিন, কড়ায়-গণ্ডায় খাজনা আদায় না করে সে ছাড়বে না। সে যখন পেয়াদা পাঠিয়ে দেয়, আমার মতো ভীরু প্রজা তো তার হাঁক-ডাকে একপায়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেখানে যা কিছু ক্ষুদ-কুঁড়া আছে কেচে-কুড়িয়ে এনে তার দেনা শোধ করি। নইলে আর নিষ্কৃতি কোথায়?

—কবির মতোই কথা বলেছেন বটে। বেবি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো: কিন্তু এখানে বসে কবিত্ব করার চাইতে চলুন না কোথাও একটু ঘুরে আসি।

কুবের কুণ্ঠিত হয়ে বললে—পরীক্ষা আমার ভয়ানক কাছে—কোথাও বেরুনো আমার বারণ। সুশান্ত-দার কড়া হুকুম।

বেবি বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলো: রাখুন তাঁর দাদাগিরি আর ফলাতে হবে না। পরীক্ষার জন্যে আপনার ঘুমের কী ব্যাঘাত হচ্ছে তা তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আর আমার সঙ্গে বেরুলে আশা করি আপনার জাত যাবে না।

কুবের উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ইতস্তত করতে লাগলো। আলো জ্বালালে তবু কিছু-একটা কাজ করা হয় ভেবে সুইচ্‌বোর্ডে সে হাত রাখতে যাচ্ছে, অমনি পরদা সরিয়ে ঘরের মধ্যে দু' জনের আবির্ভাব হলো—মিসেস সোম আর সুশান্ত, সশরীরে।

টুপ্ করে কুবের আলো জ্বালালো তক্ষুনি।

মিসেস সোম অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলেন: my! যা ভেবেছি—তুই এখানে, এখানে কী করছিস, বেবি?

বেবি দীপ্ত, সস্মিত মুখে বললে—কুবেরবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলাম, মা।

—গল্প? বিরক্তিতে মিসেস্‌এর নাকের ডগা রেখাসংকুল হয়ে উঠলো: আবির্ভাব-এ না গিয়ে? এইখেনে বসে গল্প?

—হ্যাঁ মা, মন খুলে মানুষের ভাষার দু'টি-চারটি plain আলাপ। বলে

আঁচলের ঢেউ তুলে দ্রুতপদে বেবি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ঘরের চারপাশে একটা কুটিল কটাক্ষ হেনে মিসেস সোমও তার পিছু নিলেন।

সুশান্ত একটু কঠিন হয়েই বললে,—সামনে তোমার পরীক্ষা আর তুমি কিনা—

সামান্য পরীক্ষা-পাশের জন্যে সুশান্তর কোনো কালেই বিশেষ মৌখিক উৎসাহ ছিলো না, পাশ করে চাকরির ভাবনা কুবেরের অন্তত ভাবতে হবে না এই আশ্বাসই সে বরাবর দিয়ে এসেছে। তবে পরীক্ষা একটা দিতে হয়, দেবে—লেখাপড়ার একটা সক্রিয় অভ্যাস থেকে তার সাহিত্য ভবিষ্যতে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হবার আশা রাখে, এমনি তার ছিলো একটা গৌণ যুক্তি। সেই সুশান্ত পরীক্ষা সম্বন্ধেই এমন মাস্টারমশাই হয়ে উঠলো, কুবের তো অবাক। সেটা এড়িয়ে গিয়ে নম্র হয়ে বললে,—আজ দুপুরে হঠাৎ একটা কবিতা লিখলাম।

কিন্তু কবিতার নাম শুনেও সুশান্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলো না। আশ্চর্য। মুখ কালো করে বললে,—আবির্ভাব-এ এলে না যে? ওঁরা সব তোমাকে যেতে বলছেন।

কাতরকণ্ঠে কুবের বললে,—এখন ভাবছিলাম একটু পড়া করবো। বলে সে ভালোছেলেটির মতো টেবিলের উপর বই গুছোতে বসলো।

॥ এগারো ॥

কুবেরের পরীক্ষা হয়ে গেছে অনেকদিন, সুশান্ত আবার তাকে কবিতা লেখবার জন্যে তাড়া দিলে। ওর ইচ্ছে ছিলো পরীক্ষার পর একবার মার কাছে যায়, সুশান্ত উঠেছিলো ধমকে! বলেছিলো: তাঁকে আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি, সঙ্গতিমতো এখেনে তিনি আসছেন। আমার কাছে কয়েকদিন আগে লিখেছিলেন কাশীতে ওঁর কোন গুরুঠাকুর আছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অস্থির। তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না, তুমি তোমার কাজ করো! তিনি এলে আমি কাউকে দিয়ে তাঁকে কাশী পেঁছে দেবো। তোমার ভার যখন নিলাম মাসিমাকেও বা কোথায় ফেলবো? ও-সবে, সংসারের কি হচ্ছে না হচ্ছে তাতে তোমার নজর দিতে হবে না—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করে যাও।

সুশান্তর এই ছিলো বিলাসিতা যে কুবেরকে সে জীবনে প্রতিষ্ঠা দেবে, সাহিত্যে দেবে রাজাসন। ঝড়ের ঝাপটা থেকে আঁচলের তলায় ভীরু দীপ-শিখাটিকে সে কোনোরকমে বাঁচিয়ে রাখবে, সেই থেকে সারা পৃথিবীতে লাগিয়ে দেবে সে ভাবের দাবানল। তার নিজের কবিতার চেয়ে এ-ই হবে তার বড়ো সৃষ্টি। দাদারা তার এই কাণ্ডে বিশেষ সন্তুষ্ট নন, বলেন: সুশান্তর যতো নাই-কাণ্ড, কোথা থেকে এক দায়িত্ব নিয়েছে কাঁধে করে। বুড়ো ঢেঁকি হয়ে এমন

কবিত্ব করতে কেউ কখনো কাউকে দেখেছে নাকি ভূভারতে ? বলা বৃথা, সুশান্ত তাতে কান পাতবার ছেলে নয়। দাদারা খুশি না হন, দাদাদের থেকে সে এককণা সাহায্য নেবে না, নেবার তার দরকারো নেই। তার অংশে যে-টাকা ভাগ হয়ে আসে, তারি থেকে কুবেরেরো কুলিয়ে উঠবে, তার জন্যে করতে হলোই বা না তার কিছু স্বার্থত্যাগ। জীবনে যদি সে একজনকে সত্যিকারের স্থান করে দিতে পারে, তবে সেই হবে তার পরমতম প্রাপ্তি।

সে কুবেরকে যতো না ভালোবাসুক, স্নেহ করতো তার এই অর্ধোচ্চারিত, অনতিস্ফুট কাব্যপ্রতিভাকে। তাকে সে সযত্নসেবায় সরস সহানুভূতিতে সিঞ্চিত, সমৃদ্ধ করে তুলবে। তার আত্মার গহনতম গুহায় জ্বলছে যে বিশীর্ণ শিখা, তাতে দেবে সে বায়ুর অনুকূল উৎসাহ। কুবেরকে সে বলতো : জানো কবির জীবনো হচ্ছে সৈনিকের জীবন, তার চাই স্বাস্থ্য, চাই বল, চাই নির্ভীকতা। আর এই বলই বলো, শক্তিই বলো, সবাইর মূলে চাই শিক্ষা—ট্রেনিং, ডিসিপ্লিন্। এই ট্রেনিং-মাস্টার সুশান্ত নিজে, নিজে তাকে সে দিতো দামি উপদেশ, গ্রন্থের অরণ্যে দেখিয়ে দিতো সে তাকে দুর্গম, দুস্তর তীর্থপথ। বেড়াতে যাবার বেলায় সুশান্ত, খেতে বসবার বেলায় সুশান্ত,—কোথায় কী লেখা ছাপতে দেয়া হবে তারো বেলায় সুশান্ত এসে হাজির। কোথায় সুশান্ত নেই—তাকে এড়িয়ে বাইরে এক পা বেরুনোই হচ্ছে নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞতা। আর সুশান্ত কুবেরের জন্যে কী না করছে, তার অভিজাত আবির্ভাব-এ লিখছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড স্তুতি, তার পুরোনো গদ্য-পদ্য অনুবাদ করে মাদ্রাজে-বোম্বাইয়ে সাপ্তাহিকে-মাসিকে ছিটিয়ে দিচ্ছে। যাদের কথার দাম আছে তাদের ধরে-ধরে বার করাচ্ছে সে আর-আর কাগজে বিস্তৃত প্রশংসা, এবং তারই পাল্টা জবাবস্বরূপ যেখানে-যেখানে বেরচ্ছে গালাগাল, তাদেরকে টাকা দিয়ে তাদেরই কলম থেকে বার করাচ্ছে সে দীর্ঘ অভিনন্দন। কোনো প্রকাশক যদি দেখা করতে আসে আগে সেলাম দিতে হবে সুশান্তকে। তারই সঙ্গে যতো কথাবার্তা, চিঠি লিখতে হলে, তাকেই, উত্তরো দেবে সে নিজে। লেন-দেনের আবর্তের মাঝে কুবের নেই, সে আছে তার সৃষ্টির নির্জনতায়। সেদিন কুবেরের এক চেনা, পুরোনো প্রকাশককে তো সে প্রায় তাড়িয়েই দিলো বলতে হবে। বললে : আর আপনাদের খপ্পরে ওকে পড়তে দেবো না, আমি আছি ওর দ্বার রক্ষা করে। আপনাদের বাজারে বোলতা মাছিদের ভিড় বাড়াবার জন্যে ও আর ভেজাল সওদা নিয়ে বসছে না। যান্। পয়সা ? পয়সার লোভ আর কতো আপনারা দেখাবেন শুনি ?

তবু এতোতেও যেন কুবের প্রাণ খুলে সাড়া দিতে পাচ্ছে না। এমন একটা স্নিগ্ধ ছায়াতলে এসে সে যেন গভীর করে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুশান্ত তাকে জাগায়, কোথায় কী অসুবিধে হচ্ছে তারি সন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠে। বদলে দেয় আলোর বাল্‌ব্, পেছিয়ে নেয় খাওয়ার সময়, ঘরটাকে অন্য কায়দায় সাজিয়ে রাখে। তাকে নিয়ে যায় বইয়ের রাজ্যে, সেখান থেকে মনে তৃষ্ণা আহরণ করবার জন্যে। দুই কাঠের ঠোকাঠুকিতে যেমন আগুন তৈরি হয়, তেমনি কোনো বইয়ের সঙ্গে তার মনের সঘন সংস্পর্শে জেগে উঠতে পারে অনুভবের উত্তাপ, কাব্যের দাহিকা। না, তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই, সময়ের মতো সুশান্তও প্রতীক্ষা করতে জানে।

শুধু খুঁজে বেড়াতে হবে কোথাও তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না, তার চারপাশে এনে দিতে হবে আরো আরাম, আরো স্তব্ধতা।

বিকেলবেলা বেবি চুপিচুপি কুবেরের ঘরে এসে দেখলো কুবের নেই। কোথাও নেই—সুশান্তর বসবার ঘরটাও ফাঁকা। উপরে উঠে এসে চুপিচুপি মেজবৌদিকে জিগ্‌গেস করতে যাচ্ছিলো, সুশান্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো—বাইরে বেবির আওয়াজ পেয়ে সে বেরিয়ে আসছে।

আঁচলের তলায় কি-একটা লুকোতে-লুকোতে সে জিগ্‌গেস করলে: কুবের-বাবু কোথায়?

সুশান্ত দু পা এগিয়ে এসে বললে,—কেন তাকে কি দরকার?

—ভীষণ দরকার। তার সঙ্গে আমি ভীষণ তর্ক করবো। বলুন।

—কী নিয়ে তর্ক?

—এই কবিতাটা নিয়ে। আঁচলের তলা থেকে সবুজ একফালি কাগজ বার করে বেবি বললে,—ওঁর মতে কবিতাটা একটা ব্যক্তিগত বিবৃতি বলে নাকি ভালো হয়নি, আমার মতে ওটা ব্যক্তিগত বলেই কবিতা হয়েছে। তাই নিয়ে তর্ক। তুমুল তর্ক। বলে বেবি হাসতে লাগলো: বলুন, কোথায়?

এক ফুঁয়ে সুশান্তর মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো, বললে,—কুবের কবিতা লিখলো কবে?

—একটা? ঝুড়ি-ঝুড়ি। দয়া করে আমাকে একটা শুধু দেখালেন। বেবি এক পা এগিয়ে এলো সামনে: আপনার ঘরে নাকি? ডেকে দিন্ না তবে।

—কেন, আমার ঘরে তুমি আসতে পারো না?

—এখন আমার সময় নেই, ভীষণ তাড়াতাড়ি। আপনি জানেন, তিনি কোথায় আছেন? আপনাকে ছাড়া বেরুনো তো তাঁর বারণ।

সুশান্তর মুখ যেন কেমন ঝাপসা, ফ্যাকাসে হয়ে এলো। বললে,—কুবের এতো কবিতা লিখেছে, কই, আমাকে তো একটাও দেখায়নি।

বেবি ঝরঝর করে হেসে ফেললো: কবিতাটা কিন্তু এক হিসাবে ভারি বিচ্ছিরি, আপনার কাছে নিতান্ত জলো লাগবে, এতে একটাও চোখ-ঝলসানো কিম্ভূত-কিমাথ শব্দ নেই—তাছাড়া আবার দুঃখের কবিতা! কুবেরবাবু নাকি সম্প্রতি ভীষণ দুঃখে পড়েছেন।

ডান হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সুশান্ত বললে,—কই দেখি।

কাগজটা তাড়াতাড়ি কোলের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বেবি বললে,—ওরে বাবা, আমাকে ভীষণ বারণ করে দিয়েছেন। কাউকে দেখাবো না এই কড়ারে তবে আমি পেয়েছি দেখতে। আমি যে ওঁকে কথা দিয়েছি।

কথাটা একেবারে সুশান্তর বুকে এসে বিঁধলো, চোখ-কান উঠলো জ্বালা করে। কুবের এতোদিনে কবিতা লিখেছে, তা-ও একটা-দুটো নয়, সেই খবর কিনা পেতে হলো তার এক প্রতিবেশিনীর মুখ থেকে। আবার তা কিনা বারণ করে দেয়া হয়েছে সুশান্তকেও দেখাতে। কবিতা কেমন হয়েছে না-হয়েছে তার প্রথম আলোচনা হলো কিনা তাঁর এক মেয়ের সঙ্গে—কবিতায় যাদের ক-অক্ষর গোমাংস। সুশান্ত মনে মনে একটা বিষাক্ত দংশন অনুভব করলে, ঠাট্টায় মুখটা একটু বেঁকিয়ে

সে জিগ্‌গেস করলে : হঠাৎ তার এতো দুঃখ উথলে উঠলো কেন ? আছে তো সোনার খাটে শুয়ে রুপোর খাটে পা দিয়ে।

—তাই তো দুঃখ। বেবির মুখে টগবগ করে হাসি ফুটে উঠলো : এতো সুখ নাকি ভয়ানক কুৎসিত, এতো আরাম নাকি কবির ভাষায় 'জীবন্মৃততা'। তার চেয়ে সহরের কোন গলিতে সামান্য এক ভাড়াটে বাড়ির নিচের তলায়,—যদি সঙ্গে অবিশ্যি তাঁর সে থাকে, যাকে তিনি আগাগোড়া তুমি বলে সম্বোধন করেছেন—টুকরো-টুকরো হাসি-কান্নার মাঝে, বিচ্ছেদ-মিলনের আবর্তে—এই যা, বেবি লজ্জায় হঠাৎ জিভ কেটে বসলো : সবি তো প্রায় বলে ফেললাম দেখছি।

সুশান্ত উঠলো ঝাঁজিয়ে : তাকে এতো সুখ ভোগ করতে কে বলছে ? তার সেই আস্তাকুঁড়ে সে আবার ফিরে গেলেই পারে।

বেদনায় বেবির মুখের আভা ঠাণ্ডা হয়ে এলো ; বললে,—বা, সে কী কথা ? উনি তো একটা কবিতা লিখেছেন, তাঁর আত্মজীবনী তো আর লিখতে বসেননি। কবিতা যে জীবনের ইতিহাস নয়, তার একটা idealised expression, এতো বড়ো কবি হয়ে তা আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে নাকি ? ওর একেকটা idea চিন্তার একেকটা ক্ষণিক বিদ্যুৎস্ফূর্তি, তার আলো আছে, তাপ আছে, কিন্তু স্থায়িত্ব নেই। আপনি যে তবে সেই 'বীরেন্দ্রসিংহ' কবিতাটায় যোদ্ধবেশে রণস্থলে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, তার মানে কি এই, আপনি মোটরের হুইল ছেড়ে হাতে সত্যি-সত্যি ব্যায়নেট্ নিতে চান ? ছোট-ছোট হাসির তরঙ্গ-চূড়ায় বেবির শরীর ঈষৎ আন্দোলিত হতে লাগলো : রবীন্দ্রনাথ একদিন যে 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' বলে খুব আর্তনাদ করেছিলেন, সেটাই কি তাঁর জীবনের পরমতম লক্ষ্য ছিলো ? উনি সত্যি-সত্যি বেদুইন হতে গেলে আমরা এতো বড়ো বাঙালি কবি পেতাম কোত্থেকে ? কিন্তু কী সব বাজে কথা আপনাকে বোঝাতে হচ্ছে। হ্যাঁ, বেবি আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো : কুবেরবাবু কোথায় ?

সুশান্ত গম্ভীরমুখে বললে,—সে এখন নিচে লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করছে। ছ'টা পর্যন্ত সে সেখানে থাকবে। তাকে এখন মিছিমিছি বিরক্ত করতে যাচ্ছ কেন ? ওটা আমার হাতে দিয়ে যাও।

আঁচল দিয়ে হাতটা আরো ঢেকে ফেলে বেবি বললে,—ছটা পর্যন্ত ? কী সর্বনাশ ! তার আগে তাঁর ছুটি নেই ?

—না।

—তাহলে মাস্টারমশাই বেত নিয়ে আসবেন ?

সুশান্ত পকেটে হাত ঢুকিয়ে দু' পা পাইচারি করে নিলো ; বললে,—যখনকার যা তখন তাই করা উচিত। একটা ডিসিপ্লিন্ চাই। সস্তা বোহিমিয়ানিজম্-এর দিন এখন চলে গেছে। ভার্জিল—সুশান্ত চেয়ে দেখলো বেবি সিঁড়ির কাছটায় প্রায় সরে গেছে : ভার্জিল যতোদিন বেঁচে ছিলেন, রোজ রুটিন ধরে বারো লাইন করে লিখে গেছেন—

বেবি তখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করছে : কী সর্বনাশ ! আমার তাহলে এখন দেখা করা হবে না ? কী ভীষণ কথা ! ঘড়ি ধরে কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক

ছ'টা পর্যন্ত। একজামিনের পড়া নয়, একজামিনের পড়া নয়, একজামিনের পড়া নয়।

পা টিপে-টিপে বেবি লাইব্রেরি-ঘরে এসে ঢুকলো। চার পাশে উঠে গেছে বইয়ের উত্তুঙ্গ পাহাড়—এবং তারি মধ্যে একটা সোফার গভীর কোলের মধ্যে ডুবে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কুবের। কোলের উপর মুখ-থুবড়ে পড়েছে একটা বই। দিনের আলো যে কখন ম্লান হয়ে এসেছে তা হয়তো তার খেয়াল নেই।

বেবি পা টিপে-টিপে এগোতে লাগলো। এখন কোথায় অকারণ শব্দে ও কথায় তার উপস্থিতি প্রখর-স্পষ্ট করে দেয়া দরকার, তা না, সে তার আবির্ভাবকে এই ঘরের ঘনীভূত আবহাওয়ার সঙ্গেই আচম্বিতে খাপ খাইয়ে নিলে: এখনকার সময়টির মতোই সে মন্থর হয়ে উঠলো, এখনকার সময়টির মতোই সে স্তব্ধ। আস্তে-আস্তে আরো একটু এগিয়ে এসে সে কুবেরের চুলের মধ্যে আঙুলগুলি ডুবিয়ে দিয়ে বললে . উঠুন। ঘুমে একেবারে বিভোর দেখছি।

এতোটা বাড়াবাড়ি না করলেও চলতো। কিন্তু খানিক আগে কুবেরের কবিতাটা সে যখন খাতায় টুকে রাখছিলো, তখন মা গোয়েন্দাগিরি করতে এসে লেখার উপর ঝুঁকে পড়ে জিগ্গেস করেছিলেন: কার কাছে চিঠি লিখছিস ?

বেবি বলেছিলো: চিঠি নয় মা, খাতায় একটা কবিতা তুলে রাখছি। ছাপার অক্ষরে দেখার চাইতে সদ্য হাতের লেখায় দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগে। ছাপার অক্ষরে লেখকের সেই ছোট-ছোট কাটাকুটিগুলি পাই না, বুঝি না কোথায় সে হোঁচট খেয়েছিলো, কোথায় পেয়েছিলো বাধা, কোথায় ঠেকে গিয়ে তার চিন্তা খাচ্ছিলো অনবরত ঘুরপাক,—তাই সেটা যেন কেমন কৃত্রিম, কেমন অসম্পূর্ণ মনে হয়। আর এই হাতের লেখার কাগজ, এতে যেন কাঁচা সোনার কর্কশ একটা উজ্জ্বলতা পাচ্ছি।

মিসেস সোম খুশি হয়ে বলেছিলেন: নতুন লিখলি বুঝি কবিতাটা ?

—আমি লিখবো এই কবিতা ? আমার শরীরের মেটাবলিজম্‌এ আমার পূর্বপুরুষদের এককণা সাধনা থাকলে তো ?

—তবে কার ?

দুই চোখ খুশিতে উজ্জ্বল করে বেবি বলেছিলো: আর কার। কুবেরবাবুর।

আর যায় কোথা! মিসেস সোম রাগে কতোক্ষণ কোনো কথা কইতে পারলেন না, তাঁর স্নায়ুশিরাগুলি যেন কেউটের ছানার মতো সারা গায়ে কিলবিল করে উঠলো। আর যখন একবার কথা কইলেন, একেকটা কথা যেন প্রায় একেকটা bacteria-bomb। শত কুবের তাতে পচে-পচে ছারখার হয়ে যাবে। প্রথমটা বেবি ততো গায়ে মাখেনি, কিন্তু বোমাগুলি ক্রমশ তারই দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সেও লেগে গেলো পাল্টা জবাব দিতে। এবং মার সঙ্গে কথায় কোন মেয়েই বা পেরেছে—এবং সে-মেয়ে যখন কুমারী। অতএব বেবি চুপ করে গেলো বটে, কিন্তু মায়েরই নাকের ডগা ঘেঁষে বেরিয়ে এলো সে সুশান্তদের বাড়ি। তারপর আবার সুশান্তর কাছে এই বাধা। তার বিরুদ্ধে সবাই যেন তলে-তলে কি-একটা চক্রান্ত করেছে। কিন্তু এদের সঙ্গে মিছিমিছি কথা বলে কিছু লাভ নেই, কথার

চেয়ে কাজই বেশি কার্যকরী। অতএব, কুবের যে-ঘরে আছে, সটান সে-ঘরে সে চলে এলো।

সটান চলে এলো বটে, কিন্তু তার স্বাভাবিক কলহাস্যে ও অজস্র বাক্যচ্ছটায় তক্ষুণি সে নিজেকে বিকীর্ণ করতে পারলো না। একে পড়েছে কুবের ঘুমিয়ে, তায় তার চারপাশে নেমেছে বিকেলের ম্লানিমা, বেবি কেমন হঠাৎ জুড়িয়ে গেলো যেন। নিজের অলক্ষিতে, সম্পূর্ণ নিজের বশের বাইরে চলে গিয়ে, কুবেরের মাথায় রাখলো সে হাত। তার মা আর সুশান্তবাবু এখানে অনুপস্থিত বটে, কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয় দেখছেন। একজন দেখলেই হলো। যে-কেউ একজন দেখলেই যেন তার খানিকটা সুস্তিবোধ হয়।

মাথায় আরেকটা ঠেলা দিয়ে বেবি ক্ষিপ্রকণ্ঠে বললে,—উঠুন, এখনই এমন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন?

ঠেলা খেয়ে কুবের ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। কে যে তাকে জাগিয়ে দিলে, হঠাৎ যেন তার কোনো খেয়াল হলো না। যন্ত্রচালিতের মতো তার হাত গিয়ে পড়লো বইয়ের উপর, বসবার ভঙ্গিটা তার অভিনিবেশে ঋজু, সতেজ হয়ে উঠলো।

বেবি প্রায় ধমকে ওঠার মতো করে বললে,—এ কী! এ কি আপনার এখন পড়ার সময় নাকি?

কুবেরের এতোক্ষণে হুঁস হলো। হকচকিয়ে গেলো: আরে আপনি? আপনি কখন এলেন? নমস্কার!

বেবি বললে,—ঘুমিয়ে থাকলে আর কী করে জানবেন কখন এলাম। নিন, আপনার কবিতা ফিরিয়ে নিন। আমি মুহূর্তে আবার আমার মত বদলে ফেলেছি, কুবেরবাবু। বেবি ঠোঁট উলটোল: আপনার কবিতাটা যাচ্ছেতাই খারাপ হয়েছে। পাঁচজনে খারাপ বললে আমাকেও দেখাদেখি খারাপ বলতে হয় বৈ কি। মেয়েদের—বিশেষ করে কুমারী মেয়েদের—একটা আলাদা, নিজস্ব মত বলে কিছু থাকতে পারে নাকি কোনোদিন? ও কি, বেবি আবার প্রায় ধমকে উঠলো: আপনি আবার বই নিয়ে মেতে উঠলেন যে?

—হ্যাঁ, সংকুচিত হয়ে কুবের বললে,—এ ক' পাতা আমার পড়ে ফেলতে হবে।

—কী ওটা?

—টি. এস্. এলিয়ট্।

—এলিয়ট? পড়ে ফেলতেই হবে?

—হ্যাঁ, সলজ্জ হেসে কুবের বললে,—পড়া শেষ করে আজ রাত্রে লিখে ফেলতে হবে তাঁর ওপর একটা প্রবন্ধ।

—আজ রাত্রেই? তাঁর ওপর আপনার হঠাৎ এতো দয়া!

—দয়া নয়, আঙুল দিয়ে বইর পৃষ্ঠার ধারগুলি মুড়তে মুড়তে কুবের বললে,—সুশান্ত-দার হুকুম। তাই কিছু বুঝি না-বুঝি, অন্তত পড়া শেষ করেছি, এই সান্ত্বনাটা তো হবে। জিগগেস করলে অন্তত সত্য কথাটা তো বলতে পারবো।

—ও! তিনি আবার মুখে-মুখে জিগগেস করবেন নাকি? Theoretical আর oral—দু' রকম পরীক্ষাই? তার ওপর আবার practicalও আছে নাকি? বেবি হেসে উঠলো: তা কেমন লাগলো এলিয়ট্?

কপালে হাত তুলে কুবের বললে,—ভগবান বলতে পারেন। আমি তো ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

—হ্যাঁ, সুশান্তবাবু হচ্ছেন বাঙলাদেশে এলিয়টের একজন হাই-অথরিটি। সমস্ত কিছু বুঝতে পারাই হচ্ছে ওঁর কাজ, বেবি বলতে লাগলো : এলিয়ট্ হচ্ছে ওঁর বড়োসড়ো একটি গড্। ওঁর মতে কবিতার কনোটেশান গেছে বেড়ে, তার প্রতি approach-এর রাস্তাই গেছে বদলে—তাই, যা নিয়ে যে করেই লেখ না কেন, তাই কবিতা,—অবিশ্যি টাইটেল-পেজ-এ তাকে কবিতা বলে চালাতে হবে—

ব্যস্তসমস্ত হয়ে কুবের বলে উঠলো : আমার ঐ প্রবন্ধটা যদি আপনি লিখে দেন তো বেঁচে যাই।

—বেঁচে যান, আদপেই যদি আপনার লিখতে না হয়। বইটা হঠাৎ ছোঁ মেরে কুবেরের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বেবি বললে,—রাখুন এসব বাজে কাজ। নিজে বরং একটা কবিতা লিখতেন তো বুঝতাম।

—না, না, আমাকে এ-বইটার একটা রিভিয়ু করে দিতে হবে আবির্ভাব-এ। প্রবন্ধটা কালই সাবমিট করতে হবে সুশান্ত-দার কাছে—সুশান্ত-দার হুকুম। কথা ক'টা কুবের এমন মুখ করে বললো যে মনে তার একবিন্দু সুখ নেই।

—কাল essay সাবমিট্ না করলে আপনার দাদাটি আপনাকে সারাদিন বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে রাখবেন বুঝি? বেবি তীক্ষ্ম ঠাট্টা করে উঠলো : পড়া না পারলে গাধার টুপি পরিয়ে সমস্ত বাড়ি আপনাকে ঘুরিয়ে বেড়াবেন না? রাখুন, রাখুন আপনার এ অনর্থক slavery। বইটা এককোণে টেবুলের উপর বেবি ছুঁড়ে দিলো : চলুন, আর দেরি নয়।

কুবের আবিষ্ট চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো : কোথায় যাবো?

—এসময়ে ভদ্রলোকেরা যেখানে যায়।

—কোথায়?

—কোথায় আবার! বেড়াতে।

—বলেন কী?

—হ্যাঁ, এলিয়টের কবিতার মতো এটা এমন কিছু কঠিন কথা বলা হচ্ছে না। চলুন।

নিজের চেহারার উপর চোখ বুলিয়ে কুবের বললে, এই বেশে?

—আবার কী! গায়ে একটা জামা, পায়ে একজোড়া জুতো আছে—বেরোবার পক্ষে এই আপনাদের অনেক। আর আমার দিকে চেয়ে দেখুন। আমি কাঁধে করে আমার ড্রেসিং-টেবুল আর লোহার সিন্দুকটা নিয়ে আসিনি।

কুবের মিটমিট করে তাকিয়ে জিগ্‌গেস করলে : আর কে যাচ্ছেন?

বেবি প্রায় ক্ষেপে উঠলো : আবার কে যাবে? আপনার সুশান্ত-দা সঙ্গে না থাকলে বুঝি আপনাকে ছেলেধরা ধরে নিয়ে যাবে? আর কেউ যাচ্ছে না, শুধু আপনি আর আমি। বুঝলেন?

কুবের স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপের মধ্যে পা ঢোকাতে-ঢোকাতে বললে,—কিন্তু সুশান্ত-দাকে একবার বলে গেলে হতো না?

বেবি তার দুই গাঢ় চক্ষু কুবেরের মুখের উপর দৃঢ় করে নিবন্ধ করে বললে,—আপনি যখন কবিতায় নতুন মিল দেন, নতুন উপমা, তখন আপনার মহামান্য সুশান্ত-দার permission নেন, না? আপনার মাথায় যখন একেকটা থ্রিলিং আইডিয়া আসে তখন আপনার সুশান্ত-দার মত নিয়ে আপনার মাথায় আসে?

অবাক হয়ে কুবের বেবির মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

বেবি হঠাৎ চুপিচুপি জিগ্‌গেস করলে: আজ রবিবার, আপনার খেয়াল আছে?

—কেন?

—আজ আবির্ভাব-এর পালা ভুলে গেছেন?

— তাতে কি?

—তাতে কী! বেবি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো: সকলের ভিড়ে আমরা দু'জন খালি অনুপস্থিত, তা-ও এতো কাছে থেকে। সবাই খোঁজাখুঁজি করে দেখবে আমরা গেছি বেরিয়ে। Mummy ছেড়ে মানুষের দেশে। সে খুব মজা হবে না?

কুবের তাড়াতাড়ি বললে, - চলুন। কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো?

রাস্তায় তারা ততোক্ষণে নেমে এসেছে। বেবি বললে—আগে একটা বাস-এ তো উঠে পড়ি, পরে ভেবে দেখা যাবে। তাই ভালো না?

মনের মাঝে বন্দী, বিমর্ষ সহর যেন বিরাট একটা অজগরের মতো কুবেরের চোখের সামনে তার বিসর্পিত, দীর্ঘ দেহ ধরলো বিস্তার করে। আবার সে সর্বাঙ্গে নগরের প্রখর রোমাঞ্চ অনুভব করলো। আবার তার কলকাতা!

॥ বারো ॥

পার্টিশান-এর দরজার মুখে মিসেস সোম বেবিকে ধরে ফেললেন: আবার ও-বাড়ি চললি বুঝি?

বেবি কুণ্ঠিত হয়ে বললে,—হ্যাঁ মা, ছুটির দিন, দুপুর-বেলাটায় হাতের কাছে কিছুই করবার পাচ্ছি না। একটু ঘুরে আসি।

— কিন্তু সুশান্ত তো এমন সময় একটু ঘুমোয়।

—ভাগ্যবান মহাপুরুষ, বেবি তার নাকের নিচে থেকে চিবুক পর্যন্ত একটু গাঢ়-গম্ভীর করে বললে,—দুপুরবেলায়ো শুতে-না-শুতেই ঘুম এসে যায়। সহজ, নিশ্চিত জীবন; আলস্য পর্যন্ত ক্লান্ত করে না—কিন্তু আমি? বিছানায় কাটা ছাগলের মতো দাপাদাপি করেও চোখের পাতা দুটো এক করতে পারি না। বেবি দরজার ছিট্‌কিনিতে হাত রাখলো।

মিসেস সোম তড়পে উঠলেন: কি সুশান্ত ঘুমিয়ে থাকলে ওকে তুই তুলতে যাবি নাকি।

—পাগল ! কাঁচা ঘুম ভাঙলে যে ওঁর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হবে। জেগে থাকলেও আমি ওঁকে বিরক্ত করবো না। বেবি দরজাটা খুলে ফেললে।

মিসেস সোম গর্জন করে উঠলেন: তবে কার কাছে তুই ঘুরে আসতে যাচ্ছিস ? সুশান্তর বৌদিরাও তো এখন ঘুমিয়ে।

—বৌদিরা ? বেবি চমকে উঠবার ভাণ করলে: সর্বনাশ ! তাঁদের কাছে এগোবো আমার তেমন সাহস কই, মা ! তাঁদের ছুঁতে-না-ছুঁতেই তো শ্যাক্‌ খেয়ে মাটিতে মুর্চ্ছা যাবো।

—কেন, ওরা তো চমৎকার মেয়ে।

—এতো চমৎকার যে তাকাতে পর্যন্ত ভয় করে। ওঁরা এতো সুখী যে কুবের-বাবুর ভাষায় একেক সময় ভারি ওঁদের কুৎসিত দেখায়, মা। গরম উনুনের পাশে ঘুমন্ত হুলো-বেড়ালের মতো।

—আর তোর ভাষা ফলাতে হবে না। মিসেস সোম চোখ পাকিয়ে বললেন,—কিন্তু একদিন এই এদেরই সঙ্গে তোর ঘর করতে হবে।

বেবি হেসে ফেললো। বললে,—হলে হবে, তাই বলে এদের এই আহ্লাদে ডগমগ মূর্তি দুটোকে সারাক্ষণ মাথায় করে রাখতে হবে নাকি? একেকটি যা অহঙ্কারের ডিপো, আলস্যের একেকটি বস্তা—সামনে এগোলে দম আসে আটকে, ছায়া দেখলেই ছুটে পালাতে হয়। ওঁদের কাছে কে যাবে ?

—তবে, মিসেস সোম শুকনো গলায় একটা ঢোঁক গিললেন: তবে, সবাই যখন এখন ঘুমিয়ে আছে, তুই কার কাছে যাচ্ছিস শুনি ?

—যে ঘুমিয়ে নেই মা, আর ঘুমিয়ে থাকলেও যাকে জাগালে মাথা ধরবার বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হবার ভয় কম। বেবির ঠোঁটের উপর সূক্ষ্ম, শাণিত একটি হাসি প্রসারিত হয়ে পড়লো: তার নাম তুমি জানো, যদিও আমার মতো তাকে তুমি চেনো না, মা।

—কেন, কেন তুই তার কাছে এতো ঘন-ঘন যাবি শুনি ? মিসেস সোম রুখে উঠলেন: তার কাছে তুই কী পাস্‌ ?

স্নিগ্ধ গলায় বেবি বললে,—কে জানে।

—ওর মাঝে আছে কী ? যতো রাজ্যের রাবিশ যে লেখে, যে তাই কেবল চিন্তা করে—সেই আস্তাকুঁড়ে তোর যাবার কী হয়েছে !

—কার মাঝে কী আছে মা, কে খোঁজ করতে যাবে ? বেবি মার গলা নামাবার জন্যে নিজে গলা নামিয়ে আনলো: তোমার মতে লেখা খারাপ হলেই আমার মতে লোক-ও খারাপ হয়ে যাবে, এমন কোনো কথা নেই। যাঁরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধর্মগ্রন্থ লিখে গেছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্রের আমরা খোঁজ করি না, লেখার বিচারে সেটা নিতান্ত অবান্তর। যারা সংসারে কোনো বড়ো কাজেই কোনোদিন হাত দিলো না, মা, তাদের সচ্চরিত্রতা নিয়েই বা আমরা কী করবো ? আর এ-ও বা তোমার কেমন যুক্তি বেবি খোলা দরজা দিয়ে পা না-বাড়িয়ে আবার এ দিকেই পিছন ফিরলো: যাকে দেখতে পারি না, তার চলনো বাঁকা হবে লেখক হিসেবে যে নিন্দিত, মানুষ হিসেবেও সে অভিনন্দিত হতে পারবে না ? পৃথিবীকে যে সুন্দর বলে দেখতে

পারলো না, সে নিজে হবে কুৎসিত ? ভগবান যে মানে না, সে তাই বলে হবে অধার্মিক ?

—কিন্তু, কিন্তু, রাগে মিসেস সোম তোৎলাতে শুরু করেছেন : ঐ ছাইপাঁশ যে লেখে তার companyতে কী তোর শেখবার আছে ? কী ওর লেখাপড়া ?

—না মা, একটা অথরেরো বইয়ের ক্যাটালগ ওঁর মুখস্ত নেই। কথায় বেবি একটা ঠেস দিয়ে বললে,—বিলিতি বুকুনির একটা গাদা-বন্দুক হলে কে আর ওঁর সামনে এগোতো বলো ? তাই তো আমার ভারি ভালো লাগে। বেবির দুই চোখে ঘনালো যেন স্বপ্নের কুয়াসা : একটা stuffed মিউজিয়ম ছেড়ে যেন খানিকটা ফাঁকা জায়গায় চলে আসি। সেসব গুরুগম্ভীর সাহিত্যালোচনা তাঁর সঙ্গে কে করতে যাবে ?

মিসেস সোম আৎকে উঠলেন : তবে ?

—নেহাৎ দু'টো-চারটে সাদাসিধে ব্যক্তিগত কথা মা, যাকে চলতি ভাষায় বলা যায় সুখ-দুঃখের কথা। বেবি হেসে ফেললো : খুব দূর বিদেশে গিয়ে যদি তোমার হঠাৎ কোনো দিন এক দেশী লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যার সঙ্গে তুমি তোমার সহজ মাতৃভাষায় আলাপ করতে পারো, এ যেন, মা, তাই।

মিসেস সোম দুই চোখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলেন, নিজের মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে মনে হতে লাগলো তাঁর নিতান্ত দুর্বল, নিতান্ত অসহায়। তাই তিনি তাকে অন্য দিক থেকে আক্রমণ করলেন : কিন্তু তুই যে ওর কাছে এতো ঘন-ঘন যাওয়া-আসা শুরু করেছিস এটা সুশান্তর পছন্দ নয়, জানিস ?

—এই এখন জানলাম, মা। বেবি ঝলসে উঠলো : কিন্তু আমি তাঁর কাছে তো যাই না যে তাঁর পছন্দে-অপছন্দে কিছু এসে যাবে ? তাঁর মতো আমাদেরো তো একটা পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে।

—কিন্তু ওটা ওর বাড়ি—

—সবটা নয়, এক-তৃতীয়াংশ। বেবির মুখে হাসি লেগেই আছে : তাই যদি বলো মা, উনি যে আমাদের বাড়ি আসেন, রিটার্ণ ভিজিট দেবার তো একটা সামাজিক রীতি আছে।

—কিন্তু সেই রিটার্ণ ভিজিট তো তুই তার ওখানে দিচ্ছিস না ? কে না কে এক—

বেবি অপ্রস্তুত হয়ে বললে,—ও, হ্যাঁ, এ একটা সূক্ষ্ম তর্কের কথা বটে।

সাহস পেয়ে মিসেস সোম কণ্ঠস্বর দৃঢ়তরো করে তুললেন : ও মোটেই পছন্দ করে না যে সময়ে-অসময়ে তুই ঐ ছোঁড়াটার সঙ্গে মেলামেশা করিস। ও তার অভিভাবক, তাকে শাসন করবার তার অধিকার আছে।

—বলো কী মা, অভিভাবক ? অতো বড়ো ধাড়ি সাবালক ছেলের আবার অভিভাবক! বেবি রাগে লাল হয়ে উঠলো : কী তাঁর আস্পর্ধা বলো তো, মা। হাতে নাড়ু দিয়ে ঐ ছেলেকে দিয়ে তিনি বাঁদর-নাচ করাবেন! অভিভাবক! আমার অভিভাবক তো আর নন, দেখি না, আমাকে তিনি কী করে ঠেকান।

—অভিভাবক নয় কিসে ? মিসেস সোম এবারে মুখোমুখি বাণ ছুঁড়লেন : তার সঙ্গেই তো তোর বিয়ে হবে।

রাগের রক্তিমা লজ্জায় কোমল হয়ে এলো। চাপা গম্ভীর গলায় বেবি বললে,—হবে, দুর্ভাগ্যক্রমে তার তো এখনো দেরি আছে মা। ততোক্ষণ তো আমি—আমি। আর, বেবি খোলা দরজার দিকে পা বাড়ালো: পাকাপাকি ও-বাড়ির বাসিন্দা হয়ে গেলে তো ঘন-ঘন আসা যাওয়ার আর কোনো প্রশ্নই উঠবে না। কুবেরবাবু তো তখন সব সময়েই হাতের কাছে থাকবেন। বলে আর কোনো যুক্তি-তর্কের প্রতীক্ষা না করে—সকল যুক্তি-তর্কের তো চরম সমাধানই তখন হয়ে গেছে—বেবি ওপারের বারান্দায় চলে এলো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে একেবারে নিচে।

পরদা সরিয়ে এক পশলা দমকা হাওয়ার মতো কুবেরের ঘরের মধ্যে সে ছুটে এলো।

কুবের বুকের তলায় বালিশ জড়ো করে উপুড় হয়ে কি লিখে চলেছে। আসবার কোনো আভাস আগে না দিয়েই বেবি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো। খাটের একেবারে কাছে এসে হালকা গলায় জিগ্গেস করলে: আজ আবার কি টাস্ক হচ্ছে!

—ও! আপনি এসেছেন? কুবের ধড়মড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসলো। খাতা-পত্র ছিটিয়ে দিয়ে বললে,—বাঁচলাম।

—বাঁচলেন কী বলছেন? কী লিখছিলেন শুনি? দুই চোখ নাচিয়ে বেবি জিগ্গেস করলে: মাস্টার-মশাইকে টাস্ক দেখাতে হবে না আপনার?

—না। খাট থেকে হাসিমুখে নেমে এসে কুবের বেবির বসবার জন্যে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো: তবে এ-ও প্রায় একটা টাস্কের মতোই মনে হচ্ছিলো। একটা লাইন মাথার মধ্যে এমন ঘুরপাক খাচ্ছে, অথচ কিছুতেই কলমের মুখে বেরিয়ে আসছে না। এতোক্ষণ সারা ঘর পাইচারি করে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় এইমাত্র শুয়ে পড়েছি, আর আপনি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বেবি বললে,—আর আমি এসে দিলাম যজ্ঞ পণ্ড করে। আপনার মাস্টার-মশাই জানতে পারলে আপনাকে তো আর আস্ত রাখবেনই না, আমাকেও ঘাড় ধরে তাকিয়ে দেবেন। আমি পালাই।

বেবি ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো. কুবের তাড়াতাড়ি তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে নিম্ন স্বরে বললে,—না, না, পালাবেন কী। আমি এতোক্ষণ কায়মনে এমনি বাধারই প্রতীক্ষা করছিলাম। বসুন। আপনি জানেন না, ঠেকে-ঠেকে লিখতে-লিখতে মাঝে হঠাৎ ঠিক বাধা পড়লে কেমন ভালো লাগে। কবিতায় যতির যা মূল্য, এ-ও তাই। তখনই বুঝতে পারি কবিতাটা মগজে ঠিক দানা বাধেনি, পাকতে আরো সময় লাগবে। আপনি জানেন না, আমি এতোক্ষণ প্রতিমুহূর্তে শুধু কামনা করছিলাম কিসে আমি এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি।

বেবি চেয়ারে বসলো; বললে,—নিদারুণ একটা ধ্রুপদী কবিতা লিখছিলেন বুঝি?

কুবের অবাক হয়ে বললে,—সে আবার কী?

—বা, আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। ধ্রুপদী হচ্ছে ক্ল্যাসিক্যাল। বেবি ডান হাতটায় একটা হালকা ভঙ্গি করে বললে,—আপনার কোনো নিরীক্ষাই নেই,

কর্মঠপ্রবৃত্তিই আপনার ঘুচলো না, ঘরের মধ্যে কেবল দুর্মর হয়ে থাকবেন—আছে, আপনার কাছে অমরকোষ আছে ? বেবি উঠবার একটা ভঙ্গি করলে।

—না, ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে কুবের বললে,—একটা খেয়ালি অর্থাৎ রোমান্টিক কবিতাই লিখছিলাম। ভালোবাসার। আরেকটা চেয়ারের কাঁধ ধরে কুবের বলতে লাগলো : গদ্য হলে কতো সুবিধে ছিলো সাহস করে 'তোমাকে' একবার 'ভালোবাসি' কোনোরকমে একথা বলে ফেললেই চুকে যেতো : কিন্তু কবিতায় আপনার রাশি-রাশি কথার পর রাশি-রাশি কথা সাজিয়েও এই কথাই রাখতে হবে লুকিয়ে !

—কী ভীষণ কথা ! বেবি হাত বাড়িয়ে বললে,—দেখি কদ্দুর লিখেছেন ? বাঙলা ভাষায় কতোদিন একটা ভালো প্রেমের কবিতা পড়িনি !

প্যাডের সাদা পৃষ্ঠাটা দেখিয়ে কুবের বললে—এক লাইনো লিখিনি, প্রথম লাইনটা কী করে আরম্ভ করবো তাই শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আর জানেন তো প্রেমের কবিতায় প্রথম লাইনটাই সব। একবার সেটা এসে গেলেই রাণীকে কেন্দ্র করে মৌমাছির দল গুনগুন করতে-করতে বেরিয়ে আসে।

বেবি বললে,—আমার কিন্তু প্রতিটি শব্দের জন্যে অভিধানের দেয়ালে মাথা ঠুকতে হয়। দিন, আপনার পুরোনো কবিতাই দু'-চারটে দিন, পড়ে একটু মেজাজ ঠাণ্ডা করি। কোথায় ধারালো গদ্য লিখে সমাজের জঞ্জাল সাফ করে নতুন জীবনের সূত্রপাত করবেন, তা না, আপনিও বসে গেলেন মামুলি প্রেমের কবিতা লিখতে।

—কী আর করি বলুন, মন যে আপাততো আর কোনো কথা শুনছে না। আমাকে আপনি মনের বিরুদ্ধে যেতে বলেন ?

—তা, আমি যখন আপনার মনিব নই, বেবি মিষ্টি করে হেসে বললে,—সামান্য একজন চুনোপুঁটি দরের পাঠক মাত্র, কী করে তা বলি বলুন ? দিন, তাই দু'টো পড়া যাক।

কুবের কুণ্ঠিত হয়ে বললে—একটাও আমার কাছে নেই। সব সুশান্ত-দা নিয়ে গেছেন।

ও! তিনি রোজ এসে বুঝি হিসেব নিয়ে যান তাঁর হাঁস ক'টা ডিম পাড়লো। বেবি তপ্ত হয়ে উঠছে।

কুবের বললে,—কতকটা তাই। আমার লেখার উপরে প্রথম অধিকার তাঁর, তিনিই প্রথম তা পড়বেন, করেক্ট করবেন, ছাপতে হলে ছাপাবেন—

—ছিঁড়ে ফেলতে হলে ছিঁড়ে ফেলবেন। বেবির চোখ-মুখ জ্বালা করে উঠলো : আর আপনি এই অত্যাচার শিরোধার্য করে নিচ্ছেন ? তিনি করেক্ট করছেন, আর আপনি কিছু বলছেন না ?

কুবের ভয়ে-ভয়ে বললে,—যেখানে ভালো হচ্ছে না দেখছেন, সেখানে করেক্ট একটু করলেনই-বা।

—ভালো হচ্ছে না ? আপনার ভালো আর তাঁর ভালো এক ? বেবি ছটফট করতে লাগলো : আপনি কি তাঁর আফিসের কেরানি যে প্রতিপদে তিনি আপনার হিসাব-পত্র চেক করবেন ? আপনাকে এতো সব উনি সুবিধে করে দিচ্ছেন, আর

স্বসম্মুখ হবারই সুবিধে দিচ্ছেন না ? মুখ দিয়ে আবির্ভাবী-ধরনের খুব একটা জাঁকালো কথা বেরিয়ে যেতেই বেবি হেসে উঠলো, তার সমস্ত গাম্ভীর্য এলো তরল হয়ে : কিন্তু আমাকে সে-কবিতাগুলো দেখাবেন বলুন।

—তাহলে আমায় সেগুলি চুরি করে আনতে হয়।

—কেন, আপনার জিনিস আপনি জোর করে চেয়ে আনতে পারবেন না ?

—আমি শুধু লিখে যাবো, তাদের dispose করবেন সুশান্ত-দা—এই চুক্তি। কিন্তু, আমি আপনাকে এবার থেকে নতুন কবিতা লিখে দেবো, ওদের চেয়ে আরো সত্য, আরো গভীর।

বেবি হেসে বললে,—আপনি চুক্তি করে সাহিত্য করতে বসেছেন নাকি ? রুটিন বেঁধে, গজ-ফিতে মেপে ? কেন, আপনার একটা স্বাধীন ইচ্ছে নেই, রুচি নেই ? কী লিখবেন না লিখবেন, কী করবেন না করবেন, সব অন্য একজনের মুখ চেয়ে ? আপনার লেখা আরেকজন করেক্ট করে দেবে ? আপনার কীর্তি আপনাকে একা ভোগ করতে দেবে না ?

কুবের তার বাক্যচ্ছটাদীপ্ত, সুন্দর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। নিষ্প্রভ গলায় বললে,—আপনি এসেও যদি আমাকে কেবল সাহিত্যিক অস্তিত্বের কথাই মনে করিয়ে দেন, তবে আমি যাই কোথা ? আমি যে সামান্য একজন মানুষ, এই কথা কি আপনিও আমাকে অনুভব করতে দেবেন না ?

—আপনি মানুষ না কাঁচকলা ! চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরে বেবি বলতে লাগলো : মানুষ হলে কাউকে আর-কেউ এমন bully করতে পারে ? কার সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেলেন না-গেলেন, তার জবাবদিহি দিতে হয় ? মানুষ হলে কেউ তার লেখায় আর-কারুর কারেক্‌শান সহ্য করে, হিসেব করে তাকে লেখা প্রডিউস করতে হয় ? ইচ্ছের বিরুদ্ধে করতে হয় তাকে বুক-রিভিয়ু ? আপনার মা এলেন, আপনি বললেন তাঁর সঙ্গে আপনিও কাশী যাবেন, ওপর থেকে হুকুম এলো : খবরদার, আমার সঙ্গে বরং শিলং যাবে ; আপনি গেলেন ঠাণ্ডা হয়ে। মানুষ হলে কেউ একজামিনের পর আবার পুঁথির মধ্যে মুখ গুঁজে থাকে ? জানেন, আমি যে এখানে এসেছি, আপনার কর্তা লুকিয়ে থেকে তা স্পাইং করছেন ? মানুষ ? মানুষ হলে মানুষ এতো ঐশ্বর্যের মাঝে পড়ে থেকে নিজের initiative হারায় ? আপনাকে তবু মানুষ করবার জন্যেই নাকি আপনার সুশান্ত-দা এখানে নিয়ে এসেছিলেন।

কুবের তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মলিন গলায় বললে,—আপনি আমাকে ঠিক অপমান করছেন কিনা বুঝতে পারছি না।

—নিশ্চয়, অপমানই করছি তো। বেবি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো : তবু এখনো যদি আপনার কিছু আত্মসম্মান থাকে, আমার সঙ্গে চলুন বেড়াতে।

কুবের চমকে উঠলো : বেড়াতে ? এই দুপুর বেলা ?

—বেড়াতে গেলে আপনার গার্ডিয়ান গোসা করবেন নাকি, না, কলকাতা সহরে ভূমিকম্প হবে ?

—বাইরে ভারি রোদ।

—আর সে-রোদ তো আমার গায়ে লাগবে না ! বেবি একটা তীক্ষ্ম কটাক্ষ

হানলো : খুব ছায়ার মায়ায় ভুলেছেন দেখছি। না, আমিই ভুল ভেবেছিলাম, 'আবির্ভাব' -এর অবাহাওয়ায় এসে আপনার মানুষ হতে আর বাকি নেই। একেবারে টিপটপ।

বেবি রাগ করেই বেরিয়ে যাচ্ছিলো হয়তো, কুবের আবার তার সমুখ ঘেঁষে দাঁড়ালো : তার চেয়ে এক কাজ করুন। আপনার কিছু নতুন কবিতা নিয়ে আসুন, তাই দুজনে বসে পড়া যাক।

—কেন, আমার কবিতার ওপর আপনি কলম চালাতে চান নাকি? বেবি আরো কি বলতে গিয়ে হঠাৎ বলে ফেললো : আমি তো আর প্রেমের কবিতা লিখি না।

—লিখলেনই বা, লিখলে কী ক্ষতি হয়?

মুখে যা আসছে তাই বেবি অনর্গল বলে যাচ্ছে : প্রেমের কবিতা লিখলে দুপুরের রোদে যে ফ্যান ছেড়ে বাইরে বেরুনো যায় না। ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন।

কুবের বললে,—আপনার লিরিক্ কতোদিন পড়িনি।

—পড়ে আর কাজ নেই। আমি তো আর একটা মাইনে-করা মেশিন নই যে অনর্গল কবিতা ম্যানুফেক্চার করবো—তা-ও কিনা প্রেমের কবিতা। আপনাদের কাছে ওটা না-হয় নেহাৎ একটা কনভেনশ্যনুল, অর্ডারি-মাল। আমরা যখন সত্যি-সত্যি কাউকে ভালোবাসি, তখন আর আমরা প্রেমের কবিতা লিখি না, তখন আমরা ভদ্রলোকের মতো স্তব্ধ হয়ে যাই। ওপর থেকে কেউ চোখ রাঙালেও না। অলক্ষিতে বেবি আরো একটু ঘেঁষে এলো : ছাড়ুন পথ ছাড়ুন। আপনি আমার গার্ডিয়ান নন, যে অমনি পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

আশ্চর্য, কুবের তাকে আর একটুও বাধা না দিয়ে আস্তে-আস্তে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো।

॥ তেরো ॥

ঘরের নিরেট স্তব্ধতার মধ্যে ফিরে এসে কুবেরের নিজেকে ভারি শূন্য মনে হতে লাগলো। চারিদিককার দেয়াল যেন ঘনতরো হতে-হতে তাকে ধরলো পিষে যেন অন্ধকার উঠছে ফেনিয়ে। ইচ্ছে হলো পায়ের থেকে এই সোনার বেড়ি খুলে ফেলে সে বাইরের মুক্ততরো হাওয়ায় পাখা মেলে দেয়, ছুটে বেরিয়ে পড়ে এই ভয়ানক নির্জনতার কারাগার থেকে। এখানে সে আর বসে আছে কেন, কিসের লোভে!

বেবি যেন তার এই নির্জনতার আকাশে নবনীল একটি মেঘের আভাস নিয়ে এসেছিলো, তার অন্ধকারে রৌদ্রের সতেজ প্রসন্নতা। তার আবির্ভাবে সহসা তার আত্মা যেন এতোকালের গভীর সুপ্তি থেকে চোখ মেললো, জীবনে এলো শাণিত স্বাদ, শরীরে রুধিরা-মদিরা। তার এতো ঐশ্বর্যের মাঝে বেবিই যেন

তার পরম ঐশ্বর্য—তার Tenth Muse। তার প্রথম নারী। অসীম ঊর্মিল সমুদ্রের অগণন ঢেউ ঘেঁটে-ঘেঁটে এতোদিনে সে যেন তীর করলো আবিষ্কার, পেলো তার নিজের ভাষা, নিজের পরিচয়। এই অপূর্ব চেতনায় তার সমস্ত অস্তিত্ব দীপ্যমান করে তোলবার জন্যেই যেন বিধাতা তাকে এইখানে নিয়ে এসেছেন, তার প্রাণে এনেছেন এই প্রকাশের পিপাসা। তার চেতনার সে যে কী বিশাল ব্যাপকতা, তারই একটা পরিচয় পাবার যেন তার দরকার ছিলো।

একা, শূন্য ঘরে কুবের বেবিকে একবার মনে-মনে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করে ধরতে গেলো, কিন্তু টুকরো-টুকরো তারার স্ফুলিঙ্গের মতো এখানে-ওখানে ছিটিয়ে পড়েছে তার চোখ, চোখের দীপ্তি, তার ভুরু, ভুরুর বঙ্কিমা, তার আঙুল, আঙুলের লীলা। তার গলার সেই শঙ্খের নিটোল নম্রতা ভাবতে গেলে হারিয়ে যায় তার ললাটের আভা, তার কণ্ঠের মসৃণ ঝঙ্কার শুনতে গেলে খুঁজে পাওয়া যায় না আর তার দ্যুতি। টুকরো-টুকরো তারা—সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না অপারপরিধি নিখিল-আকাশের। আশ্চর্য, প্রথম সে বেবিকে ভেবেছিলো কবিতারই একটা অলৌকিক বিষয়, যেমন তারার আলো বা অন্ধকারের গন্ধ, যেমন পাতার মর্মর বা বর্ষার আবহাওয়া। ভেবেছিলো, সে মাত্র এক ঝলক বিদ্যুৎ যার ছোঁয়ায় মনে জাগে ভাবের আকস্মিক শিখা, আলোর আলোড়ন ; যাকে ধরতে গেলে মৃত্যু, অথচ যার থেকে প্রাণের প্রদীপ ধরিয়ে নিলে জাগে জীবনের বিস্ময়। আশ্চর্য, তাকে সে ভেবেছিলো সাকারা কবিতা, কল্পনাকায়া। তার রচনার একটা পরোক্ষ উদ্যোতনা। কিন্তু,—কুবের ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পাইচারি শুরু করেছে, কাঁচা হাতে ধরিয়ে নিয়েছে একটা নতুন সিগারেট কিন্তু, আজ এতোদিনের ঘনিষ্ঠতায় বেবি আর সেই দুঃস্পৃশ কল্পনা হয়ে নেই—সে আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ, সবিশেষ একটি নারী, ভাবের পুঞ্জীভূত একটা কুজ্ঝটিকা নয়, জীবনের একটা শরীরময় নিবিড় আত্মপ্রকাশ। জীবনে সে অলৌকিক চেতনার সঙ্গে সঞ্চারিত করে দিয়েছে একটি সুমধুর পিপাসা। আশ্চর্য, কুবের নিজেকেও আর নৈর্ব্যক্তিক কবি বলে মনে-মনে স্বীকার করতে পারছে না, বেবির চোখের আলোয় নিজের সে এই নতুন রহস্য উদ্ধার করেছে : সে মানুষ, কবিতার চেয়ে কামনা যেখানে প্রবল, আত্মার চেয়ে শরীর যেখানে দুর্ধর্ষ সে সেই অমিতবলদৃপ্ত যুবা,—এই নতুন পরিচয় পেলো যেন সে বেবির চোখের আয়নায়।

কুবের দ্রুত পায়ে পাইচারি করতে লাগলো।

তারপর একসময় কি মনে করে সিগারেটটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে, পাখাটা বন্ধ করে, সোজা উঠে গেল উপরে। যাবার আগে গায়ে দিয়ে নিলো একটা পাঞ্জাবি, চুলটাও একটু সংস্কার করলে। হঠাৎ তার মনে হলো তার মরুজীবনের পারে বিধাতার আশীর্বাদের মতো নেমে এসেছিলো ক্ষীণ, নির্মল একটি জলধারা, তারই রুক্ষ বালুস্তূপে পড়ে সে পাচ্ছে না আর পথ, যাচ্ছে শুকিয়ে।

উপরে বারান্দায় বড়ো একটা চেয়ারে বসে মেজবৌদি তাঁর কোলের ছেলেকে বুকে করে অনর্গল আদর করছিলেন, এবং কেউ কোথাও কাছে নেই ভেবে সে-আদর তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিলো, এমনি সময় পেছন থেকে কুবের ডাকলো : মেজবৌদি।

কুবেরকে হঠাৎ উপরে দেখতে পাবে মেজবৌদি ততোটা আশা করেননি ; চমকে উঠলেন : এই যে, কবি-ঠাকুরপো যে।

যেন কি গভীর ষড়যন্ত্র করছে এমনি সুরে কুবের জিগ্‌গেস করলো : ওদের বাড়ি যাবার শর্ট-কাট্‌টা কোন দরজা দিয়ে আমায় একটু দেখিয়ে দিতে পারো ?

মেজবৌদি সম্বৃত হয়ে বসে বললেন,—কাদের বাড়ি ?

মেজবৌদির কাছে অন্তত এটুকু সাধারণ বুদ্ধি সে আশা করেছিলো। কি বলবে হঠাৎ কিছু ভেবে পেলো না ; আমতা-আমতা করতে লাগলো : এই, প্রায়ই যিনি আসেন, এই ব্রততী-দেবীদের বাড়ি।

—তার কাছে তোমার কী দরকার ? মেজবৌদি মুখ টিপে একটু হাসলেন : তোমার নিজের কাজকর্ম ফেলে এরি মধ্যে তুমি উঠে এলে ?

এতো অবান্তর কথা না বলে সোজাসুজি রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেই হয়, কথার গোলক-ধাঁধায় তাকে আর আট্‌কে রেখে লাভ কি। কুবের একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললে,—আমি নকলনবিশ নই যে বাঁধা-ধরা রুটিনের মধ্যে আমাকে কাজ করে যেতে হবে, ইচ্ছে না করলে লিখবো না। তুমি যদি জানো, রাস্তাটা আমাকে দেখিয়ে দাও।

মেজবৌদি খর্‌খরে গলায় ঠাট্টা করে উঠলেন : তোমার যে লিখতে আজ ইচ্ছে করছে না তা তো চোখের সামনে জ্বলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, ও-বাড়ি যাবে, সদর রাস্তাটা তোমার চোখে পড়লো না, এলে এই খিড়কির দরজার সন্ধানে !

কুবের যেন বসে পড়লো। কথাটা সে কেন ভেবে দেখেনি ভাবতে তার এখন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। বেবি এই পথেই প্রত্যহ আনাগোনা করতো, অতএব এর চেয়ে সম্ভ্রান্ততরো কোনো পথ যে থাকতে পারে এটা ছিলো তার ধারণার বাইরে। তাছাড়া তার মগ্নচৈতন্যে এই ধারণাই হয়তো নিহিত ছিলো যে উপরের দরজাটা খুলে ফেললেই নিভৃতে সে বেবির দেখা পেয়ে যাবে, সদর রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে পেরোতে হবে অনেক কায়দা-কানুনের বাধা।

একনিশ্বাসে তার সমস্ত উৎসাহ গেলো নিবে। এখন পালাতে পারলেই সে বাঁচে, কিন্তু ভাগ্য একবার যখন তার সঙ্গে পরিহাস করতে শুরু করেছে, সহজে আর তাকে নিস্তার দেবে না।

সুশান্ত যে এতোক্ষণ ওৎ পেতে ছিলো কে জানতো। নিচে যাবার জন্যে কুবের সবে বোধহয় এক-পা এগিয়েছে, অমনি সে বেরিয়ে এলো ; যেন কিছু জানে না এমনি কৌতূহলী চোখে সে জিগ্‌গেস করলে : কি, কী হয়েছে মেজবৌদি ?

মেজবৌদি ছেলে বুকে করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। লজ্জায়-ম্লান কুবেরের দিকে চোখের ইসারা করে ঠোঁট কুঁচকে বললেন,—কী জানি, কবির খেয়াল। ও-বাড়ি যাবার জন্যে পথ খুঁজছিলেন।

—ও ! এই যে, তুমি ! সুশান্ত এগিয়ে এলো ; বললে,- শোনো, আমার ঘরে একবারটি এসো তো, কুবের।

কুবের ঘরে ঢুকতেই সুশান্ত দরজা দিলো ভেজিয়ে ; বললে,—বোস। সিগারেট খাবে ?

সুশান্ত গলা খাঁখ্‌রে জিগ্‌গেস করলে : আজ কিছু লিখলে ?

—না।

—দুপুরে এতোক্ষণ কী করছিলে তবে? ঘুমিয়েছ?

—না, চুনকামকরা খটখটে দেয়ালের দিকে চেয়ে কুবের বললে,—লিখতে চেষ্টা করছিলাম, দুপুরে ব্রততী-দেবী এসে পড়লেন, তাঁর সঙ্গে গল্প করে—

—ব্রততী-দেবী? ও! বে—বি, সুশান্ত মুখ বেঁকিয়ে উঠলো: আমাদের বেবি। সে এসেছিলো কেন?

কুবের ঈষৎ তপ্ত হয়ে বললে,—তার আমি কী জানি? তাকেই জিগ্গেস করুন না-হয়।

—হুঁ! নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে সুশান্ত একটা শব্দ করলো: তা, তুমি কেন এখন ওর কাছে যাচ্ছিলে তা তুমি জানো বোধহয়?

যেন কাঠগড়ার আসামী, তেমনি করেই কুবের কাটা-কাটা জবাব দিচ্ছে: জানি।

—কেন?

সুশান্তর মুখের শঙ্কাকুল, কুটিল চেহারা দেখে কুবের না হেসে আর থাকতে পারলো না। বললে,—অসম্পূর্ণ গল্পটা সাঙ্গ করবার জন্যেই যাচ্ছিলাম। সময় কাটতে চাচ্ছিলো না!

—এ তো মহা মুশকিল হলো দেখছি। সুশান্ত চঞ্চল হয়ে উঠে পড়লো: তোমাকে কই একটু নিরিবিলি জায়গা করে দিলাম, না, যতো উৎপাত জুটে গেলো। লেখার সময় এরকম বিরক্ত করলে মানুষের কখনো সহ্য হয়? দাঁড়াও, ওকে ডেকে এনে আচ্ছা করে ধমকে দিতে হবে তো। সময়ে-অসময়ে এমনি যদি তোমার লেখায় এসে intrude করে—তাহলে কি করে কী হবে? দাঁড়াও, আমি মিসেস সোমকেও বলবো। নিশ্চয় বলবো।

কুবের অপ্রতিভ হয়ে বললে,—না, না, উনি আসাতে আমার লেখার কোনোই অসুবিধে হয় না।

—বা, এই তো, ও এসেছিলো বলেই তো আজকের কবিতাটা তোমার মাঠে মারা গেলো।

কুবের প্রসন্ন গলায় বললে,—সে একটা প্রকাণ্ড রিলিফ্। উনি না এসে পড়লে যা-তা করে লিখে ফেলতাম হয়তো একটা, কিন্তু উনি এসে থামিয়ে দিলেন বলেই একটা অপমৃত্যুর ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলাম।

কিন্তু, সুশান্তর গলা হঠাৎ এক পরদা চড়ে গেলো: ও কেন, কেন এতো ঘন-ঘন তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে? আর তুমিই বা ওর সঙ্গে মেলামেশায় শেখবার কী এতো পেতে পারো?

কুবের হাসলো; নম্রকণ্ঠে বললে—উপদেশ ছাড়া আর কিছুতে কি মানুষ শেখবার পেতে পারে না? আর আমরা কি খালি শিখবোই, কিছু-কিছু তার ভুলবো না? সব সময়েই ভঙ্গিটা সোজা করে রাখতে হবে, গা এলিয়ে দেবো না মাঝে-মাঝে?

—কিন্তু আমি তোমাকে এখন থেকেই সাবধান করে দি, কুবের। সুশান্ত হঠাৎ তাঁর খুব সামনে এসে দাঁড়ালো: সব সাধনায় নারীই জানবে তার একমাত্র শত্রু—

—কিন্তু একমাত্র এই কাব্যসাধনা ছাড়া। কুবের যেন কথা কয়টা সুশান্তর মুখের উপর বরফের কুচির মতো ছিটিয়ে দিলো: মাত্র এইখানেই নারী আমাদের সহায়। কোনো নারীর সঙ্গ গভীর সংস্পর্শে না এসে কোনো কবিই গভীর হতে পারেনি।

—কিন্তু এ তো দেখছি ভয়ানক মুশকিল হলো। সুশান্ত দু-চার পা টহল দিয়ে হাসিমুখে আবার ফিরে এলো কুবেরের কাছে: এখন পাশের বাড়ি থাকতেই ও তোমাকে এমনি ধারা জ্বালাতন করছে, পাকাপাকি এবাড়িতে চলে এলে তোমাকে আর তিষ্ঠোতেই দেবে না দেখছি।

কুবের মূঢ় চোখে সুশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

—তখন তোমাকে কোনো একটা ভালো জায়গায় পাঠিয়ে দেবো, কি বলো? কলকাতা চাও কলকাতাই সই, কিম্বা কাছাকাছি কোনো একটা নিভৃত গ্রামে—প্রকৃতির নির্জন পরিবেশের মধ্যে। সেখানে আর কেউ তোমাকে বিরক্ত করতে পারবে না, সুশান্ত খুশি হয়ে বলতে লাগলো: মন খুলে লিখতে পারবে। আমিই থাকবো তোমার literary agent। খুশি-মতো উইক্-এন্ড-এ চলে আসবে কলকাতা—আমরাও মাঝে-মাঝে তোমার ওখানে পিকনিক করে আসবো। সুবিধে বুঝে একটা বোট-হাউস তৈরি করে দেবো না-হয়। খুশির মাত্রা ঠিক রাখতে না পেরে সুশান্ত একেবারে তার পিঠ চাপড়ে দিলে।

কুবেরকে মলিন, একটু বা ম্রিয়মাণ দেখে মনে-মনে সুশান্ত উৎফুল্লই হলো হয়তো। বললে,—তোমার মাঝে কী বিরাট ভবিষ্যৎ সুপ্ত আছে, তা তুমি নিজে কী করে দেখবে বলো। আমিই দেখো তাকে প্রতিষ্ঠিত করবো, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে কোনো স্বার্থত্যাগই আমার কাছে বেশি নয়, কুবের। সুশান্ত একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো: তোমাকে আবারো বলছি, লেখকের জীবন সৈনিকেরই জীবন—কোনো অপচয় কোনো অনিয়ম, কোনো ভাববিলাসকেই তাঁর প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। আর শোনো—সুশান্ত ড্রয়ার টেনে এক তাড়া পাণ্ডুলিপি টেনে আনলো: তোমার এই কবিতাগুলি পড়লাম। লেখা অবিশ্যি খুবই ভালো, কিন্তু লেখার tone কেমন নেমে গেছে। তুমি হঠাৎ প্রেমের কবিতা লিখতে গেলে কেন? ও তোমার লাইন নয়।

কুবের গম্ভীর মুখে বললে,—প্রেম ছাড়া কোনো কবিতা হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আগে যা সব লিখেছিলাম, তাই বরং এখন মেকি, অসার বলে মনে হচ্ছে।

—কিন্তু এ কী মেয়েলিপনা! তোমার ভাষার সেই তেজস্বিতা কই—এ কী বিচ্ছিরি ঢলে-পড়া ভাব! তোমাকেও শেষকালে এই কন্‌ভেনশ্যান্ মেনে চলতে হবে, এ তোমার কাছে আশা করিনি কুবের।

—আমার ভাবের sincerity ভাষার দৈন্য দিয়ে ব্যাখ্যা করাটা ঠিক বিচার হবে না হয়তো। কুবের ঘামতে লাগলো: বরং আমার তো মনে হয়, আমি এতোকালই একটা শব্দসার কন্‌ভেনশ্যান্ পালন করছিলাম—এতোক্ষণে যেন সহজ নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি।

—মিথ্যে কথা। সুশান্ত জোর দিয়ে বললে,—তোমার ধ্রুপদী-ঢঙের কবিতা-

গুলিই বেশি-ভালো ছিলো। তোমার সে-লাইন ছেড়ে এসব মাথামুণ্ডু নিয়ে কেন তুমি মাতামাতি করতে গেলে?

—উপায় কী না করে? কুবের চেয়ারের মধ্যে নড়ে-চড়ে বসলো: আমার সমস্ত মন যখন এই সুরেই ভরপুর হয়ে উঠলো, তখন—

—না, এইখেনেই সংযম দরকার, সৈনিকের ডিসিপ্লিন্। সুশান্তর মুখ অস্বাভাবিক-রকম থমথমে হয়ে উঠলো: যা তোমার বিশেষত্বকে accentuate করে না, তেমন জিনিস নিয়ে তোমার dabble করা উচিত হবে না। আমি ভেবে দেখলাম কুবের, এগুলো 'আবির্ভাব'-এ ছাপানো তো যাবেই না—খালি 'আবির্ভাব'-এর রসজ্ঞানে বাধবে বলেই নয়, হবে তোমারই অখ্যাতি—অন্যান্য কাগজে প্রকাশ করাও অন্যায় হবে, কেননা ওগুলো বিষয় হিসেবে অত্যন্ত বাজে হয়েছে।

কবিতাগুলি ফিরিয়ে নিতে-নিতে কুবের বললে,—শুধু বিষয় হিসেবে কোনো কবিতা খারাপ হতে পারে এই প্রথম শুনলাম। সে যাই হোক, ছাপার জন্যে আমি বিশেষ ব্যস্ত নই, এখন লেখবার উৎসাহেই মশগুল। কুবের একটু হাসলো: এ-কোনো একটা বিশেষ ঢঙের নয়, সেই তো এর বিশেষ পরিচয়। আমি কী বিশেষত্ব নিয়ে ফুটে উঠবো তা কি আমিই জানি? তার চেয়ে আমি যখন যা, আমার তখন তা-ই হয়ে ওঠা কি ঠিক হবে না? আমি যদি কিছু কোনোদিন গভীর করে উপলব্ধি করি, তবে, তা আমার অতীতের বিশেষত্বের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না বলেই আমাকে চুপ করে যেতে হবে?

—উপলব্ধি? তোমার এই সব muddy, mean utterance-এর পেছনে উপলব্ধি! সুশান্ত এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো: তোমার এই প্রেমের উপলব্ধিটি কে শুনতে পাই?

লজ্জায় কুবের একেবারে মিইয়ে গেলো। সুশান্তর একটা রূঢ়, অকপট মানুষমূর্তি তার চতুষ্পার্শ্বের কবিত্বের কুজ্ঝটিকা ভেদ করে এই কুৎসিত নির্লজ্জতায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে সে তা কল্পনাও করতে পারতো না। কবি সুশান্তর মুখোশ গেল খুলে, বেরিয়ে এসেছে একটা শীর্ণ নরকঙ্কাল।

কুবের চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললে,—কবিতায় তার কোনো নাম নেই।

—কিন্তু জীবনে? সুশান্ত যেন একটা আর্তনাদ করে উঠলো।

—আমার এ-উপলব্ধি যদি সত্য হয়, কুবের তখন দরজার পরদা ছুঁয়েছে: আমার জীবনেও সে কোনো ভাবে উচ্চারিত হবে নিশ্চয়ই।

—শোনো কুবের, কুবের অন্তর্ধান করতেই সুশান্তর মনে হলো এ সে কী ছেলেমানুষি করছে: রাগের কথা নয়, শোনো।

কুবের দাঁড়ালো।

—তোমার মন যা চায়, তাই তুমি লিখবে বৈ কি, একশো বার লিখবে। তোমাকে এই স্বাধীনতা দেবো বলেই তো সমস্ত জঞ্জাল থেকে তোমাকে এইখানে ছিনিয়ে এনেছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে মনে করিয়ে দি, কুবের। জীবনে প্রেমের প্রাপ্তির জন্যে বেশি লালায়িত হয়ো না, তবে তোমার কবিতারই হবে অপমরণ। মানসিক তীব্র অভাববোধের থেকেই কবিতার জন্ম হয়—এবং আশা

করি, সাধারণ গৃহস্থ হওয়ার চাইতে কবি হওয়াকেই তুমি বেশি কামনীয় মনে করো।

কুবের ম্লান একটু হাসলো ; বললে,—তা আমি জানি। বিধাতা যাকে জন্ম থেকে সাহিত্যিক বলে কলঙ্কিত করে দিয়েছেন, তাকে সুখী করবার জন্যে তিনি সৃষ্টি করেননি। তা জেনেও আমাদের সাহিত্যই করতে হবে।

সুশান্ত যেন স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেললো। হালকা গলায় বললে, আমার সঙ্গে সন্ধ্যের দিকে আজ তুমি একটু বেরোবে, কুবের। এ-মেইলে নতুন কয়েকটা বই আসবার কথা—আর তোমার জন্যে বলছিলে সেই একটা কিমোনো—

নীরবে সম্মতির একটা ইসারা করে কুবের নেমে গেলো।

সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, না আরো-কিছু। কবিতার ফাইলগুলি পকেটে করে তক্ষুণি সে বেরিয়ে পড়লো। এই কবিতা সে না-ছেপে চেপে রাখবে না কিছুতেই।

কুবের বেরিয়ে পড়লো—নিজের ইচ্ছে-মতো, নিজের সব চেনা জায়গায়। কাগজে-কাগজে সে-কবিতাগুলি সে বিলিয়ে দেবে। পৃথিবীকে এ-বাণী তার পরিবেশন করে না দেয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। একা-একা এতো আনন্দ সইবার কৃপণতায় সে কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে, পরের মনে এই উত্তাপ সঞ্চারিত করে না দিলে নেই তার কোনো পূর্ণতা। পরের কাছে সে লাঞ্ছনা পাক্, তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু যে-আনন্দ একা তার জীবনে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে পরকে ডাকবে সে তার নিমন্ত্রণে।

কাগজওলারা তার লেখা পেয়ে কৃতার্থ।

—এই মাসেই কোনোরকমে জায়গা করে দিতে পারেন কোথাও ?

ভূপেনবাবু এক লাইন পড়েই লেখার মূল্য নির্ণয় করতে পারেন ; বললেন, —আপনার কবিতা তো আমরা পাইকায় ছাপবো। ভালো লেখা কখনো-কখনো দেরিতে আসে বলে প্রথম ফর্মাটা আমরা ফাঁকা রাখি, আপনারটা সেখানেই যাবে। অনেক, অনেক ধন্যবাদ।

নবঘনবাবু তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন,—তবু এতোদিনে গরীবদের মনে করলে, ভায়া। তা-ও কিনা দু'ছত্তর পদ্য দিয়ে। ছাপবো না ? ছাপবো না কী বলছ ? এক্ষুণি প্রেসে দিয়ে আসছি—এই মাসেই। যাও, যাও তোমার লেখা আবার পড়তে হয় নাকি।

তারপর সে গেলো অনভিজাতদের পাড়ায়। বাকিগুলি দিলো সেখানে ভাগ করে : সব তার যা হোক করে আগামী সংখ্যায়ই বেরুনো চাই।

এসব কাজকর্ম সেরে সে ভাবলো একবার অবনীর বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসে। আজ রাস্তায় নেমে এসে সবাইকে তাঁর অত্যন্ত পরিচিত, অন্তরঙ্গ বলে মনে হচ্ছে—এ-পর্যন্ত রোজ তাকে সুশান্তর সঙ্গে মোটরে বেরুতে হয়েছে বলে তার সে কাছ ঘেঁষতে পায়নি, সুশান্তর সামনে তার নামোচ্চারণই ছিলো অশ্লীল। আজ সমস্ত রাস্তা সে পায়ে হেঁটেই চলেছে—পায়ে হাঁটার সেই সুখ সে এতোদিন ভুলে ছিলো, তা-ও কিনা সহরের এই নোংরা, ঘিঞ্জি ফুট্‌পাত ধরে।

তার সেই সহর—যে তার শরীরে এনে দিয়েছিলো যাত্রার রোমাঞ্চ, মনে

অনুভবের তীক্ষ্মতা। এতোদিনে তাকে ছেড়ে সে ছিলো মৃত কতোগুলি মানুষের শ্মশানে,—তার চেয়েও তারা কৃত্রিম, তার চেয়েও শোভাসর্বস্ব। আবার সে নেমে এলো এই গতির আবর্তের মাঝে, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততায়। নিজেকে তার এখন কতো মুক্ত লাগছে, কতো নির্ভয়!

অবনী যে শ্যামবাজারের দিকে একটা গলিতে তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসে বাসা করেছে সে-খবরটা অবনী চিঠিতে কুবেরকে আগেই জানিয়েছিলো। চিঠিটা পড়েছিলো অবিশ্যি সুশান্তর হাতে, খুলেওছিলো সুশান্তই। চিঠিটা কবির কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে সুশান্তর সিদ্ধান্তই শেষ। পাছে কোনো অবাঞ্ছনীয় চিঠি পেয়ে কবির অভিনিবেশে বাধা পড়ে সেদিকে ছিলো তার সতর্ক চক্ষু। চিঠিটা দিন দুই পরে কুবেরের হাতে দিয়ে সুশান্ত মুরুব্বিয়ানা চালে বলেছিলো: তোমাকে একবার গিয়ে দেখা করতে বলেছে দেখছি। এতো যদি বন্ধুপ্রীতি, সে নিজে আসতে পারে না দেখা করতে? চিঠিটার মধ্যে আগাগোড়া প্রচ্ছন্ন যে একটা সুর আছে তাতে মনে হয় সে কিছু টাকা চায়। যদি বলো, কিছু না-হয় পাঠিয়ে দি বেচারাকে। উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে কি সাহিত্য করা চলে? তা, কোনো আপিসে-টাপিসে কেরানি হলেই তো পারে।

অবনীর বাড়ি যাবার কথা সে উল্লেখ পর্যন্ত করতে পারেনি।

সুশান্ত বলেছিলো: কষ্ট করে তোমাকে আর উত্তর পাঠাতে হবে না,—জবাব আমিই দিয়ে দিয়েছি।

কী যে সে জবাব দিয়েছে তা জানবার ঔৎসুক্য না দেখিয়ে কুবের নিজ হাতে একখানা চিঠি লিখে দিয়েছিলো বটে, কিন্তু অবনী চুপ করে গেছে।

ঠিকানা কুবেরের মনে ছিলো। বন্ধ একটা গলির শেষ কোণে ছোট একখানা একতলা বাড়ির দরজায় সে এসে থামলো।

বাইরের ঘর বলে ছোট, সংকীর্ণ একটা ঘরে তক্তপোষ পেতে এক বুড়ো ভদ্রলোক বসে আছেন, হাতে তাঁর চেন-বাঁধা এক কুকুর। তাকে দেখেই কুকুরটা খেঁকিয়ে সারা বাড়ি প্রায় মাথায় তোলবার জোগাড়, ভদ্রলোক তার মুখে এক থাবড়া মেরে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন। কুবেরের মুখের দিকে চেয়ে প্রায় ভয়ে-ভয়ে জিগ্‌গেস করলেন: কী চাই?

বাড়ির গায়ে নম্বরের প্লেট্‌টার দিকে আরেকবার তাকিয়ে কুবের বললে,—অবনী আছে?

—না, সে তো এইমাত্র বেরিয়ে গেলো, এই খানিক আগে। ভদ্রলোক দরজার দিকে ঝুঁকে এলেন: বোধহয় এখনো বড়ো রাস্তায় গিয়ে পড়েনি। তা, ও ফিরে এলে কিছু বলতে হবে?

কুবের হতাশ মুখে বললে,—হ্যাঁ, বলবেন, কুবের বসু এসেছিলো—

তার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে কে জানে—এই কথা ভাবতে ভাবতেই কুবের গলির আদ্ধেক রাস্তা পার হয়ে এসেছে, অমনি ঘরের বাইরে চলে এসে ভদ্রলোক তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করেছেন: মশাই, মশাই, অবনী ফিরে এসেছে। এইমাত্র ফিরে এসেছে—

কুবের আবার ফিরলো। ভদ্রলোকের কাছে এসে বললে,—বললেন যে তখন বাড়ি নেই?

—হ্যাঁ, বাড়িতে ছিলো না বৈ কি, তা খিড়কির দরজা দিয়ে এসেছে কিনা, আমি দেখতে পাইনি। কুকুরটাকে ফের শাসন করে, কৃতার্থ হবার ভঙ্গিতে ভদ্রলোক বললেন,—বসুন, বসুন, চেয়ারে একখানা খবরের কাগজ পেতে দি।

—আরে কুবের যে! তুমি হঠাৎ গরিবের কুঁড়ে ঘরে! কঙ্কালসার অবনী একটা বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

কুবের তেমনি দাঁড়িয়ে থেকেই বললে,—তোমার বাড়িতে আবার একটা খিড়কির দরজা আছে নাকি? তোমার চেহারা দেখে তো মোটেই মনে হয় না যে এইমাত্র তুমি বাড়ি ফিরছ। ব্যাপার কী, বলো দেখি?

লজ্জায় ম্লান হয়ে অবনী বলল,—বাবার কথায় তুমি কিছু মনে করো না। বোস হে বোস।

—সারাক্ষণ তাহলে তুমি বাড়িতেই ছিলে?

—হ্যাঁ, কোথায় যাবো আর! কাল সকালের আগেই আমাকে একটা গল্প তৈরি করতে হবে।

—তবে, বাড়িতেই যদি ছিলে, তবে আমার সঙ্গে এই রসিকতা করবার কী কারণ ছিলো বুঝতে পারলাম না।

অবনী অপরাধীর মতো মুখ করে বললে,—ব্যাপারটা তোমার বুঝতে এতো দেরী হবার কথা নয়। পাওনাদাররা সন্ধ্যে-সকাল সব সময়ে এসে বিরক্ত করে—আমাকে তো লিখতে হবে ভাই, খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে তো। তা, কী মনে করে এলে বলো দেখি—কতোদিন বাদে!

অপমান ভুলে কুবের চেয়ারে বসে পড়লো। অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্গেস করলে: বলো কি হে, পাওনাদার তাড়াতে এই ব্যবস্থা করেছ?

—সারা দিনে-রাতে তাহলে আর সময় পাই নাকি? অবনী তক্তপোষে পা তুলে উঠে বসলো: তা, বাবা যখন বাড়ি থাকেন না, তখন তাঁর হয়ে কুকুরটাই কাজ চালিয়ে দেয়। খাসা আছি বলতে হবে। অবনী গলা ছেড়ে হেসে উঠলো।

—হঠাৎ তোমার এমন দুর্দশা হলো কেন?

—আর বোলো না। কী দুর্মতি হয়েছিলো যে বিয়ে করেছিলাম, অবনী গলা নামিয়ে বললে,—সাহিত্যিক হিসেবে যতোই তুচ্ছ হই, তোমাকে একটা দামি কথা বলে রাখি কুবের, বাঙলাদেশে যদি কিছু বড়ো কাজ করবার স্পর্ধা রাখো, খবরদার, তবে বিয়ে করো না। বৌ, তার সঙ্গে এঁড়ি-গিঁড়ি, তাদের জন্যে বাসা করো, তার ভাড়া যোগাও,—আর, বাসা তুমি একবার করেছ কি, কুবের, কুকুর-মাছির মতো যতো আত্মীয়-অনাত্মীয়, সব এসে তোমাকে ছেঁকে ধরবে। আর এই সব খরচ মেটাবার জন্যে কী রেইটে এই যে আমাকে লিখতে হচ্ছে—তবু, কী পাওয়া যায়, তোমাকে সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে আজ আর লজ্জা দেবো না।

কুবের বললে,—ঘাড়ের ওপর যখন এই প্রচণ্ড বোঝা, তখন এসব ব্যসনে ডুবে না থেকে কোনো একটা ছোটখাটো চাকরি নিলেই পারো।

—বা, এ-ও তো একরকম কেরানিগিরি। অবনী আরেকটা বিড়ি ধরালো:

তোমার মার্চেণ্ট-আপিসের কেরানি হিসেব মেলায়, আমি না-হয় গল্প লিখি। দু'য়ের মাঝে বিশেষ কোনো তারতম্য নেই। তারা যে-চোখে ইলিশমাছ কেনে, সেই চোখে কেনে তোমার গল্প। কিছু বিশেষ আর আশাও করি না। ছেলেবেলা থেকে যখন এই চাকরিতেই ঢুকে পড়েছি—

সমবেদনার সুরে কুবের বললে,—কিন্তু লেখার এই অমিতাচার করার দরুণ তোমার লেখার কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে না?

ঘৃণায় নাক কুঁচকে নিয়ে অবনী বললে,—রাবিশ, রট্, কিন্তু তাতে কারো কিছু যায়-আসে না বাঙলা-দেশে। এখানে মুড়ি-মিছরির সমান দর। যতো ভালোই কেন না তুমি লেখ, আর যতো খারাপই না কেন আমি লিখি, আমাদের কোনো তফাৎ নেই, দেখবে সমালোচনায় আমরা পাশাপাশি জায়গা পেয়েছি। সজ্ঞানেও খারাপ লিখলে এখানে পাপ হয় না। তোমার মার্চেণ্ট অফিসের কেরানির লেজারও আর টিঁকে থাকবে না, আমারো সাহিত্য যাবে মরে, ধূলিসাৎ হয়ে, তাতে আমাদের তো ভারি বয়ে গেলো। তা, যাই বলো, তুমিই কিন্তু বেড়ে আছ আমাদের মধ্যে। তাকে অভিবাদন করবার জন্যেই যেন অবনী তার একখানা হাত চেপে ধরলো: বৃহস্পতি তোমার তুঙ্গী, তাই বলা-কওয়া-নেই, এমন একখানা দাদা পেয়ে গেলে! আর আমাদের কপালে, সেই যে কথায় বলে—মূলে মাগ নেই, তায় ফুলশয্যে। দাদা দূরে থাক, অবনী ফিসফিসিয়ে বললে,—স্বয়ং যিনি জন্মদাতা, সারা জীবন কেবল তিনি হাই তুলেই কাটিয়ে দিলেন, একটা কুটো কেটে দু'খানা কোনোদিন করলেন না। যাই বলো, তোমার কাছ থেকে দেশ কিন্তু অনেক আশা করে।

—ছাই। কুবের হতাশ, নিষ্প্রাণ গলায় বললে,—খালি আরামই পাচ্ছি, একটি লাইনো আর লিখতে পারছি না।

—আঃ, একটি লাইনো লিখতে না-পারার সে যে কী আরাম, তা বোধহয় মরবার আগে কোনোদিন বুঝতে পারবো না। অবনী হেসে উঠলো: হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোবার আরাম পেলে কোন্ গাধা তবে আর লিখতো। কাল সকালে উঠতেই দুধওয়ালা তোমাকে তাগাদা দিতে আসবে না—তার চেয়ে বড়ো সাহিত্য সংসারে কিছু আছে বলে তো আমার জানা নেই—

যাবার সময় আর পায়ে হেঁটে নয়, কুবের একটা ট্যাক্সি নিলে। এই দরিদ্র, দূষিত, আবিল আবহাওয়া থেকে পালাতে পারলে যেন সে বাঁচে। দরকার নেই তার এই সাধনার স্বাধীনতা, দরকার নেই তার সকলের সাথে সমপঙ্‌ক্তিভোজন। বাঁচতে হলে সবার আগে চাই মহান স্বার্থপরতা, তার সঙ্গে সহজ সামঞ্জস্য। ট্যাক্সিতে গা ছড়িয়ে বসে খোলা হাওয়ায় সে যেন মুক্তি পেলো।

মুক্তি পেলো সে তার নরম, মিষ্টি আলোয় পরিচ্ছন্ন ঘরে ফিরে এসে। উত্তপ্ত আশ্রয়ে, শয্যার বিস্তৃত বিশ্রামে। ধাবমান জীবনের থাক তার উদ্দাম অবাধ পক্ষচালনা, বেশি শান্তি এই নীড়ের নির্বাত নিশ্চিন্ততায়। সে কবিতা লিখুক যতো খুশি, কিন্তু থাক, জীবন নিয়ে সে যেন অনর্থক কাবিষ্ট না করে। এই সে বেশ আছে।

দোর-গোড়ায় চাকর তটস্থ, কুবেরের কনিষ্ঠ আঙুলের মৃদু চালনার দিকে সে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

বাথরুম থেকে ফিরে এসেই কুবের ইজিচেয়ারটায় ভেঙে পড়লো।

শান্তি তারো সত্যি নেই, এক বিষণ্ণ আবহাওয়া থেকে আরেক জ্বলন্ত আবহাওয়ায় সে চলে এসেছে মাত্র।

—কখন ফিরলে? সুশান্ত কাছাকাছিই তার জন্যে অপেক্ষা করছিলো: তোমাকে বললাম না, আমি তোমাকে সঙ্গে করে বেরুবো? কোথায় গেছলে শুনি?

—এই একটু ঘুরে এলাম। কুবের বললে: শরীরটা ভালো লাগছিলো না।

—তবে গাড়ি নিয়ে বেরুলে না কেন? অসুস্থতার কথা শুনে সুশান্ত দমে গেলো: এখন কেমন আছ?

—ভালো আছি।

—যাক, আজ আর রাত জেগো না, বুঝলে? কী খাবে?

—যা রোজ খাই।

—খেয়ে-দেয়েই ঘুমিয়ে পড়ো, বুঝলে? শরীরের প্রতি অবহেলা হচ্ছে নীতির প্রতি অবমাননা। ঠাকুরকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমার খাবার আজ এইখেনেই দিয়ে যাবে।

সুশান্ত চলে গেলো।

কিন্তু লাইব্রেরিতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কি-এক গভীর, গূঢ় গবেষণা শেষ করে সে যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলো, দেখতে পেল কুবেরের ঘরে আলো জ্বলছে। ঘুমোবার আগে আলো নেভাবার কথা হয়তো তার মনে ছিলো না। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে যেতেই সে থমকে দাঁড়ালো।

রুক্ষ, উস্কখুস্ক চুল, রাত্রি-জাগরণে চোখ গেছে বসে, মুখে ক্লান্ত বিশীর্ণতা—একটা প্রেতগ্রস্ত বিভীষিকার মতো কুবের ঘরময় পাইচারি করে বেড়াচ্ছে, হাতের কি-একটা কাগজ থেকে কি-কতোগুলি আবৃত্তি করে যাচ্ছে বিড়বিড় করে। তার যেন সে একটা নির্মম ক্রিমিন্যাল-এর চেহারা—চোখে-মুখে তার হিংস্র, উগ্র বন্যতা।

প্রথম দেখায় সুশান্ত যেন ভয় পেয়ে গেলো। তারপর তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে এসে ধমক দিয়ে উঠলো: এ কী হচ্ছে, কুবের?

কাগজটা তুলে শিশুর মতো অনর্গল আহ্লাদে কুবের বলে উঠলো: কবিতা, একটা কবিতা লিখে ফেললাম, সুশান্ত-দা।

—তোমার না আজ শরীর খারাপ?

—লিখতে বসে সেকথা আর মনে ছিলো না।

—দেখি, কেমন হলো। সুশান্ত হাত বাড়াতেই কুবের কাগজটা সমর্পণ করলে।

কয়েক লাইন পড়েই সুশান্তর মুখ মেঘলা করে এলো। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে,—এ তুমি কাকে নিয়ে লিখেছ জিগ্গেস করি?

—কাকে নিয়ে আবার লিখবো? কুবের বললে,—আমাকে নিয়ে।

—কিন্তু আবার তুমি প্রেমের কবিতা লিখতে গেলে যে?

—উপায় কী। তাছাড়া কী আর আমার লেখবার আছে? কুবের চেয়ারে

বসে স্বচ্ছন্দে এখন একটা সিগারেট ধরালো : সংসারে প্রেম ছাড়া কিছু আর আমার বলবার নেই, আমি অসহায়, তাছাড়া আমি ভীষণ অসহায়। আমার সমস্ত দেহ-মন যদি তাই সমস্বরে বলতে চায়, তবে আমি আর কী করতে পারি ? পাগলের মতো কুবের আপন মনে হেসে উঠলো ; গুনগুন করে বললে,—Now I clap my hands and cry, 'Eureka', 'Eureka' !

সুশান্ত অবাক, চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে।

॥ চোদ্দ ॥

শীত পড়ে গেছে—আঠারোই পৌষ মিসেস সোমের জন্মদিন এই এসে গেলো। প্রতি বারের মতো এবারো তিনি একটা ধুমধাড়াক্কা করবেন। এ-ব্যাপারের মধ্যে নতুনত্ব শুধু এই যে উৎসবের আয়োজন ও অনুষ্ঠান তাঁর নিজেকেই করতে হয়, সংক্ষেপে বলতে গেলে, বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন করে বিস্তৃত একটি ভোজ দেন। কাঁটাছাঁটা সাহিত্যালোচনা হয়, টুকিটাকি গান, আর বন্ধু-বান্ধবরা চাদরের তলায় পকেটে করে যে সব প্রেজেন্ট নিয়ে আসে, মাকে ডিঙিয়ে মেয়ের হাতেই পৌঁছে দেয়া যেন তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মিসেস সোম যে ক্রমশ আধুনিকতরো হয়ে উঠেছেন প্রতি বছরেই তার পরিচয় পেয়ে সবাই উত্তরোত্তর স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে। ফ্যাশানের সঙ্গে-সঙ্গে মিসেস সোমও তাঁর মনের ডৌল চলেছেন বদলে।

সবাইরই ছিলো আগ্রহ বেবিরো একটা জন্মদিন হোক, মিসেস সোমের ছিলো ঘোরতরো আপত্তি সে কেন এই জাতীয় কল্যাণানুষ্ঠানে উদ্যোগী হবে না। বেবিকে কেউ কিছু এবিষয়ে বলতে এলে সে খর-রসনায় জবাব দিতো : আমার জন্মগ্রহণে বসুন্ধরা কী-এমন সুজলা সুফলা হয়েছেন যে আমাকে নিয়ে ধেই-ধেই করে নাচতে হবে। নিজের ভ্যানিটিকে তৃপ্ত করবার আরো অনেক ভদ্র উপায় মানুষের আছে।

অনুগৃহীতের দল তাতেই বাধিত হতো না, মুচকে হেসে জিগগেস করতো : আচ্ছা, তোমার জন্মের তারিখটা আমাদের দাও না।

বেবি উঠতো ঝঙ্কার দিয়ে : খবরদার মা, পাঁজির পাতার ও-তারিখ মিথ্যে তারিখ। আমার জন্মের ঘটনাটা একটা অচল মুহূর্তে আবদ্ধ হয়ে নেই। প্রতি নতুন ক্ষণে আমার জন্ম হচ্ছে, প্রতি নতুন ক্ষণে করছি আমি তার উৎসব। সেখানে আপনাদের অবিশ্যি কারুর নিমন্ত্রণ নেই, আমি তার জন্যে ভীষণ দুঃখিত।

মিসেস সোম নিমন্ত্রিতদের তালিকা প্রস্তুত করছিলেন। বললেন,—দেখ তো কেউ তেমন বাদ পড়লো কি না।

তালিকাটা খুব সীমাবদ্ধ। তাই একবার চোখ বুলিয়েই বেবি বলে উঠলো : কুবের—কুবেরবাবু কোথায় ?

—ওকে আবার কী বলতে যাবো ? মিসেস সোম নাকের ডগাটা সুচলো করে তুললেন : তোর বন্ধুদের কাউকে বলবি নাকি ? লাবণ্য, বুলা, পুষ্প—

—ওরা, বেচারিরা এখানে এসে কী করবে ? কী বুঝবে এর উচকপালে'-র ? বেবি মুখ ভার করে বললে,—বন্ধুর মধ্যে একজনকে শুধু বলতে চাই।

—বেশ তো, কে সে ? সোফারকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো না হয়।

—সে এমন কোনো ত্রিলোকচিন্তামণি নয় মা, যে তাকে গাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে। আমি নিজেই গিয়ে বলে আসতে পারবো। বেবি খোঁপার কাঁটা খুলতে-খুলতে অন্যমনস্কের মতো বললে—আমাদের একেবারে পাশের বাড়িতেই থাকে।

মিসেস সোম আঁৎকে উঠলেন : কে সে ? সুশান্তকে তো বোলবোই।

—সে তো ওপরের তলার হলো, মা। নিচের তলার মানুষটি যে বাদ পড়েছে—

—তুই কু—কুবেরের কথা বলছিস ? মিসেস সোম গর্জন করে উঠলেন : ও তোর বন্ধু হলো ?

চুলে চিরুনি চালাতে-চালাতে পরিষ্কার, প্রসন্ন গলায় বেবি বললে,—বাঙলা-ভাষায় এর চেয়ে আর কী ভালো শব্দ আছে মা ? তারপর সে তার চোখ তুলে ধরলো : আর তাকেই বা তুমি কেন বলতে যাবে না ? রাম যদি আসতে পারে, তবে লক্ষ্মণই বা কেন পারবে না ?

—আমার ইচ্ছে। আমি শুধু 'আবির্ভাব'-গ্রুপকে নিমন্ত্রণ করছি।

—সেও তো তারি মধ্যে পড়ে।

—কক্‌খনো না। লেখা গোটাকতক ছাপা হয়েছে বলেই সে 'আবির্ভাব'-এর একজন হয়ে গেলো না। মিসেস সোমের নাসারন্ধ্র স্ফীততরো হয়ে উঠলো : তবে একটা বর্ষসূচী ধরে লেখক-লেখিকাদের নামে চিঠি পাঠাতে হয়।

—কিন্তু অধিবেশনে রোজ সে আসে।

—তেমনি সুশান্তদের লোকনাথও আসে চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে। আমার জন্মদিনে কাকে-কাকে আমি নিমন্ত্রণ করবো সে-বিষয়ে আমি তোর মতামত জানতে চাই না। মিসেস সোম আয়তনে পর্যন্ত বিস্ফারিত হতে শুরু করলেন : এতো জঘন্য যে লেখে, মেয়েদের প্রতি লেখায় যার এতোটুকু শ্রদ্ধা নেই,—নিতান্ত সে সুশান্তর সম্পর্কে কি ভাই হয়, তারি মুখ চেয়ে ক্ষমাঘেন্না করে আমি 'আবির্ভাব' এর আড্ডায় মাঝে-মাঝে যাই, নইলে—

বেবির অসম্বৃত চুলের মধ্যে চিরুনি রইলো আটকে : সে অবাক হয়ে বললে—লেখার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি, মা ? আর্ট কি কৃত্রিম একটা ভাণ নয়, তার মূল্য কি তার pure objectivityতেই পর্যবসিত থাকবে না ? কোনো মেয়ে যদি সত্যিই অশ্রদ্ধেয় হয়, আর্ট কি তাকে খাতির করে কথা কইবে ?

—তুই থাম। তোকে কে ফোঁপরদালালি করতে বলছে ?

বেবি আবার চুল আঁচড়াতে লাগলো : তুমি বললে কি না মা, আমার বন্ধুদের কাউকে ডাকবো কি না—তাই তো, তাইতে তো,—নইলে আমার কী দায় পড়েছে ! বলে সে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আজ বিকেলে মায়ের সেই জন্মদিন এসে হাজির। দোতলায় ভিতরের দিকে

হল্-ঘরটায় শ-ওয়ালেস্ টেব্‌ল সাজিয়ে দিয়েছে। কোঁচা লুটিয়ে, চাদর ফাঁপিয়ে, বুকে কেউ বা কালো রেশমের ফিতে ঝুলিয়ে, এ.কেক করে লোক এসে যাচ্ছে—'আবির্ভাব'-এর একেকটি উজ্জ্বল তারকা। জুতোয়-জামায় শো-কেইসের বিজ্ঞাপনের মতো তারা ঝকমক করছে। পালিশের ঘটায় ঘরের নিস্তেজ আবহাওয়াটা যেন নিমেষে উচ্চকিত হয়ে উঠলো।

তারা প্রথম বসবে এসে বাইরের এ-বারান্দায়, উপরে টালির ছাদ, নিচে ম্যাজেণ্টা রঙের মার্বেল—সেখানে প্রথম হবে ছোটোখাটো একটি প্রার্থনা, সংক্ষিপ্ত একটু স্তুতিবাচন, ছোট-ছোট দু'টি চারিটি মেয়ের বঙ্কিম, ভারতীয় নৃত্য, বেহালায় দু'টি-চারটি টান, একটু-বা রবীন্দ্রসাহিত্যের ঐশ্বর্যালোচনা এবং সেই আদর্শের প্রতি এই পরিবারের নিষ্ঠা—তারপরেই, আর-কিছুর দরকার নেই, সটান খাবারের টেব্‌লে। প্রেজেণ্টের পালাটা একেবারে নামবার সিঁড়ির কাছে এসে ঠেকবে।

বেবি তাড়াতাড়ি সাজগোজ করে নিলো। অফোটা চাঁপার রঙের মতো ফিকে, নরম একখানা এগারো-হাতি গরদ, গা ভরে সমস্ত শাড়িটা সামলানো যাচ্ছে না, কাঁধ থেকে বুকে ও বুক থেকে কাঁধে, আঁচলটা বারে বারে নামা-উঠা করছে, সদ্য স্নান করে এসেছে বলে গায়ে বৃষ্টি-ধোয়া মাঠের স্নিগ্ধতা, প্লেন দু'টি সরু বালা দীর্ঘ, লীলায়িত দুই হাতে এনেছে শুভ্র লাবণ্য,—সারা শরীরে ফুলন্ত বসন্তের একটা বন্যা তুলে বেবি কুবেরের ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়লো।

কুবের তার ইজিচেয়ারের হাতলে পা দু'টো তুলে দিয়ে পরম নির্ভাবনায় একটা সিগারেট টানছে, বেবিকে আচমকা ঢুকতে দেখে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলো।

বেবি কাছে এসে বললে,—কী, টাস্ক করছেন না ?

সিগারেটটা য়্যাশ-ট্রেতে ঠুকতে-ঠুকতে কুবের হেসে বললে,—He also serves who only sits and smokes. সিগারেটটা নিবিয়ে চেয়ার ছেড়ে সে উঠে পড়লো : বসুন।

খাটের ধারে সামান্য একটু হেলান দিয়ে আধখানা বসে বেবি বললে,—চমৎকার আছেন কিন্তু। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেলো, পাশও যা-হোক একটা করলেন, তবু আপনার নড়বার চড়বার একটু নাম নেই। এখন কী আর করবেন ভাবছেন ?

টেব্‌লের উপর এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে-করতে কুবের বললে,—এই ভাবনা করাটাই আমি ভুলে গেছি। যখন যা ঘটবে তারি সঙ্গে দিব্যি খাপ খাইয়ে নেবো, এছাড়া নিজের ওপর আর আমার বিশেষ আস্থা নেই।

বেবি দুই উজ্জ্বল চোখ তুলে বললে,—আপনাকে সুশান্তবাবু এখানে মানুষ করতে নিয়ে এসেছিলেন—একেবারে পণ্ডশ্রম দেখতে পাচ্ছি। এমনি করে'ই জীবন কাটিয়ে দেবেন ভেবেছেন ?

—পাগল! জীবনকে আপনি এতো সহজ, এতো সংকীর্ণ ভাবেন ? কখন কী বিস্ময় ঘটে তার কিছু ঠিক আছে ?

বেবির চোখ থেকে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা ঠিকরে পড়তে লাগলো : কিন্তু

বিস্ময়ের আর কী দরকার ! যে সুখের সমুদ্রে অনন্ত শয়ন নিয়েছেন, তার চেয়ে আর কিছু বড়ো বিস্ময় আপনি কল্পনা করতে পারেন নাকি ?

— একেক সময় একেকটা দুঃখও প্রকাণ্ড সুখের মনে হয়। কুবের এখান থেকে ওখানে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো : সুখ ? তেমন নির্জীব, নিরানন্দ সুখ সংসারে কে কবে পেয়েছে, কে কবে পেতে চায় ? কে কবে নিজেকে সুখী মনে করতে পারে ? এমন-কি আপনি পর্যন্ত সুখী নন।

উড়ন্ত আঁচল দিয়ে গলাটা লেপটে জড়িয়ে ধরে বেবি বললে—আপনাকে আর অমন খেলো উপনিষৎ আওড়াতে হবে না। আমার কী ! আমার দিব্যি ভালো ঘরে বিয়ে হয়ে যাবে, দিন-দিন শশিকলার মতো সুখে স্ফীততরো হতে থাকবো। আপনার কথাই বরং ভাবুন।

—মিথ্যে কথা। কুবের দীপ্ত হয়ে উঠলো : আপনার কপাল দেখেই বলে দিতে পারি আপনার কপালেও সুখ নেই। আপনার গাইনোকোলজিস্ট-সাহেবকে গিয়ে জিগ্‌গেস করুন, বিয়ে করলেই মেয়েরা সুখী হয় না।

—সর্বনাশ ! বেবি খাড়া হয়ে উঠলা : কিন্তু সুখ-দুঃখের আলোচনা ছেড়ে এখন আমার সঙ্গে আসুন দেখি একবার।

কুবের চমকে উঠলো : কোথায় ?

—আমাদের বাড়িতে, rather আমার পড়ার ঘরে।

—হঠাৎ ?

—আপনাকে আমি নেমন্তন্ন করছি।

- আমার এই সৌভাগ্য ?

—সৌভাগ্যটা কার ? অতিথির, না, অতিথি যে সম্বর্ধনা করে ? বেবি চঞ্চল হয়ে উঠলো : নিন, চলুন তাড়াতাড়ি।

কুবের হেসে বললে,—একটু সাজগোজ করে নেবো না !

—হঠাৎ সাজগোজ করতে যাবেন কেন ?

—বা, এতো সব ভদ্রলোক আসবেন, তার মধ্যে এই বর্বর বেশে যাওয়া যায় নাকি ?

—আপনার কিছু ভয় নেই। ভদ্রলোকদের মধ্যে, আপনিই সেখানে একলা।

— একলা মানে ?

—আমি অবিশ্যি থাকবো। তা বলতে পারেন, আমি ভদ্রলোক নই। বেবি ঘাড়টা একপাশে হেলিয়ে হেসে উঠলো : কিম্বা এ-ও বলতে পারি, আপনাকে এই বর্বর বেশে একবার যখন দেখে ফেলেছি, তখন মিছিমিছি আর আমার কাছে সঙ্কোচ করে কী হবে ? চলুন।

নার্ভাস হয়ে কুবের বললে—কিন্তু নেমন্তন্নটা কী উপলক্ষে জানতে পারি ?

—সবাইর একটা উপলক্ষ থাকবে এমন কোনো কথা আছে নাকি ? বেবি সসঙ্কেতে হেসে উঠলো : আপনার এখানে আসার না-হয় একটা উপলক্ষ আছে— এখানে আপনি কবিতা লেখবার স্বাধীনতা পাবার জন্যে এসেছেন, in other words, কলে তৈরি একটা মানুষ হতে এসেছেন। কিন্তু আপনার কার্যাবলীর মতো আমার কাজগুলি সব সময় উপলক্ষ মেনে চলে না।

কুবের আয়নায় দাঁড়িয়ে চুলগুলি একটু ঠিক করতে-করতে বললে,—ছাই স্বাধীনতা। প্রেমের কবিতা লিখছি বলে তো সুশান্তদা রাগে কাঁই—প্রেমের কবিতা যখন লিখছি তখন চরিত্র আর আমার ঠিক নেই।

—না, না, চরিত্র বাঁচাতে হবে বৈ কি। বেবি ঝরঝর করে হেসে ফেললো: আপনার সুশান্ত-দার মুখ চেয়ে লেখা অতএব ছেড়ে দিয়েছেন তো? চলুন, চলুন, চুল-টুল পরিপাটি করতে হয়, আমার ঘরে গিয়েই করতে পারবেন।

কুবের আয়নার থেকে সরে এলো। জোর গলায় বললে,—লেখা ছাড়বো কী বলছেন? তার চেয়ে মরে যাওয়া যে অনেক সোজা। লেখার জন্যে দেশে-দেশে অনেকের অনেকরকম Persecution হয়েছে, কিন্তু সুশান্ত-দার এ-এক অদ্ভুত অত্যাচার। লেখার আগেই তাঁর Proscription। অসম্ভব।

—অত্যাচার, অসম্ভব,—এসব বলছেন কী?

—আমি আমাকে না লিখে থাকি কি করে? আর যদি লিখলামই, তবে তা ব্রড্‌কাস্ট না করে দিলে তার অর্থ কী। আমি তা একা ভোগ করতে চাই?

—নিশ্চয়, এ তো আর প্রেম করা নয়, প্রেম নিয়ে কবিতা লেখা। বেবি ঠোঁট উলটে বললে,—ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যে কথাই তো বাইরে প্রচার করতে হয়।

—মিথ্যে নয়, বেবি, হঠাৎ তার নামোচ্চারণ করে ফেলে কুবের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো: ঘরের মধ্যে সূর্যের আলো কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু কবিতাগুলো নানান কাগজে বেরিয়ে গেলো দেখে তো সুশান্ত-দা একেবারে একটা স্তম্ভের মতো অটল চেহারা করে আছেন।

—একশো বার করা উচিত। আপনাকে চাইলেন মানুষ করতে, আর হলেন কিনা একটি অপদেবতা। বেবি দরজার দিকে ঘুরে গেলো, সামনের দিকে সামান্য হাত বাড়িয়ে বললে,—চলুন, আর দেরি নয়।

জুতোর মধ্যে পা গলাতে-গলাতে কুবের বললে,—কিন্তু কারণ তো জানা হলো না।

—আপনার প্রেমের কবিতারই কি কোনো কারণ আছে?

কী উত্তর দিতে গিয়ে কুবের হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো। সে-স্তব্ধতা মাত্র একটা বাক্‌নিবৃত্তি নয়, গভীর-মুখর। নিষ্ঠুর, নিরাবরণ তার সশব্দতা।

অস্থির হয়ে বেবিকেই ফের বলতে হলো: আজকে আমার জন্মদিন হবে কি না—

—জন্মদিন হবে মানে?

—মানে, প্রতি মুহূর্তেই তো আমরা জন্মগ্রহণ করছি। আঁচল এলো করে বেবি দ্রুতপায়ে ঘরের বাইরে এলো চলে: আসুন, আসুন আমার সঙ্গে। ইচ্ছেমতো যে কোনো একটা মুহূর্ত আমরা জন্মদিন বলে চিহ্নিত করতে পারি। এতো বড়ো কবি হয়ে এই সামান্য কথাটা আপনি বুঝতে পারেন না?

কথাটা বিশেষ প্রাঞ্জল হলো না, ডুবে গেলো অতলতরো গভীরতায়। কিন্তু কবিতায় কথাই কি সব?

উপরে পার্টিশানের দরজা দিয়ে নয়, বেবি তাকে নিয়ে চললো প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে, দিনের আলোয়—যদিও তখন প্রায় সন্ধ্যে বলতে হবে—সদর দরজার ভিড়

এড়িয়ে ঢুকলো এসে চাকরদের এলাকার দরজায়—যে-দরজা দিয়ে তারা বাজার থেকে সওদা করে বাড়ি ফেরে। ব্যাপারটা আগাগোড়া কুবেরের কাছে ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাসের মতোই রহস্যাচ্ছন্ন। তারপর পা টিপে-টিপে সে ঘোরানো লোহার সিঁড়িটা বেয়ে-বেয়ে কুবেরকে উপরে নিয়ে এলো। তারপর এ-ঘর ও-ঘর করে একেবারে তার পড়ার ঘরে।

ঠাণ্ডা, পরিচ্ছন্ন, ছোট একটি ঘর। একটি টেবুল, খান দুই চেয়ার ও সুন্দর ডিজাইনের একটি বুক-কেইস্‌ ছাড়া আর কোনো বিশেষ আসবাব নেই। টেবুলে জি-ই-সি-র একটা রিভল্‌ভিং ফ্যান, দেয়ালে বড়ো-বড়ো টাইপের একটা ক্যালেণ্ডার। প্লাগ ঢুকিয়ে পাখাটা চালাতে গিয়ে বেবি বললে,—বসুন, এগিয়ে এসে বসুন, আপনি যে এই শীতেও ঘামছেন। চালাবো নাকি ?

—দরকার নেই। শুকনো গলায় কুবের বললে,—ওপাশে অতো হুল্লোড় হচ্ছে কিসের ? সুবিমলবাবুর, সুশান্ত-দার গলা শুনতে পাচ্ছি না ?

—পেলে পাচ্ছেন। আপনি এখন দয়া করে বসুন। বেবি চেয়ারটা টেনে দিলো : ঐ উঁচুকপালে ভিড়ে আমাদের জায়গা নেই, এই আমরা বেশ আছি। তারপর কুবের বললে : আপনার কিছুই সঙ্কোচ করবার নেই। স্বচ্ছন্দে আপনি গলা ছেড়ে হেসে উঠতে পারেন।

কুবের অল্প একটু হেসে বললে—সঙ্কোচ নয়, কিন্তু আমি ভাবছি আমাকে যে জোর করে নিয়ে নিলেন—

—জোর করে নিয়ে এলাম বৈ কি। এখন থেকে অমন সাফাই গাইবেন না বলে রাখছি। বেবি থমকে দাঁড়ালো : কেন, আপনি নিজে ইচ্ছে করে চলে আসতে পারেন না ? না, সামান্য ইচ্ছে বা ব্যক্তিত্ব দেখাতে গেলে আপনার জাত যায় ? বেবি শব্দ করে উঠলো হেসে : অতএব জোর করে না নিয়ে এলে আর উপায় কী ! আলস্য আর আরাম ভোগ করতে-করতে আপনার মেরুদণ্ডই তো ঘুনে ধরেছে। তা, কী হলো তাতে ? জোর করে নিয়ে এলামই বা !

কুবের তার উল্লাস-উদ্ভাসিত শরীরের দিকে চেয়ে বললে,—ভাবছি, পাছে আমার গায়ের হাওয়ায় আপনাদের বাড়ির আবহাওয়া কলুষিত হয়ে যায়।

—পাগল ! নিজেকে আর সে মর্যাদা দেবেন না, কুবেরবাবু। বেবির দু'টি ঠোঁটের সুকোমল বঙ্কিমা বিদ্রূপে হঠাৎ কর্কশ, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো : আপনি তো আপনার সে-মৌলিকতা হারাতে বসেছেন। দিনে-দিনে আপনি তো হতে চলেছেন আপনার অভিভাবকেরই একটা নিষ্প্রাণ রেপ্লিকা। লিখলেন দু'চারটে মিনমিনে প্রেমের কবিতা, তা-ও অভিভাবকের হুমকিতে বন্ধ হয়ে গেলো। প্রতিজ্ঞা করে এলেন আর কোনো কাগজে আপনার কুকীর্তি প্রচার করবেন না। স্বধর্মে যে নিধনও শ্রেয় ছিলো তা ভুলে গেলেন, হারাতে বসলেন নিজের ব্যক্তিত্ব। আপনার প্রাতঃস্মরণীয় সুশান্ত-দা দিব্যি আপনাকে একটি নিটোল, নধর মানুষ বানিয়ে তবে ছেড়েছেন। মানুষের কাছে থেকে এ-বাড়ির কেউ কিছু ভয় করে না।

কুবের জ্বলে উঠলো : কক্‌খনো না, আমি কক্‌খনো আমার হাল ছাড়িনি, ছাড়বোও না। আমি যা লিখবো, তা লিখবো।

—তবে তাকিয়া ঠেস দিয়ে তাই কেবল লিখুন—কোনো কাজ করে আর দরকার নেই।

কুবের বললে মৃদু হেসে : লেখা ছাড়া আর কোনো বড়ো কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে কিনা মাঝে-মাঝে তা আমার সন্দেহ হয়।

—কিন্তু, বেবি চোখ তুলে বললে,—এই লেখার রীতি-নীতি নিয়ে আপনার অভিভাবকের সঙ্গে যে দিনে-দিনে বিরোধ ঘনিয়ে উঠছে—

কুবের গম্ভীর হয়ে বললে,—তাই তো মুশকিল। ভাবছি তেমন ধরনের লেখাগুলি আর ছাপতে দেবো না।

বেবি ঝাঁঝিয়ে উঠলো : কেননা আপনার মাস্টার-মশাই তাতে চটে যাবেন। যেন সমস্ত লেখা আপনার এই গার্ডিয়ানটির মুখ চেয়ে তবে ছাপতে হবে। যেন একা তাঁর জন্যেই আপনাকে লিখতে হচ্ছে। অথচ কবিত্বের খুব কায়দা করে তো বললেন, সূর্যের আলো তুমি ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে পারো না। কিন্তু সূর্যই যদি মেঘে ঢাকা পড়ে রইলো—বেবি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কুবের ম্লান গলায় বললে,—কিন্তু সুশান্ত-দা আমার জন্যে এতো করছেন, মিছিমিছি তাঁকে ক্ষুণ্ন করে—

—মিছিমিছি? তাই তবে বলেন না কেন? বেবি মুখ বেঁকিয়ে বললে।

—কী মিছিমিছি, বেবি?

—আপনার কবিতার পেছনে তবে কোনো সত্য, কোনো উপলব্ধি নেই? আমিই বা তবে বোকার মতো কী এতো বকে যাচ্ছি।

—ভীষণ, ভীষণ সত্য আছে। কুবেরের মুখ-চোখ, সমস্ত চেহারা কেমন বদলে গেলো।

—যদি সত্যই থাকে, বেবির মুখ রাত্রির অন্ধকারে কম্পান্বিত একটি তারকাবিন্দুর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—জানলা খুললেই যে প্রথম তারা হঠাৎ ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ বলে মনে হয় : তবে তার কাছে কিসের আপনার সুশান্ত-দার ক্ষুণ্নতা-অক্ষুণ্নতা! শুধু কবিতায় নয়, জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে কোনো বাধা, কোনো বিপদকে আপনি ভয় করবেন না। তা না, আপনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন সুশান্ত-দার হাতে। পরাধীনতা শুধু আপনার সাহিত্যে নয়, জীবনেও।

কুবের হেসে বললে,—আরাম পেয়ে পেয়ে আমি এমনি অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি। এখন আর কারো 'পরে নির্ভর না করতে পারলে যেন আর পথই খুঁজে পাবো না।

—বেশ, তবে তাই হবে। বেবি চঞ্চল হয়ে উঠলো : আপনার সুশান্ত-দাই একদিন আপনাকে পথ দেখিয়ে দেবেন। অপেক্ষা করে থাকুন। তারপরেই হঠাৎ একপশলা হাসির শিলাবৃষ্টি করে বেবি সমস্ত থমথমে আবহাওয়া তরল করে আনলো : বা, আপনাকে জোর করে টেনে নিয়ে এলাম, আর আপনাকে সামান্য এক পেয়ালা চা পর্যন্ত করে দিচ্ছি না।

—তারপর আপনার আজ জন্মদিন। কুবের ঠাট্টা করে বললে,—চমৎকার আতিথ্য করছেন যা হোক।

নিচেই একপাশে স্টোভ, চায়ের সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈরি ছিলো। তারই স্তূপের

মধ্যে, কুবেরের দিকে পিঠ করে বসে বেবি বললে,—জন্মদিনের একেকটা লগ্ন আসে, তাদের তক্ষুণি আটকে রাখতে না পারলে তারা মুহূর্তের ভিড়ে আবার কখন হারিয়ে যায়। যাক্, যেতে দিন।

কুবের বললে,—কিন্তু আপনাকে তো আমার একটা উপহার দিতে হয়।

দুই হাঁটুর মধ্যে ঘাড় গুঁজে বেবি মুখ লুকিয়ে বললে—বেশ, একটা কথাসর্বস্ব কবিতা লিখে দেবেন। আপনার কী—আপনাকে দিয়ে তো আর কোন বড়ো কাজ সম্ভব নয়।

নকল বৃষ্টিপাতের শব্দ করে স্টোভ জ্বলছে। কেটে গেলো অনেকক্ষণ। এর পর কুবের কী বলে তারি আশায় বেবির সমস্ত অণু-পরমাণু যেন শ্রুতিমান হয়ে আছে। সাহস করে সে মুখ ফেরাচ্ছিলো না, হয়তো কুবের এর পর তার খোঁপায় কিম্বা পিঠে রাখবে একখানি হাত, নীরব সহানুভূতিতে বসবে এসে তার পাশ ঘেঁষে। সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে তার কিন্তু ভারি একটা চমৎকার সঙ্গতি ছিলো, বেবির বসবার এই ভঙ্গিতে ছিলো অবারিত একটি প্রশ্রয়। প্যানের জল পর্যন্ত উঠলো ফুটে। তবু কুবেরের কোনো সাড়া নেই। সুশান্ত-দা না আদেশ করলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারছে না।

জলে চা ছেড়ে দিয়ে বেবি বললে,—বার্নড-শ এলেন-টেরিকে একবার একটা চিঠিতে লিখেছিলেন: It is not your business to be happy, but to carry the flag to victory. কথাটা আমার মনে গেঁথে আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি এই সুখই চান, নিজের গৌরব চান না।

কুবের অসহায়ের মতো বললে,—পাছে বেশি সুখ পেতে গিয়ে নিজেকে আরো অগৌরবের মধ্যে টেনে নিয়ে যাই, তাই ভয়ানক ভয় করে, বেবি। কিন্তু তুমি যদি বলো, তুমি যদি—

বেবি চুপ করে চা তৈরি করতে লাগলো। এক বাটি আগে তাকে এগিয়ে দিয়ে সে নিজে আরেক বাটি নিয়ে বসলো চেয়ার টেনে। বললে,—গলায় তার উত্তেজনার আমেজ পাওয়া যাচ্ছে: কিন্তু, আমারো কিন্তু জীবন নিয়ে খুব বড়ো একটা adventure করতে ইচ্ছে করে। আমরা মেয়েরা কি করে কী লিখবো বলুন? কতো সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে আমরা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছি। জীবনের কতোটুকু আমরা দেখি, কতোটুকু আমরা পাই? আমারো তাই ইচ্ছা করে—আমারো তাই ইচ্ছা করে খুব একটা ফাঁকা জায়গায় চলে আসি, আপনার মতো পরের ওপর নির্ভর না করে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াই—

হঠাৎ দরজার কাছে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শুনে দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে উঠলো। বেবির মুখে অবিশ্যি স্বচ্ছ হাসির ফুটলো একটি আভা, কিন্তু কুবেরের মুখ প্রায় ধরা-পড়া চোরের মতো বিবর্ণ।

যা ভেবেছিলো তাই। দরজা ঠেলে মিসেস সোম হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে হাজির। ঘরের চেহারা দেখে তাঁর সমস্ত শরীর যেন এক নিমেষে একটা শিলাস্তূপে পরিণত হলো। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো দুই প্রস্তরখণ্ডের একটা সঙ্ঘর্ষের মতো: এ কী? এখানে তুই কী করছিস, বেবি? আমি ওপরে নিচে

ডাকাপিক করে হায়রান হচ্ছি এখানে-সেখানে তোকে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে, আর তুই কিনা—শিগগির উঠে আয় বলছি।

চায়ের বাটিটা হাতে নিয়ে বেবি উঠে দাঁড়ালো : কেন, ও'রা এখনো সব বিদেয় হননি ?

—অভ্যাগত অতিথিদের ফেলে এখানে তুই—এ তুই কী হচ্ছিস দিন-দিন ? এ-সময় এ-ঘরে তোর কী দরকার ?

নির্মল হাসিতে মুখখানিকে শিশুর মতো সরল করে বেবি বললে,—নিরিবিলিতে বসে একটু শুধু চা খাচ্ছিলাম, মা।

—উঠে আয় বলছি। মিসেস সোম হাত ছুঁড়তে লাগলেন : ও'রা সবাই তোকে ডাকছে।

—কারা ?

—সুশান্ত।

—তাঁকে এইখানেই আসতে বলো না।

বলতে হলো না, সুশান্ত নিজে থেকেই হাজির। একমাত্র তারই বুঝি এ-ঘরে আপনকর্তৃত্বে ঢুকে পড়ার অধিকার ছিলো। খাওয়া শেষে আর সবাই তখন দূরের বারান্দায় ও সিঁড়িতে ভদ্রলোকের মতো অস্ফুট গুজগাজ ও ফিসফাস করছে।

সুশান্তও ঘরে ঢুকে থমকে গেলো। চোখ পড়লো তার কুবেরের উপর—যেখানে সে অপ্রত্যাশিতের ধাক্কায় বিপর্যস্ত, প্রায় মুহ্যমান হয়ে বসে আছে।

কিন্তু বেবি তাকে আড়াল করে দাঁড়ালো : আসুন। আমি আজ আপনাদের সভায় যোগ দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

সুশান্ত নিজেকে সামলে নিলো। কুবেরের দিকে চেয়ে বললে,—তুমি এখানে কোত্থেকে এলে, কুবের ?

বাটির হাতলের উপর আঙুলের টোকা দিতে-দিতে কুবের বললে—আমাকে উনি এখানে হঠাৎ ডেকে নিয়ে এলেন। বিনা নিমন্ত্রণে আসিনি।

বেবির সমস্ত রোমকূপে কে যেন তীক্ষ্ণ সূঁচ ফোটাতে লাগলো। দুর্বল, মজ্জালেশহীন, ভীরু, কাপুরুষ কোথাকার! চরিত্রহীন বলে একেই! যেন এখানে আসবার পক্ষে সব সময়ে তার একটা নিমন্ত্রণ চাই। সে যেন নিজের ইচ্ছায় জোর করে এখানে আসতে পারতো না। কোথায় সে পুরুষের দৃপ্ত বলিষ্ঠতায় বেবিকে রক্ষা করবে, না, নিজের অপরাধ-ক্ষালনের চেষ্টায় এমন একটা হীন স্বীকারোক্তি করলে! বেবির সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠলো। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে কুবেরের মুখের উপর যেন কতোগুলি বন্দুকের ছররা ছুঁড়ে মারলো : বিনা নিমন্ত্রণে যেমন এখানে আসেননি, আশা করি তেমনি এখান থেকে চলে যাবার সময়ো আপনার একটা হুকুমের দরকার হবে। সে-হুকুম আমিই দেবো, আমি যখন সাধ করে ডেকে আনতে গেছলাম। যান, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কী হাঁ করে ? অভিভাবক তো সশরীরেই বর্তমান আছেন, তিনি পথ দেখিয়ে নিরাপদে নিয়ে যেতে পারবেন। বলে চায়ের বাটিটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বেবি সেখান থেকে সটান ছুটে বেরিয়ে গেলো।

নিমেষে সমস্ত ঘরের আবহাওয়া নির্বাত, নিষ্কম্প, নিশ্চল হয়ে রইলো। ঘরের মধ্যে যারা ছিলো তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারলো না। যে যার মনে আস্তে-আস্তে একে-একে বেরিয়ে গেলো মাত্র।

॥ পনেরো ॥

সুশান্ত ব্যাপারটায় আর ঢিল দিতে পারলো না। কবিত্ব করে লগ্ন আর পিছিয়ে রাখবার কোনো মানে হয় না। সময়ের জন্যেই সে যদি এতোদিন অপেক্ষা করে থাকে, তবে এই এসেছে সময়।

কথাটা পাকাপাকি করে ফেলবার জন্যে মিসেস সোমের কাছে বড়োবৌদিকে সে পাঠিয়ে দিলে।

মুখে তার এমন একটা নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের ভাব যে তার এই আকস্মিক আগ্রহাতিশয্যের যেন কোনো নিগূঢ় অর্থ নেই। ব্যাপারটা যখন প্রায় দু' পক্ষ থেকেই অবধারিত, তখন আসছে মাঘেই হয়ে যেতে দোষ কী! আর তার সঙ্গে বিয়ে হ'লে বেবির পড়াশুনোর ব্যাঘাত হবার তিলমাত্র সম্ভাবনা নেই—অতএব ও-পক্ষ থেকেও আবেগের স্রোতে এমন ভাটা পড়বে না।

কুবেরকে সে এ-সংসারে অনেক জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলো, কিন্তু তাই বলে সে যে যোগ্যতাতিরিক্ত এতোখানি জায়গা জুড়ে বসতে চাইবে এটা তার কাছে একটা দুর্বিনীত স্পর্ধার মতোই দেখালো। এইখানে সুশান্ত একটা কবির কৃত্রিম মুখোশ টেনে আর বসে থাকতে পারলো না, পারলো না সময়ের হাতে ঘটনার অঢেল সুতো ছেড়ে দিতে : হয়ে উঠলো সে স্থূল, শরীরী, যান্ত্রিক একটা মানুষ—সীমা-সংকীর্ণ, হয়তো বা প্রবল স্বার্থপর। অবিমিশ্র স্বার্থপরতাই বা তাকে কি করে বলো? বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলতে পারা যায় survival of the fittest.

কুবেরের সঙ্গে—যাকে সে স্থান ও প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে এইখানে নিয়ে এসেছিলো, তারি সঙ্গে বাধলো তার একটা স্পিরিচুয়্যাল সংঘর্ষ। অথচ বাইরে সে তার এতোটুকু আঁচড় ফুটতে দিলো না। খবরটা তাড়াহুড়ো করে কুবেরের কানে পৌঁছে দেবারো কোনো সার্থকতা নেই। যেমন তার কক্ষে ঘুরে গিয়ে পৃথিবী একদিন সূর্যের সম্মুখীন হবে, তেমনি, তেমনি সহজে একদিন ঘুম ভাঙতেই চোখের সম্মুখে ব্যাপারটা সে প্রত্যক্ষ করবে মাত্র। এবং সেটা যতো শিগ্‌গির সম্ভব।

কুবেরের কবিতা হঠাৎ যেদিন অন্য স্রোতপথে বিরাট একটা মরুভূমির উপান্তে এসে পড়েছিলো, সেদিনই সে বুঝেছিলো এই দেশের নির্দেশ তাকে কে দিয়েছে, কোন মরীচিকা! তখনই চেয়েছিলো তাকে নিরস্ত করতে। বন্যা তখন এতো প্রবল, কোনো বালির বাঁধই টিঁকলো না। কুবের লিখে চললো কবিতার পর কবিতা, পিপাসায় শুষ্ক, প্রতীক্ষায় উন্নিদ্র। তার কল্যাণচিন্তা করেই সুশান্ত তাকে প্রশ্রয় দেয় নি। কিন্তু তাকে অতিক্রম করে কুবের তা মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিকীর্ণ করে দিয়েছে, ভেবেছে একটা কথা খুব উচ্চকণ্ঠে প্রচার করলেই বুঝি তা জীবনে সত্য হয়ে দাঁড়াবে। এই অন্যায় অবাধ্যতার পরও সুশান্ত মুখ বুজে ছিলো, কিন্তু সেই দিনের সে-ঘটনার পরেও

কুবেরের চক্ষুরুন্মীলন হলো না। সে কবিতায়, আরো কবিতায় তার সমস্ত দেহ-মন যেন বিসর্জন দিলে। আগের কবিতা তবু সে লিখতো ফিকে একটু চোখের জলে, এখন লিখতে শুরু করেছে গাঢ়, মদির রক্তে। এইখানেই কুবেরকে আর সে ক্ষমা করতে পারলো না।

আগে-আগে যে-সব কবিতা সে ছেপেছে, তার ছিলো রেখার অস্পষ্টতা, রঙের কোমলাভ বিষণ্ণ একটি প্রশান্তি, ভাবের অস্ফুট কবোষ্ণতা মাত্র। সেখানে বড়ো ছিলো সে নিজে, নিজেকে কৃতার্থ বলে জানানোই ছিলো তার আনন্দ—তার প্রেম ছিলো তখন পূজার পর্যায়ে, অভিনন্দনের উৎসবে। কিন্তু এখন আর পূজা নয়, অভ্রভেদী, তীব্র এক পিপাসা, অভিনন্দনের দূরত্ব অতিক্রম করে প্রেম এখন যেন অন্তরঙ্গরূপে সমাসীন হয়েছে। রেখাগুলি এখন ক্ষুরধার স্পষ্ট, রঙে এসেছে বিহ্বল প্রগল্‌ভতা, ভাবে কামনার উত্তাপ, ভাষায় আর্তনাদের লেলিহান বহ্নিচ্ছটা। সেই দীপ্তিতে সুশান্তর চক্ষু গেলো ধাঁধিয়ে, শরীর-মন শতমুখে জ্বালা করে উঠলো। এতোটা সে সহজে হতে দিতে পারবে না। বুঝতে তার বাকি নেই এই রঙে-রেখায় কাকে সে মূর্তিমতী করতে চাইছে, কাকে সে দিতে চায় অমরণ মাধুরী। থাকুক, কুবের থাকুক তার এই কবিতা নিয়ে। সুশান্ত আর দেরি করতে পারে না।

কুবের সেদিন মুখ ফুটে বলতে পেরেছিলো: দিন কয়েকের জন্যে কোথাও একটু ঘুরে আসি, সুশান্ত-দা। পরীক্ষা পাশ পর্যন্ত করলাম, তবু এখনো এক-বারটি বেরুনো হলো না।

সুশান্ত তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলো: যাবে বৈ কি, যখন তোমার খুশি। কিন্তু বলি কি, আর একটা মাস পরেই না-হয় গেলে।

—কেন?

—এই আসছে মাঘেই, বেশি দেরি নেই, আমি বিয়ে করবো ভাবছি।

—তাই নাকি? কুবের খুশিতে উঠেছিলো ঝিলিক দিয়ে, কিন্তু ভুলেও একটিবার সে জিগ্গেস করলো না, কাকে?

সুশান্ত গায়ে পড়েই তাকে বলেছিলো: তুমি তাঁকে চেনো। পাশের বাড়িতেই তিনি থাকেন। কথা আমাদের অনেক দিন আগে থেকেই একরকম ঠিক কি না। আর একটি মাস কুবের, তারপর যেখানে ইচ্ছে, যতোদিন খুশি, তুমি বেড়িয়ে এসো।

হ্যাঁ, যখন ইচ্ছে তখনই সে চলে যেতে পারে। কুবেরকে দিয়ে তার স্বপ্ন-দেখার দিন এতোদিনে ফুরিয়ে এলো। তাকে সে আর ধরে রাখতে চায় না, পারবেও না হয়তো। তাকে সে তার সাহিত্যিক নীতি থেকে পারলো না বিচ্ছিন্ন করতে; কোনো লাভ, কোনো ক্ষতি, কোনো বেদনাই তাকে ভ্রষ্ট করতে পারলো না। সে তাকে একমাত্র মুক্তি দিতে চেয়েছিলো, তাই সে দু'হাত ভরে অজস্র গ্রহণ করুক।

কিন্তু থাকতেই যদি বা সে চায়, সুশান্ত কখনোই তার শাখা-প্রশাখা গুটিয়ে নেবে না। আরাম চাক, অর্থ চাক—সুশান্ত এতো কলুষিত, কৃপণ, বা অনুদার

নয়। কুবেরের কাব্য-প্রতিভার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্যে সে সমস্ত বন্ধুর পথ সমতল করে দিতে সব সময় প্রস্তুত আছে। এ শুধু সংসারের চোখে পারিবারিক একটা ঘটনা ঘটছে মাত্র, তার জন্যে; কুবের না চাইলে, কক্‌খনো সে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে না।

ভেবে দেখতে গেলে, কুবেরের কিন্তু এ ভালোই হলো। সে আবিষ্কার করবে কবিতার এক নতুন উৎস-মূল। হয়তো বা তার জীবনের প্রথম, পরম বেদনা। সে-বেদনায় তার আকাশে জাগবে সাতরঙা রামধনু, পৃথিবীতে ফুটবে লাবণ্য, জীবন হবে সুস্বাদু। মূলে বেদনা যতো গভীর, রূপে সৃষ্টি ততো ঐশ্বর্যশালী। পরিমিত পরিধির মধ্যে গৃহস্থ হবার পণ নিয়ে সে আসেনি, সে বর নিয়ে এসেছে কবি হবার, স্বয়ং ঈশ্বরের সমকক্ষতা করবার। যদি বেদনা কিছু সে পায়, তার—অশ্রু-সাগরের থেকে জন্ম পাবে এক মহত্তরো, বিপুলতরো পৃথিবী। এ বেদনা তার অকল্যাণের হবে না।

বড়োবৌদি মিসেস সোমের কাছে গিয়ে কথাটা উত্থাপন করলেন।

এবং এইবার, এতোদিন বাদে মিস্টার সোমের প্রথম আবির্ভাব হলো। নাকে চশমা লাগিয়ে তিনি স্ত্রীকে জিগ্গেস করলেন: কথাটা শুনেই তো খুব নাচানাচি শুরু করেছ, কিন্তু মেয়ের মত নিয়েছ তো?

মিসেস সোম মুখ বেঁকিয়ে বললেন,—বেবি আমার এতো কাঁচা মেয়ে নয় যে এমন পাত্র লুফে নেবে না। চাণক্যশ্লোকের সব কন্‌ডিশান্ এখানে একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে—কন্যা বরয়তি রূপং, মাতা বিত্তং, পিতা গুণং—আর ইতর জনকে যা আমরা খাওয়াবো—

—অতো উথলে না উঠে বেবিকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও দিকি।

বেবিকে সঙ্গে করে মিসেস সোম তক্ষুণি ফিরে এলেন। গা-ময় আধময়লা শাড়ি ও একপিঠ রুক্ষ চুলে বেবিকে ভারি স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিলো, ভারি স্তিমিতাভ। মিস্টার সোম তাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন ও তার একখানি হাতে হাত বুলুতে-বুলুতে জিগ্গেস করলেন: এ-বিয়েতে তোমার মত আছে তো, মা?

বেবি পাতলা ঠোঁটে মিষ্টি একটু হেসে বললে,—মত না করবার কী আছে?

—কিন্তু খুব একটু আগে হচ্ছে বলে তোমার মনে হচ্ছে না তো? বি-এটা পাশ না করতে—

মিসেস ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: পাশ করে তো মেয়েদের কতো পাখা গজাচ্ছে। সুশান্ত ওর চাকরির প্রত্যাশা করে না।

—তুমি চুপ করো তো। ও কী বলে শুনতে দাও না ছাই।

বেবি বললে—বি-এ পাশটা এমন কিছু ভয়ানক কথা নয়, বাবা, যে বিয়ে হয়ে গেলে তা ঘটে ওঠা অসম্ভব হবে।

সোমপত্নী আরেকটা হাউই ছাড়লেন: তারপর বিয়ে করে সুশান্ত বেবিকে নিয়ে কণ্টিনেণ্ট যাবে ঠিক হয়ে আছে। সারা য়ুরোপ টুর্ করতে অন্তত ছ'টি মাস। তোমার ক'টা বি-এ পাশ মেয়ের এমন শিক্ষার সুযোগ মেলে শুনি?

মিস্টার সোম তাঁর স্নেহস্পর্শে বেবির সর্বাঙ্গে আশীর্বাদ বর্ষণ করতে লাগলেন: খুব ভালো কথা, মা। তোমার যখন মত আছে, তখন আর কোন কথা নেই।

হ্যাঁ, মত আছে বৈ কি। তার পড়ার ঘরের অন্ধকার নির্জনতায় বসে বেবি চুপ করে বাইরের জানলা দিয়ে কোথায় কোনদিকে যেন শূন্য চোখে চেয়ে আছে। সহরের ধোঁয়াটে আকাশ কুয়াশায় কালি হয়ে আছে, তারই ভিতর থেকে সে যেন—মনে-মনেই হয়তো—দেখতে পাচ্ছিলো সুদূর, একাকী একটি তারা। হয়তো দিনের প্রত্যক্ষ সূর্যের চেয়েও জ্যোতিষ্মান, কিন্তু রাত্রির বিস্তীর্ণ অন্ধকারে কতো অস্পষ্ট, কতো সঙ্কুচিত হয়ে আছে।

নিশ্চয়, বিবাহের পাত্র হিসেবে সুশান্তর ত্রিসীমানায়ো বুঝি কেউ আসতে পারে না, কিন্তু তার জীবনে বিবাহের অতিরিক্ত কোনো আকাঙ্ক্ষা, কোনো আরাধনাই কি ছিলো না? সে কি আগাগোড়াই একটা কল্পনার কম্পন, অনুভূতির অনুরাগ—তার মাঝে কি কোনো সত্য, কোনো নিত্যতা নেই? ভাবতে ভাবতে বেবির দুই চোখ অশ্রুজলে হঠাৎ ছলছল করে উঠলো: নির্জন অন্ধকারে বসে প্রথম এই একটু চোখের জল ফেলতে তার ভারি ভালো লাগছে।

রাখো, রাখো এই বেদনার বিলাসিতা। কল্পনার আকাশ থেকে কঠিন বাস্তবতার মাটিতে নেমে এসো। বেবি চোখ মুছে উঠে বসলো, ভাবলো গুনগুন করে একটা গান গেয়ে মনটাকে সে হাল্কা করে। এলো না কোনো গান। তার চারপাশে শুধু নীরবিত রাত্রি, আর দূরে, মনে-মনে, একাকী একটি তারা। আর মাঝখানে সে কী নিঃস্ব, কী ভীষণ অসহায়।

কিন্তু কার উপর অভিমান করে সে এ দুঃসহ কাণ্ড করতে যাচ্ছে। আর, না করেই বা উপায় কি! কুবেরের কবিতা থেকে সুশান্তবাবু তার আবিল আসক্তির পরিচয় পেয়েছেন, তারপর সেই দিনের কাণ্ডে তাতে চড়িয়েছেন আরো রঙ, দলের মাঝে চুপিচুপি রটিয়ে দিয়েছেন তার কলঙ্ক। মাকে করছেন bully, কুবেরকে দিচ্ছেন ধমক। এ প্রায় blackmail করে বিয়ে করা—যদিও কুবের না এসে পড়লে এমনি হয়তো ঘটনাক্রমে বিয়ে হয়ে যেতো। পরিবারের সঙ্গে, নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে কতো আর সে একা যুঝতে পারে। সুশান্তকে বিয়ে না করে কী-ই বা উপায়! তার কে আছে আর? সেই তারাটির দিকে চেয়ে বেবি মনে-মনে জিগ্‌গেস করলো: বলতে পারো, আমার আর কে আছে?

মেরুদণ্ডহীন, অকর্মণ্য, পরাশ্রয়নির্ভর এক অক্ষম কবি। শ্লথপ্রাণ, আত্মকর্তৃত্বহীন। সমস্ত আবেগ যে একমাত্র লেখনীর মুখে ক্ষয় করছে। নিজেকে না পারছে প্রসারিত করতে, না বা তুলতে ঘটনার উপরে। চায় স্থবির আরাম, গতির আবর্ত নয়—স্থলের আশ্রয়, স্রোতের নয় তীক্ষ্ণতা। ক্ষীণায়ু, মিটমিটে একটা জোনাকি—তার পাশে সুশান্ত একশো-ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারের রঙিন, সুতীব্র একটা বিদ্যুদালোক। সে তার পায়ের নখের যোগ্য নয়।

বেবি দুই হাতে তার মনের মুখ চেপে ধরলো—তার এই অভাবনীয় আবদার আর শুনতে পাচ্ছে না। বিয়েটা একটা পদ্য-মেলানোর মতো ছেলেখেলা নয়, সেখানে রঙিন ফানুস না উড়িয়ে দস্তুরমতো ফাই-ফর্দ রেখে ঘরকন্না করতে হয়। সেখানে বলিষ্ঠ সাহচর্য দরকার, দরকার অর্থানুকূল্য। শিশুকাল থেকে যে আবহাওয়ায় তার জীবন বর্দ্ধিত হয়েছে, তার একটা ছন্দানুবর্তিতা। কাগজের পৃষ্ঠায় কবিতার ছন্দ মেলানোর চাইতে অনেক কঠিন, অনেক ব্যয়সাধ্য। প্রেম

নিয়ে adventure করা যায়, বিয়ে নিয়ে নয়। এটুকু দিব্যজ্ঞান তার আছে।

কিন্তু তাই বলে এমন রাতও মানুষের জীবনে ঝাঁকে-ঝাঁকে আসে না। আজকের মতো একটি-তারা-জাগা ধূসর রাত। তারপর, বিয়ের পর, দিন-রাত্রির উদ্বেল তরঙ্গফেনার মাঝে এ-রাত কবে একদিন হারিয়ে গেছে। আজকের এই রাত!

॥ ষোলো ॥

তবু, তবু কুবের কবিতাই কেবল লিখবে, কেবল লিখবেই।

তার এই অদম্য ও উচ্ছৃংখল আত্মপ্রকাশের বিরুদ্ধে সুশান্ত আর একটিও কথা কইছে না, বরং, ভাবতে কুবের অবাক হয়ে যাচ্ছে, এ-সংসারে তার আদর যেন আরো বেড়ে গেলো। সুশান্ত তার প্রতি আরো অজস্র হয়ে উঠেছে, অনর্গল। তার হাত-খরচের টাকার সংখ্যা গেছে বেড়ে, তার আরামের আরো দুয়েকটা উপাদান: ঘরের বাইরে তার গতিবিধি হয়েছে অবারিত। ক্রমশ সে যেন পাচ্ছে তার ইচ্ছার উপর অপরিমিত অধিকার। শুধু লেখায় নয়, তার দৈনন্দিন ব্যবহারে। সুশান্ত তার থেকে অনেক দূরে যেন সরে গেছে, তার সকল কাজে উপস্থিত থাকা দূরে থাক, সামান্য একটা উঁকি দিতে পর্যন্ত সে আসে না। তার হাতে ছেড়ে দিয়েছে সে এখন দীর্ঘ লাগাম। কেউ আর তাকে কিছু বলবার নেই: যেখানে খুশি সে যাক, যার সঙ্গে খুশি সে মিশুক, যা তার প্রাণ চায় গদ্যে-পদ্যে তারই সে করুক উদ্ঘাটন। আর এসবে যেন সুশান্তর প্রাণ নেই, সে যেন মন দিয়েছে এখন আর কোন গভীরতার সন্ধানে। তার যেন এখন পড়েছে আর কোন জরুরী কাজ। তাই এদিক থেকে সে তার দৃষ্টি নিয়েছে সরিয়ে, একেবারে এখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, তাই কুবেরের কী হলো তাতে আর নেই কোনো তার উৎসাহ।

তাই যদি হয়, কবিতা লেখা ছাড়া কুবেরের আর কী করবার আছে? নিষ্পাদপ, নির্জন মাঠে ঘোড়া-ছুটানোর মতো সে উদ্দাম করে দিয়েছে তার উদ্ধত কল্পনা। রাত্রির অন্ধকার আকাশ জ্যোতিতে বিদীর্ণ করে উড়িয়ে দিয়েছে সে কামনার বিশাল ধূমকেতু। সুশান্ত-দা তবুও নীরব, তবুও সমাহিত। মাসিক-পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেসব উলঙ্গ অভিব্যক্তির প্রাখর্যে তার চোখ আর জ্বালা করে উঠছে না। অভিজাত 'আবির্ভাব'-এর কাছে লুপ্ত হতে বসেছে তার উত্তুঙ্গ সম্ভ্রান্ততা, আজ-কাল সেই 'আবির্ভাব'-এর প্রতিও তার তেমন লক্ষ্য নেই, নেই মর্যাদাবোধের সেই অতিমাত্রা। দিনে-দিনে সব যেন কেমন বদলে যাচ্ছে, রঙ যাচ্ছে চটে, আবহাওয়া আসছে নিস্তেজ, নিরুত্তাপ হয়ে। কুবেরের কাছে লাগছে কেমন অভাবনীয়। মনে হচ্ছে, কোথায়, যেন কোথায় তারি বিরুদ্ধে পাকিয়ে উঠছে একটা ঘোঁট, কোনো কুটিল ষড়যন্ত্র। তার এই মুক্তি যেন এখান থেকে বিদায় হয়ে যাবারই একটা কঠিন ইঙ্গিত। যেন তার পালা গেছে ফুরিয়ে, মিলে গেছে তার দক্ষিণা। এবার সে অন্য জায়গায় গিয়ে ক্যাম্প করুক, কোনো মরুভূমির পারে, বা নিঃসঙ্গ কোনো পর্বতের গুহায়। আর এখানে থেকে তার লাভ কী।

দুই চোখ ধারালো করে কুবের সেই ভবিষ্যতের পথ খুঁজতে লাগলো। দেখলো অবনীকে, দেখলো তারি সব সহচর সাহিত্যিকদের। নির্বান্ধব যাদের সংসার, জীবিকাই যাদের সাহিত্য। দেখলো সেই বিরাট অপচয়, জীবনে তাদের সেই ক্লান্তির কালিমা। এই আরাম, এই নিশ্চিন্ত সুখশয্যা ছেড়ে কোথায় সে যাবে —কিসের সন্ধানে। এখানেই সে পাচ্ছে বিস্তীর্ণ আশ্রয়, নিজেকে সাহিত্যের মাঝে সম্ভোগ করবার পরিপূর্ণ অধিকার। সুশান্ত-দা দিনে-দিনে অলক্ষ্যে তাকে স্বেচ্ছাস্বাধীন করে তুলছেন। তার সবই যখন গেলো, তখন এইটুকু নিশ্চিন্ত আশ্রয়ই বা সে ছাড়ে কেন?

একটা বই পড়তে-পড়তে কুবের হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, হঠাৎ সেই ঘরে পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে, সশরীরে বেবিরই কি না হলো আবির্ভাব। ভীষণ সেজে এসেছে, এই ক'দিনে তবু তাকে যেন একটু বেশি শীর্ণ দেখাচ্ছে, মুখের আভাসে কমনীয় পাণ্ডুরতা। ঠোঁট দুটি আরো তীক্ষ্ণ, চোখ দু'টি আরো গভীর। দু'টি হাত যেন আরো দুর্বল, শরীরের সমস্ত ক'টি রেখা যেন স্তিমিত। প্রথম আবেগে বিস্ময়ের চেয়ে বেদনাই করলো কুবেরকে আচ্ছন্ন।

কিন্তু বাইরের এই আপাত নিস্তেজতার অন্তরালে বেবি যে তার অন্তরে এতো আগুন নিয়ে এসেছে কুবের তা কল্পনাই করতে পারতো না। তার নিষ্পলক, বিমূঢ় চোখের সমুখ দিয়ে বেবি একেবারে তার টেবুলের কাছে এগিয়ে এলো। টেবুলের উপর ডান হাতটা মুঠো করে রেখে সে শরীরে একটা দৃঢ় ভঙ্গি আনলে! কুবেরের মুখের উপর শাণিত দৃষ্টি ফেলে সে পরিষ্কার গলায় বললে,—আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম।

উঠবে, না, বসে থাকবে, কিছু একটা ঠিক করতে না পেরে কুবের জিগ্গেস করলে: কি?

বেবি দমবার পাত্রী নয়, সব কথা সে পরিষ্কার করেই বলতে এসেছে। গলা আরেক পরদা চড়িয়ে সে বললে,—আপনি আমার নামে এসব কুৎসিত কলঙ্ক রটাচ্ছেন কেন?

—আমি? কলঙ্ক রটাচ্ছি? তোমার নামে? কুবের নিজের অলক্ষিতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—নিশ্চয়। টেবুলের একটা ধার শক্ত করে চেপে ধরে বেবি বললে,—আমার নামে এই সব বিশ্রী কবিতা লিখে মাসিক-কাগজে ছাপাচ্ছেন –

—তবু, তবু আমাকে খানিকটা নিশ্চিন্ত করলে যা হোক। কুবের হেসে উঠলো: কবিতা, কবিতা! কবিতা কখনো কারো কলঙ্ক রটায়? ও যে নিছক স্তুতি, মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা।

—কিন্তু, কেন, কেন আমাকে নিয়ে আপনি অমন কবিতা লিখবেন?

—তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখছি একথা তোমাকে বললে কে?

—কে আবার বলবে? বেবি তার কথায় আগুন বিকীর্ণ করতে লাগলো: আমি কি ছেলেমানুষ যে আমাকে চোখ ঠারবেন? একথা কে না জানে? সুশান্ত-বাবু তো একথা দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আমাদের সমস্ত পরিবার হয়ে উঠেছে সন্ত্রস্ত। পাড়ায়-পাড়ায় শুরু হয়েছে কানাঘুষো, নানান রকম কুকথা।

কেন, কেন আপনি এমন আমার অনিষ্ট করছেন? আপনি ভালো কবি হতে পারেন, তাই বলে আপনি ভদ্রলোক নন?

কুবের স্তম্ভিত হয়ে গেলো। বললে,—আমি তো দু'চার লাইন কবিতা লিখি মাত্র, তাতে তোমার কী আমি অনিষ্ট করলাম? ও তো নিরীহ কতোগুলি কবিতা মাত্র, কল্পনার খানিকটা উদ্দাম আতিশয্য। তাতে তোমার কথা আসে কি করে? কবিতা কবিতাই, কারো তো জীবন-বিবরণ নয়।

—নিশ্চয় আমার কথা আসে। বেবির শীর্ণ, দীর্ঘ দেহ নিষ্কম্প শিখার মতো স্থির হয়ে আছে: সেসব কবিতায় আমার নাম পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন, দিয়েছেন আমাকে সনাক্ত করবার আরো সব নির্দিষ্ট সঙ্কেত। আর সাহস পেয়ে এমনো সব অসম্ভব ইঙ্গিত করেছেন যা জীবনে ঘটলে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ থাকতো না। লোকে আগে আমার নাম পেয়ে, ওসব জঘন্য ইঙ্গিতের সঙ্গে আমার নামটা যোগ করে দিয়েছে। কেন, কেন আপনি এই অভদ্রতা করছেন।

কুবের গম্ভীর হয়ে বললে,—এ তোমার ঠিক কাব্যের রসবিচার হচ্ছে না, বেবি। লোকেরা তাদের নিজ-নিজ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে কী-কী স্থূল ইঙ্গিত আহরণ করছে, তা কবির দেখবার নয়। ব্রততী কেবল তোমারই নাম নয়, ওর অর্থ হচ্ছে লতা। আর কবিতায় কল্পনা এতো বেশি মুক্তি পায় যে তার আগাগোড়াই একটা মিথ্যা, একটা অবাস্তব স্বপ্ন দিয়ে তৈরি। একথা কি তোমাকে নতুন করে বোঝাতে হবে? তুমি যখন কবিতা লেখ, তখন তোমার জীবনে যা ঘটছে তাই কি শুধু লেখ, জীবনে যা ঘটতে পারতো, যা ঘটলে তুমি সার্থক হতে, তাই কি লেখ না?

বেবি তবুও ঠাণ্ডা হলো না। সে যেন ঝগড়া করতেই এসেছে, এসেছে কুবেরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে। সে আবার বিষমুখ বাণ ছুঁড়লো: কিন্তু লেখার থেকে আপনার মনের তো পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কেন আপনি এক ভদ্র-কুমারীর প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করে কবিতা লিখবেন, কোন অধিকারে?

কুবের নম্র অথচ কঠিন গলায় বললে,—তোমাকে নিয়ে কবিতা আমি লিখিনি। নিজেকে এতোটা প্রাধান্য দিতে তোমার লজ্জা করা উচিত।

—তবে কাকে নিয়ে লিখেছেন? বেবির গলায় ফুটে উঠলো করুণ বিষণ্ণতা।

—যদি গোপনে জিগ্গেস করো, চুপিচুপি বলতে পারি—তোমাকেই। কুবের হেসে ফেললো: কিন্তু তা নিয়ে অতো ঝড়-ঝাপটা তুলছ কেন? যদি কেউ মুখোমুখি জবাবদিহি করতে আসে, তবে তার সঙ্গে জীবনের সম্পর্কে কাব্যবিচার করতে বসবো না। বলবো, মূর্তিটা এখানে উপলক্ষ, কবিতা নিছক কবিতাই। কিন্তু তোমার কাছে সত্য আমি কি করে লুকোবো বলো?

বেবি বললে,—কিন্তু আমাকে নিয়েই বা আপনি কেন লিখতে যাবেন? কী অধিকার আপনার আছে?

কুবের তেমনি প্রসন্ন গলায় বললে,—অন্য কেউ জিগ্গেস করতে এলে একথার জবাব দিতে অস্বীকার করতাম, কিন্তু তুমি যখন বলছো,—তোমাকেই বা এর কী জবাব দেবো? না লেখা ছাড়া আমার উপায় কী! তুমি ছাড়া আজকের জীবনে আমার কী লেখবার আছে? অতো অধিকারের কথা কী বলছ, বেবি। তোমাকে

যে আমি ভালোবাসি, তোমাকে যে আমি কোনো কালে পাবো না, সেই কি আমার পরম অধিকার নয় ?

বেবি কথায় যেন আর জোর পাচ্ছে না। কুবেরের আনন্দদীপ্ত, স্বপ্নালস দুই চক্ষু তার মনে যেন আবেশের কুয়াশা এনে দিচ্ছে, তা'র কথাগুলি মদের ফোঁটার মতো মনে এনে দিচ্ছে বিহ্বল একটা নেশা। তবু প্রাণপণে নিজেকে সে নিবৃত্ত করলে। বললে,—আশা করি এখন থেকে নিজেকে সংযত করবেন। আর ক'দিন বাদেই আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আশা করি তখন আর আমাকে লোক-সমাজে লজ্জিত করবেন না।

—তুমি এসব কথা ঠাট্টা করে বলছ না, সিরিয়াসলি বলছ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—তা পারবেন কেন ? বেবি আবার হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠলো : কাণ্ডজ্ঞান আপনার আর কিছু আছে নাকি ? কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়ে যাই, আমার বিয়ে হবার পর আপনি আর এই উচ্ছৃংখল কবিতা লিখতে পারবেন না।

কুবের গম্ভীর হয়ে বললে—আমার কবিতার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত কী সম্পর্ক থাকতে পারে, আমি ভেবে পাচ্ছি না, বেবি। তোমার বিয়ে হোক বা না হোক, তাতে আমার কবিতার কী এসে যায় ? তোমাকে নিয়ে আজ যদি কিছু লিখে থাকি, কাল-ই বা তবে লিখবো না কেন ? তুমি পরের স্ত্রী হবে বলেই কি আমার পর হ'য়ে যাবে নাকি ? এ তোমার কোন দেশী লজিক, বেবি ?

—না, তখন, আমি আপনার পূজনীয়া—কথাটা বেবির নিজেরই শেষ করতে বেধে গেলো !

—পূজনীয়া তো তুমি আমার এখনো। কুবের বললে—এতো কথাই যখন তোমার বলবার ছিলো, তখন চেয়ারটায় খানিক বসো না। বিয়ে যখন তোমার ঠিকই হয়ে গেছে, তখন আমার কাছে বসতে দেখলে তোমার বা আমার অভিভাবকরা কেউই বিশেষ আপত্তি করবেন না হয়তো।

—অসম্ভব। আমি এখুনিই চলে যাবো। বেবি চঞ্চল হয়ে উঠলো : আপনার সঙ্গে বাজে গল্প করবার কার এমন সময় পড়েছে ?

—তোমাকে নিয়ে কবিতা আরো লিখবো বলেই কি এখন ফের এমন চটে উঠলে ? কুবের মধুর করে হাসলো : আমাকে নিয়ে কেউ যদি এমন প্রেমের কবিতা লিখতো তো আমি কৃতার্থ হয়ে যেতাম। ভাবতাম জগতে এতোদিনে একটা কীর্তি অর্জন করলাম, কবিরই সঙ্গে-সঙ্গে ফাঁকতালে অবিনশ্বর হয়ে গেলাম। দান্তে ছাড়া বিয়াত্রিচের নাম কে জানতে পারতো ? আমাদের দেশের কবিরা মিথ্যা সম্ভ্রমবোধেই হোক বা ভাবের উত্তাপের স্বল্পতার জন্যেই হোক, তাদের প্রেয়সীদের উহ্য রেখেছেন, রেখেছেন নামপরিচয়হীন, অশরীরী একটা ছায়া করে। আমি তোমাকে সেই অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবো। আমার কবিতার সঙ্গে-সঙ্গে লোকে তোমাকেও না-হয় একটু জেনে গেলো।

বেবির সমস্ত শরীর ক্ষোভে ও অপমানে জ্বলা করে উঠলো। নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে সে যেন ভিতরে-ভিতরে কি-একটা দুঃসহ যন্ত্রণা পিষে

ফেললো। কটু, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে,—কাপুরুষের মতো এসব কথা বলতে আপনার লজ্জা করে না ?

কুবেরের সমগ্র মুখমণ্ডলে গভীর প্রশান্তি : আমি তোমাকে ভালোবাসি এর মধ্যে তুমি কোথায় লজ্জা খুঁজে পাবে, বেবি ? যা আমার সত্যিকারের ব্যক্তিত্ব—এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব—তার থেকে, তুমি আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে কি করে ?

বেবি জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরোর মতো কথাগুলি কুবেরের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো : আমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে ? আমাকে নাম ধরে ডাকবারই বা আপনার কী আস্পর্ধা ?

—তুমি ছাড়া সে-অধিকার আমাকে আর কেউই দিতে পারতো না। শুকনো একটা ঢোঁক গিলে কুবের বললে,—বেশ, 'আপনি' বললেই যদি খুশি হও, মনে করো না যে তা'তে তুমি আমার কম আপন থাকবে, বেবি !

বেবি সারা গায়ে ঝলমলে পোষাকের একটা পেখম তুলে চলে যাচ্ছিলো, ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বললে,—কিন্তু একটা কথা আপনাকে আরো বলবার আছে। আপনি থাকুন আপনার মুখসর্বস্ব ভালোবাসা নিয়ে, কিন্তু আমি আপনাকে ঘৃণা করি—

কুবের হেসে বললে,—নাটুকে ঢঙে এই কথা মুখে বলবারো তোমার কোনো দরকার ছিলো না। তা'তে করে বড়ো জোর আমার নামে একটা ডিফেমেশান্ আনতে পারো, কিন্তু আমাকে তুমি বদলাতে পারো না। শোনো, দাঁড়াও।

—হ্যাঁ, ভীষণ ঘৃণা করি। যার মেরুদণ্ড নেই, পরের মুখের দিকে চেয়ে যে কেবল প্রত্যাশা করে, নারীকে অসহায় পেয়ে যে করে অপমান, তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পর্যন্ত আমার ঘৃণা হয়।

তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগেই সুশান্ত হঠাৎ সেখানে এসে পড়লো। বেবির দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে সে জিগ্গেস করলে : তোমার হলো ?

বেবি স্বাভাবিক, নম্র কণ্ঠে বললে,—হ্যাঁ, কিন্তু আজ আর সিনেমায় নয়, চলুন এখানে-ওখানে কোথাও ঘুরে আসি !

সুশান্ত বললে,—কিন্তু বুক্ করে এসেছি যে।

—করলেনই বা। বন্ধ ঘরের ঝাঁজ আমি এখন আর সইতে পারবো না। খানিকটা ফাঁকা হাওয়ায় ঘুরে আসতে চাই। বেবি দরজার কাছে একটু দাঁড়ালো : না-হয় আপনি আর-কাউকে নিয়ে যান, আমি চললাম বাড়ি।

—না না, ফাঁকা হাওয়াই বা মন্দ কী ! চলো, যা তোমার ভালো লাগে। সুশান্ত বেবিকে নিয়ে কারো দিকে না চেয়ে সদর্পে, সোজা বেরিয়ে গেলো।

॥ সতেরো ॥

বেবিকে নিয়ে সুশান্তর অমনি চলে যাবার পর কুবেরের কাছে ঘরের সমস্ত হাওয়া একসঙ্গে উঠলো বিষিয়ে—মনে হলো আকাশের সমস্ত শূন্য যেন একসঙ্গে এসে ঘরের মধ্যে বাসা নিয়েছে। এতোক্ষণ বেবি করছিলো অভিনয়, আর তার রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে দাঁড়িয়ে প্রম্পট করছিলেন তিনিই, এবং তার নিষ্ক্রান্ত হবার

বেলায় তিনিই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। রঙ্গমঞ্চের উপর তাঁর ক্ষণকালের উপস্থিতি দিয়ে তিনি কতো কথা যে একসঙ্গে প্রমাণ ও প্রচার করে গেলেন কুবের তার থৈ খুঁজে পাচ্ছে না। বেবির তিরোধানের চেয়েও সুশান্ত-দার এই নির্লজ্জ অবজ্ঞা আজ তাকে যেন কঠিন করে আঘাত করলো। কুবের যে নিতান্তই তাঁর করুণার পাত্র, তাঁর ছায়ায় স্নিগ্ধ, প্রশ্রয়ে পরিপুষ্ট, শাসনে শৃঙ্খলিত, এমনি একটা উদ্ধত ঔদাসীন্য আজ তাঁর সমস্ত ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়ে উঠলো। সে তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলের তলায় যেন নিতান্ত একটা ঘৃণ্য ছারপোকা। বেবিকে যে তিনি বিয়ে করছেন তা বেবির প্রতি কোনো সপ্রেম আকর্ষণে নয়, যেন কুবেরের অমিতচারিতাকে শাসন করতে ; প্রতিপন্ন করতে সে তাঁর চেয়ে কতো ছোট, প্রতিপক্ষ হিসেবে কতো নগণ্য। ইদানিং কুবেরের কবিতার প্রতি তিনি যে হঠাৎ এতো উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রতিভার প্রতি স্বতোচ্ছ্বসিত সম্মানবোধে নয়, যেন তাঁকে এমনি কঠিন একটা ব্যঙ্গ করতে ; প্রতিপন্ন করতে তাঁর জীবনের তুলনায় তার কবিতার তুচ্ছতা। তাকে যে তিনি এই বিশাল ঐশ্বর্যের মাঝে নিয়ে এসেছিলেন তা শুধু উদ্ঘাটিত করে দেখাতে তার অপরিসীম রিক্ততা। তার প্রতি বা কারো কোনো প্রতিভার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক শ্রদ্ধায় নয়, তৃপ্ত করতে শুধু তাঁর নিজের ক্ষুদ্র বিলাসবৃত্তি। কুবেরের পিঠ চাপড়ে নিজের ঢাক পেটানো। তাঁর কাঁধে ভর রেখে ভিড়ের মধ্যে নিজের গলা উঁচিয়ে ধরা। যেমন 'আবির্ভাব' ছিলো তাঁর এক বিলাস, তেমনি কুবের। তাকে দিয়ে তাঁর অনেক কাজ এগোতো। এ পর্যন্ত তিনি বেবির মধ্যে কবিতার একটু গুঞ্জন আনতে পেরেছিলেন মাত্র, কুবেরকে দিয়ে তিনি সঞ্চারিত করলেন তার জীবনে প্রেমের উত্তাপ ; এবং সে-উত্তাপে তার ভিতর থেকে যখন নারী বিকশিত হয়ে উঠলো, তাকে আবৃত করে স্থাপন করলেন তাঁর পরাক্রান্ত স্বার্থপরতা। এতোদিনে কুবেরকে দিলেন তিনি মুক্তি,—এতোক্ষণে এখানকার কাজ তার সাঙ্গ হলো।

সারা রাত কুবের বিছানায় শুতে যেতে পারলো না। শয্যাময় স্তূপীভূত আরাম আজ তার কাছে শ্মশানের চেয়েও নিদারুণ বীভৎস মনে হতে লাগলো। বিলাসের সমস্ত উপকরণ উগ্র স্পর্ধিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে তাকে যেন তিক্ত বিদ্রূপ করছে ; দিচ্ছে তার লালসাকে ধিক্কার, জীবনকে অভিশাপ। কোনো সুখেই সুখ নেই,—কুবের আর এখানে বসে আছে কী করতে, কিসের প্রত্যাশায় ? পত্রের শেষে পুনশ্চের মতো—তার আর এখানে কতোটুকু প্রয়োজন আছে ? জীবনে আর তার কিসের ভয়, সে তাকে অপমান করলেও কুবেরের উপর তার অভিমান নেই। কোনো দুঃখেই নেই দুঃখ, জীবন আজ তাকে এই বাণী উচ্চারণ করেই যেন সমুদ্রের স্বরে ডাক দিয়ে উঠলো।

কুবেরের পালা গেছে ফুরিয়ে ; আজ সে একা, চিরকাল সে একা—জনসমুদ্রের পারে সে একাকী ক্রুসো। জীবনে সফল বা সুখী হওয়ার জন্যেই সে আসেনি, তার হাতে যে পতাকা আছে, যে লেখনী, তাকেই সে পর্বতের শেষ চূড়া পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাবে। এই সস্তা সাফল্য, এই ড্রয়িং-রুম-খ্যাতি নিয়ে সে করবে কী ? এই কি তার সাহিত্যের চরম পুরস্কার ? মাসিক-পত্রিকার পৃষ্ঠায়

জাঁকালো স্তুতি ও নিন্দায় তার নামের এই অহেতুক প্রাধান্য, তার প্রতি সমসাময়িক লেখকদের দুর্বল ঈর্ষাপরায়ণতা, মেয়েদের সশ্রদ্ধ কৌতূহল, বার্ধক্যগ্রস্তদের ত্রাস ও তিরস্কার—এই কি তার প্রাপ্য ? না নগদ কিছু টাকা, বড়ো জোর অটোমোবিল আর স্কাই-স্ক্রেপার ! এই কি সাহিত্যিক সার্থকতার পরিমাণ ? তাকে কি এমনি করে সফল হবার জন্যেই বিধাতা লেখক বলে কলঙ্কিত করে দিয়েছেন ? সফল হওয়া অর্থই কি পৃথিবীতে তোমার কাজ সাঙ্গ করে দেয়া নয়, যেমন প্রণয়ানুশীলনে সফল হওয়া মাত্রই মাকড়সা তার প্রাণ হারায় ? পৃথিবীর সমস্ত ব্যর্থতার মধ্যে এই সাফল্যই কি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল নয় ? সমস্ত কুশ্রিতার মধ্যে এই কি নয় সবচেয়ে দৃষ্টিকটু ? তুমি সম্মানের সঙ্গে তোমার দৈন্য, তোমার ব্যর্থতা বহন করতে পারো, কিন্তু তোমার সাফল্যের চাকচিক্য বাইরে তুমি প্রকাশিত না করে ছাড়বেই না এবং সাফল্যের সঙ্গে-সঙ্গে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে তোমার উলঙ্গ দারিদ্র্য ।

কুবের তেমনি করেই হয়তো সাহিত্য সফল করতে চেয়েছিলো, কিন্তু আজ বেরিয়ে পড়েছে তার জীবনের রূঢ় রিক্ততা । সে সাহিত্যে চেয়েছিলো বিশ্রাম, কিন্তু জীবনে লেগেছে আজ তার গতির তরঙ্গ । কী সে করবে, যদি না তার নিজের জীবন জীবন্ত হয়ে উঠে ? জানবে সে কী, জানাবে সে কাকে, যদি না সে নিজে কিছু হয়ে উঠে ? এতোদিন এই 'হওয়া' ছেড়ে সে কিছু একটা 'করার' নেশায় মত্ত হয়ে ছিলো, কিন্তু আজ ঈশ্বর তাকে সম্পূর্ণ 'হওয়ার' জন্যে ডাক দিয়েছেন । আজ আর বুদ্ধি নয়, বোধ : পত্রপুষ্পবহুল শাখা-প্রশাখা-বিস্তারে নয়, একেবারে জটিল মূলে, মাটির প্রচ্ছন্ন গভীরতায় । প্রকাশের দীপ্তি নয়, অনুভবের দাহ —নয় আর কল্পনার কুয়াসা, রক্তের প্রগাঢ় ফেনিলতা । মনের মাধুরীর পরিবর্তে আজ এই বর্তমান, প্রত্যক্ষ দেহ—অগ্নিশিখার মতো কম্পমান, কামনায় লেলিহ তার শিখা । এতোদিন এই আলো সে শুধু লেখায় করেছে সঞ্চারিত, তার তাপে জীবনকে মুঞ্জরিত করবার কথা ছিলো ভুলে । নিজেকে ছেড়ে সে খুঁজে বেড়িয়েছে পৃথিবীর মাধুর্য, অনুসরণ করেছে যতো তার পলাতক রহস্যকে : তাকিয়ে দেখেনি নিজে সে কতো মধুর, কতো অনির্বচনীয় —নিজের জীবনে তাঁর রচনার চেয়ে তাঁর নিজের জীবন বিধাতার কতো বড়ো রচনা । আজ অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে সে বলতে পারলো . 'ঈশ্বর, আমি আমি-ই ।' কিন্তু সেকথা এখন আর তার কে শোনে ?

পরদিন বিকেল বেলা কুবের সুশান্তর কাছে গিয়ে বললে—নিঃসঙ্কোচ, প্রশান্ত গলায় বললে, আমি এখন যেতে চাই ।

সুশান্ত তার লাইব্রেরিতে বিশাল অক্ষরারণ্যের মাঝে চুপ করে বসে ছিলো । নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে,—বেশ তো, ভালো কথা, সোফারকে বলো, মোটর বার করে দিক । আজ আর আমরা বেরুবো না, সকাল থেকে বৌদির শরীরটা কেমন ভালো নেই ।

কুবের বললে—আমি বেড়াতে বেরুবার কথা বলছি না, আমি এমনি চলে যেতে চাচ্ছি ।

সুশান্ত চমকে উঠলো : চলে যেতে চাচ্ছ মানে ?

কুবেরের মুখে কোনো কথা সরলো না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুশান্ত তার দিকে চেয়ে দেখলো কুবেরের হঠাৎ কেমন ভোল ফিরে গেছে, তার বেশ ও ব্যবহারের মসৃণতার উপর ফুটে উঠেছে যেন কর্কশ রুক্ষতা। গায়ের জামা-কাপড়ে শ্রী নেই, মাথার চুলে নেই পারিপাট্য। এ নিশ্চয়ই তার বেড়াতে বেরুবার পোষাক নয়, স্নিগ্ধ শালীনতার বদলে কেমন একটা উদ্ধত বিদ্রোহ। এই চেহারায় সুশান্তর কাছে বেরুনোর অর্থই যে তার অসমসাহসিক কিছু একটা করবার সংকল্প, একথা বুঝতে তার আর দেরি হলো না!

সুশান্ত ভুরু কুঁচকে জিগ্গেস করলে: চুপ করে রইলে কেন?

—না, চুপ করে থাকবার কোনো মানে হয় না, কুবের পরিষ্কার গলায় বললে—চুপ করে থাকলে এ-ক্ষেত্রে অর্থটা বিশেষ প্রাঞ্জল হবে না। আমি এখান থেকে আজই—এক্ষুণি চলে যেতে চাই।

—কেন? সুশান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—এখানে কেন যে এসেছিলাম তারো যেমন কিছু বিশেষ কারণ নেই, তেমনি চলে যাওয়ারো একটা কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। কুবের একটু হাসলো।

—তুমি পাগল হলে নাকি, কুবের?

সেই হাসিটি কুবের নিভতে দিলো না: আমার তো মনে হয়, শরীর-মন নিতান্ত সুস্থ না থাকলে আমি এতো সুখ-ঐশ্বর্য ছেড়ে বেরুতে পারতাম না।

—কেন, তোমার হলো কী? এখানে নতুন কোনো অসুবিধে হচ্ছিলো নাকি?

—সুখ-সুবিধেরো এমন একটা সীমা আছে যা অতিক্রম করে গেলে তা দুর্বহ একটা বোঝার মতো মনে হয়। একটা সীমা পর্যন্তই আরাম, তার অতিরিক্ত হতে গেলেই মনে হয় তা অত্যাচার।

সুশান্তর মুখের উপর যেন কে চাবুক মারলো। চিবিয়ে-চিবিয়ে বললে,—কিন্তু আজই তোমার না গেলে হতো না? আর দিন দশেক বাদে আমাদের বিয়ে।

কুবেরের মুখের স্নায়ুগুলি রক্তের চাপে শিহরিত হতে লাগলো: এ-ও আমার একটা কবিতার আইডিয়ার মতো, অকস্মাৎ আমার মনে বিদ্যুতের মতো বিচ্ছুরিত হলো। যখন যা আইডিয়া আসে, তক্ষুণি তা ভাষায় রূপান্তরিত করতে না পারলে আমি মুক্তি পাই না।

—কিন্তু কোথায় তুমি যাবে? ঠোঁটের একটা কোণ একটু কুঁচকে সুশান্ত জিগ্গেস করলে।

—কি জানি। কুবের চোখ নামিয়ে বললে,—কী যে কখন লিখবো যেমন জানি না, তেমন কোথায় যাবো তারো কিছু ঠিক নেই।

—কিন্তু তোমার চলবে কী করে শুনি?

—দেখি কী করে চলে। এমনি একটা নতুন পরীক্ষায় হাত দিতে পারবো ভেবে ভারি ভালো লাগছে। কুবের হাসলো: আমি কতো কী নতুন বিস্ময় ঘটাতে পারি একথা হয়তো আমি নিজেই এখনো জানি না।

—সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র নেবে না?

—দরকার নেই, খালি হাতই আজ আমার যথেষ্ট। অতো ভার আমি সামলাবো কি করে?

সুশান্ত ক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হতে লাগলো : কিন্তু সঙ্গে যথেষ্ট টাকা-কড়ি নিয়েছ তো ?

—সামান্য যা পেয়েছি নিয়েছি বৈ কি। আমার জন্যে আপনি আর ভাববেন না।

—কিন্তু টাকা তুমি পেলে কোথায় ? সুশান্ত অস্থির হয়ে উঠলো : দাঁড়াও, টাকা সম্বন্ধে অন্তত বাজে সেন্টিমেন্ট্যালিটি কোরো না। আপাততো কতো তোমার লাগবে মনে করো ?

কুবের দু'পা সরে গিয়ে বললে,—আপনার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমি দুপুরবেলা যা-হোক কিছু নিজে সংগ্রহ করেছি। একটা উপন্যাস লিখে দেবো বলায় এক পাবলিশার আমাকে শ-খানেক টাকা advance করেছে।

সুশান্ত একেবারে বসে পড়লো। পীড়িত মুখে বললে : তবে তোমাকে আর বাধা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কিন্তু এখানে কি কোনোদিন আর ফিরে আসবে না ?

কুবের বললে,—তাই বা কি করে সাহস করে বলতে পারি ? আপনাকে যাতে আর বিরক্ত না করতে হয়, তারই চেষ্টা করে দেখবো হয়তো।

— শুনে সুখী হলাম। সুশান্ত কথায় ঠেস দিয়ে বললে,—কিন্তু কোনোদিন আবার পরীক্ষার ফি বা অমনি একটা কিছু টাকার দরকার পড়লে আমাকে ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখো।

—তা, লিখতে হবে বৈ কি। আচ্ছা। কুবের নিচু হয়ে হঠাৎ প্রণাম করতে গেলো সুশান্তকে, সুশান্ত ছোঁয়া বাঁচিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেলো পিছনে।

বললে,—থাক, ভক্তিতে আর অতো গদগদ না হলেও চলবে। কিন্তু তোমাকে জিগ্গেস করি, আমার সঙ্গে এই ব্যবহারটাই তোমার সঙ্গত হলো ?

—আর আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইখানে বেঁধে রাখাই কি আপনার সঙ্গত হবে ?

—কিন্তু মানুষের সামান্য একটা কৃতজ্ঞতাও থাকে।

—সেই কৃতজ্ঞতা থেকেই তো আমি বিদায় নিচ্ছি। কুবের ভারি গলায় বললে,—আমাকে মানুষ করবেন বলেই আপনার সঙ্কল্প ছিলো শুনেছিলাম, আজ তা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। সত্যি, এই পুতুল-নাচ আর আমার ভালো লাগলো না।

সুশান্ত আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসলো। কোলের উপর একটা বই টেনে এনে নির্লিপ্ত গলায় বললে,—বেশ। কিন্তু কখনো একটা চাকরি-বাকরির দরকার হলে আমাকে মনে কোরো। লাইফ-ইনসিয়োরেন্সের একটা এজেন্সি তোমায় আমি এখুনি দিতে পারি।

—থাক, এখুনি তার কোনো দরকার হবে না। কুবের দরজার দিকে এগিয়ে এলো : তেমন দরকার হলে আবার আপনার কাছে আসতে হবে বৈ কি। আশীর্বাদ করুন, তেমন দরকার যেন কোনোদিন না হয়। আচ্ছা, আসি।

সুশান্ত বইয়ের থেকে মুখ তুললো না।

॥ আঠারো ॥

রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই কুবেরের গায়ে যেন হাওয়া লাগলো ; গায়ে-হাতে-পায়ে রক্তের চঞ্চল চলাচল। তখন শীতের সহর প্রায় সন্ধ্যার মুখে এসে পড়েছে —তার আকাশে এখন ক্লান্ত, ধূসর জড়িমা। যেমন কুবেরের মনে আজ বেদনা-ধূসর, ম্লান গোধূলি-লগ্ন। কিন্তু আকাশের সেই বিবর্ণ কুণ্ঠাকে উপেক্ষা করে সহর উঠেছে নিজের আনন্দে আলোড়িত হয়ে, রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে অতিকায় ডবল-ডেকার, সরীসৃপের মতো সবুজ ট্র্যামের সার, কাতারে-কাতারে জনবাহিনী। একেক করে জ্বলে উঠছে আলো, একের কণ্ঠে মিলছে আরেকের কোলাহল। সব মিলে যেন একটা গতির ঐকতান। তার সঙ্গে মিলেছে যেন আকাশের নিঃশব্দ ধূসরতা। তেমনি কুবেরের সমস্ত স্নায়ুতে-শিরায় এখন গতির উন্মাদনা : দুই হাতের অজস্র রিক্ততার সঙ্গে দুই পায়ের অবারিত মুক্তি। নিজের সঙ্গে মিলিয়ে সহরকে যেন সে এতো সত্য করে কোনোদিন আর অনুভব করেনি। আজকের ধোঁয়াটে, নিরানন্দ আকাশ যেমন সহরের বিশেষ একটা গুণ, তার প্রসাধনে বিশেষ একটা অঙ্গরাগ, তেমনি কুবেরের বাইরের এই অভূতপূর্ব সক্রিয়তার পিছনে মনের আছে একটা মধুর তন্দ্রালস বিষণ্ণতা—তার সমস্ত গতি-আবর্তের ঊর্ধ্বে মৌন, নিশ্চল একটি পটভূমি। সব মিলিয়ে আজকে তার নিজেকে অত্যন্ত ফাঁকা লাগছে, অত্যন্ত একাকী—দেখতে পাচ্ছে, পড়ে আছে তার সামনে কতো দূরের নির্জন পথ, কতো গভীর নিঃসঙ্গতা। তার বিধাতা তাকে কী অপরিমেয় জীবন রহস্যের জটিল আবর্তের মধ্যে নিয়ে এলেন।

কোথায় সে এখন যায়! যেতেই যখন কোথাও হবে, তখন তার সঙ্গে আরেক-বার দেখা করে গেলে ক্ষতি কী!

যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই তো সে আছে, না-হয় বেবি তাকে আরো সামনে দু'পা ঠেলে দেবে। তাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলাটা আজকের তার এই যাত্রার মুহূর্তে এমন কিছু বিসদৃশ হবে না।

কবিতার আইডিয়ার মতো কথাটা একবার মনে হতেই কুবেরের সমস্ত শরীর একবাক্যে সাড়া দিয়ে উঠলো। নিচে দরোয়ান ছিলো বসে, সাজাচ্ছিলো কলকে, তাকে জিগ্‌গেস করতেই জানা গেলো দিদিমণি উপরেই আছেন। উপরে না থাকলেই বোধ করি তার ফিরে যাওয়া সহজ ছিলো, কিন্তু উপরে যখন আছেনই, তখন তার ফের নিচে নেমে আসাই বা এমন কী কঠিন হবে?

উপরে-নিচে সমান অন্ধকার। কুবের সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলো উপরে। আলোর ছিঁটে-ফোঁটা নেই, না আছে বা নিঃশ্বাসের অস্ফুট একটা শব্দ। জন-মানুষহীন শুধু একটা দেয়ালের দেশ। কুবের বারান্দা দিয়ে ঘুরে গেলো। বেবির পড়ার ঘর। দরজার পাল্লা দু'টো সম্পূর্ণ জোড় খায়নি, দুয়ের মধ্যেকার ঈষৎ ফাঁক দিয়ে বাতির দীর্ঘ একটি রেখা এসে পড়েছে। কুবেরের মনে হলো কার যেন কাতর একটি হাতছানির সঙ্কেত।

দরজার গায়ে আঙুলের সে দুটো টোকা মারলো। ভরা গলায় ভিতর থেকে আওয়াজ হলো : কে ?

সাহস পেয়ে কুবেরের আঙুলই ফের কথা কইলো।

বেবি উঠে এসে দরজাটা টেনে দু' ফাঁক করলে। তার বাঁ হাতে আধ-খাওয়া একটা হাফ-পাউণ্ড প্লাম-কেইক্, তারি একটা পুরো কামড়ে মুখের গহ্বরটা তার ভরাট –তাই, আকস্মিক কুবেরকে দেখে সে এমন একটা শব্দ করলে, সেটা আনন্দের না ভয়ের, তা ঠিক বোঝা গেলো না। কুবের নীরবে তার দিকে চেয়ে রইলো।

কেইক্-এর টুকরোটা তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করে বেবি উদ্বেল কণ্ঠে বললে,—আপনি ? এতো দুঃসাহস আপনার, একেবারে সোজা উপরে উঠে এলেন। আসুন, আসুন, পৃথিবী তার axisএর ওপর ঠিক ঘুরছে তো ? বসুন এইখানটায়। বেবি কেইক্ রেখে একটা চেয়ার টেনে দিলো : চা খাবেন ? দাঁড়ান, আমি ফের স্টোভ ধরিয়ে জল চাপিয়ে দিচ্ছি।

কুবের আমতা-আমতা করে বললে,—না, বসবো না—

বেবি চঞ্চল হয়ে বললে,—কিছু ভয় নেই আপনার। হিমালয়েই যদি উঠতে পারলেন, তবে কৈলাস আর বাকি থাকে কেন ? বসুন, আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।

—তোমার মা কোথায় ?

চোখে দুষ্টুমির হাসি এনে বেবি বললে,—মা ? তিনি কাউন্সিলে গেছেন ভিজিটার্স' গ্যালারি থেকে বক্তৃতা শুনতে। এখুনি অবিশ্যি তাঁর ফেরবার কথা। তিনি এসে পড়লে আমাকে কিন্তু আজ দোষ দিতে পারবেন না বলে রাখছি। আমি কিন্তু আজ আপনাকে নেমন্তন্ন করে আনিনি, সাবধান, আজ কিন্তু আপনি নিজের ইচ্ছায়ই চলে এসেছেন।

কুবের বললে,—হ্যাঁ, নিজেই চলে এসেছি।

বেবি দু'চোখে কৌতুকের আভা ভরে বললে,—তাই তো অবাক হচ্ছি। পৃথিবীটা ঠিক ঘুরছে, না, কক্ষচ্যুত হয়ে শূন্যে তলিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পাচ্ছি না। আপনার হঠাৎ এই বীরত্বের কারণ জানতে পারি কি ?

কুবের তার মুখের দিকে চেয়ে নির্ভীক, প্রশান্ত গলায় বললে—আমি এখান থেকে চিরকালের জন্যে চলে যাচ্ছি কি না, তাই ভাবলাম যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

কথা শুনে বেবি যেন খানিকক্ষণ পাথর হয়ে রইলো।

—যদিও তার কোনো দরকার ছিলো না, তবু—

বেবি দু'চোখে বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে বললে,—এখান থেকে চিরকালের জন্যে চলে যাচ্ছেন মানে ?

—একেবারে literal মানে। এখান থেকে চলে যাচ্ছি মানে ওবাড়ির ব্যূহ থেকে মুক্তি খুঁজে পেয়েছি। চিরকালের জন্যে যাচ্ছি মানে, এখানে ফিরে আসবার আর আমার কোনো দরকার হবে না।

—কেন ? কান্নার মতো বেবি প্রশ্ন করে উঠলো।

—তার উত্তরটা তোমাকেই কেবল দিতে পারি। কিন্তু তারো দরকার নেই।

কুবের চোখ নামিয়ে বললে,—তুমি তা এমনিই বুঝতে পেরেছ। আমি তাই একবার স্পষ্ট গদ্যে স্বীকার করতে এসেছিলাম।

বেবির সর্বাঙ্গ যেন ঘন-অরণ্যের মতো অকস্মাৎ মর্মরিত হয়ে উঠলো : সত্যি ?

তার দিকে চেয়ে কুবের আর পলক ফেলতে পারলো না।

—সত্যি ? আপনি ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন ?

— একেবারে। খালি-হাতে।

—এতো আরাম, এতো সুখ, এতো ঐশ্বর্য ছেড়ে ?

—যদি বলো, তাই। কুবের পরিপূর্ণ দুই চক্ষু দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে ধরলো : আরো বেশি আরাম, আরো বেশি ঐশ্বর্যের মাঝে।

— আর কোনোদিন ও-বাড়ি ফিরে যাবেন না ?

কুবের হাসলো : আমাদের পৃথিবী এতো অপরিসর নয় যে ঘুরে-ফিরে একই পথ দিয়ে আমরা যাওয়া-আসা করবো। যদি বলি, ক্ষমা করো, তুমিই আমাকে পৃথিবীর—

—দাঁড়ান। শব্দের একটা ঝাপটা মেরে বেবি তাকে স্তব্ধ করে দিলে। পরে, চেয়ারের কাঁধের উপর যেখানে পাশাপাশি কুবেরের দুই হাত সংলগ্ন হয়ে ছিলো, তারই উপর ডান হাতখানা রেখে একটু এগিয়ে বেবি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বললে,— আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

তার চেয়ে পৃথিবীর কক্ষচ্যুত হয়ে শূন্যে তলিয়ে যাওয়াও অনেক সহজ ও সমীচীন ছিলো। কুবের দুই করতলের মধ্যে তার ভীরু, পেলব হাতখানি চেপে ধরে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বললে,—আমার সঙ্গে কোথায় যাবে ?

সেই স্পর্শের মাঝে তার সমস্ত দেহ ও প্রাণের উত্তাপ ঢেলে দিয়ে বেবি বললে, —তা আমি কী জানি। তোমার সঙ্গে যাবো, সেই ঢের।

—তুমি কি পাগল হলে নাকি ?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বেবি ধারালো গলায় বললে—পাগল ছাড়া পৃথিবীতে কে কবে অসাধ্যসাধন করেছে ? পাগল হতে পারাটা তো সৌভাগ্য। তুমি স্থির হয়ে এখন একটু বোস দেখি, আমি স্টোভটা ধরাই। এতো সাহস দেখিয়ে এতোগুলি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসতে পারলে, বেবির ঠোঁটের উপর হাসির একটি সূক্ষ্ম রেখা উঠলো ফুটে : আর এই ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেট থেকে আমাকে কুড়িয়ে নিতে পারবে না ?

—কিন্তু আমি, কুবের ঘেমে উঠলো : আর কী, কতোটুকু—তার তুমি কিছুই জানো না।

—যথেষ্ট জানি। তার পীড়িত মুখের দিকে চেয়ে বেবি শব্দ করে হেসে উঠলো : তোমাকে জানার চাইতে আমার নিজেকে জানা বেশি দরকার। বাধ্য ছেলের মতো চেয়ারে এখন একটু বসো দেখি চুপ করে।

কুবের চেয়ারে বসলো। সে দিনের মতো বেবি ধরাতে লাগলো স্টোভ। শব্দ শুরু হলো কৃত্রিম বারিধারার।

কুবের বললে,—কিন্তু আমাকে—কি বলে—তোমার যে অনেক কষ্ট, অনেক অসুবিধে সহ্য করতে হবে।

মুখ না ফিরিয়েই বললে,—রাখো তোমার ধর্মোপদেশ। দয়া করে, আর আমার ওপর ভালোবাসা দেখিয়ো না তো। কষ্ট, অসুবিধে,—শব্দ দু'টো আস্তে-আস্তে উচ্চারণ করে বেবি প্যানে করে জল চাপালো, তারপর কাছে উঠে এসে : যেমন সেই কষ্ট, অসুবিধের ভয়ে দাদার বাড়িতে সুখের দোকান দিয়ে বসেছিলে। কই টি'কতে পারলে না তো দেখি। ও-দু'টোকে আমি তোমার মতো ভয় করি না! একটা চেয়ার টেনে তাতে বসে প্লাম-কেইক্‌টায় আবার সে দাঁত বসালে : ও আমি ভোগ—ভোগ করতে পারি, বুঝলে? Life is not all beer and skittles. কিন্তু যাই বলো, কেইক্‌ চিবোবার একটা নরম শব্দ করতে-করতে বেবি হেসে উঠলো : আমাকে বিয়ে করে কষ্ট হবে তো তোমার।

—আমার! কুবের আকাশ থেকে পড়লো আর কি।

—হ্যাঁ, বেবির মুখে-চোখে সেই দুষ্টু হাসি : তোমার আর প্রেমের কবিতা লেখা হবে না। বঙ্গ-সরস্বতী একেবারে মূর্চ্ছা যাবেন। সমালোচকের দল খাদ্যের অভাবে শুকিয়ে ঠায় মারা যাবে। শেষকালে তুমি কি না Eros এর পুজো ছেড়ে Hymen এর পুজো ধরলে।

কুবের স্বস্তির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লে : ও! এই কথা?

-হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি। বেবি খিলখিল করে হেসে উঠলো : প্রাণহীন কতোগুলি প্রেমের কবিতা লেখার চেয়ে জীবন্ত একটা প্রেম করা কতো বেশি মূল্যবান। সামনে স্বয়ং মূর্তি হাজির থাকতে কেউ যে আবার প্রতিমা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে এমন অন্ধ এই প্রথম দেখলাম।

বেবির হাতের চুড়ি ক'গাছ নিয়ে মৃদু-মৃদু নাড়াচাড়া করতে-করতে কুবের বললে—কিন্তু তোমার কবিতা!

—তোমার জন্যে চা করবো বলে যে আগুন করলাম আজ তাতে সব পুড়ে গেলো। বেবি উঠে পড়লো, প্যানের ঢাক্‌নাটা খুলে দেখলো জল গরম হয়ে এসেছে। বললে,—তোমার লেখা পড়ে-পড়ে ভয়ানক বকে গেছি, নইলে অনায়াসে বলতে পারতাম, তোমার সঙ্গে যে নতুন সংসার পাতবো, সেই হবে আমার সত্যিকারের কবিতা।

কাটলো কতোক্ষণ চুপচাপ। আঁচলটা হাতের মুঠোয় জড়ো করে হাতল ধরে প্যানটা সে নামালো। তারপর যতোক্ষণ না তার চা করা শেষ হলো, কুবের তার বসার ভঙ্গিটির থেকে চোখ ফেরাতে পারলো না। বাটি হাতে করে যখন সে উঠে দাঁড়ালো, মনে হলো ভোর হয়ে যাওয়ার পরেও অপরিম্লান শুকতারাটির মতোই সে জেগে আছে।

সসার-শুদ্ধ বাটিটা তার হাতে এগিয়ে দিতে-দিতে বেবি বললে,—সেদিনের আমার জন্মদিন তুমি ব্যর্থ করে দিয়েছ। আজ আবার গোধূলি-লগ্নে সেই ব্রাহ্ম-মুহূর্ত ফিরে এসেছে।

—কিন্তু তোমার চা কই?

লজ্জায় ঈষৎ শিহরিত হয়ে বেবি বললে,—প্রেমের ব্যাপারে হাইজিন যদি বেশি না মানো তো তুমি আদ্ধেক খেলে পর ও-বাটিতে আমিও না-হয় একটা চুমুক দেবো।

হাত বাড়িয়ে কুবের বললে,—বা, আমার কেইক্ কই ?

—আর তো নেই।

—বা, ঐ যে তোমার হাতে আছে। কুবের ছোঁ মেরে তা কেড়ে নিলো : কেউ কখনো একা অতোগুলি খায় ?

আরো কতোক্ষণ কাটলো।

কুবের কেইক্ চিবোতে-চিবোতে বললে, দুর্বল গলায় বললে,—কিন্তু আমি ভাবছি, সুশান্ত-দা কী ভাববেন ?

—রক্ষে করো। চেয়ার ছেড়ে বেবি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো : এখনো তোমার সুশান্ত-দা ? এখনো তোমার অভিভাবকের ভয় ! বাবাঃ, আমি গেলাম, আমি ঠিক মরে যাবো এবার। বেবি ফের চেয়ারে এসে বসলো : কী আবার ভাববেন ? সুশান্ত-দা শান্ত হয়ে দেখবেন তাঁর কবি এতোদিনে জ্বলজ্যান্ত একটি সপদার্থ মানুষ হয়ে উঠেছে।

—আর তোমার মা ?

—ভয় নেই, কোনো এম-এল-সিকে দিয়ে ফ্রি-লাভ এর বিরুদ্ধে কোনো বিল ড্রাফট করাবেন না। বেবির কণ্ঠস্বর দীপ্ততরো হলো : কী ভাববেন তিনি ? শিশুকাল থেকে আমাকে যে তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন, দেখবেন আমি তার সম্পূর্ণ মর্যাদা রেখেছি। আমার মুখ চেয়ে তাইতেই তিনি সুখী হবেন।

—তোমার বাবা ?

—তিনি করবেন আশীর্বাদ। কণ্বমুনির মতো বলবেন, শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ। বেবি হেসে উঠলো : জানিনা কণ্বমুনি কী বলেছিলেন। তবে, বালিগঞ্জে তাঁর যে নতুন বাড়ি উঠেছে, আমরা কখনো-সখনো সেখানে বেড়াতে এলে দক্ষিণ খোলা বড়ো ঘরটা যে আমাদের কপালেই নাচবে, তাতে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। বেবি টেবলের উপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখ একেবারে কুবেরের সামনে নিয়ে এলো : কিন্তু তাঁদের মেয়ে কী ভাববেন তার কিছু অনুমান করতে পারো ?

—কী।

বেবি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেলো ; বললে, - ভাববে, এ এক বিষম দায় হলো। ঘরে আজ অতিথি উপস্থিত, তার জন্যে নিচে চাকরদের পাশের ঘরে বিছানা করে দিতে হবে ; ঠাকুরটা পলাতক, হয়তো ভালো দেখে দুটো রেঁধে দিতে হবে - কনে-দেখানোর প্রায় প্রত্যেক সাবজেক্টেই দিতে হবে পরীক্ষা। আগে থেকে বলে রাখি, রান্নাবান্না আমি কিছু পারি না কিন্তু।

কুবের আস্তে-আস্তে বেবির এলানো হাতের উপর তার একখানি হাত রাখলো। হেসে বললে,—কিন্তু অতিথিকে যদি প্রহারেণ ধনঞ্জয়ের ব্যবস্থা হয়—

মুখ গম্ভীর করে বেবি উত্তর দিলে : সেও এক মস্ত দায়। যা শীত পড়েছে ক'দিন থেকে, তবু কী আর করা যাবে, অতিথির মান রাখতে হবে তো ? পিঠে একটা কুলো বেঁধে আমি তোমার সঙ্গে না-রাম না-গঙ্গা বলে বেরিয়ে পড়বো আর-কি।

কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই দুজনে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। এবং হাসির আলোড়নে বেবি একেবারে চেয়ার ছেড়ে।

উদ্ভাসিত মুখে বেবি বললে,—চলো না, আমরা এখন একটু কোথাও বেড়িয়ে আসি না। দোতলা বাসএ করে। মা ততোক্ষণে ফিরবেন। বাবাও। পরে না হয় একসঙ্গে ordeal face করা যাবে।

—চলো। কুবেরো উঠে দাঁড়ালো : এখন বাইরের ফাঁকাটা চমৎকার লাগবে !

—তা তো লাগবেই। দিব্যি ঢাকাঢুকি দিয়ে বেরিয়েছ কি না দাঁড়াও, র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে আমিও একটি বুড়ি হয়ে আসি।

অন্ধকার সিঁড়ি এবার আলো হয়ে উঠেছে। নামতে নামতে কুবের বললে, —কিন্তু ক'দিন বাদে বিয়ে তোমার ঠিক হ'য়ে গেছলো, বেবি।

বেবি গাঢ় গলায় বললে,—কিন্তু যে-দেবতাকে সাক্ষী করে বিয়ে হবে, তিনিই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যখন এলেন, তখন দিনক্ষণ, পাঁজি-পুঁথি সব উলটে-পালটে ছারখার হয়ে গেলো।

—কিন্তু আমি যদি আজ না আসতাম, বেবি ?

—না আস, তোমার সাধ্য কী। বেবি তার দিকে চেয়ে মধুর মুখে হাসলো : তোমার উপর তুচ্ছ অভিমান করে কখনোই নিজের সর্বনাশ করতাম না। আমি এমন ভালোবাসতে শিখিনি যে দুটো কবিতা লিখেই—

সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই—বেবি আর কুবের পাশাপাশি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লো। সামনে সুশান্ত।

সুশান্তর পায়ের নিচে সিঁড়িটা যেন তলিয়ে যেতে শুরু করছে। প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে জিগ্গেস করলে : তুমি কুবের, এখানে ?

বেবি পরিষ্কার গলায় বললে,—দেখতেই তো পাচ্ছেন। ফাঁকায় আমরা একটু বেড়াতে যাচ্ছি। দয়া করে একটু পাশ দিন।

সুশান্ত সরে দাঁড়ালো। কুবেরকে লক্ষ্য করে বললে,—এই বুঝি তোমার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসার নমুনা ? বেবি !

বেবি থামলো।

—তোমার শরীর ভালো নেই, আর এই ঠাণ্ডায় তুমি বেরুচ্ছ ?

বেবি সস্মিত মুখে বললে,—আমার শরীর ভালো নেই, আমাকে দেখে এই কি আপনার এখন মনে হচ্ছে ?

—কিন্তু কোথায় যাচ্ছ শুনতে পাই ?

—আপাততো বিশেষ কোথাও নয়। দোতলা বাসএ করে এখানে-সেখানে একটু ঘুরে আসতে যাচ্ছি। আপনি বসুন না, মা এক্ষুণি এসে যাবেন !

দুজনে দরজার কাছে এসে আরেকবার থামলো।

বেবি বললে,—সত্যি আপনি যাবেন না যেন। আপনার সঙ্গে আমাদের জরুরি কথা আছে। আমাদের ফিরতে বেশি দেরি হবে না। আর যদি দেরি একটু হয়-ও, ভাববেন না কিছু। মাকে বলবেন, আমরা এই একটু বেড়াতে বেরুলাম। আঃ, কী সুন্দর ঠাণ্ডা !

সুশান্ত খোলা দরজার দিকে বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইলো।

আসমুদ্র

॥ এক ॥

সৌম্যর পৃথিবী বইয়ের দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিলো। কালো-কালো, সারি-সারি, চলমান অক্ষরগুলি যেন তার অগণন ভীরু প্রজা, সে তাদের উপর অপ্রতিহত প্রভুত্ব করে এসেছে। তার একরাজ স্বেচ্ছা-তন্ত্র, কিন্তু সে-শাসনে নিয়মের বড়ো কড়া পাহারা, সময়ের মোড়ে-মোড়ে রুটিনের রূঢ় সঙিন খাড়া রয়েছে উঁচিয়ে। কোথাও এতোটুকু শৈথিল্য নেই, ফাঁকি দিয়ে একচুল পালানো যাবে না। তার জীবনে, বইয়ের দুর্গবেষ্টিত, নিরাপদ, নিবিড় জীবনে শাসনের প্রতপ্ত শুভ্রতা। সে তার আপন নিয়মের ছায়ায়, ঘন উষ্ণ একাকিত্বে, অনাহত অপরিমেয় একাকিত্বে, বিচ্ছিন্ন, পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

পরীক্ষা পাশ করতে সৌম্যর ভারি ভালো লাগতো। পরীক্ষার জন্যে তৈরি হওয়া তার জীবনের একটা তীব্র নেশা ছিলো, যুদ্ধে যাওয়ার নেশা। অসংখ্যেয় তার সৈন্য—কালো-কালো, সারি-সারি, চলমান অক্ষর—দিন-রাত সে তাদের সসজ্জ, সংহত করে তুলতো। আক্রমণে উন্মুখ আত্মরক্ষণে নৃশংস। বিশাল প্রান্তরের উপর দিয়ে চলেছে তার পদাতিকের শ্রেণী, রৌদ্রে ঝলসে উঠছে তাদের প্রফুল্ল তলোয়ার। কারা বা চলেছে ধুলো উড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে, দূর দিগন্ত অন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষিপ্র দীপ্তিতে। কে তাদেরকে বাধা দেবে, কে সামনে দাঁড়াবে এই বেগবান জ্যোতি-প্লাবনের ? কোন ছিদ্রে কখন শত্রু এসে হানা দেয়, সেই ভয়ে সৌম্য দুই দৃঢ় হাতে তার দুর্গ-সংস্কার করতে বসতো—তার বিদ্যার দৈত্যকায় দুর্গ, রাখতো না কোথাও সে এতোটুকু দুর্বল গোপনতা। শত্রুর সামনে সে উন্মুক্ত, আশির-পদনখ অনাবৃত, তার সর্বাঙ্গে সস্মিত সম্বর্ধনা। পরীক্ষার হল-এ গিয়ে যখন সে বসতো, মনে হতো বিশ্রান্ত তীরে প্রকাণ্ড একটা জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে—এই বুঝি তার পালে লাগলো হাওয়া, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের পৃষ্ঠা পেরিয়ে চলেছে কোন ধূম-ধূসর অনাবিষ্কৃত দিগন্তের ইশারায়,চাকায়-চাকায় উথলে উঠছে ফেনিল উর্মিলতা। পরীক্ষার বিশাল সেই সমুদ্র তার কাছে যেন এক-অঞ্জলি জল : সেই পরিধিহীন বায়ুমণ্ডল যেন সে এক নিশ্বাসে নিঃশেষ করে দিলে।

জীবনে সেই তার দানবিক উন্মত্ততা ছিলো, পরীক্ষা পাশ করা। ইস্কুলে-যাওয়ার সেই প্রথম দিনটির কথা এখনো তার স্পষ্ট মনে পড়ে। মনে হয়েছিলো, নিচু-ক্লাসের সেই ছোট, কোমল, ঘন ঘরটির মধ্যে বসে তার মনে হয়েছিলো, সে যেন কোন রূপকথার রুপোলি রাজ্যে এসে হঠাৎ পথ হারিয়ে বসেছে, বিস্ময়ের আর সীমা নেই। জানালা দিয়ে সাদা দেয়ালের উপর এক পশলা রোদ এসে পড়েছে, বাইরে দেখা যাচ্ছে গাঢ় সবুজের ঝাপসা মাঠ—তার শৈশব-মনের মধ্যে সেই মাঠ যেন ছিলো ঘুমিয়ে। সেই ছোট ঘরের রোদ-লাগা দেয়ালের নরম উষ্ণতা তার মনে এনেছিলো একটা নিভৃতির আবেশ, একটা কঠিন ঘনতার আবহাওয়া। বইয়ের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা মনে হতো তার নতুনতর ভোরবেলার মতো, অক্ষরগুলি যেন অপরিচিত তারার মতো রহস্যে ঝলমল করছে। নতুন একটি শব্দ খুঁজে পেলো,

যেন বৃহৎ এক মহাসাগরে খুঁজে পেলো সে একটা দ্বীপ। ক্লাসের একটা চৌকাঠ অতিক্রম করলো, যেন পেলো সে আরো খানিকটা আকাশ। সামান্য শব্দে যে এতো জাদু আছে, তার অর্থে যে এতো অসীমতা, তা আর আগে কে জেনেছে? তার জীবনে নেমেছে এই শব্দের শিশিরাদ্র' স্তব্ধতা, শব্দের এই রৌদ্রময় অন্ধকার। দুর্ভেদ্য শব্দ দিয়ে দৃঢ় করে রেখেছে সে তার জীবনের দুর্গ, অব্যাহত হয়ে আছে সে তার বলিষ্ঠ, নিষ্ঠুর নিশ্চিন্ততায়।

এক এক সময় শব্দের অরণ্য ঠেলে-ঠেলে সে-ও ক্লান্ত হয়ে পড়তো, তারো মতো দানবীর যে দুর্ধর্ষতা। শব্দের এতো ভার যেন আর বওয়া যায় না। মনে হতো, কী হবে এতো মনে করে রেখে, কী আছে এদের মানে জেনে? প্রথম-প্রথম, ছেলেবেলায়, শব্দ ও তার অর্থ মিলে তার মনে একাকী আবিষ্কারের একটা নির্জন ঐশ্বর্য এনে দিয়েছিলো, সে-আনন্দ ছিলো আহরণে নয়, আস্বাদনে। তারপর যখন সে চলে এলো কলেজে, কলকাতায়, অভ্রংলিহ আকাঙ্ক্ষার আকাশে, তখন সেই শব্দ হয়ে দাঁড়ালো অর্থহীন; অর্থগুলি নিঃশব্দ। যেন বিছিন্ন কতোগুলি অস্থিতে বিকৃত একটা কঙ্কাল। আর সেই শোভাযাত্রা নয়, একটা শৃঙ্খলায়িত শ্রেণীবদ্ধতা। তবু সেই শৃঙ্খল থেকে সৌম্যর নিস্তার নেই, এই শৃঙ্খলকেই করে তুলবে সে জয়মাল্য। প্রতি পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হতে লাগলো, দস্যুর মতো দুই হাতে কুড়িয়ে নিতে লাগল শব্দের ঝিনুক। ফার্স্ট না হয়ে তার উপায় নেই—নিতেই হবে কোনোরকমে তাকে একটা চাকরি। তখন তার সমস্ত শব্দ ও অর্থ মনে-মনে এই চাকরি কথাটি উচ্চারণ করছে। তখন, দুর্বার দুঃসাহসে ঝাঁপিয়ে পড়তো আবার সে শব্দের লবণাক্ত সমুদ্রে, লেভায়াথান-এর মতো ঘোলা জল ঘেঁটে সে আবার অগ্রসর হতো—ঐ বুঝি দেখা যাচ্ছে সোনালী তীর; তার সাফল্যে শ্যামল, উত্তপ্ত আশ্রয়।

তারপর একদিন সৌম্যর ছুটি মিলে গেলো, পাশ করবার আর পরীক্ষা নেই। যার জন্যে এতদিন ধরে সে অক্ষরাকীর্ণ বিদ্যার মরুভূমি পার হয়ে এসেছে, মিলেও গেলো সে-চাকরি, কিন্তু, আশ্চর্য, তার জন্যে এতো দুঃসাধ্য সাধনায় তার ফার্স্ট না হলেও হয়তো চলতো। চাকরিটা এক বিলিতি সওদাগরি আপিসের য়ুরোপিয়ান অ্যাসিস্টান্টসিপ্—মিলে গেল বিদ্যের বহরে নয়, মুরুব্বির জোরে। হেসে-খেলে জীবনটাকে বাজিয়ে-যাচিয়ে এমনি গা ছেড়ে দিয়ে সামান্য এম-এটা পাশ করলেও হয়তো চাকরিটা মিলতে পারতো, তার জন্যে বই দিয়ে এই একটানা বাইশ বছরকে এমন বাক্স-বন্দী করে রাখবার দরকার ছিলো না। যাই হোক, পথের অনর্থক দীর্ঘতার দুঃখ ভোলা যায় প্রাপ্তির শিখরে উঠে। শুরুতেই তিনশো টাকা মাইনে।

তারপরের ব্যাপারগুলো এমন তাড়াতাড়ি ঘটতে লাগলো যার জন্যেও এতোদিন ধরে তার জীবনে কোনো ধারাবাহিক প্রস্তুতি ছিলো না। সৌম্যরা বাড়ি বদলালে চারপাশের দেয়ালগুলোকে, এতোদিনকার ঘন, চাপা দেয়ালগুলোকে একটু দূরে দিলে ঠেলে, আলো-হাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দিলে অবারিত। আগে-আগে বন্ধুরা কেউ ডাকতে এলে নিচেই তাকে নেমে যেতে হতো, রোয়াকে দাঁড়িয়ে বাক্যালাপ; এখন সে তাদের সটান, স্বচ্ছন্দে উপরে নিয়ে আসতে পারছে, উপরেই এখন তার

বসবার ঘর। শোবার সীমান্তেই এখন তার বাথরুম। দেখতে দেখতে, এর জন্যেও ছিলো না কোনো আকস্মিক সম্ভাব্যতা, তার জীবন-যাত্রায় এসে গেলো একটা এলো-মেলো সাহেবিয়ানা, সেই গোলমাল ঢিলেমির পর একটা ধারালো ঋজুতা। নতুন করে সূর্য উঠলো, পৃথিবী পৃষ্ঠা উলটোলে। শুধু তার সেই বইগুলিকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না, সেই রাশীভূত অক্ষরের নির্ভুল পারম্পর্য বিস্মৃতির ধুলোয় হঠাৎ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলো। সমুদ্রটা পার হয়ে আসতেই অনাবশ্যক সেতুটা সৌম্য পা দিয়ে ঠেলে দিলে।

তারপর আরো আছে।

সৌম্যর বাবা পরমেশবাবু এই সময়ে তার বিয়ে দিলেন, যে-টুকু সামান্য বেসুর ছিলো তা ছন্দে তুললেন নিটোল করে। ছেলের একটা মত পর্যন্ত জিগ্গেস করলেন না। ভাত খাওয়ার পর আঁচাতেই হয়, চাকরি পাবার পর বিয়ে। বলতে কি, এবিষয়ে সৌম্যর মত কিছু ছিলোও না। কাকে বা কেমনধারাকে বিয়ে করবে দূরের কথা, এখুনি এই মুহূর্তে, বিয়ে করাটা সম্ভব কিনা সে-সম্বন্ধে পর্যন্ত নয়। এতোকাল সে সযত্নে পরের মত কুড়িয়েই বেড়িয়েছে, নিজের মত বা মন নিয়ে এক বিন্দু মাথা ঘামায়নি। যেমন পোকা-মাকড়ে রক্ত নেই, তেমনি তার মধ্যে কোনো মত ছিলো না। যা একান্ত হাতের কাছে এসে পড়ে, তাতেই তার ঘোরতর সম্মতি আছে। যেমন তার চাকরি। বিশেষ এটার জন্যে তারই এমন কোনো লোলিহান চেষ্টা ছিলো না, তেমনি কোনো বিশেষতরর জন্যেই তার অসম্ভব আসক্তি নেই। চাকরি করতে হয় করবে, মাইনেটা মোটা হলেই হলো, বিয়ে করতে হয় করবে, পাত্রীটি মেয়ে হলেই যথেষ্ট। পরমেশবাবু বাছাই করতে লাগলেন, অধিকাংশ পাত্রী মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে ফেল করলো। তাঁর চুল-চেরা পরীক্ষা। কেউ দিব্যি রূপের পাহাড় ডিঙিয়ে এসে কৌলীন্যের কূলে আছাড় খেয়ে পড়লো, কেউ যদি বা কুল রাখলো তো এদিকে শ্যামত্বও তাদের ভীষণ।

অবশেষে একটি মেয়েকে তিনি চিহ্নিত করলেন। পরমেশবাবুর মুখে তার বর্ণনাটা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। ডাক পড়লো সৌম্যর। পরমেশ-বাবু বললেন,—কি, একবার নিজের চোখে দেখে আসবি নাকি?

সৌম্য হাসি-মুখে নির্লিপ্ত গলায় বললে,—না, আমার আবার দেখার কী দরকার।

॥ দুই ॥

পাত্রীকে সভাস্থ করা হলো। রক্তের মতো লাল চেলীতে মেয়েটি যেন ফাঁপানো খানিকটা লাল মেঘ, তার শাড়িতে শিখার মতো একটা দুঃস্পৃশ অশারীরিকতা। মাথায় নতুন একটি ঘোমটা দুই চোখের উপর অনাদি রাত্রির রহস্য এনে দিয়েছে। পৃথিবীর ওপারে চাঁদের যেই আধখানা অন্ধকার, মেয়েটি যেন সেই আধখানা

চাঁদেরই মতো আশ্চর্য অচেনা। পিঁড়ির উপর বসবার শ্রীতে সে তার শরীরের সমস্ত স্নেহ যেন ঢেলে দিয়েছে, তার চিত্তের তরল নম্রতা। কোলের উপর শুভ্র, শিথিল দু'খানি হাতে দুর্বল, আর্দ্র করুণা ; যেন তার নিঃসহায় রিক্ততার ছবি। অলক্তলিপ্ত নরম লাজুক দু'টি পদতল যেন অলিখিত দু'টি কবিতা। পা দু'টি গুটিয়ে বসবার ভঙ্গুর রেখাটি যেন মধ্যরাত্রে ঘুমের মধ্যে শোনা বাঁশির সুরের মতো উদ্‌ভ্রান্ত।

সুখে সৌম্যর সমস্ত শরীরে স্পর্শময় গাঢ় একটি তন্দ্রা নেমে এলো। তার জন্যে আজকের এতো আয়াস-আয়োজন, এতো সাজ-সজ্জা, এতো হৈ-চৈ, সব সে বুঝতে পারে ; বুঝতে পারে, তারই জন্যে আজকের রাত্রি ফুলে ও আলোয়, লাস্যে ও লাবণ্যে অসম্বৃতা হয়ে উঠেছে চারদিকে এতো ব্যস্ততা, এতো বাহুল্য, ছেলেদের এতো ক্লান্তি, মেয়েদের এতো সভঙ্গ তরঙ্গিমা - সব সে বুঝতে পারে, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না, সংসারে এতো মেয়ে থাকতে কী করে এই বিশেষ অপরিচিত মেয়েটি, এক চিলতে জ্যোৎস্নার মতো মলিন মেয়েটি, কী অসীম দুঃসাহসে তার মাঝে আকাশের অতল আত্মীয়তা নিয়ে তার সামনে চুপি-চুপি এসে বসলো। এতোটুকু ভুল করলো না, এতোটুকু দ্বিধা করলো না। কাতর করুণ দু'খানি অর্ধোচ্চারিত হাতে অসঙ্কোচে বলতে লাগলো ; এতো বড়ো পৃথিবীতে একমাত্র আমিই তোমার একান্ত, আমাকে তুমি নাও, আমাতে তুমি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠো। আশ্চর্য, সৌম্য যেন প্রাপ্তির প্রচণ্ডতায় স্তব্ধ হয়ে গেলো, অগ্নিময় প্রথম পৃথিবী-পিণ্ডে শ্যামল প্রাণসঞ্চারের মতোই যেন এ আদিম, অসম্ভব। ঐ দু'টি হাতে নিয়ে এসেছে সে স্পর্শের সমুদ্র, দু'টি আনমিত ভুরুতে বিস্ফারিত বিস্ময়, বিস্রস্ত আঁচলে আকাশের অজস্রতা—শুধু তারই জন্যে, ভাবতে সৌম্যর সমস্ত রক্তধারা যেন গান গেয়ে উঠলো। একটি শঙ্খের মাঝে যেমন বিশাল সমুদ্রের নিশ্বাস শোনা যায়, তেমনি মেয়েটির মধ্যে নিমীলিত হয়ে আছে জীবনের বিচিত্রিত অপরিমেয়তা।

গোড়াতেই হয়ে গেছে শুভদৃষ্টির পালা। সৌম্য ছিলো দাঁড়িয়ে, শিপ্রাকে পিঁড়ি করেই তোলা হলো, মাথার উপরে কে ছড়িয়ে দিলে একটা সাদা চাদর। ভীষণ গোলমাল ; ভালো করে, চোখ বড়ো করে তাকা, শিপ্রা। লজ্জায় আচ্ছন্ন, পল্লবিত, ভীরু দু'টি চোখ শিপ্রা ধীরে-ধীরে তুলে ধরলো। ভীরুতা, অথচ প্রচ্ছন্ন একটি প্রগাঢ় পরিচিতি ; শিপ্রা যেন ঈষৎ স্ফুরিত ঠোঁটে বলছে ; মুহূর্তের কতো মরুভূমি পেরিয়ে শেষকালে তোমাকে চিনলুম। কি, আমাকে, সেই আমাকে তুমি চিনতে পাচ্ছো না ? সৌম্য কী যে দেখলো ঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। রাত্রের অন্ধকারে সাদা খানিকটা সমুদ্র, না মৃত্যুর পরে অবিনশ্বরতার ধূসর একটা ইশারা, তা তাকে কে বলবে ? মালা-বদলের পর আবার তারা যার-যার পিঁড়িতে গিয়ে বসলো ! শিপ্রার সমস্ত মুখের মধ্যে সৌম্যর কেবলি মনে পড়তে লাগলো তার চিবুকের সেই ডৌল, নাকের শিশুসুলভ সারল্য, কপালের উপরে চুল কটির শীতল বিশ্রান্তি।

বাসর-ঘরে শিপ্রাকে সৌম্য পেলো না, পেলো না তার পরিপূর্ণ নিভৃতির পরিমণ্ডলে। ঘরে-বাইরে তখন অনেক চকিত-চক্ষু চঞ্চলার ভিড়, হাসির কশাঘাতে সমস্ত শূন্য তারা উচ্ছৃঙ্খল করে দিয়েছে। কতোক্ষণে শেষ হবে না-জানি এ

ফেনায়িত মুখরতা! কতোক্ষণে তাদের এই মদের বুদ্বুদের মতো উচ্চ হাসির পরে নামবে শীতল আলস্য, ঘুমের মধুরতা! কতোক্ষণে এরা বাড়ির সমস্ত আলো নিবিয়ে জ্যোৎস্নাকে পথ ছেড়ে দেবে, তাদের শরীরে, তাদের বিছানায়, তাদের প্রথম পরিচয়ের প্রতীক্ষমাণ মৌনে। অসম্ভব। আজই যেন, এখনো যেন, যতো রাজ্যের গান আর কথা, পিচ্ছল লীলা আর উজ্জ্বল উচ্ছলতা, ঘুমের কুয়াশা যেন উল্লাসের উদগ্র বিদ্যুদ্দন্তে বিদীর্ণ হচ্ছে। সৌম্য স্নায়ুতে-স্নায়ুতে ক্লান্ত হয়ে উঠলো। সে এখন চায় গম্ভীর স্তব্ধতা, শব্দের অভাব নয়, শব্দহীনতার স্পর্শসহ একটা উপস্থিতি, ফেনহীন সুনীল মধ্য-সমুদ্রের শান্তি, কোনো-কিছুর ভয় নয়, তবু এমনি একটা ভয়ের বিরাজমানতা। সে-স্তব্ধতা চায় সে তার স্বাদে, আঘ্রাণে, তার পরিপার্শ্বে, তার আত্মায়। সৌম্য সমস্ত চেতনায় স্তব্ধ হয়ে সেই স্তব্ধতার অপেক্ষা করতে লাগলো। তারপর সত্যি যখন ঘরের দেয়ালগুলি চুপ করে গেলো, আলোগুলি যখন অন্ধকারে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো, তখন প্রায় শেষ রাত্রি, চাঁদ প্রায় হলদে হয়ে এসেছে। শিপ্রা বিছানার এককোণে একটুকরো নরম অন্ধকারের মতো ঘুমে রয়েছে অসহায় হয়ে—সমস্ত ক্ষীণজীবী চাঞ্চল্যের অন্তরালে নিঃশব্দ একটি উপলব্ধির সুষমা—তার সেই ঘুম, সমর্পিত, সুন্দর সেই ঘুম যেন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। শরীরে কোথাও এতোটুকু ভয় নেই, বাধা নেই – তার ঘুমটুকু যেন একবিন্দু শিশিরের মতো তার বিছানার উপর ঝরে পড়েছে। সৌম্য স্নিগ্ধ, আবিষ্ট চোখে সেই ঘুমটুকু দেখতে লাগলো—যেন অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে, পাছে দৃষ্টির উত্তাপে প্রজাপতির মতো তা উড়ে যায়। শিপ্রার ক্ষীণ, ক্লান্ত মুখে রাত্রির পাণ্ডুর একটি আভা এসে পড়েছে, সে-মুখের কাতর ডৌলটিতে কী পরিপূর্ণ বিশ্বাস, দু'টি অশঙ্কমান ভুরুতে কী অসীম নির্ভর—সৌম্যর ভারি মায়া করতে লাগলো। চিনতো না, শুনতো না, স্বরের একটি রেখা নয়, পায়ের নয় একটি শব্দ, এতোকালের অন্ধকার পেরিয়ে কী অসীম অনায়াসে শরীরময় অগাধ স্তব্ধতা নিয়ে তার পাশে আজ সে শুয়ে আছে। নির্ভুল, নিভৃত অনায়াসে। আশ্চর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের কী নিগূঢ় ষড়যন্ত্রে আজকের এই স্তিমিত রাত্রি, এই সুরভিত স্তব্ধতা, এই বিন্দু-পরিমাণ ঘুম! এই ঘুমের নির্মাণে জ্বলেছে কতো সূর্য, গলেছে কতো জ্যোৎস্না, গড়িয়ে গেছে কতো ঘুমের নিটোলতা। একটি বিহ্বল ফলের মাঝে যেমন বহু সূর্যের স্বাদ, তেমনি এই ঘুমের আড়ালে যেন বহু রাত্রির অন্ধকার। কতো মুহূর্তের প্রতীক্ষা নিয়ে সে আজ পরিপূর্ণতায় ডুবে গেছে। অথচ সৌম্যর নিজের দিক থেকে এর জন্যে কোনো প্রস্তুতি ছিলো না, এই অপরূপ ঘুমহীনতার। তার কর্মব্যস্ততার চারদিকে যে এমন একটি স্তব্ধতা ছিলো ঘুমিয়ে, কোনো বই-ই তা লেখেনি। আশ্চর্য, এমন কথা কোনো একটা বইয়েও কিনা লেখা নেই।

শিপ্রাকে সৌম্য পেলো ফুল-শয্যার রাত্রে, রাত্রের প্রায় শৈশবে। চাঁদ তখন জানালার মুখোমুখি, অন্ধকার বিছানা ফুলের ফেনায় ভরে গেছে। হাওয়ায় দেয়ালে কাঁপছে ধূসর নিঃশব্দতার ছায়া। ঘরের মাঝামাঝি খাটের উপর নিভাঁজ বিছানায় জ্যোৎস্নার রুপোলি জল—ভেজা রাত্রির সিত শীতলতা। তার তীরে তীরে ধূসর দেয়ালে রেখাহীন কালো ছায়া দুলছে, আনগ্ন মৃত্যুর শুভ্রতার পারে যেন অনির্ণীত, অবিনশ্বর। শিপ্রা খাটের ধার ঘেঁষে চুপ করে বসে আছে, নিঃশব্দতার

একটা ঢেউ, বসে আছে তার সমস্ত প্রতীক্ষা নিয়ে, প্রত্যক্ষতা দিয়ে। এতোদিন ধরে তার শরীরের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় লিখে এনেছে সে রক্তিম গীতি-কবিতা, অনেক সূর্যোদয়ের ইতিহাস, অনেক বসন্তের উপঢৌকন, তার চুলে এনেছে সে অনেক অরণ্য-আকুলতা, তার বর্ণে অনেক হৈমন্তিক ঐশ্বর্য—সব তারি জন্যে—সৌম্য সে চেতনার জ্যোৎস্নায় যেন একটা সাপের মতো ঠান্ডা, শিথিল হয়ে উঠলো। শিপ্রার চারপাশে এই নীরবতার উদ্বেল প্রশ্নটি পর্যন্ত তার অধিকারে।

সৌম্য মমতায় ক্লান্ত গলায় জিগ্‌গেস করলে: তোমার ঘুম পাচ্ছে?

সরলতায় করুণ শিপ্রার মুখ। মুখে সস্মিত সম্প্রীতির সলজ্জতা। তার গলার স্বর যেন জ্যোৎস্নার মতো সাদা, ঠান্ডা।

শুধু বললে,—না।

তাই ভালো, তারা এই রাত, সাদা ঠান্ডা রাত, তাদের মধ্যে গভীর গোপনে গলে যেতে দেবে, এই তরল নীরবতার জলে, স্পর্শহীনতার আমর্মমূল স্পর্শে। যতোক্ষণ সম্ভব, যতোক্ষণ তাদের শরীরে মৃত্যুর মতো না ঘুম নেমে আসে। চাঁদ যাবে সরে, ক্ষীণ হয়ে আসবে তার হারিদ্র পান্ডুরতায়, দেয়ালের ধূসর ছায়া বিছানায় ফেলবে ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস। তবু তারা জেগে থাকবে, প্রথম পরিচয়ের রমণীয় প্রচ্ছন্নতায়। তারপর আকাশে আর চাঁদ থাকবে না, না থাক তাদের আত্মার গহন সমুদ্রের তলা থেকে উঠে দাঁড়াবে আর এক নতুনতর সূর্য। এখন যা অপরিচয়ে সাদা, তাই তখন অন্তরঙ্গতায় রক্তিম।

॥ তিন ॥

সৌম্যর জীবনের হঠাৎ যেন দাম বেড়ে গেলো। চাকরি পেয়ে ততো নয়, যতো বিয়ে করে। চাকরি পেয়ে সংসারের চোখে মর্যাদা তার বেড়ে গেছে অবিশ্যি, কিন্তু আসল মূল্য তার নিজের কাছে: নিজের সমারোহ, নিজের সম্মাননা। সমতল জায়গা থেকে হঠাৎ সে যেন একটা গিরিচূড়ায় উঠে এসেছে, প্রায় আকাশের উত্তপ্ত সামীপ্যে, তার জীবনে এখন একটা সুবিশাল সম্ভাবনা, একটা জান্তব বলদীপ্তি। অরণ্যে নবীন বসন্ত-বিদারণের মতো তার জীবনের রূঢ়তায় এসেছে লাবণ্যের বন্যতা: সে সুন্দর, রক্তের অণুতে সে সুন্দর, দৃষ্টির প্রতি কণায়, কথার অতিরিক্ত সকল অকথিততায়। প্রতিটি মুহূর্ত গুনে-গুনে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে ছেড়ে দিচ্ছে, তার একটি ধূলিকণাও সে অপব্যয় করছে না—দ্রুত, এতো অল্প—রাতগুলি কী ভীষণ ক্ষণস্থায়ী, দিনগুলি কী পিচ্ছিল পলায়মান! আকাশের অপরিমেয় ভান্ডার থেকে সে যেন সমস্ত সময় লুট করে আনতে চায়, সমুদ্রের তলা থেকে অনন্ত কালের অনুদিত সূর্যোদয়। সৌম্য যেন একটু গম্ভীর হয়ে পড়েছে, সহসা কোনো বিপদের মুখে এগিয়ে যেতে তার আর সেই সাহসিক স্বাধীনতা নেই; তার সমস্ত চাপল্য, সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার উপর নেমে এসেছে শিপ্রার অশরীরী

স্পর্শলতা। সবুজ শস্যের তন্তুতে দৃষ্টি-বহির্ভূত, সূক্ষ্ম খাদ্যপ্রাণের মতো তার প্রতিটি নিঃশ্বাসে, প্রতিটি রোমকূপে মিশে আছে শিপ্রার নেপথ্যস্থিতি। শিপ্রা তার মাঝে মিশে আছে, ডুবে আছে, গলে আছে। উপসর্গ যেমন ধাতুকে জোর করে এক অর্থ থেকে অন্য অর্থে নিয়ে যায়, তেমনই শিপ্রা তাকে তার উপস্থিতির প্রবলতায় নিঃস্বতা থেকে বিশ্বময়তায় নিয়ে এসেছে। একমুহূর্ত তার বিরাম নেই, শরীরের এই অতীন্দ্রিয় অবচেতনা থেকে। সকালবেলা ঘুম ভেঙে সৌম্য দেখতে পায়, বিছানা খালি, শিপ্রা কখন উঠে চলে গেছে নিচে, মশারিটা তোলা, সমস্ত ঘরটি তার চলে-যাওয়ার নির্মলতায় ঠাণ্ডা, অস্পষ্ট। দেয়ালে, ঘরের আসবাবে, মেঝের উপর, ভোরের নতুন আভা এসে পড়েছে, তার এই তিরোধানের মতো নরম, একটু-বা বিষণ্ণ। আবার আরেকটি সকাল, তার ক্ষণিক অনুপস্থিতির উত্তাপে সব-কিছু কেমন রহস্যময় লাগছে। সৌম্য আরো খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকে, আশরীর অনুভব করে এই সকালের শৈথিল্য, আবার আরেকটি সকাল, আবার আরেকটি সকাল সে সৃষ্টি করলো তাদের এই অবকাশের আকাশে।

শিপ্রার সঙ্গে তারপর তার সেই দেখা হয় চায়ের টেবিলে, চৌকো ছোট একটা টিপাইয়ের মুখোমুখি। শিপ্রার বসবার ভঙ্গিটা আলস্যে একটু এলোমেলো, তার চুল ও শাড়ির রুক্ষতাটি রোদ লেগে ঝিকমিক করছে। মসৃণ, একটু-বা মলিন দু'টি চোখে টলমল করছে, স্নেহ। ভোরবেলাকার স্নেহ। দুটি হাত যেন নীরব ঔৎসুক্যে অলস শান্তিতে কোলের উপর থেমে আছে। ভুরু দুটিতে জিজ্ঞাসার কোনো রেখা নেই, কপালে স্বচ্ছ একটি ঔদাসীন্য। তার সমস্তটি শরীর যেন বৃষ্টির জলের মতো বর্ষমাণ।

সৌম্যর ভীষণ ভালো লাগে, ভালো লাগে এই ভোরবেলাকার নতুন আরম্ভটি। ভালো লাগে শিপ্রার বাহু দু'টির ঢেউ, দু'টি পায়ের নরম লঘিমা, গতির দ্রুত রশ্মিরেখা। ভালো লাগে আবার তার গা-ময় ঘন এই নীরবতার মেঘ। অথচ এই ভালো-লাগার জন্যে কিছুই সে দাম দেয়নি, এই ভোর-বেলাটির জন্যে কোনোদিন ছিলো না তার রাত্রির তপস্যা। হঠাৎ একদিন তার আকাশ অসম্ভব ঐশ্বর্যে যেন আনগ্ন হয়ে দাঁড়ালো, সে যেন জনহীন কোন বিদেশে এসেছে হাওয়া বদলাতে।

শিপ্রার নির্লিপ্ত, নিস্তেজ চিবুকটির দিকে তাকিয়ে সৌম্য জিগ্গেস করে : তোমার কেমন লাগছে ?

চায়ের বাটি থেকে চোখ তুলে শিপ্রা শিশুসুলভ সরলতায় বলে : কী ?

—চার-পাশের এই সব, এই সংসার। এই ভোরবেলা, তোমার গায়ের উপর ছোট্ট এই রোদের টুকরোটি।

শিপ্রার নিচের ঠোঁটটি হাসিতে ঈষৎ স্ফুরিত হয়ে ওঠে : মন্দ কী।

সৌম্য এবার তার সমস্ত মুখের উপর পরিব্যপ্ত দৃষ্টি ফেলে ; বলে : আর আমাকে ?

লজ্জার লৌহিত্যে শিপ্রার মুখ একটা উন্মোচিত ফুলের মতো কাঁপতে থাকে। কথা যেন রক্ত হয়ে বাজতে থাকে শরীরের স্নায়ুতে। কিন্তু সহসা ঘরের এই অন্তরঙ্গ নির্জনতা, ভোরবেলার এই সজীব শান্তি, মুহূর্ত ক'টির এই উদ্বেল

ঘনতা, তার কাছে যেন উচ্চারিত হয়ে উঠতে চায়। আবিষ্ট, দীর্ঘ একটি দৃষ্টি মেলে সে সমস্ত শরীরে সাহস সঞ্চয় করে বলে : খুব ভালো।

সেই স্বর সমুদ্রের ঢেউয়ের সফেন আদরের মতো সৌম্যর শরীরের উপর ভেঙে পড়ে।

তাই বলে এই আদর-কাড়াকাড়ি করবার বেশি সময় নেই শিপ্রার, অন্তত এই ভোরবেলা, চায়ের টেবিলে। তার অনেক কাজ, তার লেখাজোখা নেই। সংসার বেশি বড়ো নয়, পরমেশবাবুকে নিয়ে তিনটি-চারটি মোটে প্রাণী, চাকর আর ঠাকুর, তবু কাজ তার অফুরন্ত। এতো কাজ যে কোথায় এতোদিন লুকিয়ে ছিলো সৌম্য তা ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। শিপ্রার হাত লেগে ছোট-ছোট খুঁটিনাটি কাজগুলি পর্যন্ত গানের টুকরোর মতো বেজে উঠেছে। কাজগুলির দাম একমাত্র তাদের চপল অনাবশ্যকতায়, শিপ্রার সশরীর আত্মাবিকিরণে। কাজ না করলে তার নয়, কাজগুলিই তার আকাশের দিকে প্রসারিত জীবনের ছোট-ছোট জানলা। তার ছুটি, তার উদ্বৃত্তি।

খবরের কাগজ নিয়ে সৌম্য তারপর একটা কৌচের গহ্বরে ডুবে যায়, মদিরতর আলস্যে। তার সমস্ত বিদ্যাবত্তা এখন মাত্র এই প্রাত্যহিকতায় এসে ঠেকেছে। তারপর কখন আবার শিপ্রা উঠে আসে, তার চলায় এখন একটু কর্ত্রীত্বের মন্থরতা, পরনের রুক্ষ শাড়িটা দিনের ময়লা লেগে এখন একটু সম্বৃত, গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সৌম্য চমকে ওঠবার ভান করে না, খবরের কাগজের আড়ালে তার সেই গাঢ় উপস্থিতিটি সে সম্ভোগ করে।

শিপ্রা এগিয়ে এসে বলে : বেলা হলো যে, এখন উঠবে না ?

—তাই নাকি ? কটা বাজলো ? কাগজগুলি মসমসিয়ে দুমড়ে সৌম্য উঠে পড়ে।

— বড়ো ঘড়িতে প্রায় সাড়ে নটা।

বলো কী, সময় যে আজকাল উড়ছে।

অথচ, আগে-আগে নিজেকেই নিজের তার তাড়া দেবার কখনো সময় হতো না, নিজেই সে থাকতো এতো উচাটন। ঘড়ির কাঁটাটা সব সময় তার চোখের উপর বিঁধে থাকতো। এখন, শিপ্রার উপর সে তার অনেক ভার, অনেক শ্রান্তি নামিয়ে দিয়েছে, এখন এই তাড়াটুকুর জন্যে সে শরীর পেতে অপেক্ষা করে।

মাত্র খাওয়ার মধ্যে পৃথিবীর যে এতো স্বাদ ছিলো তা কে জানতো ? ঠাকুরের উপর এখন থেকে শিপ্রা খোদাগিরি করছে বলে প্রত্যেকটি খাদ্য যেন তার স্নেহ-ক্ষরণে মধুর হয়ে উঠেছে। সপ্তাহান্তে কবে আবার ছুটির দিন আসবে, তারা দুজনে বসবে একসঙ্গে খেতে দ্বৈপ্রহরিক নির্জনতায়। খাওয়ার সময়টায় শিপ্রা তার আশে-পাশে টুকরো-টুকরো হয়ে ছিটিয়ে থাকে। খেয়ে উপরে উঠতে-না-উঠতেই শিপ্রা আবার তার পোষাকের তদারকে লেগেছে। ছোট বোতামটি থেকে শুরু করে পেন্টালুন-এর ক্রিজটি পর্যন্ত তৈরি, নিভাঁজ।

পিছন থেকে কোটটা মেলে ধরে তাকে হাত ঢোকাবার সুবিধে করে দিতে-দিতে শিপ্রা হাসিমুখে জিগগেস করে : এতোদিন তোমার কী করে চলতো, যতোদিন আমি ছিলুম না ?

—সত্যি, আমিই নিজে অবাক হচ্ছি, শিপ্রা, তুমি এতোদিন না এসে কী করে থাকতে পারলে ? দেখছোই যখন আমার চলছিলো না।

কোটটা পরে সৌম্য ঘুরে দাঁড়ায়।

—চলছিলোই না তো। শিপ্রার চোখে-মুখে হাসি ভুরভুর করতে থাকে।

—সত্যি চলছিলো না, সত্যি আমি থেমে ছিলুম। এখন একেবারে গদ্যের মতো গড়িয়ে চলেছি।

—ছাই। কুড়েমির একটি ঢিপি হচ্ছ দিন-দিন।

—তোমার জাদুমন্ত্রে। আমার অনেকখানি তোমাকে দিয়ে ফেলেছি যে, ভীষণ হালকা হয়ে গেছি। দাও, দাও, পান দুটো দাও দিকি এগিয়ে। বেলা হলো।

সৌম্য ছোট্ট একটা হাঁ করে। যাতে ধরতে না পায় দুটি আঙুলে সেই দুষ্টুমি এনে শিপ্রা তাড়াতাড়ি পানের খিলি দুটো তার মুখের মধ্যে ছেড়ে দেয়। তার বাইরের এই সম্ভ্রান্ত সাহেবিয়ানার ফাঁকে এই পান-টুকুকেই শুধু সে প্রশ্রয় দিয়েছে—শিপ্রার হাতের সবুজ এই একটি স্নেহ, তার সলজ্জ একটি চুম্বনের মতো নিটোল। শিপ্রা জানলায় লুকিয়ে একটু-বা দাঁড়ায়, এমন ভাবে দাঁড়ায় যাতে সহজে সৌম্যর না চোখে পড়ে, অথচ যাতে তার এই আধেক দাঁড়ানোটি অনায়াসে সে বুঝতে পায়, পিছনে না তাকিয়েই।

সারাদিন আপিসে নানা কাজের জটিলতায় বসে-বসে সৌম্য প্রতীক্ষা করে কখন আবার আসবে সেই তীক্ষ্ম কালো রাত, অন্ধকারে দীপ্যমান সেই নিঃশব্দতা। আপিস যখন ভাঙে, সন্ধ্যার সেই ধূসর সূচনাটি শিপ্রার চোখের ক্লান্ত কাতরতার মতো বন্ধুতায় স্নিগ্ধ মনে হয়। আবার সে লুকিয়ে জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেই একটি অস্পষ্ট আচ্ছন্ন ভঙ্গিতে, যাতে আবার সৌম্য না তাকে দেখতে পায়। সান্ধ্যকৃত্য সেরে সৌম্য আর কোথাও বেরোয় না, কাউকে আর ডাকেও না তার বাড়িতে—কোথায় সে আর যাবে, পৃথিবীতে আর জায়গা কোথায় ? বসে-বসে অন্ধকার শুধু সে ঘন করতে থাকে, একটা কঠিন অস্তিত্বের মতো তা ধীরে-ধীরে সন্নিহিত, পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে চারপাশে। মানুষের জীবনে রাত যে একটা এতো বড় সৌন্দর্য তা তার আগে আর কে জেনেছে ?

তারপর আবার আরেকটি সকাল, আবার আরেকটি পরিচ্ছন্ন পুনরাবৃত্তি।

এতো সুখ যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, এতো সুখ যে, মানুষের শরীরে যেন তা বহন করা যায় না। মনে হয় না পৃথিবীতে কোথাও কোনো দুঃখ আছে, কোনো দুঃখ থাকতে পারে পৃথিবীতে। আর থাকলেই বা কী, তার তাতে কী এসে যায় ? পৃথিবীর এক-অর্ধ অন্ধকারের জন্যে আরেক-অর্ধ দিবালোকে হাহাকার করুক, সে সুখী, সে সম্পূর্ণ, তার অস্তিত্বের শীতল এই ছায়ায়, অন্ধকারের এই ভয়ঙ্কর বিপুল প্রশান্তিতে। সে আর কিছু চায় না, শুধু প্রচুর প্রাণধারণ করতে, তার উত্তপ্ত উচ্ছ্বসিত দেহে, শুধু বিস্তার করতে তার রক্তের রশ্মিজাল অরণ্যে বিদ্যুৎরোমাঞ্চের মতো। সে আর জানতে চায় না, পুঁথি-পত্রকে নির্জীব আবর্জনার মতো সে দূরে ঠেলে দিয়েছে, সে এখন চায় বুঝতে, প্রতিমুহূর্তে জীবন্ততরো হতে। এর চেয়ে কোথায় আর সুখ আছে—বাঁচবার বিস্ময়ে শুধু

বাঁচা মুহূর্ত থেকে মুহূর্তের চূড়ায় ভেঙে-ভেঙে পড়া, দেহের প্রতি অণুতে রৌদ্ররক্তিম হয়ে ওঠা। শিপ্রা—এই শিপ্রাই তার জীবনে নিয়ে এলো প্রথম বাঁচবার অর্থ, বাঁচবার অসামান্য রহস্য। সে-ই নিয়ে এলো জীবনের ঊর্ধ্বে আকাশের অলৌকিকতা, দেহের উত্তরে গাঢ় নিঃশব্দায়মান একটি স্তুতি, ঈশ্বরের বিশাল ছায়াচ্ছন্নতা। শিপ্রা যেন তার জীবনে বিশালতার একটা ঢেউ, অন্ধকারের মন্দিরে তার একটি খোলা দুয়ার। তার সমস্ত সুখ যেন পৃথিবীতে বায়বিক ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে পড়েছে, সমস্ত পৃথিবীতে যেন সীমা পেয়েছে এসে তার এই ছোট ঘরটুকুর ঘনতায়।

কোনো রাতে, মোমের মতো নরম, ফেনার মতো ফাঁপানো জ্যোৎস্নায়, শিপ্রাকে নিয়ে সৌম্য ছাদে উঠে আসে। চারিদিকে জ্যোৎস্নার উত্তাল ঝড় বইছে, সারা শরীরে ঝরে পড়ছে সেই জ্যোৎস্নার জলধারা। তারা কেউ কোনো কথা কয় না, কথা সেখানে কায়িকতার মতোই মিথ্যা, অবাস্তব। সেই চন্দ্রিল নিঃশব্দতায় মনে হয় না শিপ্রার শরীরে শরীরের কোনো রেখা আছে, খানিকটা সে-ও যেন এই জ্যোৎস্নারই মতো বিনিঃশেষ অসীমতা, ভাসমান একটা আভা। তাকে আর চেনা যায় না, চারপাশে নিয়ে আসে সে একটি অনির্বচনীয় দূরত্ব। তারপর একেকদিন বর্ষা নামে, একেকদিন কী বর্ষাই যে নামে! সে সেদিনও কথা যায় ফুরিয়ে, ঘনিয়ে আসে সেই অশরীরী অপরিচয়ের সুষমা। সার্সির ভিতর দিয়ে পরিত্যক্ত, নির্জন শহরটা দেখা যায়, যেন ঘোলাটে চোখে চেয়ে আছে নিরীহ, অসহায় একটা পশু। সেইসব মুহূর্তগুলি বিচ্ছেদের সুরে কেমন ঘন, অটুট হয়ে ওঠে। সেদিনো আবার শিপ্রাকে পাওয়া যায় না সাধারণ প্রাত্যহিকতার নাগালে, বৃষ্টির বিরমমাণতা তার চারপাশে নিয়ে আসে দূরত্বের একটি সুন্দর দুর্ভেদ্যতা। আশ্চর্য, শিপ্রা শুধু এই তার ঘরোয়াপনা দিয়েই তৈরি নয়, তার পরিমিত প্রাঞ্জলতার তলায় যেন আছে আবার একটি দুরূহ দূরের ইশারা। তাই তাকে কতো ভালো লাগে, কতো একান্ত করে অফুরন্ত।

তারপর একদিন শিপ্রা তার বাপের বাড়ি চলে গেলো গ্রাম্য কোন মফস্বলের শহরে। নেমে এলো বিচ্ছেদের ছায়া, সমস্ত ঘর রিক্ততায় উঠলো ভরে। ছোট-ছোট কাজগুলি শিপ্রার হাতের ছোঁয়ার জন্যে এখানে-ওখানে বসে কাঁদছে, দেয়ালের নীরবতায় লিপ্ত হয়ে আছে তার বিদায়ের শুভ্রতা। কিছুই ভালো লাগে না—কী ভালো লাগে এই সুরটি দিয়ে মুহূর্তগুলিকে তপ্ত করে রাখতে। শয্যাময় পুঞ্জীভূত আলস্য, শরীরে এই ক্লান্তির ঘনিমা, ঘরের শূন্যতায়প্রতীক্ষার এই বিশাল নিশ্চিন্ততা, —কী ভালো লাগে শিপ্রার এই প্রথম বিরহ! তারপর একদিন তার চিঠি এলো, তার ঠোঁট দুখানির মতো লাজুক একটি চিঠি। ঘটা করে কোনো কথাই সে লিখতে পারেনি, কথার শান্ত সারল্যের সঙ্গে মিশে আছে তার চিত্তের দ্রবীভূত ঐকান্তিকতা। ছোট চিঠিটি যেন তার গায়ের একটুকরো উষ্ণতা, নিয়ে এসেছে তার একাকী একটি নিশ্বাস। সব তার ভালো লাগছে, নতুন করে তার এই বাপের বাড়ির সবাইকে, কিন্তু আরো ভালো লাগতো যদি আর-কেউ তার সঙ্গে থাকতো তার এই হাসি-হুল্লোড়ের পরে বলিষ্ঠ একটি নৈশ স্তব্ধতার মতো। সৌম্য যে কী লিখবে কিছু ভেবে পায় না, তার বিদ্যার পাহাড়টা তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল্

করে চেয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত যা সে লিখে ফেলে—পরীক্ষার পর এই তার প্রথম রচনা—ভেবে অবাক হয়, এতো সহজ, এতো সাধারণ, এতো অকপট হতে তাকে কে শেখালো ?

ক্লান্তির মেঘ যায় কেটে, একদিন আবার শিপ্রা ফিরে এলো। মিলনের ঔৎসুক্যে সর্বাঙ্গে সে ঝলমল করছে। আবার এলো সেই কথাহীন কালো রাত, সেই মুখর মধুর মধ্যাহ্ন। কাজগুলি হাতের ছোঁয়া পেয়ে শিপ্রার মৌক্তিক দাঁতের মতো হেসে উঠলো, দেয়ালে এলো আবার সান্নিধ্যের ঘনতা। ঘরের মধ্যে আবার বয়ে চললো দিনরাত্রির নিস্তরঙ্গ নিঃসরণ। সৌম্যর মনে হতে লাগলো চারদিকে উত্তাল হয়ে উঠেছে উদ্দাম জল, শুধু তাদের এই ঘরটিই যেন নোয়ার সেই আর্ক। বিশ্রামে উষ্ণ, আলস্যে বিস্তৃত, আশ্রয়ে সীমাবদ্ধ, এই ঘরটিই যেন তার সমস্ত পৃথিবী। শিপ্রা যেন সেই পৃথিবীর উপরে নীল, অসীম একটুকরো আকাশ।

এই ঘর ছেড়ে কোথাও সে আর যেতে চায় না। তাকে মানিয়েছে এই বহির্বিচ্যুত উত্তপ্ত আত্মসর্বস্বতা। নিজের মাঝে নিজের এই পরিমিতি। এই ধূলিলেশহীন, নির্মল, নিশ্ছিদ্র অবকাশ।

বন্ধু-মহলে রব উঠলো : স্ত্রৈণ।

সৌম্য হেসে বললো : স্ত্রীকে ভালোবাসি, এ কি আমার অপরাধ ?

—স্ত্রীকে কি আর আমরা ভালোবাসি না ? তাই বলে কি কোনো ভদ্রলোক এতোটা বাড়াবাড়ি করে তোর মতো ?

সন্দেহ হয়, সৌম্যর ঘোরতরো সন্দেহ হয়, সত্যি এরা এদের স্ত্রীদের ভালোবাসে কি-না। না, এদের কাছে তাঁরা একেকটি আসবাব, জীবনধারণের একেকটি উদ্ভাবন ? এরা সবাই যেন কেমন-একটু সকরুণ, অবজ্ঞাশীল, স্ত্রীদের প্রতি তাদের ভালোবাসাটা যেন তাদের কাছে একটা যান্ত্রিক অভ্যাসের সামিল, যেমন ভালোবাসে তারা চাকরি, আহারের পরিপাক, রাত্রের ঘুম। কিন্তু সৌম্য তাদের চেয়ে আলাদা শিপ্রা শুধু তার বিচ্ছিন্ন স্ত্রীতে আবদ্ধ হয়ে নেই, সে তার সৃষ্টি, সে তার সার্থকতা। রক্তের কোষে-কোষে এতোদিন যে-প্রেম তার সুপ্ত হয়ে ছিলো, চমকিত প্রাণময়তায় তাই একদিন পরিণতি পেয়ে উঠলো তার শিপ্রাতে। সে তাদের থেকে আলাদা, অভ্যাসে তারা বিবর্ণ ক্ষীণ তামাটে, কিন্তু তার জীবন রেডিয়ম-এর মতো দ্যুতিমান, অনবরত শক্তি বিকিরণ করেও তার ক্ষয় নেই।

বন্ধুদের আর-কেউ বলতো : ছেড়ে দে ওকে, নতুন বিয়ে হয়েছে, দু'দিন গেলেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। হরে-দরে হাঁটুজল।

সৌম্যও তাদের সঙ্গে বন্ধুতায় সমতল হয়ে উঠতো। হেসে বলতো : হ্যাঁ, কতোদিন আছি তার যখন ঠিক নেই, তখন যে দু'দিন পাওয়া যায় তাই লাভ।

সেই জনতা থেকে পালিয়ে আসতো সে শিপ্রার সামীপ্যের উত্তাপে। বাইরে ওরা তাকে খণ্ডিত করে, নিয়ে আসে চারপাশে পুরাতন স্মৃতির স্থবিরতা, শুধু শিপ্রার কাছেই সে পরিপূর্ণ, শুধু শিপ্রার কাছেই সে পুরোনো নয়।

॥ চার ॥

বন্দরে জাহাজ এসে দাঁড়িয়েছে। শিপ্রা এতোদিনে পেয়েছে তার সীমার সম্পূর্ণতা, তার অনুকূল পরিবেশ। যে-গাছের যেমন সার, তার এই সংসার ও স্বামী, স্বামীর স্নেহ ও সংসারের সীমা। শিপ্রা নিজের কাছে পর্যাপ্ত, যথেষ্ট হয়ে উঠলো। এটা তার কাছে অসম্ভব, আকস্মিক বলে কিছু মনে হলো না, যেন এই তার যৌবনের স্বাভাবিক পরিশিষ্ট, তার শরীরে ও তার পরিপার্শ্বে যেন চিরকাল ধরে রয়েছে এরই নির্ভুল সমর্থন। এর মাঝে তার কাছে কিছু বিস্ময়ের নেই, আগাগোড়া শুধু একটা নিশ্চিন্ত, সহজ সজ্ঞানতা।

তেমন বিস্মিত হবার কিছু নেই বটে তার পক্ষে, কিন্তু তবু, শিপ্রার দুই হাতে এতো সুখ যেন আর ধরে না। বলতে দোষ কী, এতোটা তার না হলেও চলতো, না হলে বিশেষ বেমানান হতো না। পরমেশবাবু এতো মেয়ে বাছতে শুরু করেছিলেন, কারো আশা ছিলো না শেষকালে শিপ্রাকে তাঁর মনে ধরবে। শুধু তার চেহারার সরল, পরিচ্ছন্ন পারিপাট্যের জোরে সে যে এই দুঃসাধ্যসাধন করে বসবে একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারতো না। তার না ছিলো টাকা, না-বা আধুনিক বিদ্যাচর্চার রুক্ষ লালিত্য, সেই স্তিমিত আতাম্রতা। তারপর সৌম্য কিনা স্বচক্ষে তাকে পছন্দ করে গেলো না। সবাই আবার সন্দেহ করলে। বলাবলি শুরু হলো: ছেলের এখন মন উঠলে হয়!

সেইদিক থেকে ঘটলো আবার আশাতীত, সন্দেহের বাষ্পটুকু কোথাও রইলো না। মেয়েটা অসীম ভাগ্য করে এসেছে, জীবনের পরিভাষায় একেই বলে নিয়তি। শিপ্রাকে পেয়ে সৌম্য একেবারে মুগ্ধ, বিস্ফারিত; দুই হাতে ধরে না তার এই নিজেকে ঢেলে দেবার অজস্রতা। তার কাছে কিছুই সে চায়নি, শুধু সে তাকে চেয়েছে। সে একটা কিছুর প্রমাণ নয়, পরিপূর্ণ একটি প্রাপ্তি। কেন যে সৌম্যর এতো ভালো লাগলো বলা কঠিন। ভালো লাগলো হয়তো তার এই শ্যামল গ্রাম্যতা, তার এই গা-ময় মৃত্তিকার শান্তি, হয়তো বা তার এই নিরীহ নির্লিপ্ত মুখখানির নরম মমতা। অলস, নিস্তেজ দুটি ভুরু, বড়ো-বড়ো ভাসমান দুটি চক্ষুর কিনারে পল্লবের সজল একটু ছায়া। কে জানে হয়তো ভালো লাগলো জীবনের এই তার প্রথম, প্রখর নতুনত্ব, নিজেকে খুঁজে পাবার উদ্দাম, প্রচণ্ড চঞ্চলতা। যার জন্যেই হোক, তার ভালো লাগলো, ভালো লাগলো শিপ্রাকে, শিপ্রাকে ঘিরে তার অশরীরী অসীম পরিমণ্ডলকে।

তাকে যে স্বামীর খুব ভালো লেগেছে তা বুঝতে শিপ্রার বেশি দূর যেতে হয় না, তার জন্যে সে কৃতজ্ঞ, সুখী, নিশ্চিন্ত—তবু এটা তার কাছে কিছু একটা আশাতিরিক্ত, অসম্ভব বলে মনে হয় না, বরং মনে হয়, এ তো হবেই। এখানে আসবার আগে, একটু ভয়ে-ভয়ে হলেও সে ভেবে রেখেছিলো, পাবেই সে স্বামীর ভালোবাসা, স্বামী তাকে ভালোবাসবে এতে আবার আশ্চর্য হবার আছে কী! সবচেয়ে তাকে আশ্চর্য করেছে, তার এই অধিকারের সম্পদ। এতো বড়ো যে

স্বামী, এতো গুণী, এতো ভয়ঙ্কর, এতো টাকা যার মাইনে, সে কেমন অনায়াসে তার আশ্রয়ে এসে বিশ্রাম করছে, কী আনমিত করুণায়—তাকে স্পর্শ করে স্বামীর ভালোবাসা নয়, ভালোবাসার বিশাল এই অসীমতা। স্বামীর প্রেমে আবিষ্কার করে সে তার নিজের মূল্য, নিজের অধিকার। স্বামী তার হাতের মুঠোয়, সমস্ত সংসার তার পায়ের নিচে। স্বামী তাকে শুধু একটা স্থিতি দেয়নি, দিয়েছে অবারিত একটা স্থান। এতো জায়গা, এতো মুক্তি সে রাখবে কোথায়!

তার স্বামী, তার সংসার—শিপ্রা ঐশ্বর্যের বন্যতায় একটা ব্যাঘ্রীর মতো মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। পেয়েছে সে তার অধিকারের আস্বাদ, আর তাকে পায় কে? আগে করতো পদচারণা, এখন অভিযান। তাকে কারো কিছু আর বলে দিতে হয় না, বলে দেবার লোকই বা কোথায়, সে একাই যথেষ্ট। সৌম্য আপিস চলে গেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে আপন খুশি-মতো সে ঘর সাজাতে বসে, তার দশটি আঙুলে ছিটিয়ে দেয় তার মুক্তির আনন্দ, ছোট-ছোট কাজে-অকাজে তার অবকাশের নদী কলধ্বনিত হতে থাকে। সমস্ত সংসার যেন তার চিত্তের মুকুর, তার চারদিকের দেয়াল যেন তার মুক্তি দিয়ে তৈরি। বেলা গড়িয়ে আসবার সঙ্গে-সঙ্গে শিপ্রাও অন্ধকারের আশায় রক্তিম হয়ে ওঠে, নিচে নেমে যায় স্বামীর জলখাবার সাজাতে। সে স্পষ্ট গুনে বলে দিতে পারে আজ তাঁর মুখে কী ভালো লাগবে। সে-পাট গুছিয়ে রেখে কলতলায় সে যায় গা ধুতে, উপরে এসে চুল বাঁধে, সিঁথিতে আঁকে সিঁদুরের শিহরিত একটি শিখা—সে ঠিক জানে আজ কোন শাড়িটায় সে বেশি খুলবে। তারপর সৌম্য ফিরে আসে, সর্বাঙ্গে নিয়ে আসে অন্ধকারের আরণ্য রোমাঞ্চ, অন্ধকারের পেশল বলিষ্ঠতা, ঘরের ঘুমন্ত শূন্যতা হঠাৎ কথা কয়ে ওঠে। সত্যি, শিপ্রা ভরে আছে, অণুতে-অণুতে ভরে আছে, তার প্রতিটি পা-ফেলায়, পা-ফেলার প্রতিটি উচ্ছলতায় ঝলসে উঠছে এই তার ভরে-থাকার সুর। যখন যা তুমি চাও, যখন যা তুমি করো। স্বামীর পকেটটা পর্যন্ত তার নাগালের মধ্যে।

—বলো তো, তোমার পকেট থেকে আজ ক' পয়সা নিয়েছি?

—নিয়েছ নাকি? সৌম্য ক্ষিপ্র আঙুলে মানিব্যাগের কোটরটা পর্যবেক্ষণ করে: কতো?

—বলো না দেখি। দেখি তোমার কেমন হিসেব।

—যা ছিলো তাই তো আছে মনে হয়, সৌম্য অবাক হয়ে জিগগেস করে: আরো ছিলো নাকি টাকা?

—টাকা না হাতি! এই দেখ। দু'টি আঙুলের মুখে শিপ্রা ছোট একটি আনি তুলে ধরে।

—চার পয়সা? সৌম্য তো হেসে কুটিপাট: চার পয়সা দিয়ে তুমি কী করবে?

—ভুট্টা খাবো। শিপ্রা আবদারের সুরে খুকিকে পর্যন্ত হার মানায়: তুমি কিন্তু না করতে পারবে না। ভুট্টা খেতে আমার ভারি ভালো লাগে।

স্বামীকে নিয়ে আসে সে সহজ প্রাত্যহিকতায়, তাঁর সঙ্গে ধীরে-ধীরে সে একটা বিস্তৃত সমতা খুঁজে নেয়। আজকাল তাদের মধ্যে গুরুতর সব দরকারি কথা

এসে পড়েছে, চাল-ডাল, তেল-নুনের হিসেব। কী করে খরচ কমানো যায়, অন্তত তার নিজের খরচ, সেই যেন তার একটা বিলাস হয়ে উঠলো। এ-ও যেন তার অধিকার-বোধেরই একটা ভঙ্গি। তার ব্যক্তিত্বের একটা সুর।

সৌম্য বলে : খরচ করবো না তো তবে আছে কী করতে ?

শিপ্রার মুখ মলিন একটি স্নিগ্ধতায় ভিজে ওঠে : তার জন্যে শুধু শুধু এমনি উড়োবে নাকি? কী হবে আমার এতো রাজ্যের শাড়ির পাহাড়ে? আমার একটাই তো শরীর, ক'টা একসঙ্গে পরা যায় ?

—একসঙ্গে না হোক একটার পর একটা তো পরা যায়। প্রতিদিন ভোরবেলার নতুন পৃষ্ঠা বদলানোর মতো। সৌম্য তাকে দুই পরিতৃপ্ত চক্ষু দিয়ে যেন লেহন করতে থাকে : সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তুমি প্রতি মুহূর্তে যদি না নতুন হয়ে ওঠো তবে আকাশে এতো ঐশ্বর্য কেন ?

—তাই বলে শাড়ি পরে আমাকে নতুন হতে হবে ?

—তোমার শাড়িটা হচ্ছে আমারই আত্মপ্রকাশের প্রতীক। সৌম্য শিপ্রার কথার নাগালের অনেক বাইরে চলে যায় : মানুষের সম্পত্তি মাত্রেই তাই। যা কিছু তাদের উদ্বৃত্ত তাই দিয়ে তারা নিজেদের উদ্ঘাটিত করে। আবার সৌম্য সহজ সমতলতায় নেমে আসে : তোমার ঘর সাজিয়ে যেমন সুখ, আমার তেমনি তোমাকে সাজিয়ে। তুমি ছড়িয়ে পড়ছ সংসারে, আমি ছড়িয়ে পড়ছি তোমাতে। আমি তো ভাবছি আর ক'টা মাস পরে একটা মোটর কিনবো।

—মোটর ? মোটর দিয়ে কি হবে ?

—রাস্তায় দেখতে পাও না মোটর দিয়ে কী হয় ? তোমাকে নিয়ে বেড়াবো, গঙ্গার ধারে, সোজা চলে যাবো সেই রাঁচি—সেখানে তোমার ছোট-মাসি আছেন বলছিলে না ?

—শেষকালে চাকা ফেটে মাঝপথে হাঁ করে বসে থাকি আর-কি।

—কেন, চাকা তক্ষুণি বদলে নেবো।

—বাবাঃ, দরকার নেই অতো হাঙ্গামায়। কেন, ট্রেন কী দোষ করলো ? ট্রেনে যাওয়া যায় না রাঁচি ?

সৌম্য শিশুর মতো খিলখিল করে হেসে ওঠে : ট্রেনে যে অনেক লোক।

—আহা, তাই বলে কি ট্রেনে আর কেউ যায় ? তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি। যাওয়া হয় কি না-হয়, আগে থাকতেই তুমি মোটর কিনে বসো।

—না-ই বা হলো যাওয়া। আমরা এখানে-ওখানে বেড়াবো, গঙ্গার ধারে, মাঠে, মাঠের অন্ধকারে—

—অতো ঠাটে আর দরকার নেই। আমি সব কাজ-কর্ম ফেলে মোটরে করে ওঁর সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরুই আর-কি। শিপ্রা ভুরু দু'টি কুটিল করে গর্বের একটা ঘূর্ণি তুলে চলে যায়। হাসতে-হাসতে সৌম্য তার পিছু ধরে।

আবার কোনদিন বা মুখখানি মালিন্যে মধুর করে সে সৌম্যর পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়। চুলের মধ্যে আঙুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে : আমাকে তিন আনা পয়সা দিতে পারো ?

প্রার্থনা শুনে সৌম্য চমকে ওঠে : গোনাগুনতি একেবারে তিন আনা-ই ? তুমি ঠিক জানো ? দশ পয়সা নয় ?

শিপ্রা হেসে ওঠে : সত্যি দাও না, আমি একটা জিনিস কিনবো।

—জিনিস কিনবে ? বলো কী ? আজকাল জিনিস-পত্রগুলি এতো ভীষণ আক্রা হয়ে গেছে নাকি ?

— হ্যাঁ, দাও না, অনুনয়ে একটু-একটু করে শিপ্রা ঘন হতে থাকে : আমি পুঁতি কিনবো।

— পুঁতি ? পুঁতি দিয়ে কী হবে ?

গালের আধখানায় লজ্জার নরম একটু আভা এসে পড়ে : কানের ঝুমকো করবো।

সৌম্য তাকে কাছে টেনে এনে বলে : বেশ বিকেলে স্যাকরার বাড়ি লোক পাঠিয়ে দেবো'খন।

—স্যাকরা দিয়ে কী হবে ? স্যাকরা পারবে নাকি এই পুঁতির ঝুমকো করতে ?

—তুমি দেখো পারে কিনা।

—না, না, তুমি আমাকে পয়সা দাও। দেখো না কী সুন্দর তৈরি করি।

— নাও গে, ঐ পকেটে আছে।

শিপ্রা তক্ষুণি ছুটে যায় আলনার দিকে, পকেট হাৎকে পয়সা বার করে বলে : এই দেখ তিন আনা নিলুম কিন্তু।

—কী আশ্চর্য, খুচরো তিন আনা-ই ছিলো, সৌম্য হেসে ওঠে : আরো কিছু বেশি নিলে না কেন ?

—বেশি নিয়ে আমি করবো কী ? শিপ্রা স্তম্ভিতের মতো চেয়ে থাকে।

— খরচ করবে ইচ্ছে মতো।

—এই তো করছি। করছি না ?

—ছাই। তুমি আমার কাছে কিছু চাও না কেন, শিপ্রা ?

—বা রে, এই তো চাইলুম। আবার কী চাইতে হবে ? শিপ্রা ঘরের চারিদিকে উজ্জ্বল, চঞ্চল চোখে তাকাতে থাকে : বলো না আর কী চাওয়া যায় ?

—তোমার কোন জিনিস কিনতে ইচ্ছে করে না ?

— এই তো করলো। দেখলে তো, অমনি চেয়ে ফেললুম চোখ-কান বুজে।

—এছাড়া আর কোন জিনিস ?

— তা তুমিই ভালো জানো। শিপ্রা যেন হাঁপিয়ে ওঠে : আমি তো কিছু ভেবে পাই নে।

—শোনো। সৌম্য উঠে দাঁড়ায় : আমি তোমাকে মাসে-মাসে দশটা করে টাকা দেবো।

—দ শ টা কা ? শিপ্রা যেন চারিদিকে সাদা অন্ধকার দেখে : অতো টাকা দিয়ে আমি করবো কী ?

—খরচ করবে যা তোমার খুশি।

—বাবাঃ, শেষকালে হিসেব রাখতে মরে যাই।

—না, ও-টাকার তোমার হিসেব রাখতে হবে না। ও তুমি অমনি ছড়িয়ে দেবে।

–ও! শিপ্রার ঠোঁট দ্'টি গোল, গম্ভীর হয়ে ওঠে: মাঝে-মাঝে তোমার কাছে এসে চাই বলে তুমি বিরক্ত হও। এতোক্ষণে ব্ঝেছি। হ্যাঁ, এতোক্ষণে। বাবাঃ, কী ঘ্রিয়ে-ফিরিয়ে কথা!

সৌম্য হেসে ওঠে: না, না, তারপরেও আবার চাইবে বৈকি। যক্ষ্নি যা দরকার।

—তার পরেও আবার চাইবো? কী চাইবো? তোমরা আমাকে চাইবার সময় দিলে কোথায়? এতোক্ষণে শিপ্রারও ম্খে ত্প্তির একটি লাবণ্য ছড়িয়ে পড়ে: বাবা সংসারের খরচ করেন, সব সময় তাড়া দিচ্ছেন—বলো বৌমা, তোমার কী লাগবে? কী খেতে তুমি ভালোবাসো? সেদিন দ্ঃখের মধ্যে চাইল্ম একটু তাল-শাঁস খেতে, দেখলে তো কাণ্ডটা, বাঙলা-দেশে তালগাছ আর রইলো না। তোমার কাছে কিছ্ চাইতে যাওয়াই তো ব্থা। প্থিবীতে চাইবার যে এতো জিনিস থাকতে পারে তা আমি ভাবতেও পারত্ম না।

প্ঁতির ঝুমকোটা তখনো শিপ্রা শেষ করে উঠতে পারেনি, বিকেলবেলা আপিস-ফেরৎ সৌম্য এসে বললে,—এই দেখ কী এনেছি তোমার জন্যে। বলো তো কী?

—দেখি, দেখি। শিপ্রা সমস্ত শরীরে ঝলমল করে উঠলো: বাঃ, কার, কার এটা? কার জন্যে এনেছ?

—বলো তো কার জন্যে এনেছি? আমার আর কে আছে?

লজ্জায় শিপ্রা ছলছলিয়ে উঠলো: বাঃ,—ঝুলটা কতো বড়ো। কী স্ন্দর কাজ! ম্ক্তোগ্লি কেমন টিক্টিক্ করছে। কতো দাম পড়লো শ্নি?

—দাম জেনে আমাদের কী হবে? ফ্লের উপর প্রজাপতির মধ্র আলস্যের মতো সৌম্যর দ্ই চোখ শিপ্রার ম্খের উপর ছড়িয়ে পড়লো: লজ্জায় তোমার গাল দ্'টি যে এই গলে যাচ্ছে—তারই বা কে দাম দিতে পারে?

—আহা! কথাটা শিপ্রা ম্খে না বলে ফুটিয়ে ত্ললো তার চোখের বিলোল একটি টানে, ভুর্র ত্বরিত একটি স্ক্ষ্মতায়। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে গয়না দ্টো কানে পরতে-পরতে সে বললে,—তোমাকে নিয়ে আর পারি না। আমাকে সাজিয়েই যেন তোমার সুখ। দেখ, দেখ, কেমন আমাকে এখন দেখাচ্ছে বলো তো?

সমস্ত শরীর চক্ষ্ষ্মান করে সৌম্য তার দিকে, তার শরীরহীন শিহরায়মান-তার দিকে চেয়ে থাকে। সত্যি, একেক সময় তার বিশ্বাস হয় না এমন একটা বিস্ময় কী করে উদ্ভূত হলো তাদের এই অপরিচয়ের সম্দ্র থেকে। শিপ্রার নামের একটি নিশ্বাসও সে কোনোদিন শোনেনি, তার র্ঢ় রৌদ্রে ছিলো না একটিও তারার কণিকা—তারার কণিকাটির মতোই অস্ফুট, ভঙ্গ্র এই শিপ্রা: সম্প্র্ণ স্র্য সহ্য করতে পারে না এমনি একটি ছায়ায় ফোটা নরম, নির্মল ফুল, তার লজ্জার সব্জ পাতা দিয়ে ঘেরা: এক চিলতে এই মেয়ে—কোথা থেকে কী অসীম অধিকারে জ্ড়ে বসলো তার সমস্ত জায়গা, সমস্ত অন্ধকার!

কী এসে যায় তারা স্বামী-স্ত্রী কিনা, পরিচিত কিনা পরস্পর, কী এসে যায় তাদের মিলনের এই অকাল আকস্মিকতায়? শিপ্রা নিয়ে এসেছে তার জীবনে নতুনতরো শরীর, নতুনতরো পৃথিবী, নতুনতরো ঈশ্বর। ভাবতে সে সত্যি অবাক হয়ে যায়, এই একটুকরো মেয়ে তার হাতে করে এনেছে এতো অজস্রতা, চোখে এতো করুণা, সীমান্ত ভরে এতো অনুরাগ! কে সৌম্য, কোথায় সে বা ছিল এতদিন, শিপ্রা তারই জন্যে সমর্পিত, সমুচ্ছ্বসিত, যেমন রাত্রি প্রাতস্তন অভ্যুদয়ের জন্যে। তারই জন্যে সিঁথিতে আঁকে সে সিঁদুর, শরীরে আনে প্রতীক্ষা, সংসারে ছড়ায় কল্যাণ। যেখানে সে হাত রাখে, সেখানেই তার দাবি; যেখানে রাখে পা, সেখানেই তার অহঙ্কার। সৌম্য আগে জানতোও না কখন তার ক্ষিদে পায়, কী খেতে তার ভালো লাগে, কিসে তার কতোটুকু অসুখ করে। সে আর একলার জন্যে নয়, তার প্রতিটি রক্তধারায় মিশেছে এখন আরেক জনের রক্ত, তার ঘুমে ডুবে গেছে এখন আরেকজনের ঘুম। স্নেহে মুখখানি মসৃণ, ব্যস্ত দিনের বেলার মতো স্বাভাবিক, রুপালী রোদের মতো খুশি—এই এক ফালি শিপ্রা যেন দুই হাতে তাকে, তার সমস্ত ভবিষ্যৎকে একসঙ্গে এক মুহূর্তে লুট করে নিয়েছে। তার এই দস্যুতার কাছে নিজেকে ছেড়ে দেয়ার মাঝে কী শান্তি, কী গভীর শান্তি! সৌম্য শুধু তাকে জায়গা ছেড়ে দেয়, দেয় তার অহঙ্কার, তার আনন্দকে বিস্তৃত বিস্ফারিত হবার অবকাশ। শুধু সে তাকে সাজায়, তাকে সাজিয়েই তার সুখ—এর বেশি সে আর কী করতে পারে? সে শুধু তাকে সুখী হবার, ক্ষণে-ক্ষণে খুশি বোধ করবার শিহরণ এনে দেয়। তাকে যে সে কী ভালোবাসে, তার প্রমাণ দেবার জন্যে সে যেন স্বর্গ-মর্ত মন্থন করে বেড়ায়। তারই ভালোবাসা যেন শিপ্রার মুখে বিচ্ছুরিত হয়। আর, কী করুণ, কী কঠিন এই ভালোবাসা! সাপের কাছে বাঁশির সুরের মতো, তীব্র একটা যন্ত্রণার মতো এর সুখ। আত্মার গভীর মর্মমূল পর্যন্ত সেই ভালোবাসা নেমে গেছে, বিষের বহ্নিময় একটা শিখার মতো। শিপ্রাকে সে এতো ভালোবাসে যে তাকে ছুঁতে পর্যন্ত তার মায়া করে: এতো ভালোবাসে যে তাকে ছুঁয়ে যেন সে ঈশ্বরকে ছোঁয়, ছোঁয় যেন পৃথিবীর প্রথম প্রাণের উত্তপ্ত উৎসটিকে।

শিপ্রাও এতোটা কখনো আশা করেনি। তার দিনগুলি যেন কাটছে না, তার মধ্যে গলে-গলে যাচ্ছে। ক্রমশই সে ছড়িয়ে পড়ছে তার অধিকারে, তার প্রেমের প্রবল নিঃশব্দতায়। কী প্রচণ্ড তার অধিকার—তার এই স্বামী, এই তার সংসার। স্বামী যেন তার চোখের দুই তারায়, সংসার যেন তার অনায়াস মুঠোর মধ্যে। আর প্রেমে কী বলিষ্ঠ, কী বিগলিত তার স্বামী, কী ছায়া-ঢাকা সমতল তার সংসার। কে জানতো তার মাঝে এতো সম্ভাবনা ছিলো, এতো যোগ্যতা। স্বামীর স্পর্শময় সান্নিধ্যে বসে সে আস্বাদ করে রাত্রির আকাশময় তৃপ্তি, স্বামীর স্পর্শময় দূরত্বে বসে সে পান করে দিনের উন্মুক্ত প্রাণধারা। এতো সুখ সে রাখবে কোথায়, এতো জায়গা সে কী দিয়ে ভরে তুলবে? তার স্বামী, তার কাজ, তার উপার্জন, তার পরিশ্রম শুধু তারই জন্যে—তার এতো বড়ো সংসার, শুধু সে-ই উথলে উঠবে বলে। কোনোদিন কি সে জানতো, তার সেই অপরিস্ফুট কৈশোরে, সেই কলধ্বনিত চঞ্চল দিনগুলিতে, তার জীবনে আছে এই

ঐশ্বর্যের সূচনা, এই সমৃদ্ধ মন্থরতা ! বন্ধনের মাঝে এতো ফাঁকা, এতো ছুটি ॥ এতো বড়ো আকাশ তার দুই হাতে আর ধরছে না। কী বিশাল আশ্রয়ের মধ্যে সে এসে পড়েছে। খোলের মধ্যে ছোট্ট একটি শামুকের মতো সে নিরাপদ—তার স্বামী ও তার সংসারের এই আবিষ্ট বেষ্টনের মধ্যে, কী ভীষণ সে নিরাপদ, কী ভীষণ সে দুর্ভেদ্য। এতো সুখ, শিপ্রার এক্কেকসময় মৃত্যুর মতো ভারি অসহায় মনে হয় ; এতো শান্তি, মনে হয় সে যেন প্রতি তন্তুতে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

—এতো ধুলো কোত্থেকে আসে বলতে পারো ? কোমরে আঁচল জড়িয়ে শিপ্রা টেবিল ঝাড়ছে : আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে, সব ধুলো কি আমার ঘরেই আসবে ?

সৌম্য ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে দাড়ি কামাচ্ছে। বলে : পৃথিবীতে রোদই তো শুধু নয়, ধুলোও যথেষ্ট। তোমার হাতের নির্মলতায় মরতে আসে আর-কি।

—আর চড়ুই পাখিগুলো, কী ভীষণ যে জ্বালায়।

—তুমিই তো বলো দুপুরবেলা ওদের ডাক শুনে তোমার নেশা লাগে।

—তুমি কী কুড়ে, তোমার বসবার ঘরের ক্যালেণ্ডারের তারিখটা পর্যন্ত বদলাতে পারো না ?

—তারিখ কি সত্যিই বদলাচ্ছে নাকি ?

—না, তোমার জন্যে বসে আছে। বলে, কী সুন্দর শীত এসে পড়লো।

—তুমিই আমার শীত। তেমনি ঘন, তেমনি ঠাণ্ডা।

—দেখেছ, কাগজ-পত্রগুলো আবার এমনি এলোমেলো করে রেখেছ ?

—কী করে গুছিয়ে রাখতে হয়, ভুলে গেছি যে।

—না, তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

—পারো না বলেই তো তোমাকে এতো ভালোবাসি।

—আর ভালোবাসতে হবে না। এখন দয়া করে ভদ্রলোক সেজে তাড়াতাড়ি স্নান করো গে যাও। ঘড়ির চেহারাটা একবার দেখেছ ?

—এসো না, তোমারো গালে সাবান মাখিয়ে একটু অভদ্র করে দি। ঘড়িটা বন্ধ করে দাও।

—বয়েস বাড়ছে, না দিন-দিন ছেলেমানুষ হচ্ছ।

—আর তুমি বুঝি হচ্ছ বুড়ি ! আমাকে ছুঁয়ো না, সত্যি ছুঁয়ো না, জুজুবুড়িকে আমার ভীষণ ভয় করে।

এমনি দিনের পর দিন। অসংলগ্ন সব কথার প্রজাপতি। ভঙ্গুর সব ভঙ্গির উচ্ছলতা। মুক্তির উদ্দাম হাওয়ায় মুহূর্তগুলি যেন ঢেউয়ের লবণাক্ত ছিটের মতো তাদের জীবনের উপর ঝরে পড়ছে, তৃষার্ত জীবনের উপর ঝরে পড়ছে।

॥ পাঁচ ॥

হু-হু করে দু'বছর কেটে গেলো, যেন পাশাপাশি দু'টি মুহূর্ত। প্রেম সময়কে ঘুষ দিয়ে একজায়গায় বসিয়ে রাখতে পারলো না। সমুদ্র-পাখীরা ঢেউয়ের উপর পাখা ঝাপটে একে-একে বিদায় নিলে।

আগে তবু যা শিপ্রার চলা-ফেরা লঘুতায় মন্দায়মান ছিলো, এখন, এই দু'বছর পর, আতীব্র ক্ষিপ্রতায় সে যেন শীর্ণ একটা তলোয়ারের মতো ঝকমকিয়ে উঠেছে। আগে তবু বা তার একটু কুণ্ঠা ছিলো, স্বাভাবিক বয়সের কুণ্ঠা, তার নবীনতার জড়িমা : বাধা যেটুকু ছিলো তা তার পরিচ্ছন্ন অপটুত্বের। এখন আর সেকথা ওঠে না। এখন দু'বছর সে পার হয়ে এসেছে, ঘেঁটেছে অনেক ধুলো, গুছিয়েছে অনেক বিশৃঙ্খলা। সে এখন সমর্পণের সমতলতা থেকে অভিজ্ঞতার চূড়ায় এসে উঠেছে। পরমেশবাবু তার হাতে সংসারের বাজার পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। সে আর এখন বধূ হয়ে নেই, নিরাবরণ কর্ত্রী। এখন সে চাকর-ঠাকুরকে দস্তুরমতো ধমক দিয়ে কথা কয়, দরকার হলে সৌম্যর মুখের উপর সে তর্ক করতে ছাড়ে না। আজকাল তার স্বরে এসেছে ধার, চলায় এসেছে গরিমা। দুই চোখ সব সময় যেন সন্দেহে তীক্ষ্ণ হয়ে রয়েছে, কখন কোথায় ঘটছে ত্রুটি, কোথায় বা অনিয়ম, সে ঈগলের মতো তক্ষুণি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ধোপা কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে, তক্ষুণি তাকে বরখাস্ত করো, ধাঙড় এসেছে দু'দিন দেরি করে, তার মাইনে গেলো কাটা। কয়লাওলাকে সামনে রেখে কয়লা মাপাবে, ঘি-ওলা তার বোতলের দাগের এক চুল কম দিয়ে সারতে পারবে না। সমস্ত সংসার এখন যেন তার মালিকানা জমিদারি ; প্রজাবৃন্দ, এমনকি মাছখেকো কালো বেড়ালটা পর্যন্ত তার প্রতাপে তটস্থ।

তার দিকে তাকিয়ে সৌম্য বেশ একটা মজা পায়—কী করে সেই সেদিনের শিপ্রা আস্তে-আস্তে এমন ভোল বদলালে। তার সেই ভাঙা-ভাঙা লীলা কেমন স্তব্ধ হয়ে উঠলো নিটোল মাংসলতায়। আগে যার কথার আধখানা ছিলো হাসি দিয়ে ঢাকা, এখন সেই কথা কাঁটার মতো মাথা তুলে আছে, নেই আর সেই হাসির আস্তারণ। তার ঠাকুর ডেকচিতে ঘি ঢালবার সময় বাটি বসিয়ে ঘি চুরি করেছে, তার হাসবার সময় কোথায় ? সে এখন বড়ো বেশি স্পষ্ট, তার চারপাশে নেই আর সেই অনভিজ্ঞতার ভীরুতা ; সে এখন অনেক বেশি জেনে ফেলেছে, নেই আর সেই দুর্বল, দোলায়মান ঔৎসুক্য। এক বোতল কেরোসিন তেলে ক'টা উনুন ধরানো যায় বাজি ধরে সে তা বলে দিতে পারে, কোন চালে কতোখানি আয় দেয় তা তার মুখস্ত। সমস্ত সংসার সে ছকে রেখেছে তার নখের উপর। ভাবলে সৌম্য সত্যি অবাক হয়ে যায়। সামান্য একটা চায়ের কাপ পর্যন্ত সে আর ভাঙে না, তার আঙুলগুলি আজকাল এতো নিখুঁত চালাক হয়ে উঠেছে। জিনিসের উপর তার এতো অসহ্য মায়া, ভাত চেয়ে সে-ভাত পাতে ফেলে রাখলে সৌম্যর আর রক্ষে নেই। এতোটুকু অপব্যয় সে

ক্ষমা করবে না, একটা ব্লেড্-এ মাত্র একবার দাড়ি কামানোটা তার চোখে বর্বর বিলাসিতা। যেঘরে সম্প্রতি লোক নেই সেঘরের আলোটা তার চক্ষুশূল। খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত সে বেচবে। সৌম্যর মাঝে-মাঝে হাসি পায়, কিন্তু সম্ভোগও করে শিপ্রার এই আত্মীয়তার অত্যাচার, তার এই আধিপত্যের ঐশ্বর্য। সব-কিছু যেন তার, সব-কিছু মিলে সে যেন নিজে, সে যেন খুঁজে পেয়েছে নিজেকে। ঘরের মেঝে যেন তার পায়ের ভারে কাঁপছে, দেয়ালগুলো তার মুখের দিকে চেয়ে অপরাধী শিশুর মতো পাংশু। সবাই ভয়ে-ভয়ে তার পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, দেয়াল আর মেঝে; তার মুখের দিকে কাঙাল চোখে চেয়ে থাকে হাওয়া আর রোদ, সেই সব না-ঘুমোবার রাত্রি। সে তার সেই প্রথম, ক্ষণিক চিরন্তনতা থেকে নেমে এসেছে প্রত্যহের প্রয়োজনে।

তার শরীরের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে দু'টি উষ্ণ, উর্বর বৎসর, এখন, ভাবতে সৌম্যর ভারি মায়া করে, তাকে কেমন ক্লান্ত, একটু-বা ব্যয়িত দেখাচ্ছে। তার মাঝে নেই আর সেই অজানার রোমাঞ্চ, সেই আদিম, অরণ্য বিভীষিকা। লজ্জার সেই ঐশ্বর্য নেই, নেই সেই জড়িমার মধুরতা: এখন সে সংজ্ঞায় স্থির, সীমায় আবদ্ধ, স্পষ্টতায় উদ্ঘাটিত। তাকে অতিক্রম করে নেই যেন আর সেই অশরীরী সুর। চাঁদের মতো সৌন্দর্যে জমে-জমে সে যেন পাথর, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। সেই সুরটি বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সৌম্য কতো আয়োজন করে, তেমন করে আর যেন তা বাজতে চায় না। আছে অনেক কথা, অনেক নিঃশব্দতা, তবু সে-সুরটি যেন কখন কোন ফাঁকে হারিয়ে গেলো। সেই ক্ষণিক চিরন্তনতা যেন প্রত্যহের আঘাতে গেলো ক্ষয় হয়ে।

সৌম্য বললে: চলো, ছাদে গিয়ে বসি। এখন অন্ধকার, আমরা বসে থাকতে-থাকতে অনেকক্ষণ পরে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠবে দেখো। সেই হলদে চাঁদ।

মৃত একটা ভারের মতো অনড় অবসাদ যেন শিপ্রার সর্বাঙ্গে নেমে এসেছে। ঠাট্টায় ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে শিপ্রা বললে,—বাবাঃ, আমার যা ঘুম পাচ্ছে এখন।

শিপ্রা সত্যি-সত্যি মশারি ফেলতে লাগলো।

—বাঃ, আমি এখন তবে কী করি?

—ঘুম না পেয়ে থাকে, একটু বই-টই পড়ো না। আমার তো ঘুমোবার ঐ চমৎকার ওষুধ। মশারির ভিতর থেকে শিপ্রা স্বচ্ছ গলায় হেসে উঠলো: আজ-কাল তো পড়াশুনো একেবারে গোল্লায় দিয়েছ। পাশ করবার না থাকলে লোকে কি আর কিছু পড়ে না? কিন্তু যাই পড়ো বাপু, এই ঘরে।

অগত্যা সৌম্য বই-ই একটা নিয়ে বসলো। আবার কতোদিনে হলদে চাঁদ উঠবে কে জানে।

পরদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আবার সৌম্য বই নিয়ে বসেছে। হাসতে-হাসতে শিপ্রা হঠাৎ কাছে এসে হাজির। বললে,—তোমার পাশে একটু বসতে দেবে?

—বোসো না, কতোই তো চেয়ার।

—বাবাঃ, কী রাগ! শিপ্রা একটা চেয়ার টেনে সৌম্যর কাছে ঘন হয়ে বসলো: একটু পড়তে বলেছিলুম বলে কী প্রতিশোধটাই কাল নিলে। আমাকে একফোঁটা ঘুমুতে দিলে না।

—তুমিই তো বারণ করলে ওঘরে যেতে।

—না বারণ করবে না! একা-একা ভয়ে আমি মরি আর-কি।

—যাতে ভয় না পাও, তারি জন্যে তো আজো এই ঘরেই বই নিয়ে বসেছি।

—আহা, কী আদর! তাই তো কাল সারাক্ষণ আলোটা জ্বালিয়ে রাখলে মাথার ওপর।

—বাঃ, বললেই পারতে, আমি টেবুল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিতুম।

—কী বুদ্ধি! তাহলেই যেন আমার ঘুম আসতো। সব কথা আমাকেই বলতে হবে। উনি নিজে কিছু বুঝবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। শিপ্রা হঠাৎ তার বই-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো: রাখো।

—না, না, ছাড়ো, সৌম্য তাকে অল্প-অল্প বাধা দিতে লাগলো: একটা চমৎকার জায়গায় এসে পড়েছি।

বইটা ছেড়ে দিয়ে শিপ্রা অভিমানে মুখখানা মেঘলা করে তুললো: তুমি বই নিয়ে বসে থাকলে আমি কী করি?

—তুমিও একটা বই নিয়ে বোসো। সৌম্য অল্প করে হাসলো: তোমার তো বই নিয়ে বসলেই ঘুম পায়। তোমার তো চমৎকার ওষুধই আছে।

—বাবাঃ, একটুখানি কাছে বসলে যদি এমনি করে তাড়িয়ে দিতে হয়, শিপ্রা রাগ করে উঠে পড়লো।

শিপ্রারই হলো জিত। আর এক পা-ও তাকে তাড়িয়ে দেয়া হলো না।

—না, না, এই বই রাখছি বন্ধ করে। সৌম্য তাকে তার চেয়ারের কাছে টেনে আনলো: তোমার কাছে কিসের এই সব শুকনো পৃষ্ঠা। চলো, ছাদে যাবে? আজকের চাঁদ আরো হলদে হয়েছে।

—না, ছাদে নয়, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

—তাই বলো। কতোদিন তোমার কথা শুনিনি। সৌম্য আলস্যে যেন আরো ঘন হয়ে এলো: তোমার রাত্রের কথা।

—শোনো, শিপ্রার বসবার ভঙ্গিটা ঋজুতায় ধারালো হয়ে উঠলো: গিরধারীকে তোমার তাড়াতেই হবে।

—ও! এই কথা? সৌম্য উঠলো হেসে: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর তুমি কথা খুঁজে পেলে না?

—না, গম্ভীর মুখ করে শিপ্রা বললে: ঠাট্টা নয়। ও ভীষণ চুরি করছে, ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে ওর সাহস। আমার সেফ্‌টিপিনটা ও-ই নিশ্চয়ই কুড়িয়ে পেয়েছিলো, আর দিলে না।

—আমি দেবো। সৌম্য আবার হেসে উঠলো: এই তো হলো একের নম্বর। আর?

—যাও, শিপ্রা আবার একটা ওঠবার ঢেউ তুললে: তুমি আমার কোনো কথায় গা পাতবে না, কে তোমার সঙ্গে কথা কইবে?

—না, না, নিশ্চয় তাড়াবো, সৌম্য সেই ঢেউটাকে আবার ভেঙে দিলে: তুমি দেখো কাল ভোরে ও আর নেই। তারপর?

—আর এই যে মাসিক পত্রিকাগুলো রাখছ, শিপ্রার খোঁপাটা খসে গিয়েছিলো,

দু'হাত তুলে আনমিত ঘাড়ের উপর সেটা স্তূপীকৃত করতে-করতে কথাটা সে শেষ করলে : সেগুলি দপ্তরি ডাকিয়ে বাঁধিয়ে ফেলতে হবে।

সৌম্যর গলা যেন শুকিয়ে গেলো : সব ? ওগুলো বেচে ফেললে হয় না ?

—আহা, বেচবার জন্যেই যেন পয়সা দিয়ে রাখা হয়েছে।

—বেচলে তবু কিছুটা উঠে আসতো। একে এতো বেরিয়ে গেছে—তার আবার ?

—হ্যাঁ, আমি ওগুলো বাঁধিয়ে আলমারিতে সাজিয়ে রাখবো।

—জঞ্জালগুলোর জন্যে আবার একটা আলমারিও কিনতে হবে ? এ বেলা তোমার টাকা আর টাইট্ থাকছে না, না ?

—আহা, আমার বেলাই টাকার খোঁটা। কে চায় তোমার মাসিক-পত্র রাখতে ?

—কী মুশকিল, কালই আমি আলমারির অর্ডার দিয়ে আসবো। তারপর ?

শিপ্রা এবার হঠাৎ গভীরতায় নেমে এলো। চোখের প্রান্ত দু'টি রহস্যে কালো করে সে বললে,—মাকে চিঠি একটা লিখে দিয়েছি।

—লিখে দিয়েছ, কী লিখে দিয়েছ ? সৌম্য যেন চমকে উঠলো।

—যে, তুমি আমাকে আর একটুও ভালোবাসো না, শিপ্রা হাসতে-হাসতে নিজের কোলের উপর নুয়ে এলো, মুখখানাকে নরম আলস্যে তেমনি কাৎ করে রেখে বিহ্বল চোখে বললে : না গো, ভীষণ ভালোবাসো। নইলে, শিপ্রা সোজা হয়ে বসলো তার চেয়ারে হেলান দিয়ে : নইলে কি এককথায় আলমারি কিনতে ছোটো ?

—এই কথা ?

—লিখে দিয়েছি, শিপ্রার গলা যেন শোনা গেলো অন্ধকারের স্তব্ধতা থেকে : শরীর আমার ভালো নেই, আমি তোমার কাছে যাবো।

সৌম্য অন্যমনস্কের মতো বললে,—তার তো অনেক দেরি আছে।

তারপরে, আশ্চর্য, আর কোন কথা নেই। দু'জনের মাঝে নেমে এলো রাত্রির নিঃশব্দ উষ্ণতা, স্পর্শহীনতার বৈদ্যুতিক ঔজ্জ্বল্য। আস্তে-আস্তে উঠে সৌম্য আলোটা নিবিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিলে। তারপর আবার আস্তে-আস্তে ফিরে এলো তার চেয়ারে।

পরদিন সকালে শোবার ঘরেই সৌম্য খবরের কাগজে বাজার দরের ওঠা পড়ার হিসেব নিচ্ছে, নিচে শুনতে পেলো একটা গোলমাল। শিপ্রার শাণানো গলায় ছিটকে পড়েছে আগুনের ফুলকি। সমস্তটা সকালবেলা সৌম্যর চোখে কেমন বেসুরো ম্রিয়মাণ হয়ে এলো।

—এই তুমি গিরধারীকে তাড়িয়ে দিচ্ছ ? শিপ্রা তার টেবিলের উপর ফেটে পড়লো।

তার চার পাশে নেই আর গতরাত্রির সেই নীরবতার স্নেহ। শরীরের প্রতিটি রেখা যেন জাগরণে রুক্ষ হয়ে এসেছে। বদলে ফেলেছে সেই রাতের শাড়িটা, ঘুম দিয়ে যা স্নিগ্ধ ছিলো, পরেছে তার আধ-ময়লা আটপৌরেখানা, গায়ে যার লেগে আছে অভ্যাসের ধুলি। স্পষ্ট দিবালোকে তাকে যেন তাতে চেনা যায় না।

সৌম্য অসহিষ্ণু গলায় জিগ্গেস করলে : কেন, কী হয়েছে ?

—এই দেখ না, বেগুনের সের ছ'পয়সা করে—পাশের সাধনাদি'দের বাড়িতে ছ'পয়সা করে আনছে—আর ও বলছে কিনা দশ পয়সা ?

—সেই জন্যে এমন একটা লড়াই শুরু করে দিয়েছ ?

– না, করবে না ? জলজ্যান্ত এমন ডাকাতি, প্রতি সেরে চার পয়সা করে চুরি ! তুমি বলো কী ?

—চাকর-বাকররা এমনি করেই থাকে। সৌম্যর গলা ক্লান্ত হয়ে এলো।

—করেই থাকে ? আর তুমি তার একটা বিহিত করবে না ? শিপ্রা ঝাঁজিয়ে উঠলো : আমি দিয়েছি ওকে তাড়িয়ে। ওর মাইনেটা হিসেব করে এবার ফেলে দাও।

—এতোটা বিহিত যখন করলে, তখন এটুকুও পারবে। দেরাজের চাবি তোমারই আঁচলে বাঁধা।

—হ্যাঁ, এলো আঁচলে শিপ্রা দেরাজ খুলতে গেলো : আমিই দিয়ে দিচ্ছি। আট টাকা করে মাইনে হলে আঠারো দিনে কতো পাওনা হয় ?

সৌম্য মুখে হাসি চেপে রাখলো, কঠিন হয়ে বললে,—আমি তার কিছু জানি না।

– আহা, এটুকু যেন আমি বার করতে পারবো না। মুখ গম্ভীর করে শিপ্রা মনে-মনে কী খানিকক্ষণ হিসেব করলে : যাক, পুরো পাঁচ টাকা দিয়ে দিলেই চলবে।

—বলো কী, সৌম্য আঁৎকে উঠলো : এতোগুলি পয়সা বেশি দিয়ে দেবে ?

—তা, নিক গে। অসীম ঔদাস্যে শিপ্রার মুখ স্নিগ্ধ হয়ে এলো . এতোদিন চাকরি করছে, নিলোই না-হয় কিছু বেশি।

—বাজারেও তো ও এমনি কিছু বেশি নিচ্ছিলো। সৌম্য হাসবে, না গম্ভীর থাকবে কিছু ভেবে পেলো না।

—তবু রোজ-রোজ খুঁটে-খুঁটে বেশি নেয়ার চাইতে এ অনেক ভালো। মুখ দিয়ে আমার কথা যখন একবার বেরিয়ে গেছে, তখন আর কিছুতেই ফেরানো যাবে না। শিপ্রা আবার একটা ঝামটা দিয়ে উঠলো : বসে আছো কী চুপ করে ? যাও, চাকর খুঁজে নিয়ে এসো আরেকটা।

খবরের কাগজের অতলতরো গহ্বরে ডুবে গিয়ে সৌম্য বিরক্ত গলায় বললে—তা আমার দ্বারা হবে না। তোমার খেয়াল মতো চাকর জোগাবার ব্যবসা আমি খুলে বসিনি।

শিপ্রা দরজার সামনে রাগে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, এক মুহূর্ত, তারপর তার জিভ উঠলো লকলক করে : বয়ে গেছে আমার ঘরের তোলা-পাট সামলাতে। আমি সব এক্ষুণি ফেলে ছড়িয়ে ছত্রখান করে দেবো। আমার কী ! আমাকে তো আর আপিস যেতে হবে না।

শিপ্রা ত্বরিত একটা বিদ্যুৎরেখার মতো নিচে গেলো মিলিয়ে।

আশ্চর্য, সিঁড়িতে আবার তার হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে হাসি লাফাতে-লাফাতে একেবারে সৌম্যর সামনে এসে গড়িয়ে পড়লো। সৌম্য তো অবাক। শিপ্রার সেই ক্রোধান্বিত স্তব্ধতা যেন হঠাৎ-বর্ষায় খণ্ড-খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। শিপ্রা

একটা চেয়ারে বসে পড়ে আরো খানিকক্ষণ হেসে নিলো. পরে এক ফাঁকে একটু দম নিয়ে বললে,—যাক তোমাকে আর চাকর খ‍ুঁজতে যেতে হবে না।

—কেন, হলো কী ?

—যা হবার। টাকাটা মুখের ওপর ছুঁড়ে দিতেই গিরধারীর সে কী ভেউ-ভেউ কান্না। যদি একবার দেখতে। শিপ্রার শরীরে আবার একটা হাসির ঢেউ এলো, সেটাকে হাত দিয়ে চোখ-মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে সে বললে,—বলে কি না আর কোনদিন চুরি করবে না, আমার পা ছুঁয়ে বলে কি না এই বাড়ি ছেড়ে গেলে এমন মা-জী আর সে কোথাও পাবে ? ঠিক এবার সে ছ'পয়সার বেগ‍ুন আনবে, এক সেরে তিনটে ওঠে এমন বড়ো বেগ‍ুন।

হাসির চাপে আরো অনেক কথা যেন সে পিষে ফেললে।

কিন্তু সৌম্যর মুখ এতোটুকু ভিজলো না। সে কঠিন হয়ে বললে,—তুমি ব‍ুঝি পাশের বাড়ির ঐ বৌর সঙ্গে বসে ম‍ুলো-বেগ‍ুনের দর কষো ? তোমাকে বলেছি না—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শিপ্রা বললে,—কেন, কী দোষ হয়েছে তাতে ? ভদ্রমহিলা বাড়িতে এলে তাঁকে তাড়িয়ে দেবো নাকি ?

—এছাড়া আর তোমাদের কোনো কথা নেই ?

—উনি যদি সে কথা তোলেন, আমি কী করতে পারি ? শিপ্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো : তাঁর সামনে তো আর তোমার খবরের কাগজটা পেতে দিতে পারি না ? আর কী এমন মন্দ কথা জিগ‍ুগেস করি ? ম‍ুলো-বেগ‍ুন না হলে দিন-দিন এমন নধর হতে কী করে ?

—তুমিও ব‍ুঝি যাও ওদের বাড়ি ?

—মাঝে মাঝে যাই বই কি। একজন এতো এলে তাঁর বাড়ি তুমি কী করে না গিয়ে পারো শ‍ুনি। সমস্ত দ‍ুপ‍ুরবেলাটা একা-একা কাটাই কী নিয়ে ?

—কেন, বই, এত রাজ্যের বই, বই পড়তে পারো না ?

—বই, বই পড়ে আমার কী হবে ? তোমাকে দিয়েই তো আমার বই পড়া শেষ হয়ে গেছে। কী আছে বইয়ে ? শিপ্রা হেসে উঠলো : মান‍ুষে কী ওতে পায় ? এর চেয়ে বেশি ?

—ব‍ুঝলে তো পাবে। কিন্তু, সৌম্যর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো : আস্তে-আস্তে চেষ্টাও তো একটু করতে পারো।

—যা বলেছ, শিপ্রার এখন হাসবার মেজাজ এসেছে : ব‍ুঝতে হবে বলেই আর পড়তে ইচ্ছে করে না। চেষ্টা করবার বয়স গেছে পেরিয়ে।

—বটে আর কি ! তাই যাও ম‍ুলো-বেগ‍ুনের গল্প করতে। এদিকে আমি আজকাল আর তেমন বই নিয়ে বসি না বলে তো কতো আপসোস করো শ‍ুনতে পাই।

—সত্যি বলছি, খ‍ুশিতে শিপ্রা ছলছল করে উঠলো : বই নিয়ে বসলে তোমাকে ভারি স‍ুন্দর দেখায়। তুমি যখন আলোয় বসে পড়ো না, আমি অনেকক্ষণ তোমার মুখের দিকে ল‍ুকিয়ে চেয়ে থাকি। ঘ‍ুম কী করে আসবে বলো ?

—আর তোমাকে সুন্দর দেখায় বুঝি তোমার রান্নাঘরে, তোমার মুলো-বেগুনের হাটে ?

দেখায় না ? নিচে নেমে যাবার মুখে শিপ্রা আবার আরেক পশলা হাসলে : আমি যখন বসে তরকারি কুটি, স্টোভ জেলে তোমার জলখাবার তৈরি করি, তখন আমার মুখের দিকে কোনোদিন চেয়ে থাকোনি ? হয়েছে, আর চাইতে হবে না। এখন চান করতে চলো।

আজকাল একেই সৌম্যর আপিস থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যায়, তায় জলখাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম করতে না-করতেই আবার ছোটে আড্ডার সন্ধানে।

শিপ্রা হয়তো কোনো-কোনোদিন বলে : আবার এখুনি বেরুচ্ছ ?

—হ্যাঁ, দিনভোর এই খাটুনির পর এখন একটু অসাংসারিক কথায় নিজেকে না ভোলাতে পারলে মারা যাবো। তোমার মতো দুপুরে তো আর ঘুমাতে পারি না।

শিপ্রার মনে পড়ে আগে-আগে সৌম্য আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে এসে কোণের ঐ ইজিচেয়ারটার উপর ভেঙে পড়তো, এমন তার উদ্বৃত্ত শক্তি থাকতো না যা অপচয় করবার জন্যে তার একটা জনতার দরকার হবে। তখন উষ্ণ এই গৃহকোণ, দেয়ালের উপর সন্ধ্যার ম্লানায়মান বিশ্রাম, মাঝে-মাঝে মনে-ভেসে-ওঠা গানের কথার মতো শিপ্রার ভাঙা-ভাঙা যাওয়া-আসা—সব নিয়ে সে কেমন যথেষ্ট ছিলো। এখন এই ঘর, এই ঘরের শান্তি তার কাছে যেন বড়ো পুরোনো, বড়ো সেকেলে হয়ে উঠেছে। তাই আজকাল সে এখান থেকে পালাবার জন্যেই যেন পা বাড়িয়ে আছে। শিপ্রার মনে হয়, এ-ই হয়তো স্বাভাবিক, এ-ই হয়তো অভ্যাসের ধর্ম, তবু বাইরে থেকে সহজ বলে স্বীকার করলেও মন যেন পুরো সায় দেয় না।

শিপ্রা প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনার সুরে বলে : শিগ্‌গির-শিগ্‌গির ফিরো কিন্তু। খাবার নিয়ে আমি কতোক্ষণ বসে থাকবো ?

—খিদে পেলে তুমি তো আগেই খেয়ে নিতে পারো।

—থাক, আর আদরে দরকার নেই। হাতের কব্জিতে ঘড়ি তো একটা খুব ফ্যাসান করে বেঁধে রেখেছ দেখছি, দয়া করে মাঝে-মাঝে নিজের চোখ দুটোকেও একটু দেখিয়ো।

সৌম্য শিগ্‌গির-শিগ্‌গিরই ফেরে, রাত তখন প্রায় দশটার কাছাকাছি, এর আগে নাকি ভদ্রলোক বাড়ি ফিরতে পারে না। বিয়ে করেছে সে প্রায় দু'বছরের উপর—সামাজিক ভদ্রতাটা অন্তত বাঁচিয়ে চলতে হবে তো। অথচ শিপ্রাই আগে-আগে সৌম্যর সেই অবাধ্য, অবিচ্ছিন্ন আসক্তিকে শাসন করেছে : কি কেবল কুনোর মতো অন্ধকারে বসে থাকো একটু বেড়িয়ে আসতে পারো না ? লোকে বলে কী ? হায়, এখনো নাকি লোকে বলাবলি করে ; তাই সৌম্যকে ভালো করেই বেড়িয়ে ফিরতে হয়। সৌম্য ঘরের সঙ্গে তার সময়ের সম্পর্কটা অনেক ভদ্র, অনেক সংক্ষিপ্ত করে এনেছে। শিপ্রা যেন তার এই ভদ্রতারই একটা নমুনা। তার হাতের একটা বই, যে-বইর গল্পটা সে আগে জেনে নিয়ে পরে পড়ছে, পড়তে-পড়তে গল্পটা জানছে না।

আশ্চর্য, ঘড়ির ছোট্ট কাঁটাটা দশের ঘর-ও পেরোতে চললো।

সৌম্য ঘরে ঢুকে দেখলো, শিপ্রা প্রতীক্ষায় জ্বলতে-জ্বলতে এতোক্ষণে বিছানায় নিবে গেছে। সারা মুখে চুল এলোমেলো করে দিয়ে সে তার ঘুম ভাঙালো : বড্ড দেরি হয়ে গেলো। গিয়েছিলুম সেই বরানগর।

শিপ্রা এক গা চমকিত ঘুম নিয়ে উঠে বসলো : আমাকে তো একদিন নিয়ে যেতে পারো না।

—আমার সেখানে নেমন্তন্ন ছিলো যে। না, না, খাওয়ার নয়, গান শোনার। গীতি সোম-এর নাম শুনেছ? তার গান। কতোদিন পর ভালো গান শুনলুম। চলো, চলো, খেতে দেবে চলো, তার হাত ধরে সৌম্য টানাটানি করতে লাগলো : ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। এতো পরিশ্রম করে গেলুম, অথচ ভদ্রলোকরা এক পেয়ালা চা ছোঁয়ালো না।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শিপ্রা নিজেই নেমে পড়লো। ঈষৎ অভিমানের সুরে বললে—সারা রাত তবে গান শুনে কাটিয়ে দিলেই পারতে। এ লোকের আবার ক্ষিদে পায় নাকি?

—একেবারে ভ-য়ে দীর্ঘ ঈ, মূর্ধণ্য ষ, মূর্ধণ্য ণ। সৌম্য হেসে উঠলো।

—ছাই। শিপ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলো : যে লোক গান জানে না তার আবার কিছু দাম আছে নাকি? তবে মিছিমিছি এসেছ কেন ফিরে?

—যে-লোক গান জানে না তার ডাক যে গানের চেয়েও মর্মভেদী। সৌম্যর মেজাজ এখন গানেরই মতো হালকা : গান জানো না, কিন্তু কে পারে তোমার মতো খাবার সাজিয়ে রাখতে, ঘর গুছিয়ে রাখতে, রাখতে পেতে এই বিছানা—হায়, বলো কিনা, ফিরে কেন এসেছি!

—তবে একদিন আমাকে কেন বেড়িয়ে আনতে পারো না? শিপ্রা মুখ ফেরালো, তার চোখে জল দাঁড়িয়ে গেছে : বাবা কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, চাকর-ঠাকুর কেউ নেই, সমস্ত বাড়িটা কেমন ভূতে-পাওয়া বাড়ির মতো থমথম করছে, আমার একা-একা কী ভীষণ ভয় করে।

—সত্যি, আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সৌম্য কী বলবে কিচ্ছু ভেবে পায় না।

—মনে হয় সমস্ত বাড়িটা যেন আমার বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, চাপা পাথুরে হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পাচ্ছি না। তুমি আমার কথা একটুও ভাবো না। শিপ্রার দাঁড়ানো জল চোখের পাতা বেয়ে গালের উপর নেমে এলো : একেক সময় ভয়ানক একা মনে হয়। মার জন্যে ভারি মন কেমন করে। ক'দিন আগেই তো আমাকে পাঠিয়ে দিলে পারো।

—সত্যি, এতো দেরি করা আমার কিছুতেই উচিত হচ্ছে না। এখন চলো, সৌম্য তাকে আবার আকর্ষণ করলো : আর ক'টা দিন, তার পরে যাবেই তো মার কাছে। আর একা তোমাকে কে রাখে?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে দেয়ালের একটা ফোকরে সৌম্য সুন্দর খানিকটা অন্ধকার দেখতে পেলো, সেই ছোট্ট ফাঁকটুকু দিয়ে কোথাকার সমুদ্রের একটুখানি হাওয়া ছুঁয়ে গেলো তার মুখ—এই দেয়ালটুকুর বাইরে কী আতঙ্কিত নির্জনতা তার জন্যে প্রতীক্ষমাণ, শান্ত একটা পশুর মতো ওৎ পেতে আছে।

॥ ছয় ॥

আরো দু'টো মাস কাটলো। শিপ্রার বাপের বাড়ি যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে।

এর মধ্যে একদিন, সৌম্য আপিস থেকে ফিরেছে, শিপ্রা সরাসরি হঠাৎ তার মুখের উপর বলে বসলো : আজ এক্ষুণি যেন আড্ডা দিতে ছুটো না।

ঘরে পা দিতে-না-দিতেই এই সম্বর্ধনা। কথার ধাক্কায় সৌম্য যেন টলে পড়লো, থতিয়ে বললে,—কেন, কী হয়েছে?

—তোমাকে একবার শেয়ালদা যেতে হবে।

—শেয়ালদা? সেখানে কী?

—স্টেশান গো স্টেশান। শিপ্রা দুই হাতে ঘর-দোর গুছিয়ে যেন সারতে পারছে না : চিটাগং-মেইল অ্যাটেণ্ড করতে হবে।

—কেন, কে আসছেন? সৌম্য এতোক্ষণে যেন কোটের বোতাম দু'টো খুলতে পারলো।

কথাটা যেন গুলির মতো সৌম্যর কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো : বনানী-দি আসছেন।

—কে আসছেন?

—বনানী-দি। শিপ্রা ঘরময় ছোট-ছোট লঘুতায় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলো : ঘর-দোরের কী যে চেহারা হয়ে আছে! উনি এসে এমনি অবস্থায় দেখলে কী যে ভাববেন আমাদের, তার ঠিক নেই। ধোপাটার আবার এ ক'দিন দেখা নেই, জমে আছে ময়লা কাপড়ের একটা পাহাড়। সব এর মধ্যে গুছিয়ে ফেলতে পারি তবে হয়। কখন ট্রেন আসে? আর দেখ শিপ্রা এতোক্ষণে যেন একটা নিশ্বাস ফেললো : সিঁড়ির পাশে ঐ ছোট ঘরটা ওকে দিলুম, বেশ নিরি-বিলি দক্ষিণ-খোলা ঘর, একজনের পক্ষে যথেষ্ট, কী বলো? বাবাও তাই বললেন। সমস্তটা দিন জিনিসপত্রের টানা হেঁচড়া করতে কী মেহনৎটাই না আমার হয়েছে! তোমার ছোট সেক্রেটারিএট্ টেব্‌লটা কিন্তু ওঁর ঘরে সরিয়েছি, টেব্‌ল-ল্যাম্পটাও, কে জানে যদি রাত্রে লেখাপড়া করতে বসেন, বলা যায় না তো। আর আমাদের আছে যখন জিনিসটা—শিপ্রা চোখের কোণে চকিত একটু হাসলো।

ততোক্ষণে অসহায় হয়ে সৌম্য একটা চেয়ারের মধ্যে ভেঙে পড়েছে। মুখে অনুনয়ের কাতরতা এনে সে বললে,—তার আগে যদি বলো তোমার বনানী-দিটি কি?

—বা, বনানী-দি'কে চেনো না? শিপ্রা ফোঁস করে উঠলো : আমাদের বিয়ের সময় দেখেছ তো তাকে।

—তখন তো কতো জনকেই দেখেছি। সব মেয়ে তো তখন তোমার মাঝেই ডুবে ছিলো।

—বনানী-দি, কী বলবো, ভীষণ ভালো মেয়ে। শিপ্রা যেন সমস্ত শরীরে

আপ্লুত হয়ে উঠলো : তাঁকে কী বলে তোমাকে বোঝাবো ? অসম্ভব। শিপ্রা আবার তার গৃহকর্মে মন দিলে : এলেই দেখতে পাবে।

—থাক, অসম্ভবকে আর তোমার বর্ণনা করতে হবে না। আমার কথাগুলোর শুধু উত্তর দিয়ে যাও। সৌম্য নিজেকে খুব খানিকটা গুরুতরো মনে করে আরাম বোধ করলে : তিনি তোমার কে হন ? তোমার চেয়ে বয়সে বড়ো ?

দু'টি আঙুল তুলে শিপ্রা বললে,—পুরো দু'টি বছর। বনানী-দি যে-বার ম্যাট্রিক দেয়, আমার তখন ক্লাস নাইন। আমার তো পড়াশুনো আর হলো না. বিয়ের জন্যে বাড়িতে বসে ফুলতে লাগলুম, বিয়েটা হলোও কোনো-রকম, বনানী-দি গড়গড়িয়ে দিব্যি বি-এটা পাশ করে ফেললে।

সৌম্য তাকে বাধা দিলো : আমার প্রথম প্রশ্নটা ?

—আমার কে হন? খুঁজলে সম্পর্ক একটা বার করতে পারো, আমার মার কি-রকম মামাতো না মাসতুতো বোনের মেয়ে। সে-সম্পর্ক আমরা ধরি না। ইস্কুলে তিনি আমার বনানী-দি হবার পরে তবে এই সম্পর্কটা বেরিয়েছে।

—তা, তিনি এখানে কেন আসছেন ?

—বা., সুভদ্রা-বালিকা-বিদ্যালয়ে তিনি চাকরি পেয়েছেন যে। ও হরি ! শিপ্রা খুশিতে ছটফট করে উঠলো : তুমি তাঁর চিঠিটা এখনো দেখনি যে। তাই ! আমার সেকথা মনেই ছিলো না।

—থাক, পরে দেখা যাবে। পোশাকের ভারমুক্ত হয়ে সৌম্য চেয়ারে আবার গা ঢেলে দিলে : বুঝলুম। তার কলকাতায় আসা হচ্ছে। কিন্তু এই গরিবের বাড়িতে কেন ?

—কারণ, কলকাতায় আমিই তাঁর নিকটতমো আত্মীয়। শিপ্রা গর্বে আবার একটা ঝিলিক দিলে : এবাড়ি গরিব হতো, যদি আমি না থাকতুম। তা তোমার ভয় নেই, এখানে তিনি বেশিদিন থাকছেন না, ছোট দেখে একখানা বাড়ি খুঁজে দিলেই সেখানে তিনি উঠে যাবেন।

—তা আমি কাল ভোরেই যা হোক করে খুঁজে বার করে দেবো। সৌম্য হেসে উঠলো : তিনি একাই আসছেন নাকি ?

—হ্যাঁ, সম্প্রতি তো একাই।

—আর বাড়ি খুঁজে দিলে বুঝি তাঁর সঙ্গী-মশাইটি এসে চড়াও হবেন ? নিজের জন্যে সামান্য একখানা বাড়ি খুঁজে নেবার পর্যন্ত তাঁর সামর্থ্য নেই। দেখলে, সৌম্য তাকে চোখের একটা চিমটি কাটলে : স্ত্রী রোজগার করতে পারলে, দেখলে, পুরুষের কতো সুবিধে।

—তুমি বলছ কী এসব ? শাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে শিপ্রা হাসিতে উথলে উঠলো : বনানী-দি বিয়ে করলেন কবে ?

—বিয়ে করেননি ? তবু ভালো, দূরে হঠাৎ ছায়া দেখলে মাথায় ঘোমটা দিয়ে পালাবেন না। সৌম্য গলা নামিয়ে আলগোছে জিগ্গেস করলে : তাহলে বলো, 'সম্প্রতি একা'-কথাটার মানে কী ? পেছনে কে আসছেন ?

—কে আবার ! তাঁর ঠাকুমা। খুনখুনে আশী-বচ্ছরের এক বুড়ি। সংসারে বনানী-দির ঐ একমাত্র বন্ধন।

সৌম্য ভীষণ নিরাশ হয়ে গেলো। বললে,—তিনি পরে আসছেন কেন ?

—এখন এই নতুন জায়গায়, বাড়ি-টাড়ি ঠিক হয়নি, কী করে আসেন বলো ? কী ভারিক্কি চালেই শিপ্রা কথা কইছে : এখানে, এবাড়িতে নিরিমিষ্যি পাট নেই, পরেই আসবেন—তুমি চিঠিটা ছাই পড়েই দেখ না একবার।

—আরেকটা প্রশ্ন আছে। সৌম্য ভয়ে-ভয়ে জিগ্‌গেস করলে : তোমার বনানী-দির এখনও বিয়ে হয়নি কেন ?

—বিয়ে হয়নি মানে ? শিপ্রা একেক সময় এমন আচমকা কথা কয়ে ওঠে যে সৌম্যর দস্তুরমতো মাথা ঘুরে যায় : বিয়ে উনি করেননি।

ভঙ্গির কাঠিন্যটা আলগা করে দিয়ে সৌম্য হেসে বললে,—তাই তো জানতে চাই, কেন করেননি ?

—উনি বিয়ে কোনোদিন করবেনো না ! কথাটা বলতে গিয়ে শিপ্রারো শরীরে একটা তেজস্বী দৃপ্তি এলো : তার চেয়ে আরো অনেক বড়ো কাজ আছে মানুষের। অন্তত কোনো-কোনো মানুষের। হঠাৎ শিপ্রা কি-একটা খুশিতে নিচু হয়ে সৌম্যর গলা জড়িয়ে ধরলে : জানো না বুঝি একটা মজার কথা ? হাসিতে শিপ্রা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পড়ছে : সেকথাটাই তোমাকে জানানো হয়নি। কিছুই আমার মনে থাকে না দেখছি।

সৌম্য শূন্য চোখে চেয়ে রইলো : কী ?

শিপ্রার আবার সেই পরিচ্ছন্ন হাসি : তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ের একটা কথা উঠেছিলো যে।

—বলো কী ? তারপর ?

—বাবা তাঁকে পছন্দ করলেন না।

—তবে এই যে বললে বিয়ে তিনি কোনোকালে করবেন না, সৌম্য কথাটা একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে বললে : অথচ বাবার সামনে তিনি পরীক্ষা দিতে দাঁড়িয়েছিলেন ?

—কক্‌খনো না। শিপ্রা যেন নিজেই একটা অপমান বোধ করলে, এমনি আহত তেজে দূরে ছিটকে দাঁড়ালো : বনানী-দিকে তুমি সে-জাতের মেয়ে পাওনি। বাবাই তাঁকে দেখবার জন্যে অস্থির—মেয়ে তো আর তিনি কম দেখেননি। বনানী-দিকে তো কিছুতেই রাজি করানো গেল না ; পরে, বাবা এমনি আলাপ করতে চান বলায় বনানী-দি এলেন তাঁর পরনের ময়লা শাড়িটি পর্যন্ত না বদলে। ইস্‌, শিপ্রার ঠোঁটে শাণিত একটা ঠাট্টা খেলে গেলো : তাকে একবার বলা হোক না, অমুকে তোমাকে দেখতে এসেছে, অমনি উনি সাপের মতো ছুবলে উঠবেন, বলবেন আমি যাবো ছেলে দেখতে। তিনি কিনা দাঁড়াবেন শো-কেস্‌-এর বিজ্ঞাপন হয়ে ! বলে দেখ না একবার।

সৌম্য হেসে বললে,—তুমি এতো কথা জানলে কী করে ?

—বাঃ, আমাদের পাড়ায় থাকতেন, আমরা জানবো না ? বাবা তো সে-যাত্রা আর চাটগাঁয়ে কম মেয়ে দেখেননি।

—থাক, পছন্দ যে করেননি বেঁচে গেছি।

শিপ্রার চোখ দুটি ঠাণ্ডা, একটু-বা ধোঁয়াটে হয়ে এলো : না, তুমি জানো

না, বনানী-দি ভারি ভালো মেয়ে। রং একটু ময়লা হলেই কি আর সুন্দর হওয়া যায় না? সত্যি, বাবা তাঁর ওপর ভারি অবিচার করেছেন।

হাসির ধাক্কায় সৌম্য উঠে পড়লো চেয়ার ছেড়ে: তা নিয়ে তুমি কিনা এখন আপসোস করছ! উদারতার কী মহান উদাহরণ!

এতোক্ষণে যেন শিপ্রা চোখে ফর্সা দেখলে। সৌম্যর হাসির শুভ্রতায় তার মুখের ব্যথিত আভাটুকু এক ফুঁয়ে নিবে গেলো। অনর্গল হাসিতে সে সৌম্যর দুই হাতের উপর গলে পড়লো, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে-যেতে বললে,—আমি কী বোকা, সত্যি কী ভয়ঙ্কর বোকা!

তাকে তার পায়ের উপর তুলে দিতে-দিতে সৌম্য বললে,—তাই বলো। বাবার পছন্দটা শেষ পর্যন্ত ভালোই।

—যাও কী সব বাজে কথা কইছিলুম এতোক্ষণ। শিপ্রা আবার তার গর্বিত আতিথেয়তায় বিস্ফারিত হলো: তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, একবার স্টেশনে যেতে হবে তো?

বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে সৌম্য ঈষৎ বিরক্ত গলায় বললে,—কেন সেকথাও চিঠিতে লিখেছেন নাকি?

—না তা অবিশ্যি লেখেননি। তবু আমাদের বাড়িতে আসছেন, আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে।

—কিন্তু আজ সন্ধ্যেয় আমার একটা জরুরী কাজ ছিলো।

—যাও, আমাকে আর বকিয়ো না। কাজের মধ্যে তো আড্ডায় গিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকদের মুণ্ডপাত করা। একদিন না হয় আমারই একটা কথা শুনলে।

সৌম্যকে শিপ্রা যখন ঠেলতে-ঠেলতে স্টেশনের দিকে পাঠিয়ে দিলে তখন সাতটা প্রায় বাজে। শিপ্রার আজ নতুন রকমের স্ফূর্তি, শত চুপ করে থেকেও তা সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না। বনানী-দিকে সে চিরকাল ভয়ঙ্কর সম্মান করে এসেছে, তিনি তার মুঠোর মধ্যে থেকেও নাগালের বাইরে, তার কাছে তাঁর সমস্তটা অস্তিত্ব তারার দূর ধূসরতা দিয়ে তৈরি ছিলো, তার ভালোবাসার মধ্যে বিস্মিত ভয়ের ভাবটাই ছিলো বেশি—সেই বনানী-দি আজ আসছেন, অথচ শিপ্রা তার ধারে-পারে কোথাও একটু কুণ্ঠা, একটু লঘুতরতা, একটুখানি কৃতার্থ হয়ে থাকবার দুর্বলতা অনুভব করছে না। বরং, সত্য কথা বলতে গেলে, তারো আজ সম্পৎশালিতা কিছু কম নয়: এই তার সংসারের উপর প্রবল প্রভুত্ব, এই তার গর্বিত আত্মসর্বস্বতা। দেখতে গেলে এক হিসেবে বনানী-দির চাইতে তার আজ বেশি মর্যাদা, বেশি প্রতিপত্তি। তার আজ আর আপ্যায়িত হবার নমনীয় ভঙ্গি নয়, বরং সে তার ঐশ্বর্যে যেন একটু বিচ্ছিন্ন, সমারূঢ়। সে যে কতো সুখী, কতো পূর্ণ, কতো স্বপ্রধান, এই কথাটা সবিস্তারে বনানী-দিকে জানানো যাবে বলে শিপ্রা সারা শরীরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। এতো বড়ো সংসারের সে যে একচ্ছত্র কর্ত্রী, তার মুখের কথায় যে ঘরের দেয়ালগুলো পর্যন্ত টলমল করে ওঠে, ইচ্ছে করলেই সে যে হাত খুলে অনেক টাকা খরচ করে ফেলতে পারে, এবং ইচ্ছে করলেই পারে হাতের মুঠোটা লোহার মতো আঁট, শক্ত করে

তুলতে—তার একটা প্রচ্ছন্ন আভাস দিতে পারবে ভেবে মনে-মনে সে বিভোর হয়ে উঠলো। তাই, বনানী-দির ঘর সে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে বিলাসের রমণীয়তায়, জমিয়ে রেখেছে উপকরণের পাহাড়। অতিথির আরামের কথা সে ততো ভাবছে না, যতো তার নিজের অহঙ্কারের। অতিথির সম্বর্ধনার চাইতে নিজের সমৃদ্ধিটাই তার বড়ো জিনিস।

সৌম্য ফিরে এলো, নিঃসঙ্গ। নিচেটা খালি, রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। ভারি পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে সে ক্লান্ত, বিতৃষ্ণ গলায় বলতে লাগলো: কে কোত্থেকে এক উড়ো চিঠি দিয়েছে, ছোটো অমনি ইস্টিশানে। নাকাল আর কাকে বলে। বাবাঃ, এ কী রসিকতা! পয়লা এপ্রিলের তো এখনো অনেক দেরি, সেই আসছে বছর।

আদ্ধেক উঠে সিঁড়িতে বাঁক নিতেই শিপ্রার তরল এক ঝলক হাসির শব্দ তার কানে এলো। সৌম্য বিপদের একটা গন্ধ শুঁকলে। নিঃশব্দে পার হয়ে গেলো আরো দুটো ধাপ। যা আঁচ করেছিলো —সৌম্য যেন বসে পড়লো মাটির উপর। দরজাটা খোলা—বনানী-দির ঘরের দরজা। ঘরে কেবল শিপ্রা উপস্থিত নয়, আরেকটি মেয়ে মেঝের উপর নিচু হয়ে বসে এলোমেলো আঁচলে তার সুটকেশ ঘেঁটে স্নানের কাপড় খুলছে। সৌম্যর নির্বাপিত মুখের উপর ছিটিয়ে পড়লো শিপ্রার আরেক ঝলক হাসির ঝাপ্টা।

—এ কী, উনি আমার আগেই বাড়ি পৌঁছে গেছেন দেখছি।

—হ্যাঁ, আপনি গিয়েছিলেন বুঝি স্টেশনে? বনানী বিচ্ছুরিত একটা অন্ধকারের শিখার মতো দাঁড়িয়ে পড়লো। দুই অঞ্জলি মুদ্রিত একটি পদ্মের মতো জোড় করে স্মিতমুখে বললে: নমস্কার। আপনি যে স্টেশনে যাবেন তা ভাবিনি, তাই নেমে পড়েই একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এসেছি।

সৌম্য অপ্রস্তুতের মতো নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে বললে,—আমার অবিশ্যি পৌঁছুতে মিনিট খানেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো। তখনো লোকজন নামছে। ভেবেছিলুম আপনি একটু দাঁড়াবেন হয়তো!

—কী করে জানবো বলুন। বনানী ম্লান একটু হাসলে।

—তাতে কী হয়েছে? শিপ্রা স্বামীকে প্রচ্ছন্ন একটু খোঁচা দিলে: কারু সাহায্য না নিয়ে একাই চলে আসতে পেরেছেন। মিছিমিছি তুমি ব্যস্ত হচ্ছিলে, মেয়েদের অবলা ভাবতে পারলেই তো তোমরা খুশি হও। তারপর স্নিগ্ধ একটু হেসে: বনানী-দিকে তুমি মনে করতে পারছো না? আমাদের বিয়ের সময় তো উনি এসেছিলেন।

ভয়ে-ভয়ে সৌম্য বনানীর দিকে, বিশেষ করে বনানীরই দিকে তাকালো। কিন্তু মনে হলো না এর আগে কোথাও সে তাকে দেখেছে। এই যেন দেখলো প্রথম, রাত্রে, রাতের অন্ধকারে অপরিচয়ের অসীমায়। দেখলো, তখন উঠে দাঁড়াতেই দেখলো, বয়স তার কুড়ি-একুশের বেশি হবে না, পরনের শাড়িটা ট্রেনের ধুলোয় ময়লা, অগোছালো, স্নান করতে যাবার আগে পিঠের উপর চুলগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছে—এর বেশি আর কিছু তার দেখবার ছিলো না। আর সমস্ত কিছু তার অঙ্গে, তার চারপাশে, তার সান্নিহিততায়। সে যেন নির্মম একটা অস্পষ্টতা

দিয়ে তৈরি, ভয়নীয় অস্পষ্টতা। জানলা দিয়ে দূরে একটা গাছ দেখা গেলো, অন্ধকারে নিস্পন্দমান ঋজুতায় মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বনানী যেন সেই গাছের মতো রহস্যময়। তার এই স্তব্ধ শরীর ও তাকে বহন করবার এই মহিমা, শরীরের উপর মাথার দৃঢ়, উন্ধত স্পর্ধা, তাকে মনে করিয়ে দিলো—কী যে মনে করিয়ে দিলো কে জানে—যেন কোনো প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, তার গুহায় নিঃশব্দে পদচারণা করছে, দ্রুত, তীব্র, গম্ভীর। কেন যে তার এরকম মনে হলো বলা কঠিন, কিন্তু তার এই স্থূল, বন্য নির্লিপ্ততা সে যেন স্পষ্ট স্পর্শ করলে। অথচ দেখেছে তাকে সে কতোক্ষণ।

আশ্চর্য, কোত্থেকে এ এলো, আত্মার কোন অগাধ অন্ধকার থেকে? নিজেকে একবার জিগ্গেস করলে সৌম্য। এলো একেবারে অবধারিতের মতো, অবিচ্ছেদ্যের মতো। কথা নয়, অতলান্ত নিঃশব্দতা! কবিত্ব নয়, নিষ্করুণ উদ্ঘাটন। সাজসজ্জা নয়, অচেষ্ট সারল্য, অকপট অনাবৃতি। মাটির নিচে যে জল আর সেই জলের নিচে যে মাটি সেখান থেকে উঠে এসেছে। উঠে এসেছে কোন দূর মূল থেকে, সৃষ্টির আদিপ্রান্ত থেকে। অস্পষ্ট হয়েও অতিব্যক্ত, রহস্যময় হয়েও অছায়াচ্ছন্ন। মৃত্যুর মতো। অবশ্যম্ভাবীর মতো। শুধু বললে,—দু'টি মাত্র কথা—আমি এসেছি। বসে-বসে অসার কথার জাল বোনে না, দূর থেকে ডাক দেয়, নাম ধরে ডাক দেয়। বলে না, আমাকে দেখ, আমাকে চেন, আমাকে ধরো; বলে, কে জানে তুমি কে, তৈরি হয়ে নাও, চলো, আমার সময় নেই। ডাক এসেছে।

শিপ্রা বললে,—তোমাকে আর সাবান-টাবান নিয়ে যেতে হবে না, আমি বাথ-রুমে সব রেখে এসেছি সাজিয়ে। তেল, তোয়ালে, সাবান, বাথ-গ্লাভ, স্পঞ্জ, সলট—সব তোমার জন্যে মজুত। কী বলো, গরম জল লাগবে নাকি? তা-ও তৈরি।

খোলা-চুলে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বনানী বললে,—আমি এখন এক-পুকুর ঠাণ্ডা জল পেলে বাঁচতুম। ইচ্ছে করছে হাত-পা ছুঁড়ে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটি। গায়ে যা ধুলো জমেছে।

—বলো কি, এই রাত্রে?

—রাত্রেই তো চমৎকার। বনানী যেন নিঃশব্দে হেসে উঠলো।

সৌম্য ফিরে এলো তার বসবার ঘরে।

বনানীকে শিপ্রা তার প্রভুত্বের অপ্রতিহততা দিয়ে পিষে ধরেছে, তার নির্বাধ বন্ধুতার বেষ্টনে। সৌম্য আজ অবান্তর, তার ঘরের জাজ্বল্যমান আলোটা যেন আজ আর জ্বলছে না।

বনানীর ক্ষণিক এই উপস্থিতি তাদের, তাদের স্বামী-স্ত্রীর, জীবনে এনে দিয়েছে নতুন একটা সুর। ভৈরবীর মতো উদাস, গাঢ়। তাদের অভ্যাসের পাণ্ডুরতায় এনে দিয়েছে অল্প একটু ঘন, উষ্ণ অন্ধকার। তাদের প্রাত্যহিকতার বর্ণহীন পারম্পর্যের মধ্যে নতুন একটি আরম্ভের গাম্ভীর্য। শিপ্রাকে আজ তার কতো সুন্দর লাগছে, চারধারের অনর্গল বৃষ্টির মাঝে নাম-না-জানা, কোথা থেকে-ভেসে-আসা ছোট ফুলের দুর্বল একটি গন্ধের মতো। লাল সূর্যাস্তের ধারে সাদা, অস্পষ্ট একটুকরো চাঁদ।

॥ সাত ॥

শিপ্রা রান্নাঘরে বসে একহাতে জলখাবার তৈরি করছিলো। শীতের বেলা হঠাৎ এক নিশ্বাসে চারদিক থেকে যেন উবে গেলো, মরা একটা ভারের মতো খসে পড়লো একটা অন্ধকার, অনড় অন্ধকার, তার গায়ের উপর নিশ্বাস ফেলে বেড়াতে লাগলো বিশীর্ণ, অথচ দেহহীন কতোগুলি প্রেতচ্ছায়া। শিপ্রা হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি আলোটা জেলে দিলে।

আজ আর সৌম্যর চায়ের কোনো তাড়া নেই। তার জানাই আছে যে সময় হলে শিপ্রাই প্লেট সাজিয়ে নিয়ে আসবে, ব্যস্ত কী! আজকাল আর তার আড্ডার জন্যে মন পোড়ে না, সেই তার সব তর্কের ধোঁয়ায় জটিল, জোরালো আড্ডা। আবার সে ঘরের ঠাণ্ডা, আস্তে-আস্তে-ঘন-হয়ে-ওঠা, অলস, অসহায় অন্ধকারে কানায়-কানায় ভরে উঠেছে। অবশ করে দিয়েছে তার সমস্ত অস্তিত্ব।

শিপ্রার যে হঠাৎ কী করে উঠলো বলা কঠিন। তাড়াতাড়ি আঁচলটা গুটিয়ে নিয়ে রাগে জ্বলতে-জ্বলতে সে উপরে উঠতে লাগলো। সিঁড়িটা অন্ধকার। পায়ে-পায়ে সেই অন্ধকার শুধু বেড়েই যাচ্ছে। অন্ধকারের সেই কালো, কঠিন দেয়াল হাতড়ে-হাতড়ে সে তাদের বসবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার তখনো শেষ হয়নি। তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে ঘরের মধ্যে, ফেনময় স্তব্ধতায়। অন্ধকারকে অনুসরণ করে শিপ্রা একেবারে ঘরের মধ্যে চলে এলো।

ঘরের দক্ষিণের দিকের দূর-দূর দুই জানলার পাশে দুটো নিচু, হেলানো চেয়ারে সৌম্য আর বনানী মুখোমুখি বসে আছে। কী-জানি তারা এতোক্ষণ কী কথা কইছিলো, হঠাৎ শিপ্রার আবির্ভাবে তারা চুপ করে গেছে, যেন মিশে গেছে অন্ধকারে। এই চমকে চুপ-করে-যাওয়ার ভঙ্গিটা ঘরের অন্ধকারে যেন দুলছে, ধারালো, দীর্ঘ একটা অন্ধকার। দানবিক, দৃঢ় দুই হাতে সেই অন্ধকার যেন হঠাৎ শিপ্রার মুখ চেপে ধরলো।

—কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, চোখে কিছু দেখতে পাও না নাকি? হাতের কাছে বোর্ড পেয়ে শিপ্রা তাড়াতাড়ি স্যুইচ টেনে দিলো: ভূতের মতন বসে আছো কী অন্ধকারে? চা খেতে হবে না?

—হ্যাঁ, হয়ে থাকলে নিয়ে এসো না। শরীর থেকে অন্ধকারটা ঝেড়ে ফেলে সৌম্য উঠে বসলো।

—হয়ে থাকলে নিয়ে এসো না! মৃদু অথচ ধারালো গলায় শিপ্রা একটা তিরস্কার করলে: সেকথা আমাকে বলতে হয়। ডেকে বলতে হয়, আমাদের চা নিয়ে এসো।

শিপ্রা তক্ষুণি, তাড়াতাড়ি নেমে গেলো। এবার যেন ঘরের আলোটা তাকে তাড়া করেছে।

কখন যে দেখতে-দেখতে সন্ধ্যে হয়ে এলো সৌম্য কিছু খেয়াল করেনি। কথায়-কথায় অন্ধকার হয়ে উঠেছে। সৌম্যর মনে হলো এ-অন্ধকার যেন

আকাশের অন্ধকার নয়, এ-অন্ধকার তার নিজের রচনা। এ এসেছে তার মনের দুর্গম গুহা থেকে, শরীরের পরিতৃপ্ত অবসন্নতা দিয়ে এ তৈরি। সৌম্য জানলা দিয়ে বাইরে শহরের দিকে তাকালো। এর আগে জানলার এতো পাশে সে কোনোদিন যেন বসেনি. সন্ধ্যার ম্লান ঘনায়মানতায় কলকাতাকে যে কী অনির্বচনীয়, অবাস্তব সুন্দর দেখায়, তা যেন তার জানতে বাকি ছিলো। রাস্তায় আলো জ্বলেনি, অথচ জ্বলো-জ্বলো করছে, সেই একটা দোদুল্যমান সময়। কলকাতার শরীরের উপরে শ্রান্তির একটা বিশাল ছায়া পড়েছে—ভয়ঙ্কর একটা অবসাদের ভাব। যতোদূর দেখা যায় সব যেন অস্পষ্ট, অনির্দেশ, কোথাও যেন কারু অবলম্বন নেই। তার সমস্ত খণ্ড-খণ্ড অস্পষ্ট গতি-চাঞ্চল্য মিলে যেন একটি সম্পূর্ণ স্থির, নিরুদ্দেশ স্তব্ধতা। দীর্ঘীকৃত আলস্যে মোটরগুলি যেন কোন বিস্তৃত শূন্যে ভেসে চলেছে, এখানে-ওখানে লোকজন যাওয়া-আসা করছে বটে, কিন্তু কেউ যেন কোথাও নেই। টুকরো-টুকরো করে শোনা যাচ্ছে অনেক কোলাহল, কিন্তু খানিকক্ষণ কান পেতে থাকলে মনে হয়, বিশাল স্তব্ধতারই ভাঙা-ভাঙা কটি ঢেউ। দোকান-পাট, বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, সব মিলে যেন একটা বিস্তৃত, ধূসর ঔদাসীন্য। সৌম্য সহজে চোখ ফেরাতে পারলো না। কলকাতার ভয়ঙ্কর বিপুলতা যেন সন্ধ্যায় এই তার ম্লানায়মান মৌন প্রথম তার কাছে ধরা পড়লো। তার স্তূপীভূত স্তব্ধতায় যেন সে একটা বন্য পাশবিকতার স্বাদ পেলো। তার মনে হলো, যেন একটা অতিকায় পশু সারা দিনের ব্যর্থ অন্বেষণের পরে তার শরীরের ক্লান্ত, শ্লথ মন্থরতায় তার গুহায় ফিরে চলেছে।

জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে সৌম্য বনানীর দিকে তাকালো। এতোক্ষণ কথা বলবার চমকিত, নরম আভাগুলি তার শরীর থেকে এখনো মিলিয়ে যায়নি। বাঁ হাঁটুর উপর ডান পা'টি বিসর্পিল শিথিলতায় তুলে দিয়ে তার উপর দু'টি হাত আঙুলে-আঙুলে আবদ্ধ করে বনানীও এই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বসে ছিলো। তাদের মাঝে এতোক্ষণ ধরে যে এতো নীরবতা, এতো অতৃপ্তি, জমে উঠেছিলো এতো কথা বলেও যেন তারা বুঝতে পারেনি। তাদের মাঝে এতোক্ষণ ধরে ছিলো যে এতো আত্মীয় অন্ধকার, তা শিপ্রা আলো জ্বালিয়ে দিলে পর যেন তারা টের পেলো। সৌম্য আবার আরো কাছ থেকে যেন এবার বনানীকে দেখলে। জলের নিচে পদ্মের দীর্ঘ বৃন্তের মতো তার শরীর মদির আলস্যে যেন ভিজে আছে, দু'টি টান-করে-ধরা কঠিন বাহুতে একটা নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা, শুধু আঙুলগুলি তাদের ক্ষীণায়মান নখের দিকে একটু চঞ্চল। তার বসবার এই বঙ্কিমতা যেন ধূসর একটি শ্রান্তির সুর, বেশি জানে বলেই কেমন যেন তাকে একটু ক্লান্ত দেখায়। কিংবা কিছুই সে জানে না, তারই জন্যে কন্টক্লিষ্ট। এই ক্লান্তি, এই অলস ঔদাস্য, এই বন্য নির্লিপ্ততাই তাকে একটা ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা এনে দিয়েছে। তার শরীরের এই বিশাল বিস্তৃত শীতল নিস্তব্ধতাটা সৌম্য যেন স্পষ্ট স্পর্শ করতে পারলো, তাকে মনে হলো একটা শক্তি, একটা উপস্থিতি।

আলো জ্বলে উঠতেই সৌম্য উঠলো ছটফট করে: হ্যাঁ, দিব্যি রাত হয়ে এলো দেখছি।

বনানী তা লক্ষ্য করলে না। তার আগের কথায় ফিরে গেলো।

বললে,—আমি কিন্তু কিছুতেই মানতে পারবো না এভলন্যুশান-এর পেছনে কোনো একটা সূক্ষ্ম বা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

কথা বলতে পেয়ে সৌম্য যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো, ঘরের আলো নিয়ে এলো তার নিরাপদ, নিরাবেশ স্বাভাবিকতা। চেয়ারটা সে জানলা থেকে একটু ভিতরের দিকে টেনে আনলো; বললে,—তবে আপনি কি বলতে চান আগাগোড়া কতোগুলি জার্ম-প্ল্যাজম-এর অকারণ খেয়ালপনা? ইচ্ছে মতো তারা নিজেদের অদল-বদল করে চলেছে?

—ইচ্ছে মতো কেন হবে? সেই ক্লান্ত, ধূসর গলায় বনানী বললে,—তাদের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সমতা রেখে তারাও যাচ্ছে বদলে। যাকে আমরা এভলন্যুশান বলি, সেটা এই পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে জীবনের একটা সবল প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কী? যেমন ধরুন—

সৌম্য তার চোখের দিকে তাকালো, চোখের সেই দীর্ঘ, বিহ্বল আলস্যের দিকে।

—যেমন ধরুন ঘোড়া। ঘোড়া কেন এতো ছুটতে পারে, কারণ তার প্রতিবেশী শত্রুরা তাকে ভীষণ তাড়া করেছে। ঘোড়ার বেগ তার শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনেরই একটা প্রতিক্রিয়া। শুনেছি যে-ঘাস সে খায় তা অত্যন্ত শক্ত বলে তার দাঁতের গঠন পর্যন্ত তাকে বদলে নিতে হয়েছে। একটা বিশেষ পরিবেশ ছাড়া তো কোনো প্রাণ বাঁচতে পারে না। পরিবেশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই প্রাণও যে নতুন স্বর ধরবে।

—তা তো বুঝলুম। সৌম্য অল্প একটু হেসে বললে,—এই পৃথিবী যদি আয়তনে আরো অনেক বড়ো হতো তবে তার প্রাণীদের চেহারাও অন্য রকম দেখতে পেতুম।

—হ্যাঁ, পেতুমই তো! বনানী শুকনো, শুভ্র গলায় বললে,—তখন তার গ্র্যাভিটেশানও অনেক বেড়ে যেতো যে। ধরুন প্রাণীদের চোখ, তাদের দৃষ্টিশক্তি। দৃষ্টিশক্তিতে রঙের বোধটা অনেক পরে এসেছে, এবং তার আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো ক্যামিলিয়ান ছিলো না যে তার চারপাশের রঙের সঙ্গে মিল রেখে নিজের রঙ বদলাতে পারে আত্মরক্ষার জন্যে।

বনানীর ভঙ্গিতে যেন একটা নিরাবেগ, নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা, দু'টি ভুরুতে যেন কোনো জিজ্ঞাসা নেই, সন্দেহ নেই, তার দুই চোখে যেন অতল অকৌতূহল।

সৌম্য চঞ্চল হয়ে উঠলো: তবু এই পরিবেশ বদলানোর মধ্যেই যে কোনো ঐশ্বরিক অভিসন্ধি নেই তা আপনি কী করে বলতে পারেন?

—যদি-ই বা থাকে, তাকে আপনি ঐশ্বরিক বলতে পারেন না। কেননা, বনানী ঠোঁট দু'টি পাৎলা করে একটু হাসলো: তার মধ্যে দেখতে পাই না কোনো একটা রীতি, একটা স্থূল বিধিবদ্ধতা। তবে আপনার ঈশ্বরের কে মাপজোক করবে, বিজ্ঞান সেখানে বুদ্ধিমান।

—কেনই বা আপনি তা দেখতে পাচ্ছেন না? সৌম্য সোজা হয়ে উঠে বসলো: এ তো আপনি দেখছেন যে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে ও সঙ্ঘর্ষে যারা বাঁচছে, পৃথিবীতে কেবল তাদেরই বাঁচবার অধিকার। ক্রমশ এই বাঁচবার উপযোগিতা বাড়ানোটাই কী আপনার কাছে এভলন্যুশান-এর মূল উদ্দেশ্য বলে মনে হয় না?

বনানীর স্বরে একটুও চাঞ্চল্য এলো না : কিন্তু যারা বাঁচছে, তারা দৈবাৎ বাঁচছে, তাদের বাঁচার পেছনে রয়েছে একটা ঘটনার আকস্মিকতা। পরিবেশটা বদলে নিন, দেখবেন তার আর চিহ্নটি কোথাও পড়ে নেই।

—তাই তো হলো। সৌম্য উৎসাহিত হয়ে উঠলো : তখন আবার দেখা দেবে নতুনতরো জীব, আরো বেড়ে যাবে তার বাঁচবার উপযোগিতা। মানুষ থেকে দেখা দেবে মানুষতরো বিস্ময়।

বনানী আবার হাসলো। বললে,—তা হয়তো দেবে, কিন্তু তার পেছনে কোনো উদ্দেশ্যের প্ররোচনা থাকবে না। আমরা মানুষরা সেদিনে বৃহত্তরো না হয়ে আজকের শামুকের মতো গতিহীন, মস্তিষ্কহীনও হয়ে যেতে পারি। হয়তো বা যেতে পারি নিশ্চিহ্ন মুছে। আমরা সমর্পিত হয়ে আছি আমাদের পরিপার্শ্বের উপর। কমিয়ে আনুন সূর্যের আলো, দেখুন কী হয়।

—তার অনেক দেরি আছে। কিন্তু তার মধ্যে মানুষ কতো কী হয়ে যেতে পারে, তার ক্রমান্বিত বিপুলতরতার সম্ভাবনাকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।

—করতে চাইও না। সে-ও হবে পরিপার্শ্বেরই একটা প্রসারণের কারণ। কিন্তু তাই বলে কিছুতেই একথা মানবো না তার সেই বিপুলতরতার পিছনে আছে কোনো ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য। তাই যদি হতো, তবে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে থাকতো না মশা আর মাছি, জোঁক আর বিছে, থাকতো না এই সব রোগের ব্যাকটিরিয়া। আমরা তাহলে অনায়াসে সুন্দরতরোতে চলে যেতুম, সুস্থ থেকে সুস্থতরোতে।

শিপ্রা এই সময় পট-এ করে চা নিয়ে এলো। পিছনে গিরধারীর হাতে জল-খাবারের রেকাবি।

টেবিলের উপর কাপ সাজিয়ে তাতে চা ঢালতে-ঢালতে শিপ্রা তাদের কথা-গুলিকে ছুঁতে চেষ্টা করলো। এখন উনুনের কাছ থেকে উঠে আসছে বলে তার গায়ে ঝলসানো একটা ঝাঁজ পাওয়া যাচ্ছে, সমস্ত ভঙ্গিটা তার গাম্ভীর্যে আছে ভার হয়ে! একটিও সে কথা বললো না, অথচ তার এই চুপ-করে-কাজ-করে-যাওয়ায় যেন সেই আতিথেয়তার পুরোনো প্রশ্রয় নেই।

সৌম্য শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হেসে উঠলো : কিন্তু ঈশ্বরের লীলা আমরা কী বুঝবো?

—কিন্তু যাই বলুন, একথা ভাবতে আমি কিছুতেই তৃপ্তি পাই না যে আমি কারো কোনো একটা অজ্ঞান দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করতে পৃথিবীতে এসেছি; আমার কোনো একটা গোপন বা গভীর উদ্দেশ্য আছে। বনানীর স্বর যেন সন্ধ্যার অশরীরী একটা রেখা : আমি এরকম ভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে চাই না। আমার জীবনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, উপলব্ধি নেই, আমি আমার পরিপার্শ্বের একটা সৃষ্টি. আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি আমার সেই অন্ধ পরিবেশের হাতে, তাতেই আমি বেশি তৃপ্তি পাই। আমরা যা করি, তা আমার ভালো লাগে না, যা হয়ে উঠি, তাই আমাদের পূর্ণতা। কী আছে আমাদের প্রবৃত্তি বা প্রচেষ্টার মূল্য, আমার সবচেয়ে ভালো লাগে অলস অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে যেতে।

শিপ্রা হঠাৎ টেবিলটা অমনি অগোছাল ফেলে রেখে চলে যাবার একটা দ্রুত ভঙ্গি করলে : এই রইলো তোমাদের চা।

বনানীর যেন এতোক্ষণে হুঁস হলো। দাঁড়িয়ে উঠে বললে,—সে কী, তোমার চা কোথায়, শিপ্রা? তুমি চললে কোথায়?

শিপ্রা ফিরেও দাঁড়ালো না। যেতে-যেতে যেন নিজেকেই শুনিয়ে সে বললে, —আমার তো আর কিছু কাজ নেই। বসে-বসে গল্প করতে-করতে চা খাই!

সৌম্য চেঁচিয়ে উঠলো : বলো তোমার কী কাজ? আমি করে দেবো।

শিপ্রা তখন দরজাটা পেরিয়ে গেছে। তরল এক-পরদা হাসি দিয়েও কথাটাকে সে ঢাকবার চেষ্টা করলো না ; বললে,—আহা, উনি কতো কাজ করে একেবারে ঢেলে দিচ্ছেন। আমার এখন সন্ধ্যে দিতে হবে, আজ লক্ষ্মীবার, পাঁচালি পড়া বাকি—আমি এখন ঠাট করে পা ছড়িয়ে বসে চা খাই!

অগত্যা সৌম্যকেই সশব্দে হেসে উঠতে হলো। হেসে উঠতে হলো শিপ্রার সেই নির্লজ্জ রূঢ়তাটা ঢেকে দেবার জন্যে। প্রমাণ করবার জন্যে, তার এই উচ্ছৃঙ্খল ছেলেমানষি সে কতো উপভোগ করে।

হাসির সেই শব্দটা যেন শিপ্রার গায়ের উপর শতখান হয়ে ভেঙে পড়লো। তার উলঙ্গ তীব্রতায় তার চোখ গেলো ধাঁধিয়ে, সিঁড়িটা যেন টলছে।

শিপ্রা নিচে নেমে এলো। মাটির বাতিতে করে সন্ধ্যে দিলে। নিচে কলতলাতেই সে গা ধুলো, গেলো না উপরের বাথরুমে। তারপর ভিজা চুলে সন্ধ্যার প্রথম ধূসর তারাটির মতো বসলো তার পূজার ঘরে, লক্ষ্মীর প্রতিমার কাছে। আজ যেন সে পাঁচালিটা মুখস্ত বলতে পাচ্ছে না, বারে-বারে বইটা খুলে ধরতে হচ্ছে। আর-আর দিন সে কেমন উঁচু, সুরেলা গলায় সমস্ত ঘর মাৎ করে পাঁচালি পড়তো, আজ যেন তার গলা কেবল ধরে আসছে, পূজায় কেমন সে একটা বিশ্বাসের জোর পাচ্ছে না। তার এই পূজার পিছনে রয়েছে যেন কাদের অভিজাত নির্লিপ্ততা—সৌম্যর সেই হাসির শব্দগুলি তার চার পাশে অশুচি কতোগুলি পোকার মতো যেন কিলবিল করছে। সেই হাসিতে মিশে আছে যেন বনানীদির উদ্ধত উপহাস। শিপ্রা সমস্ত শরীরে কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়লো। আজ কিছুতেই সে ছোট্ট টাটে করে শশার দু'টি কুচি ও দু'টি বাতাসা, লক্ষ্মীর প্রসাদ বলে স্বামীর কাছে নিয়ে যেতে পারবে না। শিপ্রা অসহায়ের মতো চারদিকে চেয়ে দেখলো, অন্ধকারে নীল হয়ে আসছে আকাশ, লক্ষ্মীর পটের উপর প্রদীপের ছায়াটা কাঁপছে, তার আশে-পাশে জমে উঠছে একটি বিরল একাকীত্ব। কেন যে সে পূজো করছে, কিসের জন্যে, সব যেন একাকার হয়ে তার কাছে হঠাৎ অর্থহীন, অবাস্তব হয়ে উঠলো। মনে হলো সে নিতান্ত অযোগ্য, অধম। তার কোনো দাম নেই, জৌলুস নেই ; সে শুধু উনুন ধরাবার আগুন, দীপায়নের বহ্নিকণা নয়। এই যেন সহসা ঘোষণা হয়ে গেছে সংসারে, তার নিজের সংসারে।

ঠাকুর এসে বললে—এবেলা কী রাঁধতে দেবে, মা?

শিপ্রা উঠলো খেঁকিয়ে : তা আমি কী জানি।

—বাবু বলেছিলেন মাংস হবে।

—সে তোমার বাবুই জানে। এখানে বলতে এসেছ কেন? উপরে গিয়ে জিগগেস করো না।

ঠাকুর হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

শিপ্রা যেন হঠাৎ নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হলো। উঠলো ফণা বিস্তার করে। বললে,—না, রোজ-রোজ মাংস কী। এ কী একটা হোটেলখানা হয়ে উঠেছে নাকি? যা ভদ্রলোকে খায়, সেই সোজা ডাল-ভাতই হবে।

ঠাকুর আমতা-আমতা করে বললে,—কিন্তু বাবু বলেছিলেন কিনা।

—বাবু বললেই তো আর হবে না। শিপ্রা ধমক দিয়ে উঠলো: আমি যা বলবো তাই। তুমি চাল-ডাল ধুয়ে দু' উনুনে বসিয়ে দাও বলছি। আর মাছ যা আছে তাই দিয়ে একটু সাদা ঝোল তৈরি করবে। আর না-হয় দু'টো ভাজা। আমি দিচ্ছি কুটে। বাবাঃ, শিপ্রা ঘৃণায় চোখ দু'টো ঘোলাটে করে তুললো: ক'দিন ধরে রোজ-রোজ পেঁয়াজ-রসুন খেয়ে মুখটা একেবারে ভারি হয়ে আছে। বলে কিনা, আজো মাংস! পয়সা যেন গাছে ধরছে আজকাল!

কাটলো রাতের অনেকটা। শোয়ার ঘরে সৌম্যর সঙ্গে শিপ্রার সান্নিধ্যটা এলো এবার নির্জনতায় ঘনতরো হয়ে।

শিপ্রা যেন ঘনিয়ে আছে খানিকটা মেঘ, জোরে একটু হাওয়া দিলেই তা ঝরে পড়বে।

তার রাগে ভার-ভার ফুলো-ফুলো মুখখানার দিকে তাকিয়ে সৌম্য ভারি মজা পাচ্ছিলো। তার দিকে এগিয়ে এসে সে বললে,—তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো?

শিপ্রা বালিশে একটা অড় পরাচ্ছিলো, নিলো মুখ ফিরিয়ে। চোখের তার সে কী ছটা!

সৌম্য গেলো হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে, শিপ্রা একটা মাছের মতো ঝাপটা মেরে জাল কেটে বেরিয়ে গেলো।

সৌম্য বললে,—আমায় কিছু না বললে আমি কী করে বুঝতে পারবো?

শিপ্রা বসলো এসে সামনা-সামনি একটা চেয়ারে। বললে,—বনানী-দির জন্যে কালকেই তুমি বাড়ি দেখে দেবে কিনা বলো।

সৌম্য যেন একমুহূর্তে শুকিয়ে গেলো। ধরা গলায়, অপরাধীর মতো বললে, —কেন, কী হয়েছে?

—উনি কি এখানেই বসবাস করবেন ঠিক করেছেন নাকি?

সৌম্য ঝাপ্সা চোখে শিপ্রার দিকে চেয়ে দেখলে। মুখের সব ক'টি রেখা রিক্তমায় রুক্ষ হয়ে উঠেছে, ভঙ্গিতে একটা কর্কশ তীক্ষ্ণতা, তার বসবার ঘনতার মাঝেও তার সমস্ত শরীর যেন কেমন অসহিষ্ণু। শিপ্রার এমন একটা চেহারা সে কোনোদিন দেখেনি।

তবু সে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করলো। বললে,—উনি তো আমাকে সে-কথা আজো বলছিলেন।

—আর তুমি বুঝি অমনি গদগদ হয়ে বলে বসলে, তা কি হয়? আরো ক'দিন থাকুন।

সৌম্য জোরে হেসে উঠলো, জোর করে হেসে উঠলো। বললে,—না বলে উপায় কী? তোমার জন্যেই তো তা বলতে হলো।

—আমার জন্যে? শিপ্রা দুই চোখে যেন আগুনের একটা হলকা দিলে।

—তাছাড়া আবার কী। সৌম্য ভিতরে-ভিতরে ক্লান্ত হয়ে উঠলো: তুমিই তো তোমার দিদিটিকে এতোদিন আঁচলে করে বেঁধে রেখেছ, বাঁধন এতোটুকুও আলগা করতে চাওনি। তোমার সে কাতরতা দেখে আমাকেও বাধ্য হয়ে নরম হতে হয়েছে। বাড়ি থেকে তো কাউকে আর চলে যান বলতে পারি না।

—তা পারবে কেন?

—তা পারবে কেন মানে? তুমি পারো? সৌম্য কথাটা তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো: আমার কী, তোমারই সাধের বনানী-দি, তুমি বলো না তাঁকে চলে যেতে।

—বলা না-বলা সে আমি বুঝবো। তুমি বাড়ি ঠিক করে দেবে কিনা বলো।

সৌম্য বললে,—আমি এখন আমার কাজকর্ম ফেলে রাস্তায়-রাস্তায় বাড়ি খুঁজে বেড়াই! বিশুবাবুকে বলে দেবো'খন।

বিশুবাবু পরমেশবাবুর আশ্রিত এক কর্মচারী।

—বুঝি না? যদ্দিন দেরি হয়।

—যদ্দিন দেরি হয় মানে? সৌম্য আবার রুখে উঠলো: যাতে উনি আরো ক'টা দিন, এই ভাঙা মাসটা এখানেই থেকে যান তার জন্যে তুমিই তো গোড়ায় ব্যস্ত হয়েছিলে। কী, তাঁকে তুমি বলোনি সেকথা? বলোনি?

শিপ্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো: কে ব্যস্ত তা আর কাউকে বলে দিতে হবে না।

সৌম্যর হঠাৎ সব কথা যেন ফুরিয়ে গেলো। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে সে পাইচারি করলে। পরে হঠাৎ শিপ্রার কাছে সরে এসে - শিপ্রা তখন পাখা চালিয়ে-চালিয়ে মশারি ফেলছে—তার কাঁধটা চেপে ধরে মুখটা তেরছা ঘুরিয়ে এনে তিক্ত গলায় বললে—তুমি কী বলতে চাও?

শিপ্রা এতোক্ষণে একটু হাঁসলো। স্বামীর এই রাগটুকু তার ভারি মিঠে লাগলো। হাসিতে ঠোঁট দু'টি পিছল করে সে বললে,—কিছুই বলতে চাই না। তুমি এখন শুতে যাবে কিনা বলো।

তাকে ছেড়ে দিয়ে সৌম্য আবার দু'পা নিঃশব্দে হাঁটলো। কাছাকাছি সরে এসে আবার বললে,—আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, শিপ্রা, যাকে ধরে রাখবার জন্যে তুমি এতো প্রাণপণ করছিলে, তার ওপর তুমি বিরূপ হলে কী করে? সত্যি, তোমার সেই বনানী-দি, যার জোড়া মেয়ে নেই আর পৃথিবীতে, যাকে তুমি কিনা দেবতার মতো ভক্তি করো।

—থাক, দয়া করে আর অতো অবাক হতে হবে না। শিপ্রা আলোটা টুক করে নিবিয়ে ততোক্ষণে মশারির মধ্যে চলে গেছে। বালিশে মুখ ডুবিয়ে সে অস্পষ্ট একটু হেসে উঠলো: অতিভক্তিটা সব সময়ে ভালো নয়।

সৌম্য তখুনি শুতে যেতে পারলো না। অন্ধকারে শূন্য একটা ছায়ার মতো আরো খানিকক্ষণ ঘুরতে লাগলো।

শিপ্রা আলগোছে কখন মশারির বাইরে মুখখানা বাড়িয়ে দিয়েছে। ঘুমো-ঘুমো চোখে বললে,—কষ্ট করে অন্ধকারে আর তোমাকে বাড়ি খুঁজতে হবে না। সকাল হলে আমিই বিশুবাবুকে বলতে পারবো।

সৌম্য পিছন ফিরতে-না-ফিরতেই সে-মুখ আবার মশারির মেঘে ডুবে গেছে।

তাদের দু'জনের মধ্যে রাতের মুহূর্তগুলি যেন ফুলের পাপড়ির মতো আবার নরম হয়ে এলো। বনানীর অদৃশ্য উপস্থিতিটি যেন সেই পাপড়িগুলিতে একটি মৃদুল সৌরভ এনে দিয়েছে। সৌম্য ভাবতে চেষ্টা করল এই স্পর্শ, এই স্পন্দ, এই আনন্দের কি নতুন কোনো নাম নেই, নতুন কোনো সংজ্ঞা? না, সবই পুরোনো, অভ্যাসপ্রেরিত?

॥ আট ॥

বিশুবাবুকে দিয়ে বাড়ি ঠিক করিয়ে তবে শিপ্রা নিশ্চিন্ত। বনানী তো এক পা বাইরের দিকে বাড়িয়েই আছে কবে থেকে। যাই হোক, এবাড়িতে সুখ, সুবিধে বা সান্নিধ্য যতোই সে রাশি রাশি পাচ্ছিলো না কেন, পাচ্ছিলো না সে নিজেকে, নিজেকে নিয়ে নিজের তার সেই উচ্ছ্বসিত নির্জনতাকে, শরীরের নিরবরোধ উন্মুক্ততায়, পরিবেশের পরিতৃপ্ত বিশ্রান্তিতে। তাই সে যেন এতোদিনে একটা হাঁপ ছাড়লো।

সৌম্য জিগ্‌গেস করলে: কোথায় ঠিক করলেন, বিশুবাবু?

বিশুবাবু বললেন,—এই তো কাছেই। বেলতলায়। চলুন না দেখে-শুনে পছন্দ করে আসবেন। ভাড়া তিরিশ টাকা বলছে। মেরে-কেটে আটাশ টাকায় নামিয়ে এনেছি। আরো কিছু কমবে হয়তো।

বনানী বললে,—একেবারে আলাদা বাড়ি তো?

—একেবারে। একতলা, তিনখানা ঘর, রান্নাঘর নিয়ে। বিশুবাবু ছোট একটি ছবি এঁকে গেলেন: ভিতরের দিকে এক ফালি উঠোন। ছাতে ওঠবার ঢাকা সিঁড়ি আছে।

—ছাতে রেলিঙ নেই তো?

—না, খোলা ছাত। চলুন, পাকাপাকি কথা দেবার আগে—

—চমৎকার, খোলা ছাতই ভালো। বনানী উছলে উঠলো: না, না, এর আবার দেখবার কী আছে? কাছাকাছি বাড়ি, এমন সুন্দর আলাদা বাড়ি, এঁরা সব সময় দেখা-শোনা করতে পারবেন—না, না, আপনি এখুনি গিয়ে কথা দিয়ে আসুন। কাল ছুটি আছে, কালকেই আমি রিমুভ্ করবো। টাকা চায়, টাকাও আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। এমন বাড়ি হাতছাড়া করতে পারবো না।

শিপ্রা চোখ দু'টো একটু ঘোলাটে করে বললে,—ইস্কুলের কাছাকাছি হলেই তো ভালো হতো।

—না, না, স্কুলে তো আমি স্কুলের বাস্‌-এ করেই যেতে পারবো, এখন যেমন যাচ্ছি। সে একটা কোনো কথা নয়। বনানী হেসে ফেললো : ভাড়া যে কম, সেটাও তো দেখতে হবে।

শিপ্রা তবু যেন খুশি হতে পারলো না। বললে,—ইস্কুলের পাড়ায়-ই কি আর কম ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া যেতো না ?

—কিন্তু তা হলে তোমাদের কাছে থাকতুম কী করে? বনানী স্নিগ্ধগলায় বললে.—কাউকে চিনি না শুনি না, তোমাদের হাতের কাছে যে থাকতে পারবো সেইটেই তো আমার মস্ত লাভ।

এবার সৌম্য না বলে পারলো না, তার সহজ কর্তব্যবোধ তাকে অনবরত ঠেলা মারতে লাগলো : কিন্তু কাল, একেবারে কালকেই আপনার যাওয়া হয় কী করে ?

শিপ্রা ঝামটা মেরে উঠলো : কেন, বনানী-দি আবার পাঁজিপুঁথি দিন-ক্ষণ মানতে শিখেছেন নাকি ?

—তা নয়, সৌম্য গলাটা একটু খাঁখরে নিলে : উনি একা-একা ওখানে থাকবেন কী করে ?

—কেন, কে আবার তাঁর সঙ্গে যাবে ? শিপ্রা যেন একটা ঘাই মারলে : একা মানুষ, সঙ্গে লোক পাবেন কোথায় ?

বনানী হেসে উঠলো, হাসিতে তার সমস্ত শরীর ভিজে গেলো, যেন ভরে গেলো ছোট ছোট অগণন সাদা ফুলে।

সৌম্য ঢোঁক গিলে বললে,—তা নয়। ওঁর ঠাকুমা না আসবেন শুনেছিলুম।

—তা আসবেন না হয় ক'দিন বাদে। বনানী বললে,-আমি আজই চিঠি লিখে দেবো।

—উনি এলেই না-হয় যাবেন। সৌম্য তবু আপত্তি করলে : নইলে একা-একা থাকবেন কী করে ?

—কেন, ভয়টা কিসের ? বনানী উজ্জ্বল দুই চোখ তুলে বললে,—ঠাকুমা এলেই বা আমি কী নিরাপদ হবো ? তিনি তো কলকাতায় আসছেন শুধু গঙ্গার পাড়ে মরবেন বলে।

—হ্যাঁ, চিরকাল একা থেকে এলেন, শিপ্রা চোখের কোণটা একটু বাঁকা করে বললে, আজ যতো ওঁর জন্যে ভাবনা।

তবু সৌম্য আশ্বস্ত হলো না। বললে,—অন্তত একটা জানাশোনা ঝি সঙ্গে আনা উচিত ছিলো।

—কেন, ঝি তো কবেই ঠিক করেছি একটা। তপ্ত লোহার উপর এক বিন্দু জলের মতো শিপ্রা ছাঁৎ করে উঠলো : সে তো কাজে যাবে বলে কবে থেকে বসে আছে। দিন রাতের ঝি! রাঁধতে পর্যন্ত পারে। ন' টাকা মোটে মাইনে।

—না, না, আমার জন্যে কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে। বনানী যেন একটু ঠাট্টার সুরেই বললে—আমিই আমার নিজের যথেষ্ট সঙ্গী, যথেষ্ট অভিভাবক। তারপর শিপ্রাকে একটু কাছে টেনে এনে : আজই চলো শিপ্রা, আমরা ঘর-দোর

সব গুছিয়ে ফেলি। মাঝখানে একবার শহরে বেরিয়ে কিছু জিনিসপত্র কিনে ফেলতে হবে।

শিপ্রা ভারিক্কি চালে বললে,—সেজন্যে তোমার কিছু ভাবতে হবে না, তুমি শুধু একটা ফর্দ করে ফেল, বিশুবাবুকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ছোটখাটো জিনিস আমি চালিয়ে দিতে পারবো এখান থেকে।

বনানী এবার সৌম্যকে লক্ষ্য করলে : কিন্তু কিছু ফার্নিচারও যে লাগবে।

সৌম্যর কিছু বলবার আগে শিপ্রা তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে একটা হেঁচকা টান মারলে : সব জিনিস তোমাকে আর এক দিনেই কিনতে হবে না। এখন যা তোমার টেবুল-চেয়ার লাগে এখান থেকে নিয়ে যাও। পরে দরকার বুঝে আস্তে আস্তে কিনে নিয়ো। একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা ঝপাস করে বার করে ফেলো না।

বনানী তার গিন্নিপনাতে সুড়সুড়ি দিয়েছে, আর শিপ্রাকে কে পায় ?

ঘর-দোর সাজিয়ে, রান্নাঘরে উনুন পেতে, টুকি-টাকিটি পর্যন্ত গুছিয়ে সে দুই হাতে সব ফিটফাট করে দিয়ে এলো। ঝাঁটার কাঠিটি থেকে শুরু করে শিল-নোড়া, ঘুঁটে খাইবার ধামাটা পর্যন্ত। নিজ হাতে সে উনুন পাতলে, নিজ হাতে ইঁট পেতে তৈরি করে দিলে তক্তপোষ। ঝিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে আগেই সে সজুত করে রেখেছে। বললে,—রান্নাটা কি ওকে দিয়েই করাবে নাকি ?

—পাগল ! বনানী হেসে বললে,—সবই যদি ও করবে, তবে আমার জন্যে কী রইলো ?

শিপ্রা চোখ-মুখ ঘোরালো করে বললে—ইস্কুলে যাবার সময় তোমার এই ঘরটায় অন্তত তালা দিয়ে যেয়ো। শত বিশ্বাসী লোককেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায় না। এই নাও, এটা খুব মজবুত তালা, চাবির আবার নানারকম কায়দা আছে। দেখে রাখো।

বানানী দেখতে-দেখতে বললে,—বা, তা বন্ধ করে যাবো বৈ কি। আমার কোনো কিছুতেই কিছু ভয় নেই, শিপ্রা। তোমরা এতো কাছে আছো—

—বা, আমি তো দু' তিনদিনের মধ্যেই বাপের বাড়ি চলে যাবো। শিপ্রার দুই চোখ ভয়ে ও খুশিতে ছলছল করে উঠলো : কাকাবাবু নিতে আসছেন চিঠি পেলুম।

—তবু, আবার তো ফিরবে।

—হ্যাঁ, কয়েকমাস দেরি হবে বৈ কি। মা আবার কতোদিনে ছেড়ে দেন—

শিপ্রার ইচ্ছা ছিলো এ নিয়ে আরো খানিকক্ষণ কথা হয়। তার শরীরের উপর একথাগুলির আদ্র', গাঢ় উষ্ণতা সে অনুভব করে। এই সব কথা বলতে-বলতে সে গভীর, বিহুল, সুরভিত হয়ে ওঠে। এই কথার জাল ঠেলে সে চলে আসে তার স্বামীর ভালোবাসার প্রান্তরে, তার ঐশ্বর্যের প্রচুরতায়। কিংবা, বনানী তাকে দুয়েকটা খেলো, মেয়েলী ঠাট্টা করুক, তাতে চিহ্নিত হয়ে উঠুক তার এই বিস্ময়কর অভুতপূর্বতা, তার শরীরময় প্রেমের এই প্রবল সমারোহ। কিন্তু বনানী তার ধার দিয়েও ঘেঁষলো না। শিপ্রা থাকলেও তার কিছু আসে না, চলে গেলেও যায় না তার এক তিল। আর, কেন যে যাবে, কেন যে অনেকদিন

আসতে পারবে না, সব যেন বনানীর কাছে পড়া একটা বইয়ের মতো জানা, তাতে তার একবিন্দু রোমাঞ্চ নেই, কৌতূহল নেই। পরের সুখে সুখী হওয়ার মধ্যে মানুষের মনে প্রচ্ছন্ন যে একটু ঈর্ষা থাকে, তুতোটুকু ঈর্ষা পর্যন্ত তার নেই। শিপ্রা যেন কঠিন একটা অপমান বোধ করলো।

ঘরের বাইরে চলে এসে বনানী বললে,—হলো তো এখানকার গোছগাছ, এবার বাড়ি চলো।

শিপ্রা শুকনো, যেন অসহায় মুখে হাসলো : বা, এই তো তোমার বাড়ি।

—কাল থেকে। আজ রাত পর্যন্ত আমি তোমাদের অতিথি।

পুইয়ে গেলো সে-রাত। এলো এবার বিদায়ের লগ্ন।

সৌম্য শিপ্রাকে বললে,—এ কী, তুমিও যাচ্ছো নাকি?

সদ্য-ঘুম-ভাঙা ছোট একটা ভোরবেলার পাখির মতো শিপ্রা তরল গলায় হেসে উঠলো : বা, আমি যাবো কোথায়? আমি শুধু ওঁকে রেখে দিয়ে আসবো। দুয়েকটা খুচরো কাজ যদি কোথাও বাকি থাকে—

বনানীর পরনের শাড়িটা সাদা, আগুনের মতো সাদা। এতো সুন্দর, যেন জ্বলছে। খানিক আগে মুখ ধুয়েছে বলে কপালের কাছের আঁকাবাঁকা চুল ক'টি ভেজা, দু'টি চোখে নতুন ভোরের আর্দ্র একটু আলস্য। দাঁড়াবার সমস্তটা ভঙ্গি স্তব্ধতায় কঠিন, সংহত—তার এই ক্ষণিক থেমে-থাকাটি যেন দীর্ঘ একটা সুর।

এক মুহূর্ত সৌম্যর মনে হলো বনানীকে যেন সে ছুঁতে পারে। ছুঁতে পারে সেই আগুনের শুভ্রতাকে। আর যদি একবার ছুঁতে পারে তার নবজন্ম হয়ে যায়। মুহূর্তে সে হয়ে ওঠে দুর্বোধ-দুর্দম। বীর-বিজয়ী।

বনানী সৌম্যর দিকে এক পা এগিয়ে এলো; বললে,—আপনি তো একদিনো আমার বাড়িটা দেখতে গেলেন না।

শিপ্রা ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে বললে,—পুরুষমানুষ ঘরকন্নার বিলি-ব্যবস্থা কী বুঝবে?

বনানী বললে,—এবার থেকে যাবেন মাঝে-মাঝে। আমি কিন্তু ভারি একা থাকবো।

শিপ্রার সমস্ত শরীর জ্বালা করে উঠলো : আর একা কোথায়? তোমার ঠাকুমাকে তো টেলিই করে দিলে কাল। টেলি পেয়ে আর তিনি দেরি করবেন ভেবেছ নাকি?

সৌম্য কথাটার পাশ কাটিয়ে গেলো। বনানীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে,—আমার কাজ দেখছেন তো, আপিস থেকে আসতেই রাত হয়ে যায়। যদি সময় পাই—

—হ্যাঁ, যাবেন সময় পেলে। বনানী সৌজন্যে অবারিত হয়ে উঠলো : এখান থেকে কতোটুকুন বা রাস্তা, হেঁটে গেলে বড়ো জোর দশ-বারো মিনিট। যাবেন। এবার আমার বাড়ি, নেমন্তন্ন করে রাখছি আগে থেকে।

শিপ্রা অস্থির হয়ে উঠলো : এবার চলো, বনানী-দি, বিশুবাবু সেই কখন থেকে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বনানী হেসে উঠলো : এইটুকুর জন্যে আবার গাড়ি কেন ? তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি, শিপ্রা ।

—বাড়াবাড়ি আমার না আরো কিছু । গাড়ির মাথায় টেবুল চেয়ারগুলো যাবে না ? শিপ্রা অতি কষ্টে একটু হাসলো : নইলে ভদ্রলোকেরা গেলে তাদের বসাবে কোথায় ? চলো চলো, আমার আবার নিজের কাজকর্ম সব পড়ে আছে ।

বনানীকে তার বাড়িতে বন্ধ করে রেখে তবে শিপ্রা নিশ্বাসের হাওয়া পেলো । চুপি-চুপি উঠে এলো উপরে, উঁকি মেরে একবার দেখতে সৌম্য এখন কী করছে । আয়নাটা কাৎ করে ড্রেসিং টেবুলের সামনে বসে সৌম্য তার দৈনিক দাড়ি কামাচ্ছিলো, আয়নাতে পলায়মান একটা ছায়া পড়লো । সে কোনো কথা বললো না ; কখন, কোন সময় কথা বলতে হয়, স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের ছোট-ছোট কৌশলগুলি সে এর মধ্যে বেশ শিখে নিয়েছে ।

শিপ্রাই কথা বললো । আয়নায় স্বামীর এই নির্লিপ্ততায় নিষ্ঠুর মুখ কেন যেন হঠাৎ তার ভারি ভালো লেগে গেলো, কেমন পুরুষের মতো মুখ । চুপি-চুপি শিপ্রার ছায়াটা আয়নায় দীর্ঘতরো হয়ে এলো । সৌম্যর গা ঘেঁষে অথচ তার ছোঁয়ার থেকে আত্মরক্ষা করে অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে তার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে বললে,—বনবাসে রেখে এলুম ।

—তা বেশ করেছ । সৌম্য সেই নির্লিপ্ত মুখে ঘুরে দাঁড়ালো : আমার কিন্তু আজ আপিস আছে ।

—জানি গো জানি । তা আর আমাকে বলে দিতে হবে না ! তাই আমি থাক-যাক করে ছুটে এসেছি । আমি তো ভেবেছিলুম, শিপ্রা ঠোঁট টিপে একটু হাসলো : আপিস বুঝি তুমি আজ আর যাবে না ।

—আপিস যাবো না মানে ?

—মানে, মানে এই আর কী ! শিপ্রা দরজার কাছে পালিয়ে গেলো : সব দিন কি আর মানুষের মন ভালো থাকে ?

সৌম্য তেমনি খোদাই-করা নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে রইলো । সোজাসুজি প্রতিবাদ করতে পর্যন্ত সে সাহস পেলো না, শাসন তো দূরের কথা । সৌম্য এসব গেরস্তালিতে পুরোদস্তুর রপ্ত হয়ে উঠেছে । ওসব নিয়ে কথা বলতে যাওয়া মানেই ঘুমন্ত আগুনে কাঠির খোঁচা মারা । সে-আগুন ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে আপনিই আবার নিবে যাবে । শিপ্রা হাতের কাছে সস্তা একটা খেলনা পেয়েছে, আপনিই সে এক সময় ক্লান্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তাতে মুচড়ে-মুচড়ে আবার দম দিতে গেলে ফল দাঁড়াবে উলটো । যা আপনিই থামতো, তাকেই মিছিমিছি খেপিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু লাভ হতো না । নীরবতাটা একটা খুব দুর্ধর্ষ অস্ত্র, বিশেষতো স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বে ; যার যতো বেশি কথা, তার ততো বেশি হার । লাগুক এসে যতো খুশি বাণ, স্তব্ধতার ঢালে লেগে তা আপনিই যাবে ভোঁতা হয়ে । সৌম্য এসব ফাঁক-ফন্দি বুঝে নিয়েছে, শক্ত একটা নিঃশব্দতার খোলে সে তাই আঁট হয়ে বসে রইলো । কতোক্ষণ পর শিপ্রা তার স্বাভাবিকতার স্রোতে নেমে এলেই সৌম্য আস্তে-আস্তে আত্মোন্মোচন করবে । তার আগে নয় । তাদের সময় কিছু আর আজকেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না ।

সমস্ত দিন কেটে গেলো আপিসে, বিস্মৃতির নিস্তরঙ্গতায়। সৌম্য যখন বাড়ি ফিরলো তখন ঘর-দোরের আনাচে-কানাচে একটু একটু করে অন্ধকার জমে উঠেছে। নিচেটা খালি, কোথাও এতোটুকু শব্দের দাগ নেই। আবহাওয়াটা কেমন ভার, স্যাঁতসেঁতে। সৌম্যর লুকিয়ে-লুকিয়ে ভয় করতে লাগলো।

শোবার ঘরে সৌম্য আপিসের কাপড় ছাড়ছে, শিপ্রা হঠাৎ কোত্থেকে টলতে-টলতে ছুটে এলো। তার এমন একটা অদ্ভুত চেহারা সৌম্য যেন কোনোদিন লক্ষ্য করেনি. তার মুখে-চোখে. এই তার আবির্ভাবের প্রবলতায় একটা চমকিত, ধারালো বিশীর্ণতা। সে যেন এতোক্ষণ প্রতীক্ষা করে ছিলো না, উদ্যত থাবায় ওৎ পেতে ছিলো।

—ফিরতে আজ এতো দেরি হলো কেন? একদিনো বুঝি তর সইলো না। আজই একেবারে নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছিলে বুঝি?

সৌম্য একেবারে আকাশ থেকে পড়লো : কোথায় আবার নেমন্তন্ন?

—ও! সেকথাও আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে।

মনে-মনে বিরক্ত হলেও সৌম্য মুখে হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে,—তুমি কি দিন-দিন পাগল হচ্ছ নাকি, শিপ্রা? কী ছেলেমানষি যে করো তার ঠিক নেই। তোমার এখন দস্তুরমতো বয়েস বাড়ছে।

স্বরের প্রচ্ছন্ন আন্তরিকতায় শিপ্রা যেন মুহূর্তে আবার গলে গেলো। বললে,—সত্যি যাও নি?

পেন্টালুনের ক্রিজটা ঠিক করে রাখতে-রাখতে সৌম্য বললে,—কোথায় যাবো? দেখছ সারাদিন খেটে-খুটে আপিস থেকে ফিরছি।

—কিন্তু একবার গেলেও তো পারতে। শিপ্রা চোখ দুটো একটু নাচালে : যাওয়া তো তোমার উচিতও। এতো কাছে আছো—বলতে গেলে আমরাই তো ওঁর ভরসা।

—কিন্তু আমার যাবার কী হয়েছে? সৌম্য ইজিচেয়ারে বসে পড়লো।

—বা. অতো করে নেমন্তন্ন করে গেলেন যে।

—তোমাকেও তো করেছে।

—কক্খনো না। শিপ্রা কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে মুখিয়ে উঠলো : আমাকে কক্খনো নেমন্তন্ন করেননি। আমি কে, আমাকে কেন নেমন্তন্ন করতে যাবেন?

—সত্যিই তো, তোমাকে নেমন্তন্ন করবার কী দরকার?. তুমি তার এতকালের বন্ধু. তোমার বেলায় এসব লৌকিকতার কোনো দাম নেই।

—নিশ্চয়। তা তো আমিও বলছি। শিপ্রার দুই চোখ দুষ্টুমিতে টলমল করে উঠলো : নতুন বন্ধুকেই তো লোকে বেশি খাতির করে।

—যাও, আর বাজে বোকো না। সৌম্য কিছুতেই আর নিজেকে মুছে ফেলতে পারলো না : বড্ড ফাজিল হচ্ছ দিন-দিন। যাও, শিগ্গির চা নিয়ে এসো। খিদেয় বলে আমি মরে যাচ্ছি।

শিপ্রা হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেলো। চা আর জলখাবারের প্লেটটা নামিয়ে রেখে দু' দন্ড যে সে সৌম্যর কাছে বসবে তার জো নেই। আবার তক্ষুণি পাঁউরুটিওলা এসেছে গেলো হপ্তার দাম নিতে।

এবার শিপ্রা যখন উঠে এলো, একেবারে গা ধুয়ে, গা থেকে ধুয়ে ফেলে রান্নাঘরের সেই ধোঁয়াটে আবহাওয়া। ফর্সা শাড়িটিতে যেন মেখে নিয়ে এলো নিভৃত অন্ধকারের নরম উষ্ণতা, পর্দা সরিয়ে তার ঘরে ঢোকাটি একটি অস্ফুট তারার ধূসর উদয়ের মতো।

শিপ্রা এসে দেখলে সৌম্য তেমনি ইজিচেয়ারে শুয়ে সকাল-বেলাকার মিউনো খবরের কাগজ পড়ছে, তার এলানো ভঙ্গিতে ঘনিয়ে আছে একটি কিছু-না-করার করুণ অলসতা।

শিপ্রার জিভটা আবার একটু চুলকে উঠলো। শূন্য বাসনগুলি টেবুলের নিচে নামিয়ে রাখতে-রাখতে চোখটা ইশারায় একটু ধারালো করে বললে,—কী, গেলে না এখনো?

সব-কিছুরই একটা সীমা আছে। সৌম্য এবার আর নিজেকে বশে রাখতে পারলো না। তেতে উঠলো: কোথায় যাবো? দেখ শিপ্রা, এ ভালো হচ্ছে না কিন্তু। তুমি ডিসেন্সির সীমা পেরিয়ে যাচ্ছ। এ কী অন্যায় কথা!

—বা রে, শিপ্রা ঝিরঝির-করে বওয়া ঝর্ণার জলের মতো হেসে উঠলো: তুমি তোমার আড্ডায় যাবে না? রোজই তো তুমি সেখানে যাও, অবিশ্যি মাঝের এ ক'টা দিন ছাড়া। আমার জন্যে বাড়িতে আবার কবে বসে থাকো?

—না, আজ আমি বাড়িতেই বসে থাকবো। বলতে-বলতে সৌম্য হাত বাড়িয়ে শিপ্রাকে কাছে টেনে এনে ইজিচেয়ারে তার পাশে বসিয়ে দিলো, পাশ বলতে যতোটুকু বোঝায়।

সৌম্য অন্ধকারের সেই ক'টি নতুন, রঙিন মুহূর্তকে হাতের মুঠো ভরে-ভরে কুড়িয়ে নিতে লাগলো। ঢেলে দিলো তার আদরের বৃষ্টি, উড়িয়ে দিলো তার এলো-মেলো কথার ব্যাকুলতা। শিপ্রার কোনো কথারই সে আজ পাশ কাটাতে পারলো না, বরং ইচ্ছে করে গায়ে মাখতে লাগলো, তার সাংসারিক সব ছোট-খাটো কথা, মুদির দোকানের পাওনাটা এ-মাসে কিছু ভারি হয়েছে, কেন ভারি হয়েছে তা আর বলতে হবে না, যে-ছোকরাটা তাদের তেল দেয় সে অনায়াসে গেলো দু'মাস ধরে চেপে গেছে তেলের দর নেমে যাবার খবর, ওটাকে দিতে হবে ছাড়িয়ে; আর কয়লাওলা যখন কয়লা মেপে দিয়ে যায়, তখন, এমন পাজি, বোরাগুলির ওজন বাবদ কিছু বেশি দিতে যায় ভুলে, এবার থেকে মাপার সময় ওর সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ওদের দু'জনের মধ্যে ছোট সংসারটি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, ঘরের দেয়ালগুলো কাছে সরে আসতে-আসতে তাদের পরস্পরের পরিপূর্ণ লুপ্ততার মধ্যে দু'জনকে ঘিরে ধরলো। তারপর কাকাবাবু শিগ্‌গিরই আসছেন তাকে নিয়ে যেতে—শিপ্রার অবিশ্যি তাতে ভয় নেই, সে মার কাছে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তার ভয়েরই বা কী, সৌম্য তার জন্যে গরম কাপড়-চোপড়ের দানবিক একটা অর্ডার ছাড়িয়ে এনেছে, তার হাতবাক্সের খোপগুলি ভরে দিয়েছে টাকার ঢিবিতে। দরকার হলে আরো পাঠাবে টাকা, ছুটি পেলেই সে ছুটে গিয়ে দেখে আসবে তাকে। না, কোথাও কিছু তার ভয় নেই, স্বামীর আঙুলগুলি মাখন দিয়ে তৈরি, গলে-গলে পড়ছে আদরের অনর্গলতা। তবে মাঝে-মাঝে তার এ-বাড়ির জন্যে মন পুড়বে, উনুনের

কোণটুকুর জন্যে। সে না থাকলে সৌম্যর না-জানি কতো অসুবিধে হবে, কে-বা রান্নাবান্নার তদারক করবে, কে-বা মুখের পাতা পড়া মাত্র তৈরি করে আনবে চায়ের ঘটি। তা, অসুবিধে তো একটু হবেই, প্রতিটি অতৃপ্তিতে স্বাদময় হয়ে উঠবে তার শিপ্রার বিরহ, প্রতিটি ফাঁকে ভরে থাকবে তার শিপ্রার উত্তাপ। শিপ্রাকে সে অখণ্ডিত একটি উপস্থিতির মতো তার সমস্ত সত্তার উপর উৎসারিত করে দেবে। তা তো দেবে, কিন্তু ফিরে এসে ঘরদোরের কী না-জানি সে হাল দেখে, কোথায় চেয়ার-টেবলগুলো ছড়ানো-ছিটানো, কাপড়-চোপড়গুলো টাল করে ফেলা, কড়িকাঠে ঝুলছে ঝুল, চড়ুই পাখিগুলো খড়কুটো বিছিয়ে কিছু আর রাখেনি। আর শোনো, মাসিক-পত্রগুলি এলেই যেন তার ঠিকানা কেটে পাঠিয়ে দেয়া হয়, আর যদি সে কিছু নতুন বই কেনে বাঙলা। হ্যাঁ, সত্যি-সত্যি যেন কেনে, হপ্তায় অন্তত একখানা করে বই, একটা বই শেষ করতে বড়ো জোর তার দুটো দুপুর। আর, দিব্যি এখন রাতগুলো হিমে ধারালো হয়ে এসেছে, বাইরে যেন বেশিক্ষণ আড্ডা না দেয়া হয়, ছাদে উঠে শহরের আকাশ নিয়ে কবিত্ব করাটা অন্তত শীতকালের জন্যে বন্ধ থাক। হয়েছে, তার জন্যে সৌম্যকে ভাবতে হবে না, সে তার শরীরের অবস্থা ও তার দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক অধ্যাপিত হয়েছে। আর, আসল কথাই এখনো বলা হয়নি, বই হোক না-হোক, হপ্তায় অন্তত, খুব কম করে, নিদেন পক্ষে, দু'খানা করে চিঠি—খুব বড়ো চিঠি, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সমস্ত কিছু খবর, যা ঘটেনি—ঠিক দীর্ঘ, মধুর একটা উপন্যাসের মতো চিঠি। গিরধারীকে সব সময় যেন দাবিয়ে রাখা হয়—চুরি করে এক ফাঁকে ওর মেদিনীপুরী মেটে ঘর না পাকা দালানে ফাঁপিয়ে তোলে তো কী বলেছি! চাকর-বাকরের উপর একটু কড়া চোখ রাখতে হয়, তা যা-ই হোক, উপায়ান্তর যখন কিছু নেই, অন্তত তিনবার যেন সে উপরে-নিচে ঝাঁট দেয়, জিনিসপত্রগুলিকে একটু ভদ্রলোকের মতো ফিটফাট করে রাখে। তা, থাক না সব জিনিসপত্র এলোমেলো, ছত্রখান হয়ে, সব ধুলোয় পড়ে থেকে শিপ্রার দু'টি হাতের সস্নেহ নির্মল্যতার জন্যে ধ্যান করবে, ঘরের দেয়ালগুলো কান পেতে থাকবে শিপ্রার পায়ের শব্দ শুনবে বলে, হাওয়ায় বাজবে শিপ্রার ফিরে-আসার প্রতীক্ষা। আর সত্যি সে যখন একদিন ফিরে আসবে, গুনে দেখলে, ক'টি বা আর দিন, শিপ্রা আর একা ফিরে আসবে না,—ভাবতে দুজনের শরীর সেই মহান ভবিতব্যতার রোমাঞ্চে শিহরিত হতে লাগলো।

কিন্তু শিপ্রা কি নতুন হয়ে আসবে? না, হবে আরো অপরিচিত, আরো বিগতস্বাদ? সে কি আসবে নববসন্তের সঞ্জীবনী নিয়ে না সেই স্বয়ংক্রিয় প্রাত্যহিকতা?

দুদিন পরেই কাকাবাবু এসে হাজির হলেন, জমাট পেশীতে ছোট্ট মানুষটি। শিপ্রা পরদিন সকালেই যাবার জন্যে বায়না ধরলো, বাঁধা-ছাদা তার কতোদিন আগে থাকতেই তৈরি। সৌম্য অবিশ্যি রাজী হলো না, তাকে আরো একটা রাত্তির বেশি ধরে রাখলো। শহরে কাকাবাবুরও কিঞ্চিৎ দরকার।

শেষের রাত্রে,—রাত থাকতে-থাকতেই শিপ্রাকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে তৈরি

হতে হবে—শিপ্রা সৌম্যর বুকের কাছে মুখ এনে ভয়ে-ভয়ে অথচ গাঢ়, জড়ানো গলায় বললে,—একটা কথা আমাকে তুমি সত্যি বলবে? সত্যি?

সৌম্য তার ঘুমহারা করুণ দু'টি চোখের দিকে চেয়ে বললে,—কি?

—সত্যি আমাকে তুমি ভালোবাসো?

সৌম্য জোরে হেসে উঠলো। বললে,—তুমি দেখি তার মতো করলে, শিপ্রা। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কে জিগ্‌গেস করছ।

—না, সত্যি বলো।

—তোমার কী মনে হয়?

—আমার মনে হওয়া দিয়ে কোনো কথা নয়, তুমি বলো।

—বা রে, তুমি নিজে যদি কিছু বুঝতে না পারলে, তবে আমার মুখের কথা শুনে কী হবে?

—না, আমি মুখের কথাই চাই। বলো, ভালোবাসো?

—সৌম্য তাকে আরো কাছে টেনে আনলো। দীর্ঘ একটা সুর করে বললে, —হ্যাঁ।

শিপ্রা খিলখিল করে হেসে উঠলো: কী হ্যাঁ?

—ভালোবাসি। বাবাঃ, তুমি উকিল হলে না কেন, শিপ্রা?

—খুব?

—ভীষণ। মুখের কথা দিয়ে তা শেষ করা যায় না। মুখের কথায় তা বড়ো বিচ্ছিরি, খেলো শোনায়।

—আচ্ছা, তাই যদি হয়, শিপ্রার গলা এবার গম্ভীর হয়ে এলো: আমার একটা কথা রাখবে?

—তোমার কোন কথাটা রাখিনি বলো? সেই সেদিন চাইলে একটা ক্যাশ-মিয়ারের শাড়ি, তক্ষুণি—

—অতোশতো বুঝি না। বলো, রাখবে কি-না।

—চেষ্টা করে দেখবো।

—সেটা এমন কিছু তোমার চেষ্টা করে করবার নয়। ভীষণ সোজা কাজ। তোমার এক পা কোথাও যেতে হবে না, এক পয়সা খরচ হবে না, যেমনি আছো তেমনি থাকবে।

সৌম্য বললে,—রাখবো।

—তবে আমার গা ছুঁয়ে বলো।

সৌম্য হেসে উঠলো: আবার কী করে ছুঁতে হবে?

শিপ্রার মুখে কথাটা আর কিছুতেই ফুটতে চায় না।

সৌম্য বললে,—বলো, কী কথা? চুপ করে গেলে কেন?

শিপ্রা যেন হঠাৎ অন্ধকারে মুছে গেলো। এবার যে কথা কইলো সে যেন এ হাসিতে-কথায় উজ্জ্বল, রুপোলি শিপ্রা নয়, তার অন্তরের গুহাশায়ী কঙ্কালান্বিত একটা প্রেত। সেই বিষাক্ত বিভীষিকা যেন শিপ্রা নিজেও সহ্য করতে পারছে না। লজ্জায় বাহুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে যেন বহু দূরে থেকে বললে,—বলো, তাহলে তুমি ওবাড়ি কোনোদিন যাবে না।

—কোন বাড়ি ?

—আহা, জানেন না যেন কোন বাড়ি ! শিপ্রা এর মধ্যেও হাসলো, মৃত, বিবর্ণ হাসি : বনানী-দির বাড়ি। যার সঙ্গে তোমার একদিন বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিলো।

সৌম্য তার পায়ের নখ পর্যন্ত বিমর্ষ হয়ে উঠলো। নিশ্বাসের জন্যে বাতাস নিয়ে সে বললে,—না, ওবাড়ি যাবার আমার কী দরকার ?

—তুমি তো সব জিনিস আর দরকার মনেই করো না !

—তা, সৌম্য অতি কষ্টে যেন একটা ঢোক গিললে : তা, ওবাড়িতে গেলেই বা দোষ কী ?

সেই প্রেতায়িত বিশীর্ণ হাসিতে শিপ্রা সমস্ত শূন্য টুকরো-টুকরো করে দিলো : দোষ-টোষ আমি কিছু বুঝি না। তুমি আমার গা ছুঁয়ে একবার কথা দিয়েছ, জানো তো সেই কথা না রাখলে কী হয় ? কেমন মজা, ফাঁকতালে কেমন একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলুম।

সৌম্য কোনো কথা বললো না। চোখ বুজে ভোরের জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

প্রতীক্ষা করতে লাগলো পুরাতন প্রভাতের পর কোন এক অপরিচিত রাত্রির।

॥ নয় ॥

বনানী খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠলো, খুব ভোরে, গ্যাসগুলি সবে নিবেছে, রাস্তায় দিচ্ছে জল। কী সুন্দর, নিটোল ঘুম হয়েছে তার কাল রাত্রে, তার নিঃসঙ্গতায় উত্তপ্ত, অব্যাহত অন্ধকারে, এই তার ঘরের নিবিড়, নতুন ঘনতায়। তার শরীরের বৃন্তে কালকের ঘুম যেন অন্ধকারের একটা আরক্ত, বন্য, উগ্র ফুল হয়ে ছিলো ফুটে, তার গন্ধ এখনো গায়ে লেগে আছে। বনানী খটাখট জানলাগুলো খুলে ফেলতে লাগলো, আঃ, কী চমৎকার ঠান্ডা পড়েছে ! জলের সে এখনো ভালো বন্দোবস্ত করে উঠতে পারেনি, নইলে, এখন সে স্নান করতো, মৃত্যুর মতো ঠান্ডা, অসহ্য জলে। মুখ ধুয়ে গায়ে নিজের হাতে বোনা ছোট একটা স্কার্ফ জড়িয়ে সে জানলায় এসে বসলো। ধারালো হাওয়া দিয়েছে উত্তুরে, লিকলিকে চাবুকের মতো মুখের উপর বাড়ি খেয়ে পড়ছে, এতো তীব্র যে সমস্ত গা পেতে তার আদর নিতে লোভ হয়। মোটা বুনটের শক্ত একটা চাদরের মতো কুয়াসা তাকে, তার সমস্ত পৃথিবীকে, ঘিরে ধরেছে এক অনির্ণীত অপরিচয়ের শুভ্রতায়। কোথাও কিছু চেনা যাচ্ছে না, ছোঁয়া যাচ্ছে না, নেই কোথাও একটি শব্দ, একটি আভাস, সে আর তার এই পৃথিবীকে নিয়ে বিরাজ করছে একটি অনাহত সম্পূর্ণতা। তার বাইরে, তার মনোহীন জীবনের এই একমাত্র কায়িক চেতনার বাইরে, যেন কোথাও আর কিছু নেই। মানুষ যেন অবান্তর, অবাস্তব তার যতো সব

কর্মচাঞ্চল্য, অতৃপ্ত, অসুস্থ, অর্থহীন। বনানী কুয়াসায় বুক ভরে নিতে লাগলো : তার অস্পষ্টতায়, মনে হতে লাগলো, সে-ও যেন শরীর থেকে আস্তে-আস্তে মুছে যাচ্ছে। মানুষের সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও যেন কোথাও নেই, না থাকলেও কিছু ক্ষতি নেই পৃথিবীর, তার তখনো থাকবে এই আচ্ছন্ন, অস্পষ্ট ভোরবেলাটি।

পরদাটা পাৎলা হয়ে আসছে, দেখা যাচ্ছে গাছের ঝিমানো মাথাগুলি, বন্ধ বাড়ির রহস্যময় ধূসরতা। অস্পষ্ট স্মৃতির মতো বিষণ্ণ এই ভোরবেলা, যেন বহু মানুষের শিশুকাল দিয়ে তৈরি। বনানী সেই ভোরবেলার নির্মলতায় ভিজে উঠতে লাগলো। দূরে-দূরে শোনা যাচ্ছে মোটরের ধাবমান শব্দ, দুয়েকটা করে দোকানের উঠছে ঝাঁপ, কাগজ-ফিরিয়ালাদের সাইকেলের বাজছে ঘণ্টা। কলকাতা চোখ চেয়েছে, আলস্য ভাঙছে। ধামায় করে বেপারিরা আনাজ নিয়ে চলেছে বাজারের দিকে, কলে নতুন জল এসে গেছে, গয়লারা বেরিয়েছে দুধের টিন নিয়ে। জাগছে কলকাতা, বিশাল একটা কুণ্ডলীকৃত অজগর। বাড়ির একেকটা গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে কয়লার ধোঁয়া, ঠেলাগাড়ি করে চলেছে ছাপ-মারা ছোলা মাংস, ট্যাক্সি করে এই যেন কারা নতুন কলকাতায় এলো। টুকরো-টুকরো করে ছিটিয়ে পড়ছে কাটা-কাটা শব্দ, বিরাট একটা ঐক্যতানের আগে যেন সুর ভাঁজা হচ্ছে। এই সব শব্দ ও শান্তি, বিস্মৃতি ও প্রতীক্ষা, সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে উঠে আসছে সূর্য, কলকাতার পক্ষেও সেও সমান সূর্য, রক্তিমায় উদ্ভাসিত, নতুন জন্মলাভে বীর্যবান, নিজের সত্যের নিষ্ঠুরতায় আনগ্ন-আগ্নেয়। কোন একটা উদ্ধত বাড়ির আড়ালে সে এতোক্ষণ অপেক্ষা করে ছিলো, পৃথিবীটা আর একটু সরে যেতেই, হঠাৎ সে অনাবরণ অজস্রতায় বনানীর শরীরের উপর উৎসারিত হয়ে পড়লো, চোখে মুখে চুলে আঁচলে। বনানী উঠলো জলের মতো কল্লোলিত হয়ে। নতুন রোদের গন্ধে তার সমস্ত শরীরে নেশা ধরে গেলো। ভীষণ ইচ্ছা হলো, এই রোদ সে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে, আঙুলে করে এর বীণা বাজায়। ভীষণতরো লোভ হলো পাউডারের মতো এ-রোদ সে গায়ে মাখে, সভ্যতার সমস্ত খোলস খুলে ফেলে এই রোদের বৃষ্টিতে সে স্নান করে।

জানলা গলিয়ে খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে গেছে ; যন্ত্রচালিত, সভ্য মানুষের মতো বনানী সেটা কোলের উপর কুড়িয়ে নিলো। মনে-মনে হাসলো, কী খবর সে আজ পাবে, পেতে পারে, এই সূর্যোদয়ের চেয়ে যা বেশি সত্য ? তার সমস্ত শরীরে এই সুকঠিন সুস্থ থাকার চেয়ে কী খবর তার আজ থাকতে পারে পৃথিবীতে ? এই তার ঠাণ্ডা, ঘন নির্জনতা, এই তার নিঃশব্দ, পবিত্র আপনাকে নিয়ে থাকা, আপনাতে আপনি ভরে ওঠা। জীবনকে, সভ্যতার শাসনে জর্জর জীবনকে, সে বিদীর্ণ করে দিতে না পারে, সে ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাবে তার গূঢ় দীপ্ত অন্ধকারে, এই শরীরময় শান্তিতে, এই কিছু-না-করার অলস বিরমমাণতায়। এই তার কাছে যথেষ্ট খবর।

ঝি উঠেছে, উনুন ধরিয়ে কেৎলিতে জল চাপিয়ে দিয়েছে। উঠতে হয় ; সানুষঙ্গ চা-টা নিজ হাতেই তৈরি করে নিতে হবে। ছোটোখাটো দুয়েকটা অসুবিধের কাঁটা এখনো মাথা উঁচিয়ে আছে, ফেলতে হবে উপড়ে। ঝি-কে পাঠাতে হবে বাজারে, ততোক্ষণে স্নান করে মোটা দু'টো রান্না নামিয়ে নিতে হবে, সাড়ে-ন'টায়

বাস-এর বাজবে হুর্ন। আজ আর সে পরাশ্রিত নয়, আজ থেকে সে সম্পূর্ণ আলাদা, আজ থেকে সে নিজে। বনানী ছোট-ছোট কাজের নুড়িতে ছিটকে-ছিটকে বয়ে যেতে লাগলো। চারদিকের এই লোকজন, তাদের সংসারজীবনের ব্যস্ত মুখরতা, তাকে যেন সেই চেতনার নিগূঢ় অন্ধকার থেকে এতোক্ষণে মুক্তি দিয়েছে, শরীরে এনে দিয়েছে একটি লঘুতার সুর। এতোক্ষণে তাদের এই সহ-যাত্রার সান্নিধ্য তাকে যেন স্বচ্ছন্দ করে তুলেছে: তাকেও তাদের সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে—এই একটা কর্তব্যের স্বস্তি। সে আর একা নয়, দিনের বেলা লক্ষ-লক্ষ মুখে সে এই কথা শুনতে পায়, দিনের বেলা সে-ও তাই জীবন নিয়ে দুঃ-সাহসী হয়ে ওঠে।

সমস্ত দিন তার কাটে স্কুলে, একটানা একটা ক্লান্তির মধ্যে দিয়ে। কাজ করতে হবে বলেই তার কাজ, নইলে নিজেকে সে টিকিয়ে রাখবে কী করে, এই নিঃসঙ্গতা তার ভরে তুলবে সে কিসের ক্লান্ততায়? ওটা হচ্ছে শীত-তাপ-নিবারণের একটা সৌখিন অস্ত্র, ওটার তলায়ই হচ্ছে তার আসল জীবন, যেমন পোশাকের তলায়ই হচ্ছে দেহের আসল স্বাস্থ্য। নইলে, তার যদি কোনো কাজ করতে না হতো, না থাকতো এই মাত্র শারীরিক গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা, সে থাকতো কোনো নির্মানব সমুদ্রের পাড়ে শুয়ে, জলের সেই বিশাল শরীরেরই মতো অতলান্ত প্রশান্তিতে, তার উপর ভেঙে-ভেঙে পড়তো সময়ের শিশিরবিন্দু, রোদ আর বৃষ্টি, ধারালো রোদ আর গলানো বৃষ্টি। নেমে আসতো অন্ধকার মৃত্যুর মহান বিশ্বব্যাপ্ততার মতো, শরীরের উপর শতখান হয়ে ভেঙে পড়তো চাঁদের চূর্ণ, রক্তের অগণন বুদ্বুদের ফেনায়। সে ফুটে উঠতো মাটির একটি আত্মজ ফুলের মতো, তার আদিমতমো আরণ্য স্বাভাবিকতায়। সমস্ত-কিছু আগাগোড়া অন্ধকার, সেই অন্ধকার জলে খানিকটা রঙিন তেলের মতো সমস্ত সভ্যতা ভাসছে: বনানীর ইচ্ছা করে তেলের সেই পুরু পরদাটা সরিয়ে সেই অন্ধকার জলে ধীরে-ধীরে নেমে যায়, তার নিজের দেহের, নিজের আত্মার, নিজের রহস্যের অন্ধকারে। সে শান্তি পায় তার স্কুলের কাজে নয়, বাড়ি ফিরে এসে এই তার অটল স্তব্ধতায়। আর-কোনো-কিছু-কাজ-না-থাকার নিরাপদ সম্পদে। ঝি-টি চৌকস, সব এর মধ্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখেছে, বনানীর আর কুটোটি কেটেও দুখান করতে হয় না। শাড়ি বদলে চা খেয়ে ঘরের আবছায়ায় বসে বনানী এখন, এতোক্ষণে খবরের কাগজটা নাড়ে-চাড়ে, দেখে এর চেয়েও আর কোথায় কোনো ভালো কাজ পাওয়া যায় কিনা। সেটা তার একটা বহু-অনুসৃত দৈনিক অভ্যাস, এই কাজ-খালির বিজ্ঞাপন হাতড়ানো; তার সভ্যতার একটা লক্ষণ, এই কাজ নিয়ে তার অসন্তুষ্টি। কোথায় কোন কাজ সে আর পেতে পারে যাতে তার চিত্ত ভরে থাকে পূর্ণতায়, অথচ দেহে অটুট থাকে এই অব্যাহত ঔদ্ধত্য। কাগজের স্তম্ভগুলির উপর চোখ বুলিয়ে-বুলিয়ে বনানী মনে-মনে হাসে, কোথাও তার জন্যে কাজ নেই, তেমন কাজ। এই সে বেশ আছে, এই কলকাতায়, সভ্যতার অসভ্য মরুভূমিতে।

বাদুড়ের পাখার মতো আকাশে ঝোলে অন্ধকারের পাখা, সমস্ত শূন্য রিক্ততায় পাণ্ডুর হয়ে আসে। ঘরে যেন আর মন টেঁকে না, কোথাও বেরিয়ে পড়বার জন্যে বনানী দেহে-মনে আন্দোলিত হয়ে ওঠে—এই সূর্যাস্তের শেষে, এই

আসীদমান শীতের অন্ধকারে। সমস্ত কলকাতা চুঁড়ে এক শিপ্রাদের বাড়িটা সে চিহ্নিত করতে পারে, কিন্তু সত্যি-সত্যি শেষ পর্যন্ত সেখানে যেতে তার পা ওঠে না, সেখানে যাওয়া মানে তার এই নির্জনতাকে যেন ব্যঙ্গ করা, পরিচিত লোকের নৈকট্যে নিজেকে ব্যাহত করা। যেতে ইচ্ছে করে তার সেইখানে, এই ম্রিয়মাণ সন্ধ্যায়, সেই অপরূপ অপরিচয়ের দেশে, যেখানে সব লোকজন তার অচেনা, তাদের কথাবার্তা, তাদের ব্যবহার, তাদের হাসি-তামাসা, সেই আশ্চর্য, অসীম অজ্ঞানের রাজ্যে। অতএব কোথাও আর তার যাওয়া হয় না, সেই অজ্ঞাত রাজ্য খোঁজবার জন্যে সে আলোর কাছে বই নিয়ে বসে।

বই নিয়ে বসে কিন্তু মন পড়ে থাকে ঘরের দুয়ারে। যেন কে আসবে। আসবে অচেনা অন্ধকারে নয়, এই প্রত্যক্ষ দিবালোকে। আসবে বিপ্লবীর মতো। কোষমুক্ত তলোয়ারের মতো। আসবে নির্লজ্জ উন্মোচনে, তিমিরদারী সূর্যের সৎসাহসে। বলবে, আমরা সত্যের, সামঞ্জস্যের নই; আমরা মৃত্যুর, নয় মৃতকল্পতার।

স্কুল থেকে ফিরে, একদিন চুল বেঁধে খোঁপায় কাঁটা গুঁজছে, একটি মধ্যবয়স্কা অচেনা ভদ্রমহিলা আস্তে-আস্তে তার ঘরের দরজায় দেখা দিলেন। সঙ্গে তাঁর একটি তিন-চার বছরের মেয়ে, হাতে করে একটা লম্বা লেবেনচুষ চুষছে।

ভদ্রমহিলা কুণ্ঠিত পায়ে চৌকাঠটা পেরিয়ে আসতে-আসতে বললেন,- আমি আপনার এই পাশের বাড়িতেই থাকি, একটু বেড়াতে এলুম।

বনানী মর্মরিত হয়ে উঠলো : আসুন, আসুন। তাড়াতাড়ি খোঁপায় দুটো চড় মেরে বনানী দুহাতে দুখানা চেয়ার এগিয়ে দিলো : বসুন, বোসো খুকি। খুকিকে সে নিচু হয়ে নিজের হাতে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিলো।

মহিলাটি চেয়ারে বিস্তৃত হয়ে বসলেন। খরখরে চোখে চারদিক চষে নিয়ে বললেন,—আপনি বুঝি এখানে একা আছেন?

—না, একা হলে আর পেরে উঠতুম কী করে? বনানী বসলো তার তক্তপোষের উপর সুজনি-ঢাকা বিছানায় : সঙ্গে একটা ঝি আছে।

—ও, সে তো একাই হলো! ভদ্রমহিলা তাঁর ভুরু তুললেন : আপনার বাবা-মা কেউ নেই?

—না।

—আর কেউ নেই? বলেন কী?

-আত্মীয়-স্বজনরা ভারতবর্ষের এখানে-ওখানে ছিটিয়ে আছেন বৈ কি, কিন্তু আমার কাছে থাকবার মতো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মহিলা চাপা, সন্দিগ্ধ সুরে বললেন,—স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিলো না বুঝি?

বনানী শিশুসুলভ সরলতায় হেসে উঠলো : নিজের সঙ্গেই বনিবনা হচ্ছে না বলে এখনো বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি।

ভদ্রমহিলা ন্যাকি সুরে ছোট্ট একটা আওয়াজ করলেন। বললেন,—এখানে মাস্টারি করতে এসেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কোন ইস্কুলে ?

—এই সুভদ্রা-গার্লস্‌ স্কুলে।

—সুভদ্রায় ? ভদ্রমহিলা যেন সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলেন : ও ইস্কুলটা তো বিচ্ছিরি, একটুও ভালো নয়।

—কেন, কী করলো ?

—ওটাতে নাচ-গান শেখায় ? আমার প্রতিমাকে তো প্রথমে ঐ ইস্কুলেই দেবো ভেবেছিলুম, কিন্তু নাচ-গান শেখায় না জেনে পিছিয়ে গেলুম। মহিলা একটু নড়ে-চড়ে উঠলেন : আপনি আমার প্রতিমার নাচ দেখেননি, সেই 'প্রলয়-নাচন নাচলে যখন' ? দেবো, একদিন পাঠিয়ে দেবো প্রতিমাকে। বাড়িতে আর যখন লোকজন কেউ নেই।

বনানী মনে-মনে বিরক্তি চেপে রেখে মুখে স্নিগ্ধতা এনে বললে,—নাচ-গান জেনে কি হয় ?

—কী হয় মানে ? নাচ-গান না জানলে মেয়েদের আজকাল ভালো ঘরে বিয়ে হয় নাকি ? ছেলেরা যে তাই আজকাল চায়।

বনানী কঠিন হয়ে বললে,—ছেলেরা কী চায় না-চায় সেই অনুসারেই মেয়েদের গড়ে উঠতে হবে নাকি ?

—ঠিক, ঠিক এই কথা আমার যতীশও সেদিন বলেছিলো। ভদ্রমহিলা ডগমগ হয়ে উঠলেন : এমনি বড়ো-বড়ো কথা সব সময়েই ওর মুখে লেগে আছে।

বনানী বোকার মতো তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—যতীশ, যতীশ আমার বড়ো ছেলে, সেণ্ট জেভিয়ার্সে', কথাটা ভদ্রমহিলা সাড়ম্বরে উচ্চারণ করলেন : বি-এ পড়ছে। আপনি কদ্দুর পড়েছেন ?

বনানী হেসে বললে,—কষ্টেসৃষ্টে বি-এটা পাশ করেছি।

—করেছেন ? কোন বছর ?

—গেলো বছর।

—ঠিক যতীশও আমার ঐ গেলো বছরেই পাশ করতো। হঠাৎ পরীক্ষার আগে বললে, দেবে না, ভালো তৈরি হয়নি। সেণ্ট জেভিয়াসে' কিনা তাই খুব কঠিন। ভদ্রমহিলা সন্তানগর্বে বিস্ফারিত হলেন। মেঝের-বিছানো খবরের কাগজের উপর টাল-করা বইয়ের দিকে সকৃপ চোখে চেয়ে তিনি বললেন,—আপনারো দেখি মেলা-ই বই আছে। ও-গুলি কী বই ? সাহিত ?

—এই আছে নানা রকমের।

—আর কিছু পরীক্ষা দেবেন বুঝি ?

—না, ওগুলো নেহাৎ বাজে বই। এমন ওদের দুর্ভাগ্য যে পরীক্ষার কোনো কাজে আসে না।

—যা বলেছেন ! ভদ্রমহিলা যেন এতোক্ষণে একটা গুণগ্রাহী শ্রোতা পেলেন। আমার যতীশেরও তাই, ঠিক আপনার মতো। এই কেবল রাজ্যের বাজে বই পড়বার ঝোঁক। আর সে তো বই নয়, পাহাড়। আর রাতে-দিনে কী পড়াটাই না পড়ে, পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়ছে, তবু বই ছাড়ছে না।

খুকিটি চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ভদ্রমহিলা হঠাৎ কাছাকাছি হয়ে জিগ্গেস করলেন : আপনি নাচ-গান বুঝি কিছু জানেন না ?

বনানী শুকনো মুখে একটু হাসলো : দেখতেই পাচ্ছেন। নইলে তো কোনদিন বিয়ে হয়ে যেতো।

খুকিটি পিছলাতে-পিছলাতে চেয়ার থেকে নেমে পড়লো।

ভদ্রমহিলা বললেন,—গানটাও জানেন না ? সে কী কথা ? গান-ও আবার কোন মেয়ে না জানে ? ও তো একটা বিদ্যে।

বনানী যেন দুঃখে গলে গিয়ে বললে,—সব বিদ্যেই কি সবার কপালে হয় !

খুকিটি গুটি-গুটি অগ্রসর হতে লাগলো।

সহানুভূতি করতে পেয়ে ভদ্রমহিলা যেন এতোক্ষণ আশ্বস্ত হলেন : তা যা বলেছেন ! আমার প্রতিমা কিন্তু এবিষয়ে খুব ভাগ্যবতী। গানের কম্পিটিশানে ফার্স্ট হয়ে সোনার মেডেল পেয়েছে। উপাধিও পেয়েছে একটা—কী না বলে, গীতিকণিকা। বেশ উপাধিটা, না ?

খুকিটি ততোক্ষণে দূরের টেবলটার নাগাল পেয়েছে। ব্রাউন-পেপারে মোড়া ছোট কেক্‌টা খপ করে ধরে ফেলে সে চেঁচিয়ে উঠলো : ওটা আমি খাবো।

বনানী ছুটে এগিয়ে গেলো : খাবে বই কি ! প্লেটে করে কেটে দিই, কেমন ?

—না, কেক্‌সুদ্ধ হাতটা সরিয়ে নিয়ে মেয়েটি কেঁদে উঠলো : সমস্তটা খাবো।

ভদ্রমহিলা গর্জন করে উঠলেন : কী সর্বনেশে মেয়ে, বাবা। রাখো, রাখো শিগ্গির।

খুকিটি ভ্রূক্ষেপও করলো না।

—এই এক থালা পুডিং, গুচ্ছের সন্দেশ খেয়ে এসে বাজারের কেনা এই একটা কেক্ খেতে তোর ইচ্ছে হলো ? ভদ্রমহিলা চেয়ার থেকে তার গায়ের উপর লাফিয়ে পড়বার একটি ভঙ্গি করলেন : রাখলি ? দিদির কেক্ যে ওটা। বেচারি সারাদিন খেটে-খুটে এসে কোথায় একটা কিছু চিবোবে—তা না, রাখলি ? রাখ, রেখে দে বলছি।

বনানী খুকির পাট-করা চুলের উপর হাত বুলোতে-বুলোতে স্নিগ্ধ গলায় বললে,—না, থাক না। তুমি খাও, খুকি। তোমার কী নাম ?

কেক্-এর মধ্যে হাঁ-টা ডুবিয়ে দিয়ে খুকি বললে,—ছন্নি।

বনানী হেসে বললে,—ভালো নাম ?

—ভালো নাম এখনো কিছু রাখা হয়নি। ভদ্রমহিলা একটু ক্লান্ত হয়ে বললেন : খুঁজছি। আপনার কিছু মনে পড়ে ? বেশ একটা ঝকঝকে নাম। আপনার নামটি তো এখনো জানতে পারলুম না।

—আমার নাম ? বনানী কী ভাবলে : আমার নাম ভারি বিচ্ছিরি, বড্ড সেকেলে। সে বলবার মতো নয়।

—তা যা বলেছেন। নামের আজকাল বেজায় দাম। তবু বলুন না।

হেসে গড়িয়ে পড়তে-পড়তে বনানী বললে,—আমার নাম জগদম্বা। ঠাকুমা রেখেছিলেন।

ভদ্রমহিলা বিমর্ষ হয়ে গেলেন : ছি-ছি, ঐ নামটা বদলে নিতে পারলেন না ?

বদলাবার আর সময় পেলুম কোথায় ?

ভদ্রমহিলা আপাদমস্তক গম্ভীর হয়ে গেলেন। এইবার বোধকরি উঠতে হয়।

খুকি হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলো : অমন বড়ো-বড়ো চোখ করে আমার দিকে তাকাচ্ছ কী, মা ? দিদি তো আমাকে সমস্তটা খেতে দিলো। কেমন দিদি, তুমি দাওনি ?

ভদ্রমহিলা অসহায় মুখে বললেন,—সবটা খেয়ো না, অসুখ করবে। এই বেশ আছে, বাকি আদ্ধেকটা রেখে দাও, কাল খেয়ো। ওটা এখন রেখে তোমার সেই গানটা একবার দিদিকে শুনিয়ে দাও তো ? সেই 'শেফালি তোমার'। কী সুন্দর যে গায় !

—তুমি গান জানো নাকি, খুকি ? বনানী নিচু হয়ে তাকে আবার আদর করলো।

—শুধু গান ? হাত তুলে-তুলে মাটির উপর লুটিয়ে-লুটিয়ে কেমন চমৎকার নাচে। তোমার সেই কীর্তনটা ধরো, সেই 'গোগিনী হইয়া যাবো সেই দেশে'। যোগিনীকে খুকি গোগিনী বলে। ভদ্রমহিলা আহ্লাদে একেবারে ফেটে পড়লেন।

কিন্তু খুকির যোগিনী সাজবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। হাতের কাছে যা সে পেয়েছে তা নিঃশেষ করে তার অন্য কথা।

ভদ্রমহিলা উঠে পড়লেন। বাড়িটার আনাচে-কানাচে কড়ি-বরগা সুক্ষ্মানুসুক্ষ্ম পরীক্ষা করে তিনি শুধোলেন : কতো ভাড়া দেন ?

—টাকা পঁচিশেক হবে হয়তো, আমি ঠিক জানি না।

—খুব সস্তা তো ? ভদ্রমহিলা খুকির হাত ধরে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলেন : এপাড়ায় বাড়ি ভাড়াটাই কিছু কম। আমাদের ওই বাড়ি দেখছেন তো ? ওই যে রেডিও বাজছে। পঁচানব্বুই টাকা ভাড়া। যাবেন একদিন। প্রতিমার সোনার মেডেলটা দেখে আসবেন।

বনানী তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো।

ঘরে যখন সে ফিরে এলো, তখন, এমন মুখ করে, যেন সে এইমাত্র চিতায় তার কোন প্রিয়তম আত্মীয়কে পুড়িয়ে রেখে এসেছে। ঘরে জমছে সন্ধ্যার আবছায়া, যেন একটা মূর্তিমান অনর্থকতা।

বনানী টুকরো-টুকরো হয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লো। যেন কত যুগ ধরে সে রোগশয্যায় পড়ে আছে। হে বিধাতা, রক্ষা করো, তাকে রক্ষা করো এই সভ্যতা থেকে, এই তার প্রতিবেশিতা থেকে। তাকে দাও অন্ধকার, ঘন নিঃশব্দতার অন্ধকার বর্বর ভয়ংকর অন্ধকার, শুধু আপনাকে নিয়ে থাকবার দুর্দম বন্যতা। বনানী অন্ধকারে হঠাৎ কেঁদে উঠলো। তুমি কোথায় ?

॥ দশ ॥

সৌম্য আজকাল আপিস থেকে একটু দেরি করেই বাড়ি ফেরে, মানে, যতোটুকু আগে সে চেষ্টা করে আসতে পারতো, ততোটুকু চেষ্টাও সে আর করে না। তার জায়গা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে, আড্ডাটাও আজকাল তার ভালো লাগে না, ভালো লাগে না বই, সৌম্য তার শ্রান্ত শূন্যতায় একটুখানি বিশ্রাম-শ্যামল আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়।

সিঁড়িতে পায়ের ভারি শব্দ করতে-করতে সৌম্য উপরে উঠে এলো। বসবার ঘর পেরিয়ে তবে শোবার। ঘরে অন্ধকার জমছে, পাতলা পিছল অন্ধকার, তার ভিতর থেকে ঘরের জিনিসপত্রগুলি দেখাচ্ছে অশরীরী, অস্পষ্ট কতোগুলি অনুভূতির মতো। দেয়ালগুলি যেন জীবনের শূন্যতার মতো দাঁড়িয়ে। খোলা জানলা দিয়ে বিশাল একটা ধূসরতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে, মৃত্যুর অবিচ্ছিন্ন একটি মূর্ছার মতো। সৌম্য এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা শ্লথকায় সাপ যেন একরাশ শুকনো, ঝরা পাতার উপর উঠলো খসখসিয়ে।

ভয়ার্ত কণ্ঠে সৌম্য চমকে উঠলো : কে ?

যেন অন্ধকার কথা কইলো : আমি।

সৌম্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সুইচ-অন্ করলে। সর্বাঙ্গে ঝলমল করে কোণের একটা কৌচ থেকে বনানী উঠে দাঁড়ালো।

মানুষের ঔপম্যবোধ অদ্ভুত। সৌম্যর মনে হলো, সেই পলায়মান দ্রুত মুহূর্তে, বৃক্ষগহন বিশাল অরণ্য থেকে বেরিয়ে এলো একটা বাঘিনী, সমস্ত দেহে তার বলিয়ান মহিমা, প্রশান্ত সৌন্দর্য। সৌম্যর সমস্ত শরীর যেন আকস্মিক ভয়ের আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

—বাবাঃ, কতোক্ষণ ধরে চুপ করে বসে আছি। বনানী ঘরের সমস্ত আলো যেন বন্ধুতায় আর্দ্র করে তুললো : আপনার ফিরতে এতো দেরি হয় ?

—কই, না, দেরি হয়েছে নাকি ? সৌম্য যেন জাহাজ থেকে মাটিতে এসে নামলো : আপনি আসবেন সেটা তো ভাবিনি।

—কী করে ভাববেন ? বনানী যেন বহু-দূর-থেকে-দেখা উদার, উদাস দৃষ্টিতে সৌম্যর দিকে চেয়ে রইলো। তাকে এই পোশাকে কেমন দৃঢ়, উদগ্র দেখাচ্ছে। ফ্ল্যানেল্-এর ট্রাউজারটা নিখুঁত অসঙ্কোচে নেমে এসেছে, কড়া কলারটা গলার সঙ্গে বসেছে নিটোল আঁট হয়ে, টাইটার কী স্পর্ধিত তীক্ষ্ণতা ! এমন দুঃসহ দীপ্তি, যেন কোথাও এতোটুকু আঙুলের ছোঁয়া সইবে না। সমস্ত শরীর যেন প্রচ্ছন্ন চঞ্চলতায় স্থির সংহত হয়ে রয়েছে। বনানীর মনে হলো, সৌম্য যেন ঠিক মানুষ নয়, মানবীয় একটা জন্তু, বলিষ্ঠ, পেশল, বিস্ফার। মুহ্যমান দৃষ্টিকে হাসিতে সহসা তরল করে এনে বনানী আগের কথাটাকে প্রসারিত করলো : শেষকালে পালিয়ে না এসে আর পথ পেলুম না। প্রতিবেশীরা সদলবলে হঠাৎ আমাকে তাড়া করেছে।

—কেন, কী হলো ?

—আর বলবেন না ! পাশের বাড়িতে একটি মা আছেন, তিনি তাঁর মেয়ের নাচ আমাকে দেখাবেনই। বনানী বিরক্তিতে কুঁকড়ে গেলো : একেবারে মরে গেছি, আমাকে বাঁচান।

সৌম্য হেসে উঠলো, দ্রুত গলায় বললে—বসুন। আমি পোশাক বদলে আসছি।

সৌম্য শোবার ঘরে সরে গেলো।

সমস্ত পোশাকে ঢিলেঢালা একটা বাঙালীয়ানার শৈথিল্য নিয়ে যখন সে ফের ফিরে এলো, দেখলো আলো-জ্বালা ঘরের অন্ধকার সেই কোণটিতে বনানী সংকীর্ণ হয়ে বসে আছে। অন্ধকারে খুব গভীর জলের যে একটা চমকিত দীপ্তি আছে, সেই দীপ্তিতে বনানী যেন শান্ত, ভারি হয়ে আছে। সৌম্য চেয়ারে না বসে দূরে টেবুলের ধারে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। বললে, কেমন আছেন ?

—তবু যা হোক জিগগেস করলেন। বনানী ছায়াময়, ভারী দু'টি চোখ তুলে তার দিকে তাকালো : এমনি মন্দ ছিলুম না, কিন্তু নেইবার্সের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। মানুষের সঙ্ঘবন্ধতার এই হচ্ছে দোষ। সব সময়ে আমাদের জীবনে এই ভদ্র সামাজিকতার বিষ ফুটিয়ে দিচ্ছে।

—তাই বুঝি পালিয়ে এলেন আরেক ভদ্রতার কোটরে ? সৌম্য দুর্বল একটু হাসলো।

—কী করি বলুন, বনানী সহজ পরিচিতির সুরে বললে—যদি আপনি একদিনো না যান। সময় পান না শুনেছিলুম, কিন্তু এসে দেখি, ততো মারাত্মক কিছু সময়াভাব নয়। যদি অবিশ্যি, বনানী মুখে আবার ভাবের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে এলো : মনে না করেন, গিয়ে পড়লে সত্যি-সত্যি সময়টা মাটি হবে।

সৌম্য আমতা-আমতা করে বললে,—এই যাবো-যাবো করছিলুম ক'দিন থেকে।

—যাবেন। বনানী আবার সাদাসিধে পরিচ্ছন্ন গলায় বললে,—ঠাকুমা এসেছেন।

—এসেছেন নাকি ?

—হ্যাঁ, আপনাকে দেখবার জন্য তিনি ভারি ব্যস্ত। বনানী হাসলো. আপনাকে মানে শিপ্রার বরকে।

—ও, আমাকে নয় ?

—তাছাড়া আবার কী ? বনানী নির্লিপ্ততায় দুরূহ হয়ে উঠলো : সামাজিক জীব হিসেবে আমাদের আর কী পরিচয় আছে বলুন ? আমি অমুকের মেয়ে, আপনি অমুকের স্বামী, শিপ্রা অমুকের স্ত্রী। সমাজের মাঝে আমরা কতো সংকীর্ণ, কতো খণ্ডিত হয়ে থাকি। কিন্তু ছেড়ে দিন আমাদেরকে আমাদের নিজেদের মধ্যে, জীবনের একাকী, নির্জন এই চেতনার অন্ধকারে, বনানীর চকিত চোখ অন্ধকারে একবার জ্বলে উঠলো : আমরা খুঁজে পাবো না আমাদের সীমা, আমাদের বিস্ময়।

সৌম্য বললে,—সেই বিচিত্র সীমা পাবার জন্যেই তো আমরা সামাজিক বন্ধনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছি।

—সত্যি কথা। বনানী চঞ্চল হয়ে উঠলো: কিন্তু তাতে হয়েছে এই, আমরা অনেকেই স্তূপীকৃত কতোগুলি কাটা-কাটা অংশ হয়েছি মাত্র, সম্পূর্ণ 'আমি' হয়ে উঠতে পারিনি, নির্জন, নির্লিপ্ত আমি। সমাজের স্রোতে আমরা কতোগুলি ভাসা-ভাসা ফুল মাত্র, কিন্তু নিজের অন্ধকারে আমরা মাটির তলাকার প্রচ্ছন্ন শিকড়ের মতো রহস্যময়।

বনানীকে সৌম্যর যেন কেমন ভয় করতে লাগলো। অরণ্যচারী হিংস্র পশুর মতো সে যেন তার শরীরের অন্ধকারে তার বন্য দূরত্ব নিয়ে বসে আছে, ভয় করতে লাগলো সেই দূরত্বের বন্যতা।

কিন্তু যা দূরে তাই আবার কখন ঘনিষ্ঠ মনে হয়, মনে হয় ব্যবধানহীন। ঘনাশ্রিত আকাশের মতো। সৌম্যর মনে হয় বনানীর এই রহস্যপুঞ্জিত শরীর যেন শুধু ভয় দিয়ে তৈরি নয়, আনন্দ দিয়ে, লীলালাবণ্যের জলে কেলি-কৌতুকের ঢেউ দিয়ে তৈরি। মেঘের মাঝে শুধু বিদ্যুৎ-বজ্রই নেই, আছে বৃষ্টির সমর্পণ, বৃষ্টির শীতলতা। স্নেহচক্ষু শ্যামলতার প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু যা সন্নিহিত তাই আবার দূরতম। যা হাতের কাছে তাই আবার হাহাকারের কাছাকাছি। যা সঙ্গসঙ্গীতমুখর তাই আবার স্পন্দনহীন, নিঃশব্দ-নির্জন।

সৌম্য আবিষ্টের মতো বললে,—কিন্তু সেই নির্জনতায় আপনি কী করবেন? কী পাবেন?

—ঐ তো আপনাদের সামাজিক ব্যাধি, করা আর পাওয়া। বনানী কঠিন হয়ে বললে,—আমি শুধু হবো। আমি হবো শুধু নিজে, নির্জন নিজে।

—কী করে বা হবেন যদি কিছুই আপনি না করেন সত্যি সত্যি?

—আমি তো বিশেষ কিছু হবো না যে তার জন্যে আমাকে বিশেষ কিছু করতে হবে। বনানী অশরীরী একটা ছায়ার অস্পষ্টতায় যেন নিজেকে মুছে ফেললে: আমি শুধু ভেসে যাবো, বা ভাসিয়ে দেবো নিজেকে ধাবমান জীবনের জলে, যেখানে আমাকে নিয়ে যায়, রিক্ততার যে গভীর অন্ধকারে।

শূন্য চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সৌম্য বললে,—এ কী রকম জীবন?

—এই তো জীবন। যেখানে আমি যেটুকু প্রতিধ্বনিমান হয়ে উঠি, সেই তো আমার বাঁচা। বনানী ম্লান গলায় বললে: ইচ্ছে করেই কি আমি কোনো একটা নমুনায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারি? আর পারলেও, সেটা তো একটা নমুনাই হবে মাত্র, আমি কোথায়? আমি মুছে ফেলবো আমার মন, আমার ইচ্ছে, পরিপূর্ণ ছেড়ে দেবো আমাকে বিরাট এই অন্ধকারের অজানায়। বনানী অদ্ভুত হেসে উঠলো।

ঘরের মধ্যে আরো আলো থাকলে যেন সৌম্য নিশ্চিন্ত বোধ করতো। বনানীর হাসির প্রতিশব্দে সে-ও অসহায় হেসে উঠলো। বললে,—আপনি তাহলে কিছু জানবেন না, কিছু বুঝবেন না?

বনানী বললে,—যতো জানবো ততোই তো জানবো যে কিছুই জানা হয়নি। কী আমার আর বোঝবার আছে বলুন, আমার এই আমি ছাড়া। তা-ও, যখনই বুঝতে যাবো, তখনই ফেলবো নিজেকে ছোট করে।

গিরধারী ট্রে-তে করে চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে এলো।

বনানী ক্ষিপ্রতার একটা দীপ্তি বিচ্ছুরিত করে উঠে দাঁড়ালো। বললে,—সরুন, চা-টা আমি তৈরি করছি।

সৌম্য অনায়াসে সরে গেলো, বসলো দূরে, একটা ইজিচেয়ারে। বনানী তার এই রমণীয় পরিমিতি পেতে সে-ও যেন পেলো তার একটা স্বাভাবিকতার স্বস্তি। বনানী যেন তাকে তার সমতল প্রাত্যহিকতা থেকে কোন এক অতীন্দ্রিয়, অনির্দেশ্য অন্ধকারে নিয়ে এসেছিলো, যেন কোন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখছিলো সে একটা অনাবিষ্কৃত, অনুসন্ধিত মহাসাগর। বনানী হঠাৎ তার সাংসারিক নারীশ্রীতে রূপায়িত হয়ে উঠতেই সে যেন তার চারপাশে আবার খুঁজে পাচ্ছে একটি পরিচিত উষ্ণতা, ঘন একটি অচ্ছেদনীয় শান্তি। চামচেয় করে পট-এর লালচে জলটা একটু নাড়তে-নাড়তে বনানী জিগগেস করলে: স্ট্রং করবো?

সৌম্য ভরাট গলায় বললে,—হ্যাঁ।

চায়ের একটা বাটি তার চেয়ারের হাতলের উপর রেখে বনানী বললে,—দেখুন, মিষ্টি হয়েছে কিনা।

চায়ের রঙের দিকে চেয়ে থেকেই সৌম্য বললে,—হয়েছে। কিন্তু আপনার চা কই?

—এই যে নিচ্ছি।

—খাবারের প্লেটটাও নিয়ে আসুন।

বনানী একটা খালি টিপাই এগিয়ে দিয়ে খাবারের প্লেটটা রাখলো।

সৌম্য বললে,—আপনিও নিন কিছু।

—অসম্ভব। বনানী তার চায়ের বাটিটা হাতে করে দেয়ালের দিকে তার কৌচে গিয়ে বসলো।

—তা কী করে হয়? সৌম্য বন্ধুতায় স্নিগ্ধ গলায় বললে,—আপনাকে ফেলে একা খাই কী করে?

চায়ে ঠোঁট ডুবিয়ে যতোদূর নিঃশব্দে সম্ভব ছোট্ট একটি চুমুক দিয়ে বনানী বললে,—ঐ তো আপনাদের দুর্বল, অসার ভদ্রতা। নিন এই ছোট্ট দৃষ্টান্তটা। আপনি আপিস থেকে ফিরেছেন, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত—আপনার এখন স্থূল কিছু খাদ্য চাই—সেখানে তো আপনি একা। তার কাছে আপনার আর-কিছুতে দ্বিধা করবার কথা নয়। লজ্জা হচ্ছে ভদ্রতার একটা কুৎসিত উপসর্গ।

সৌম্য কুণ্ঠিত হয়ে বললে,—তবে আপনি চায়ের পেয়ালাটাই বা নিলেন কেন?

—তার চমৎকার উত্তর আছে। বনানী নিচু সোপ্রানো-তে হেসে উঠলো: চা খেতে আমার ভালো লাগলো, এই বিন্দুতমো মুহূর্তটির জন্যে এই আমার চরমতমো ভালো লাগা। তাই আপনার মতের পর্যন্ত অপেক্ষা করিনি। আপনার মৌখিক, ভদ্রতাগ্রস্ত সমর্থনের আগে আমার ভালো-লাগাটাই আমার বেশি।

সৌম্য হেসে বললে,—দয়া করে খাবারের প্লেটটাতেও একটু ভালো লাগান না?

বনানীর হাসি আরেক পরদা উঠে গেলো: রক্ষে করুন। আপনি যেমন একা আপনার ক্ষুধায়, আমিও তেমনি আমার ক্ষুধামান্দ্যে। যা আমাদের ভালো লাগে না তাই আমাদের পাপ, আর যা ভালো লাগে তাই আমাদের পূর্ণতা, আর পূর্ণতাই হচ্ছে পুণ্য। তার কাছে আর-সমস্ত বিবেচনা একেবারে অবাস্তব।

দু'জনকে ঘিরে কল্লোলিত হয়ে উঠলো স্তব্ধতার গহনতা। সৌম্যর ভয় করতে লাগলো। যেন মনে হলো তার সমস্ত সংকীর্ণ সীমা-রেখা সে-স্তব্ধতায় মুছে যাচ্ছে, সমুদ্রের ঢালু পাড়ে বালির চিহ্নের মতো। মনে হলো সে-স্তব্ধতায় তার যেন একটা স্থির সংজ্ঞা নেই, সে যেন অমসীচিহ্নিত, অবর্ণিত একটা শুভ্রতা। জীবনের অনেক-কিছু যেন তার এখনো অজানা, এখনো অন্ধকৃত, সেই অননুমেয় অপরিচয়ের ভয়ে সৌম্যর সমস্ত অস্তিত্ব যেন ভীত, শিহরিত হয়ে উঠলো।

চেয়ে দেখলো একবার বনানীর দিকে। আবার মনে হলো পাহাড়ের চূড়ায় বসে সে যেন অস্পষ্ট করে প্রসারিত পৃথিবীর ধূসর বিশালতা দেখছে। দেখলো তার দু'টি সবলবর্ধন হাতে নিষ্ঠুরতার একটা দীপ্তি, তার বসবার সমস্ত ভঙ্গিটিতে একটা পাশব গাম্ভীর্য, তার চামড়ার বুনটে গভীর অন্ধকারের শাণিত উজ্জ্বলতা সৌম্যর ভয় করতে লাগলো, আবার সেই অশরীরী, অস্পৃশ্যনীয় ভয়। তার কঠিন একটা কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই, অথচ রক্তের গন্ধের মতো যেন তা শোঁকা যাচ্ছে। ভয় করতে লাগলো তার এই চুপ করে বসে থাকার অসহায়তাকে। তার মাঝে যে এতো স্তব্ধতা ছিলো সেই প্রথম আবিষ্কারের অসহনীয়তাকে। মনে হল এই স্তব্ধতা তাকে ঠেলে দিচ্ছে, ঠেলে দিচ্ছে অতলস্পর্শ সমুদ্রের মৌনে, স্পর্শের সমুদ্র। উদ্ধত অনিবার্যের মতো। কোথাও বাধা নেই, বিরোধ নেই, শুধু একটি প্রোজ্জ্বল প্রতীক্ষা, নিশ্চল নিমন্ত্রণ।

কথা, কথা, সৌম্য যা হোক একটা কিছু কথা কয়ে ওঠবার জন্যে ছটফট করতে লাগলো। ঘরের জাজ্জ্বল্যমান আলোটা যেন এই অন্ধকারকে, এই কথা-না-বলার অন্ধকারকে, স্পষ্টতায় আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। কথা, কথা, ছোটখাটো অবান্তর কথা, শিপ্রার কথা, শিপ্রার প্রতি তার অজস্র স্নেহের কথা,—সৌম্য যেন এই অনাবৃত প্রখর, প্রবল স্তব্ধতা থেকে তার ভদ্রতার ভালো-মানুষির খোপে নেমে আসতে পারলে বাঁচে। উন্মুক্ততার এতো ভার যেন বওয়া যায় না।

সৌম্য ডেকে উঠলো: গিরধারী!

গলায় কথা পেয়ে সে যেন এতোক্ষণে নিশ্বাস ফেলতে পারলো। ফিরে পেলো তার পুরোনো, স্বাভাবিক অনুপাত।

গিরধারী এদিকে-ওদিকে ঘুরঘুর করছিলো, কাছে এসে দাঁড়াতেই সৌম্য বললে,—নিয়ে যা এগুলো।

জিনিসগুলি কুড়িয়ে গিরধারী চলে গেলে বনানী বললে,—এ সময়টা আপনি কী করেন?

—সাধারণতো কিছুই করি না।

অনেক কথা বলে ফেলে বনানী যেন একটু ক্লান্ত হয়েছে, তার সমস্ত মুখাভাসে এসেছে এখন একটি নিরাভ ধূসরিমা। শান্তিতে গভীর চোখ মেলে বললে,—কোথাও যান না বেড়াতে?

সৌম্য যেন বনানীর অদৃশ্য ছোঁয়া পেয়ে আকস্মিক ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে। বললে,—যাবার জায়গা কোথায়?

—পড়েন?

—সারা দিনের খাটনির পর আবার পড়া ? সৌম্য বিবর্ণ মুখে হাসলো : বসে-বসে শুধু দেখি।

—কী দেখেন ?

—জানলায় বসে-বসে রাতের রঙিন কলকাতা। অদ্ভুত, সৌম্যর কথার আড়ালে এমন যে একটা আশ্চর্য সুর ছিলো তা সে নিজেই কোনোদিন শোনে নি : শুনি তার ভাসা-ভাসা শব্দের টুকরো।

—আচ্ছা, আপনার কি সত্যিই মনে হয় না, বনানী অটল, সতেজ দীর্ঘতায় উঠে দাঁড়ালো : যে আমাদের এই দেখা ও শোনা, ছোঁয়া ও অনুভব করারো অতীত একটা চেতনা আছে ? শুধু দেখে ও শুনে, শুঁকে ও ছুঁয়ে আমাদের জীবন আমরা নিঃশেষ করতে পারি না ?

—হবে হয়তো, কিন্তু, সৌম্যও একটা ক্ষিপ্রতার ভঙ্গি করলে : আপনি এখুনি উঠলেন নাকি ?

—হ্যাঁ, এবার যাই আর-কি। ঠাকুমার দূত হয়ে এসেছিলুম, তাঁর মেসেজু তো আপনাকে পৌঁছে দিয়েছি।

—চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। কাঁধের উপর সৌম্য তাড়াতাড়ি একটা চাদর কুড়িয়ে নিলো।

বনানী উঠে দাঁড়াতেই সৌম্যর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তার শীতাবরণের স্বল্পতা। তার শাড়ি পরবার ধরনে এমন একটা সবল, নির্মম শ্রী আছে, পা ফেলায় এমন একটা ঋজু স্বতঃস্ফূর্ততা, সমস্তটা আবির্ভাবে এমন একটা ক্ষিপ্র, অথচ তাপহীন ঔজ্জ্বল্য যে, তাকে, তার ব্যক্তিকতাকে, যেন এক মুহূর্তের জন্যেও অস্বীকার করা যায় না, প্রতিরোধ করাও কঠিন হয়ে ওঠে। সে যেন, সৌম্যর মনে হলো, সেই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধের অতীত একটা অসমাপ্তি দিয়ে তৈরি। তাকে ধরলেও যেন সে ধরার অতীত হয়ে থাকবে। তাকে বন্দী করে রাখলেও সে হয়ে থাকবে মুক্তির সংকেত, সংকীর্ণ অঙ্গনের উপরে আকাশের ঠিকানা। তাকে পেয়ে ফেললেও ফুরিয়ে ফেলা যাবে না। সে অসম্পূরণীয়া। সে শেষ করবে অথচ নিজে শেষ হবে না। সে এখন চলে যাক। সে এখন চলে গেলে সৌম্য যেন তার সুস্থ পরিমিততায় উত্তপ্ত হতে পারে।

রাস্তায় নেমে এসে সৌম্য জিগ্গেস করলে : এখন বাড়ি গিয়ে কী করবেন ? তার স্বরটা যেন ভীষণ ভদ্র শোনালো।

—কিছু ঠিক কী বলা যায় ? বনানীর গলা যেন যান্ত্রিক, একটু বা কর্কশ।

দুয়েক পা কাটলো নিঃশব্দে। সৌম্য কেন যে তার সঙ্গে আসছে কে বলবে ?

বনানী বিরক্ত হয়ে বললে,—আপনাকে মিছিমিছি আর কষ্ট করতে হবে না। এবার ফিরুন।

—না, এই কতোটুকু আর রাস্তা।

—আমি জানি। আমি এটুকু একাই যেতে পারবো। ঠাকুমাকে এখন পাবেন পাবেন না, এতোক্ষণে তিনি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আচ্ছা, নমস্কার। পাহাড়ের উপর থেকে নিচে পড়তে-পড়তে সৌম্য নিজেকে সামলে নিলে।

॥ এগারো ॥

কিন্তু কেনই বা সৌম্য যাবে না? শিপ্রা বারণ করে দিয়েছে, এবং সেই কারণে এতোদিন সে সত্যি যায়নি বলে তার দস্তুরমতো হাসি পেতে লাগলো। শিপ্রা যদি এখন বারণ করে দেয় যে সে রঙিন টাই বাঁধতে পারবে না, পারবে না সিঁথি কাটতে, পান খেতে, ভালো কাপড়-চোপড় পরতে, তবে তার সেই আব্দারও রাখতে হবে নাকি? শিপ্রা কী অসহ্য ছেলেমানুষ! শুধু ছেলেমানুষ! শুধু ছেলেমানুষ নয়, রীতিমতো খারাপ, সে সেখানে গেলেই যেন শিবের জটায় গঙ্গা যাবে শুকিয়ে, ভূমিকম্পে পৃথিবী যাবে রসাতলে। শিপ্রার এমন একটা অন্যায় অনুরোধ যে সে কেন এতোদিন মান্য করতে গিয়েছিলো তার কারণ সে নিজেই খুঁজে পেলো না! নিজের উপর, নিজের নির্বিরোধ দুর্বলতার উপর, তার ধিক্কার উপস্থিত হলো। তা ছাড়া, সত্যি ভেবে দেখতে গেলে, শিপ্রার এখন আর কিছু নালিশ করবার থাকতে পারে না—বনানীর ঠাকুমা তাকে দেখতে চেয়েছেন। শিপ্রা যখন যায়, সমস্যাটা এমন চেহারা নিয়ে দাঁড়ায় নি, ঠাকুমার দিক থেকেও যে একটা তাগিদ আসতে পারে সেটা দেয়নি তার কল্পনায়।

আর, এমনিতেই, সেখানে যাবে না কেন? সেখানে গেলে তার ভালো লাগবে, ভালো লাগবে বনানীর সঙ্গে কথা কইতে, ভালো লাগবে কথা আবার না কইতে, ভালো লাগবে তার উপস্থিতির সুবিশাল সেই শান্তি, ভালো লাগবে তার দূর নির্লিপ্ততা। সে খুঁজে পাবে তার জীবনের আরেকটা নতুনতরো সুর, নতুনতরো স্বাদ—তার পরিচয়ের পরিধি যাবে বেড়ে, নিজের পরিচয়ের: নিজেকে দেখবে সে আবার নতুনতরো পরিপ্রেক্ষিতে। উড়োজাহাজে করে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় সে ঘুরে আসবে, যেখান থেকে মাটি অনেক দূরে, চারধারে যেখানে শূন্যময় অশারীরিকতা। তার ভালো লাগবে, যেমন যখন সবুজ বৃষ্টি নামে ধান-ক্ষেতের উপর, যেমন শরীরের ক্লান্তির পর ঘনিয়ে আসে ঘরে-ফিরে-আসা গোধূলির ধূসরতা। যদি তার ভালো লাগে, যদি ভালো লাগে তার পৃথিবীর কারু কোনো ক্ষতি না করে, তবে কেন সে এইটুকু, শুধু এইটুকু ভালো দিয়ে তার জীবনের ক'টি রিক্ত মুহূর্তকে ভরিয়ে তুলবে না? কী যে মূর্খ যুক্তি থাকতে পারে এর প্রতিবন্ধনে, সৌম্য তো ভেবে হয়রান।

শুধু তার নিরপেক্ষ ভালো লাগবে বলে নয়, তবু, এমনিতেই, তাকে সেখানে যেতে হবে। সোজা কথা, না গিয়ে সে পারবে না। থাকতে পারবে না কিছুতেই এই একাকী আর্ত আত্মনিমগ্নতায়, যখন তার জন্যে আর-কোথাও পুড়ছে একটি অন্ধকার, জ্বলছে একটি সহানুভূতি। তাকে যেতে হবেই। যেন তার অবচেতনার মাঝে একটা ডাক এসেছে, রাত্রির গভীর স্তব্ধতার ডাক। তার অস্ফুট প্রতিধ্বনি-মানতায় পাচ্ছে সে নতুন ভাষা, যা এতোদিন তার সাংসারিক অভিধানের কোনো পৃষ্ঠায় লেখা ছিলো না। যাবে, নেহাৎ না-যাওয়ার কোনো মানে হয় না বলে।

যাবে, যদি এক সময়, সময়েরো অজানতে, স্তব্ধতার দেশ থেকে চলে আসে

স্পর্শের সমীরণ। চন্দ্রমার লেখা যদি পরিণাম পায় তরল পৌর্ণমাসীতে। কে জানে কোন্ স্বর্গের দ্বারোদ্ঘাটন হবে। দিন যাপনের বদলে ফিরে পাবে জীবনবহনের চরিতার্থতা। শুধু হৃদয় দিয়ে কী হবে, যদি না থাকে বুদ্ধির প্রসাধন, ব্যক্তিত্বের প্রদীপ্তি। শুধু ক্ষুধা মেটানোই তো নয়, চাই স্বাদ, ব্যঞ্জনে নুন, রক্তে তীক্ষ্ণতা, নিজেকে প্রসারিত করার পরিবেশ।

সৌম্য একটু সজ্ঞানে সাজগোজ করলো। মন যে তার খুশি হয়েছে সে-কথা শরীরকে সে অবাধে জানতে দিলে। পিছন থেকে অদৃশ্য ভ্রূভঙ্গি করে শিপ্রা তাকে একটু দেখছে হয়তো, কিন্তু ভদ্রতার খোলসটা মানুষ এর চেয়ে হালকা করে কী করে, সমস্ত শরীরে প্রচ্ছন্ন একটা প্রত্যুত্তর দিয়ে সৌম্য সগর্বে বেরিয়ে গেলো।

ঝি এসে দিলে দরজা খুলে। বনানী ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো—আশ্চর্য, তার হাতে একটা খুন্তি।

—এই যে, শেষ পর্যন্ত সময় করে এসে পড়েছেন যা হোক। ঠাকুমার কী ভাগ্যি।

—ও কী, রান্না করছিলেন বুঝি? পিছনে দরজাটা ভেজিয়ে সৌম্য ভিতরে চলে এলো।

—হ্যাঁ, আপনাকে সম্বর্ধনা করতে নয়। আসুন, রান্নাটা আমি নামিয়ে আসছি। বনানী পরদা সরিয়ে ঘরের বাইরে পা দিতে-না-দিতেই চেঁচিয়ে উঠলো : ও ঠাকুমা, দেখবে এসো কে এসেছে।

বনানী এবার তার ঠাকুমাকে নিয়ে ঘরে এলো। শীতে ঝরে পড়ে গেছে সব শুকনো পাতার ভার, রিক্ত শাখায় বিশীর্ণ একটা গাছের মতো ঠাকুমাকে দেখালো। ঝরে গেছে সব মাংসল আবেশ, স্নায়ব বিহ্বলতা—জীবনের সমস্ত কিছু অবান্তর আতিশয্য গাছের প্রচ্ছন্ন, প্রোথিত ক'টি শিকড়ের মতো রয়েছে ক'খানা হাড়, জীবনের শেষতম অস্তিত্বের শুচিতা। ধোঁয়া নেই, তাপ নেই, দাহ নেই, তবু একটা শিখা, জীবনের পবিত্রতম অভিব্যক্তি। অভিজ্ঞতা দিয়ে বাঁচা নয়, রোমাঞ্চ নিয়ে বাঁচা নয়, শুধু বাঁচতে হবে বলে বাঁচা। বাঁচার মাঝে এমন একটা দুঃসহ নিস্পৃহতার রূপ দেখে সৌম্য ক্ষণকাল সম্মোহিত হয়ে গেলো।

ঠাকুমাকে সে প্রণাম করলে।

তার চিবুক ধরে একটি চুমু খেয়ে তাঁর মুখের নির্দন্ত দীপ্তিতে ঠাকুমা বললেন, —তোমার মুখখানা দেখবার জন্যে কতোদিন থেকে হা-পিত্যেশ করছি।

বনানী টিপ্পনি কাটলো : একপক্ষ প্রত্যাশা করলেই তো হয় না, অন্য পক্ষেরো সময় পাওয়া চাই যে।

ঠাকুমা সৌম্যর পক্ষ হয়ে বললেন,—কী করেই বা পাবে? প্রকাণ্ড চাকরি করছে না? কতো মাইনে পাও?

বনানী বললে,—নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমি সরে যাচ্ছি।

সৌম্য অনায়াসে বললে,—এখন, চার-শোর কিছু ওপরে।

—খুব সুখের কথা। বেঁচে থাকো। শিপ্রা আমাদের ভারি পয়মন্ত। পা দিতে না-দিতেই ঘর-দোর সে লক্ষ্মী-শ্রীতে ভরে তুলেছে।

—কিন্তু, বনানী স্মিতমুখে প্রতিবাদ করলো : শিপ্রার আসবার আগে থেকেই ওঁর চাকরি।

—হলোই বা। ঠাকুমা বললেন, —লক্ষ্মী মেয়ে না হলে কী আর দু'হাত ভরে এতো ঐশ্বর্য পেতে পারে কখনো? তুমি বোসো, বাবা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—কী আশ্চর্য, বনানী দুই চোখের অসহায় একটি ভঙ্গি করে বললে,—সামনে চেয়ার দেখেও আপনি বসতে পাচ্ছেন না? মুখে আবার তা বলতে হবে? দেখুন, আগেই কিন্তু বলে রাখছি, ভদ্রতার মৌখিকতায় আমি বেশি মুখর নই।

—না, না, বসছি। সৌম্য হেলান-দেয়া নিচু একটা বেতের মোড়ায় বসলো, শরীরের সহজ, শীতল শিথিলতায়।

ঠাকুমা ঈষৎ ঝাঁজালো গলায় বললেন,—তুই সংসারের কোন জিনিসটা জানিস? তারপর সৌম্যর দিকে চেয়ে গলা নামিয়ে: তুমি এই লক্ষ্মীছাড়িটার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারো, বাবা? কতো ভালো-ভালো চাকুরের সঙ্গে তোমার চেনা।

সৌম্য একটু থতিয়ে বললে,—কী ব্যবস্থা?

—আর কী ব্যবস্থা! বনানী খিলখিল করে হেসে উঠলো: যাতে একজনের ঘরে পা দিতে না দিতেই তার ঘরটা ঐশ্বর্যে একেবারে উথলে দিতে পারি। নিজের ঘরটাতে শত দাপাদাপি করেও কিন্তু কিছু করতে পারলুম না।

—হাসছিস কী? ঠাকুমা নিজেই হেসে ফেললেন: তোমাকে আপনার লোক ভেবেই বলছি, দেখো না চেষ্টা করে, ওর একটা কিছু গতি করতে পারো কিনা?

—কিন্তু তাহলে তোমার কী গতি হবে, ঠাকুমা? বনানী দুই হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলো।

—আহা! কেন, নাত-জামাই আমাকে মাস-মাস গোটা কয়েক টাকা তুলে দিতে পারবে না? কী বলো? আমি চলে যেতুম তখন কাশীতে।

—তোমার নাত জামাইয়ের ভারি বয়ে গেছে, আদ্যিকালের কোন এক থাদাবুড়ির জন্যে পয়সা খরচ করতে যাবে!

—কেন, তুই আছিস না পোড়ারমুখি?

—আমি তো এই-ই আছি, ঠাকুমা!

—আহা, আমারই জন্যে যেন ওর বিয়ে করা হচ্ছে না।

বনানী আবার হাসির অনর্গলতায় পিছল হয়ে উঠলো: ইস্, আমি যেন তোমারই কথা ভেবে বিয়ে করছি না! আমার বিয়ে যদি সত্যি হতোই, তবে আমি যেন আর এই বুড়ির জন্যে বসে থাকতুম!

—তবে, এতো সম্বন্ধ এলো, এতো ভালো-ভালো সম্বন্ধ, একটাতেও তুই রাজি হলি না কেন?

ঠাকুমার পাকা চুলে আদর করতে-করতে বনানী বললে—ও সব তো কতোগুলি সম্বন্ধই, ঠাকুমা, একটাও সম্পর্ক নয়।

ঠাকুমা কৃত্রিম রোষে তাকে একটা ঠেলে দিয়ে বললেন,- যা, অনেক হেসেছিস, যতোদিন আছি, ততোদিন এই হেসেই জ্বালাবি। এখন যা, সৌম্যকে কিছু খাইয়ে দে। বলতে-বলতে নিজেই তিনি অন্তর্হিত হলেন।

বনানী সৌম্যর দিকে লঘু এক-পা এগিয়ে এসে বললে,—আপনাকে একটা নতুন, অদ্ভুত জিনিস এনে দি, খাবেন? ঠিক ভদ্রতায় হয়তো পড়ে না।

সৌম্য তার দিকে, তার শিহরায়মান এই লঘুতার দিকে চেয়ে থেকে শুধোলে : কী ?

—আমি যা রাঁধছিলুম। মাছ-ভাজা। চাঁদা-মাছ সমুদ্রের। চমৎকার স্বাদ। দাঁড়ান, নিয়ে আসি।

বনানীর আজ অন্য রকম সুর, তার এই ঘেরা দেয়ালের দেশে। তার সমস্ত লঘুতা নিয়ে সে যেন একটা উড়ন্ত পাখি, তার দূরত্বে আজ অভিনব আকাশের ব্যঞ্জনা। পরনের শাড়িটিতে সেই তীব্র পারিপাট্য নেই, তার চিত্তের চমকিত চঞ্চলতা যেন ভাঁজে-ভাঁজে ছড়িয়ে পড়েছে। তার মাঝে যে আবার এমন একটা শুভ্র স্বাভাবিকতা আছে এ কথা সৌম্য কবে বিশ্বাস করতে পারতো ? কে জানতে পারতো তার মধ্যে আছে আবার এই সীমাবদ্ধ সংসারের সুর ? ঈগল পাখি দুই ডানা ছুঁড়ে উড়ে গেছে সমুদ্রের উপর দিয়ে, আবার ফিরে আসছে তার নিরিনীড়ে, পর্বতশিখরের রিক্ত আশ্রয়ে। সংসারের সুরটিও তার উচ্চগ্রামে বাঁধা। কড়িকাঠের নিচে খড়কুটো-কুড়োনো সে সামান্য বিলাপভাষী ঘুঘু নয়।

—কী ভাবছেন ? প্লেট্-এ করে কড়কড়ে-ভাজা কতোগুলি মাছের টুকরো নিয়ে বনানী ঘরে ঢুকলো : মনে মনে চাকুরে পাত্রদের সন্ধান করছেন বুঝি ?

—যদি মত দেন, সৌম্য সবিনয়ে একটু হাসলো : জোগাড় করে আনতে পারি বৈ কি।

—জোগাড় করে পাত্র পাওয়া যায় বটে, বনানী একমুহূর্তে আবার দুরূহ হয়ে উঠলো : কিন্তু জোগাড় করে কখনো পূর্ণতা পেতে পারি না। যা পাওয়া যায় তাই বড়ো নয়, যা পেতে হয় তাই বড়ো। আমার মাঝে সব সময় এই একটা নিষ্ক্রিয় প্রস্তুতি আছে। কিন্তু বনানী প্লেটটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললে,—এখন এগুলো খান, আমি চা করে আনছি।

সৌম্য তার দিকে কুটিল করে চেয়ে বললে, কিন্তু এগুলো খেতে তো আমার ভালো না-ও লাগতে পারে ?

ইশারাটা বনানী বুঝলো। হেসে বললে,—আপনার ভালো না লাগে, আমার যে ভীষণ ভালো লাগবে আপনাকে খাইয়ে। এখন এ দুই ভালোর প্রতিযোগিতায় কে জেতে দেখুন।

কথাটা যে সেদিন এই ভাবে বলা যেতো সৌম্যর মনেই হয়নি। কাঁটা ছাড়িয়ে মাছের একটা টুকরো সে মুখে পুরলো।

বনানী চা নিয়ে এলো, একবাটি তার নিজেরও জন্যে। বসলো দূরে, তার তক্তপোষের কিনারে, দেয়ালে হেলান দিয়ে। তার দেহের ভঙ্গুর বঙ্কিমায় একটি অর্ধোচ্চারিত অন্তরঙ্গতা।

সাহস পেয়ে সৌম্য জিগ্গেস করলো : আপনি কোনদিন বিয়ে করবেন না বুঝি ?

—পাগল ! বনানী ভঙ্গীর আলস্যটিকে ব্যস্ত করে তুললো : এ-কথা আপনাকে কে বললে ? খুব ভালো লাগলে বা নিতান্ত ভালো না লাগলে যে কোন মুহূর্তে বিয়ে করে ফেলতে পারি। কিন্তু সে-সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার-আপনার কারুরই কোন দরকার নেই, মাছগুলি সব সাবাড় করুন।

—না, আর খেতে পাচ্ছি না। সত্যি পাচ্ছি না। সৌম্য চায়ের বাটিতে চুমুক দিলে।

বনানী বললে,—এ-বিষয়ে আমার পাকাপাকি কোন মত নেই, থাকতে পারেও না, আমি নিজের কাছেই ভীষণ অস্পষ্ট। এবং মনে হয় সব মানুষই কম বেশি তাই, তাদের নিজেদের কাছে। কখন কে কী হয়ে উঠি কেউ বলতে পারে না। অতএব কে কী করবো বা না-করবো তা নিয়ে কথা বলতে গেলে কখনোই সত্য কথা বলা হবে না। আমি কি জানি আমার সমগ্র সম্ভবনীয়তাকে, কখনো জানি, আমারই মাঝে কতো অজ্ঞেয়, কতো অপ্রাপ্য, কতো অনাবিষ্ক্রিয় আমি আছি? বনানী আবার তার ভঙ্গিটিকে অলস প্রশ্রয়ে নমনীয় করে আনলো। একটু-বা করুণ করে চেয়ে বললে,—অন্য কথা বলুন, ব্যক্তিগত কথা আমার একটুও ভালো লাগে না। নিজের মাঝে কেমন যেন ছোট হয়ে থাকি।

তারপর তাদের মাঝে শুরু হলো অনেক কথা, অনেক মুখরিত নৈঃশব্দ্য। সৌম্যই বেশি উৎসাহ দেখালো। সে জানতোও না যে এতো কথা সে জানতো. এতো কথা ছিলো তার বলবার। বই আর দেশ, এমন-কি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ছোট-খাটো পরিভাষা—ব্যাক্‌টিরিয়াম্‌ ও ভিটামিন। যতো বাজে কথা. খুঁটিনাটি কথা, সময় কাটাবার অসামরিক কথা। এমন কথা, যাতে তার নিরর্থকতার আবহাওয়ায় একটি সুদূরসঞ্চারী বন্ধুতা আসে ঘনিয়ে, পরস্পরকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যা মিলিয়ে যায় বিস্মৃতিতে। সৌম্য যেন আরেকটা নতুন জগৎ খুঁজে পেলো, তার শব্দ ও স্তব্ধতা দিয়ে তৈরি। খুঁজে পেলো নিজেকে উদ্ঘাটিত করবার নতুন সূচীপত্র, সেই নিদর্শনে সে যেন আরেকটা পৃষ্ঠা উলটোলে তার নতুনতরো আয়তন, নতুনতরো অনুপাত। সে যে শুধু একটা মাত্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে তৈরি নয়, তার মাঝে আছে যে একটা বিশাল বিরোধিতার বৈচিত্র্য, পেলো সে নিজের সম্বন্ধে সেই অপূর্ব চেতনা। দেখতে-দেখতে সে যেন বদলে গেলো, অস্তমিততা থেকে নতুন সূর্যোদয়ে, যেন পেলো আবার একটি আরম্ভের প্রবলতা।

কথার বিচ্ছুরিত কোমলতায় বনানী উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কথার নির্মল জলের মধ্যে ফুটে উঠেছে দু'-একটি করে তার হাসির সফেনতা। সমস্তটি আবহাওয়া কথায় উষ্ণ, ঘন হয়ে এসেছে। কথার তাপে কোথা দিয়ে যে সময় যাচ্ছে গলে, শীতের রাত আলস্যে এসেছে সঙ্কীয়মান হয়ে, কারুরই কোনো খেয়াল নেই। দুই অন্ধকার স্তব্ধতার মাঝে ফেনায়িত হয়ে উঠেছে কথার উজ্জ্বল জলধারা।

আর কী নিয়েই বা কথা! পাখিদের নিজেদের ম্যালেরিয়া হয়, ইঁদুরের হয় ক্যানসার, শস্যদের মধ্যে দেখা দেয় সংক্রামক রোগ। যে-মশাতে ম্যালেরিয়া হয় তারা মেয়ে-মশা। এই জীবাণুতত্ত্ব থেকে আবার কী কৌশলে তারা সাহিত্যে এসে পড়ে। সত্যি, সাহিত্যের কোনো চরিত্র দিয়ে আমরা প্রভাবিত হতে পারি কিনা। অসম্ভব, সাহিত্য পড়ে আমরা ততোটুকুই পাই যা আমাদের নিজেদেরই ভাবের প্রতিধ্বনি, ততোটুকুই হই, আমরা এমনিতেই যা হতুম, ঠিক ততোটুকুই। তারপর চলে যায় বা ঐশ্বরিক জিজ্ঞাসায়। মানুষ ঈশ্বরের, না, ঈশ্বরই মানুষের পরম রচনা। মরলে কী হয়, সৌরমণ্ডলের এই এক অণু পৃথিবীতেই আমাদের আয়ুর অঙ্কপাত কিনা। কথা, কথা, অগণন কথা।

সৌম্য হঠাৎ এক সময় চঞ্চল হয়ে বলে উঠলো : রাত অনেক হয়ে গেলো। এবার আমি যাই !

—যাবেন এখন। বনানী চোখের দীর্ঘ একটি আলস্যে তাকে আদ্র করে তুললো : এতো তাড়া কিসের ?

—না, কোনো বিশেষ তাড়া নেই বটে। চাদরটা সৌম্য কাঁধের থেকে চেয়ারের পিঠের উপর আবার ছেড়ে দিলো।

বনানী বললে,—যদি অবিশ্যি ভালো না লাগে, তবে কক্খনো আর থাকতে বলবো না।

—শেষকালে বোধকরি তাড়িয়ে দিতেই আপনার ভালো লাগবে। সৌম্য সপৌরুষ শক্তিতে হেসে উঠলো।

কথা এসে আঘাত পেলো এই স্তব্ধতার পাথরে। চারধারে একটা নিঃশব্দ মূর্চ্ছা। কুয়াসায় সব যেন কেমন অস্পষ্ট, অবাস্তব : গ্যাসের আলো, বাড়ির দেয়াল, ক্লান্তিকর রাস্তার একাকীত্ব। মনে হলো এই অবাস্তবতায় তারাও যেন ধীরে-ধীরে ডুবে যাচ্ছে। একজনের কারু কথা বলা দরকার, কিন্তু একজন আরেকজনের মুখের দিকে চেয়ে,—কে কথা কইবে ?

কথা নেই, কথা নেই।

কথা নয়, এবার যেন কিসের প্রত্যাশা। তীক্ষ্ণধার স্তব্ধতার পাষাণে নতুন কী শিলালিপি! যার জন্যে কোনো জিজ্ঞাসা নেই, কোনো প্রতিরোধ নেই। বিচার বিবেচনার ঊর্ধ্বে আদিম প্রতিপাদন।

মনে হলো, ঘরে যেন একজন ছাড়া আরেকজন কেউ নেই। হাত বাড়িয়েও কেউ কাউকে যেন খুঁজে পাবে না, সমস্ত ঘর অন্ধকার থেকে মুছে ফেললেও না। তুমি কোথায় ? আত্মার গভীর অন্ধকার থেকে দুজনেই আর্তনাদ করে উঠছে, কিন্তু নিজের কান্নায় আরেকজনের কান্না শুনতে পাচ্ছে না। শুধু প্রশ্নই করছে, উত্তর নেই। শুধু প্রতীক্ষাই করছে, নেই আবির্ভূতি।

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ বারো ॥

রাতে আয়নায় মুখ দেখা বারণ—শিপ্রা আজকাল সেই কুসংস্কার মানে না, মানবার তার সেই বয়েসও যেন আর নেই—নিচু, নতুন ড্রেসিংটেবল-এর সামনে ছোট, চৌকো একটা টুলে বসে শিপ্রা চুল বাঁধছিলো। অনেক দিন পরে তাকে আমরা দেখলুম : তার খোকা এখন পুরো তিন মাসের। খাটভরা প্রকাণ্ড, পুরু বিছানাটার মাঝখানে আরেকটি ছোট বিছানায় রঙিন মশারির নিচে কাঁথাবালিশের ভিড়ে খোকা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এতোক্ষণে শিপ্রা নিজেকে নিয়ে বসবার একটু সময় পেলো। বাবাঃ, একরত্তি মাংসের একটা ড্যালা, তার কী চেঁচায়! চোখে দেবে না একটু কাজল পরাতে, শুকনো একটা জামা পরাতে গেলেই যতো অনাছিষ্টি। থাকতে চায় কেবল বুকের গরমে, আদরের ঠাণ্ডায়।

কতো কষ্টে তাকে ঘুম পাড়িয়ে শিপ্রা এতোক্ষণে এই চুল বাঁধতে বসলো। দু দিনে ঘর-দোর সে কিচ্ছুই গুছিয়ে উঠতে পারেনি, নিচে-উপরে এখনো সব এক-হাঁটু। চারিদিকে সব অমিছিল, এলোমেলো ধুলো লেগে-লেগে খাটের বার্নিশটা পর্যন্ত চটে গেছে। এখনো কতো তার গুছোনো বাকি, সামান্য ক্যালেণ্ডারের তারিখ পর্যন্ত এতোদিন বদলানো হয়নি, তাকের উপরকার ছোট টাইমপিসটা রয়েছে বন্ধ হয়ে। আশ্চর্য, সৌম্য এতোদিন করছিলো কী? কড়িকাঠের কিনারে টুকরে-টুকরে ফোকর করে দুটো চড়ুই পাখি দিব্যি বাসা করেছে, দেয়ালের ফটোগুলি রয়েছে বেঁকে, তাদের পেছনে মাকড়সারা বুনছে জাল। দু দিনে সে কতো গুছোবে? তার ছেলে যেমন কাঁদুনে, তাকে সামলাতেই তার দিন কেটে যায়, রাতেরো প্রায় অনেকখানি। তবু চোখে যা প্রথম উৎকট ঠেকেছিলো, সব সে এরি মধ্যে কিছুটা সায়েস্তা করে নিয়েছে। আলনার তলায় জমেছিলো ময়লা কাপড়ের কাঁড়ি, সরিয়েছে তক্ষুণি ধোপা ডাকিয়ে : চেয়ার-টেবলগুলো ছিলো আপন মনে এখানে-ওখানে ছড়ানো, সব সে নিয়ে গেছে তাদের পুরোনো পরিধিতে : আলমারির দরজা দুটো তো সে এসে খোলাই দেখতে পেয়েছিলো। আশ্চর্য, এতো বিশৃঙ্খলাই বা এলো কোত্থেকে? ঘর-দোরের যা হয়েছিলো, ঠিক একটা বাউণ্ডুলে, উড়নচণ্ডি চেহারা। এ-ঘরে যেন কেউ থাকে না, শোয় না, দিবা-রাত্র হাত-পা তুলে নৃত্য করে। নিচেও কম উপদ্রব হয়নি, কোথায় বা ডালের হাঁড়ি, কোথায় বা কয়লা ভাঙবার হাতুড়িটা। আলোর বালব্ গেছে দুটো ভেঙে, চায়ের সেট্‌টা গেছে কানা হয়ে। সে ছিলো না, তার মানে এতোদিন যেন এ-বাড়ির নিচেটা একটা পোড়ো ভূতের বাড়ি হয়ে ছিলো। লক্ষ্মীর গায়ের চল্‌টা উঠেছে, জগন্নাথের ছবির জমকালো রাঙতা আরশুলা খেয়েছে চেটে। এ দু'দিনে যতোদূর সাধ্য ঘর-দোরের সে একটা শ্রী ফিরিয়েছে, কিন্তু এর চারপাশে আগেকার সেই সুস্থ, স্থির, সুস্মিত প্রসন্নতা

আনতে যেন এক যুগেও কুলোবে না। আর, বলতে কি, তার শরীরেও যেন আর দিচ্ছে না।

আয়নায় তার চেহারা দেখে শিপ্রা নিজেই কেমন চমকে উঠলো। এর আগে এতোদিন এ-আয়নায় তাকে এমন চোখে দেখবার তার অভ্যেস ছিলো না। চিরুনি চালাচ্ছে আর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে আসছে এক মুঠো করে শুকনো চুল, চুলের সেই শ্রীহীনতা সমস্ত মুখে এনে দিয়েছে বিশীর্ণ একটা বিষাদ। সমস্তটা মুখ শুকিয়ে কেমন লম্বাটে দেখাচ্ছে, নাকটা উঠেছে ঠেলে। ভুরু দু'টো কেমন কুঁচকে নুয়ে এসেছে, চোখের চারপাশে গভীর করে কালি বুলোনো। হায়, আয়নাটা পর্যন্ত বদলে গেছে। নিজের চেহারা দেখে শিপ্রার নিজেরই ভারি মায়া করতে লাগলো। তার সন্তানের জন্যে তাকে আর কম মূল্য দিতে হয়নি। সমস্তটা শরীর কেমন ধ্বসে গেছে, গা-টা সব সময় কেবল ছ্যাঁক্-ছ্যাঁক্ করছে, চামড়া এসেছে খস্‌খসে, নিষ্প্রভ হয়ে। নেই আর সেই পিচ্ছল দীপ্তি, সেই পূর্ণস্ফূর্ত উচ্ছলতা। চর জেগেছে, তাই নদী এসেছে মরে। ফল এসেছে, তাই ফুল ঝরিয়ে দিয়েছে তার পাপড়ির পরিচয়। জ্বলেছে যখন আগুন, তখন তলাকার ছাইয়ের দিকে কে তাকায় ?

তার শরীরের এই হাল দেখে সৌম্য আপিস থেকে ফিরেই অমনি ছুটেছে ডাক্তারের বাড়ি। প্রথম দিনটা কোনো রকমে তাকে দাবিয়ে রাখা গিয়েছিলো, কিন্তু এই ঘুষঘুষে জ্বরটা নাকি ভালো নয়, সৌম্যকে আর থামানো গেলো না। ভীষণ বাড়াবাড়ি। আপনিতেই তার সেরে যেতো, তার এই পুরোনো পরিবেশের উত্তাপে, তার এই স্নেহঘন শয্যার শীতলতায়। মানুষের টাকা থাকলে কতো বাজে কাজেই যে তা উড়োনো চলে। খোকার জন্যে একটা আয়া রেখে দেয়া হয়েছে, সেটার তবু একটা মানে হয়। কিন্তু ক'দিনের একটুখানি জ্বরের জন্যে শহর তোলপাড় করে ডাক্তার নিয়ে আসতে হবে, যাই বলো, এটা একটা অত্যাচার। সত্যি, তার এই রহস্যময় অলৌকিক দেহটা যান্ত্রিক তথ্যসন্ধিৎসার অধীনে নিয়ে আসতে হবে ভেবে শিপ্রা যেন মনের একটা অশুচিতা অনুভব করছে। যেন তার কাব্যসৃষ্টিকে নিয়ে আসছে সে ব্যাকরণের বিচারে।

কিন্তু উপায় নেই, তার রূপের চেয়ে প্রয়োজনীয় এখন সুস্থতা। তার আর ততো সময় নেই যে, নিজের খুশিতে বয়ে যাবে নিজের শরীরের ঢেউয়ে, এখন তার শরীরের অতল শীতলতায় নেমেছে একটি সমর্পণের শান্তি। সে আর এখন নিজের জন্যে নয় : সে উৎসর্গীকৃত। তার জীবনের উদ্বৃত্ততার ঐশ্বর্যে সে এখন সমারূঢ়। তার আর এখন সময় নেই পাতার শ্যামল প্রসারণে, সে চলে গেছে মূলে, মাটির গভীর অন্ধকারে, তার নিজের মহান অতিক্রান্ততায়। তাকে ছেড়ে তার এই অতিরিক্ততার বিস্ময়ে। নিজেকে এই নতুন করে সৃষ্টি করবার আয়োজনে।

ফিতেটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে শিপ্রা লতিয়ে-লতিয়ে বেণী করছিলো, সামনের আয়নায় পড়লো কার আধখানা ছায়া। শরীরের সেই বিহ্বল ডৌল দেখেই শিপ্রা তাকে এক নিমেষে চিনে ফেললো, টুল ছেড়ে উঠলো লাফিয়ে।

—এ কী, তুমি এলে কবে ? বনানী খুশিতে ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

—এই তো পশু। শিপ্রার গলা কেমন ভেজা, ঠাণ্ডা।

—তোমার চেহারা এ কী বিচ্ছিরি হয়ে গেছে, শিপ্রা? বনানী যেন আঁৎকে উঠলো: শক্ত কিছু অসুখ করেছিলো নাকি? তোমাকে এই শোয়ার ঘরে দেখতে না পেলে আমি তো তোমাকে চিনতেই পারতুম না। কী হয়েছিলো?

শিপ্রা ম্লান একটু হেসে রঙিন মশারিটির দিকে আঙুল তুলে ইশারা করলে: ঐ যে।

—ও কী, তোমার ছেলে হয়েছে নাকি? বনানী তাড়াতাড়ি সেই ছোট্ট মশারির উপর ঝুঁকে পড়লো। ফিরে এসে বললে—কী? ছেলে?

মধুর একটি লজ্জায় ভিজে উঠে শিপ্রা বললে,—হ্যাঁ।

—কই, আমাকে তো কেউ বলেনি। বনানী ঘরময় চোখ বুলিয়ে খোকার অস্তিত্বের ছোট-ছোট চিহ্নগুলি দেখতে লাগলো: আমি তো এতোদিন তা কিছুই জানতুম না। ইস্, তুমি যে ভারি রোগা হয়ে গেছ।

শিপ্রা একটা চেয়ার এগিয়ে দেবার চেষ্টা করতে গেলো; বললে,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।

—না, বসবো না। বনানী আকস্মিক একটা দ্রুততার দীপ্তি আনলে: আমার এক্ষুণি এক জায়গায় যেতে হবে। সৌম্যবাবু কোথায়? বাড়ি আছেন?

গম্ভীর হয়ে শিপ্রা বললে,—না বোধহয়।

—নেই? বনানী এগিয়ে গিয়ে বসবার ঘরের দরজার পরদাটা তুলে ধরলো: সে কী কথা? তাঁর সঙ্গে আমার যে একটা জরুরী কাজ ছিলো। ভুলে গেলেন এরি মধ্যে? বনানী আবার আলোয় ফিরে এলো: কোথায় গেছেন বলতে পারো?

—তা আমি কী করে বলবো?

—বা, তুমি বলতে পারো না? বনানী হাসলো: আপিস থেকে ফিরে সাধারণতো এতো তাড়াতাড়ি তো তিনি কোথাও বেরুন না। সত্যি, তুমি জানো না?

শিপ্রার গলায় প্রচ্ছন্ন একটু ঝাঁজ পাওয়া গেল: কোথায় উনি যান না-যান আমাকে সব সময় বলে যান নাকি?

—আচ্ছা, এলে বোলো আমি এসেছিলুম। বনানী যাবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

শিপ্রা সঙ্গে-সঙ্গে ভাঙা পায়ে এগিয়ে এসে বললে,—বসে যাও না একটুখানি। উনি এক্ষুণি হয়তো এসে পড়বেন।

—না, আমার বসবার একটুও সময় নেই। বনানী দরজার বাইরে চলে গেলো: মনে করে তুমি বোলো কিন্তু, ভুলো না। বনানী খট্‌খট্ করে জুতোর গোড়ালির শব্দ করতে-করতে নিচে গেলো নেমে।

ঘরের স্তব্ধতাটা ভারি একটা পাথরের মতো শিপ্রার বুক চেপে ধরলো। আলোটা যেন নিঃশব্দ একটা অট্টহাসির মতো জ্বলছে। ঘরের দেয়ালগুলো অন্ধকারে যাচ্ছে গলে। শিপ্রা খানিকক্ষণ প্রেতায়িত, সাদা একটা ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রইলো, রাগ বা দুঃখ কিছুই যেন তার বোধ নেই।

বনানী তাহলে আজ এই প্রথম এ-বাড়িতে আসছে না। তার আসা-যাওয়ার

মধ্যে কেমন একটা অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য, সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ তার গোনা, দরজা-জানলাগুলি মুখস্ত। ঘরের সমস্ত হাওয়া তার পথ ছেড়ে দেয়, দেয়ালগুলি কেমন পরিচিত চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে। না, এই প্রথম আসছে না সে। শিপ্রা যে এখানে এসেছে এই খবরটা ঘুণাক্ষরেও তার কানে ওঠেনি। তবু, এমনি সে এসে পড়েছিলো যেমন সে প্রায়ই এসে থাকে, যেমন সে এতোদিন এসেছিলো শিপ্রার অনুপস্থিতির অবকাশে। না, তার জন্যে সে আসেনি, এলে এমন একটা ঝাপটা মেরে চলে যেতো না, কিছুক্ষণ হয়তো বসতো এতোদিন পর দেখা, গল্প করতো হয়তো গলা নামিয়ে। আশ্চর্য, স্পষ্ট করে তো সে বলেই গেলো কার কাছে এসেছিলো —তবু এতো সন্দেহের কী দরকার! শিপ্রার চোখ-মুখ জ্বালা করে উঠলো। না, সে এই নতুন আসেনি, তার আজকের এই পলায়মান দ্রুত বিদ্যুতের পিছনে সঞ্চিত হয়ে আছে অনেক মন্থরতার মেঘ। এই ঘরের হাওয়ায় শিপ্রা যেন অনুভব করলো অনেক তাদের ঘনতার সৌরভ, অনেক তাদের নির্জন উষ্ণতা। অথচ এই তাদের এতো মেলামেশার মধ্যে সৌম্য একদিনো বলেনি, ভুল করেও বলেনি শিপ্রার এই নতুন সৌভাগ্যোদয়ের কথা। যেন কথাটা কতো লজ্জার, সেটাকে চেপে রাখাই ভালো। বিরাট পৃথিবীতে সে যেন একটা নেহাৎ অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর ঘটনা—এতে তাদের কোনোই রুচি নেই, আকর্ষণ নেই, এতে তাদের কিছু এসে যায় না। কতো মারই তো ছেলে হচ্ছে — এ আবার কে মনে রেখে কার কাছে বলতে যাবে? বলেনি, শিপ্রা এতোদিন ধরে কী ভয়ানক ভুগছে, জ্বরে-জ্বরে কেমন শুকিয়ে আসছে সে একটু-একটু করে। হ্যাঁ, বলবার মতো একটা কথা বটে! কার না কার একটু জ্বর হয়েছে, সেই তাপ কেউ আবার তার মনের মধ্যে পুষে রাখে! তার চোখের সামনে যখন স্বাস্থ্যের এমন একটা পুষ্পিল উজ্জ্বলতা, নির্মেঘ নির্মল নীলিমা। বয়ে গেছে তার অসুখের কথা বলে সেই রুপোলি আবহাওয়াটাকে ঘোলা করে তুলতে। শিপ্রার সমস্ত শরীর ঘৃণায় পিচ্ছল হয়ে উঠলো। আর সেই জন্যে, তার এই অসুখ হয়েছে বলে বনানী তার উপর কী অপরিমেয় সদয়। তাকে কে এই অধিকার দিয়েছে তাকে এই সহানুভূতি দেখাতে? আর কী তার উদ্ধত ঘৃণা! তার খোকাকে সে একটু ছুঁলো না পর্যন্ত। এমন একটা ভাব দেখালো যেন সে একটা পোকার চাইতেও কুৎসিত। এতে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই, দেয়ালের ফাটলে সামান্য একটা চারাগাছ দেখে সে এর চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়। তার সেই বনানী-দি! আজ শুধু মুখের একটা ভদ্রতা করতে পর্যন্ত যার সময় হয় না। দিব্যি তাকে হুকুম করে চলে যায়—তার পদার্পণের খবরটা যেন স্বস্থানে সে পৌঁছে দেয়! আর, আশ্চর্য, সেই হুকুম কিনা তাকে আজ মানতেই হবে।

কতোক্ষণ কেটে গেছে কে জানে, সৌম্য ফিরলো ডাক্তারের বাড়ি থেকে। শিপ্রা জানলার কাছে উঁচু, বাঁধানো জায়গাটায় চুপ করে বসে আছে, ঘোমটা পড়েছে কাঁধের উপর ভেঙে, ঢলঢলে খোঁপায় মুখখানি দেখাচ্ছে ভারি করুণ, দুই চোখে যেন কতো রাতের অনিদ্রা।

সৌম্য তার কাছে এগিয়ে আসতে-আসতে খুশি, দরাজ গলায় বললে,—ডাক্তারকে কল দিয়ে এলুম, কাল রবিবার এগারোটার সময় আসবে।

দেয়ালের সঙ্গে লেপ্‌টে মিশে যেতে-যেতে শিপ্রা আর্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো : খবরদার, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না আমাকে।

—কেন, কী হলো ? সৌম্য একেবারে স্তম্ভিত।

—সরে যাও এখান থেকে। সরে যাও বলছি।

চারদিকে তাকাতে-তাকাতে সৌম্য সরে দাঁড়ালো।

শিপ্রা উঠলো খেঁকিয়ে : তোমার লজ্জা করে না, লজ্জা করে না তোমার ডাক্তারের বাড়ি যেতে ?

সাত-পাঁচ কিছু ঠাহর করতে না পেরে সৌম্য হতভম্ব হয়ে বললে, —কেন, কী হয়েছে ?

—কী হয়েছে ! পাশবিক ঘৃণায় শিপ্রার সমস্ত মুখ কুৎসিত হয়ে এলো : তোমার এতো সব জরুরী কাজ, আর তা ফেলে তুমি শখ করে ডাক্তারের বাড়ি বেড়াতে গেছ ? লজ্জা করে না ?

—আমার আবার কী কাজ ! সৌম্য বিড়বিড় করতে লাগলো : তোমার অসুখ, ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া ছাড়া আমার আর এখন কী জরুরী কাজ থাকতে পারে ?

—আহা, ন্যাকা ! উনি জানেন না ও'র কী জরুরী কাজ। শিপ্রার জিভটা লক্‌লক্ করে উঠলো : এদিকে রাজ্য যে যাচ্ছে তলিয়ে। যাঁর সঙ্গে জরুরী কাজ তিনি যে আজ এসেছিলেন।

সৌম্য মূঢ় চোখে চেয়ে রইলো : কে এসেছিলো ?

—আহা, কে এসেছিলো যেন উনি জানেন না ! সে যেন আজ এই নতুন আসছে।

—বা, নাম না বললে চিনবো কি করে ?

শিপ্রা সর্বাঙ্গে জ্বলে উঠলো : নাম কি আর তুমি জানো ? নাম কি তোমার কারুর মনে থাকে ?

—এ তো ভারি মুশকিলের কথা হলো দেখছি। সৌম্য অল্প একটু পায়চারি করে নিলো : মাথা ঠাণ্ডা করে নামটা স্পষ্ট বলে ফেললেই হয়।

শিপ্রা জানলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো : তুমি জানো না, সত্যি করে বলো, তুমি জানো না, তোমার কাছে কে আসে, কার এমন বরাবর ওপরে উঠে আসবার সাহস আছে ? জানো না, জানো না তাকে ? তবু তো, আমি এসেছি, এ-কথা সে এখনো শোনেনি। সে তো তোমার কাছেই এসেছিলো, রোজ, রোজই তো আসে। তাই, তাই আমার ঘর-দোর এমন এলোমেলো, জায়গার জিনিস জায়গায় খুঁজে পাই না। জানো না, তাকে জানো না বৈ কি !

সৌম্য ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। আচ্ছন্ন গলায় বললে,—কে, বনানী এসেছিলো বুঝি ?

—আহা, নাম না বললে কী আর চিনতে পারবে ! শিপ্রা বিদ্রূপে বিষাক্ত গলায় হেসে উঠলো : নামটা তো দেখছি মধুর মতো জিভে লেগে আছে।

—এ-সব তুমি কী বলছ যা-তা ? সৌম্য ম্লান গলায় প্রতিবাদ করলে।

—আমি তো যা-তা বলবোই। সে যে তোমার কাছে জরুরী কাজের জন্য

এসেছিলো। শিপ্রা ধারালো গলায় ধমকে উঠলো : যাও না, যাও না, ঠাট করে আর এখানে বসে আছো কেন? রাজ্য যে ওদিকে ভেসে যাচ্ছে।

সৌম্য গম্ভীর হয়ে বললে,—কোন কাজটা আমার বেশি জরুরী তা তোমাকে আর বলে দিতে হবে না। আমি নিজেই ভালো বুঝতে পারবো।

—এতোদিন ধরে খুব ভালো করেই তো তা বুঝেছ। শিপ্রা হঠাৎ বিছানার উপর ভেঙে পড়লো।

সৌম্য তাড়াতাড়ি উঠে তাকে দু'হাতের মধ্যে টেনে নিলে।

শিপ্রা উঠলো মুঠোর-মধ্যে ধরা পাখির মতো ছটফট করে : ছেড়ে দাও, আমাকে ছুঁয়ো না বলছি,. যাও না. যেখানে তোমার বেশি ভালো. যে তোমার বেশি জরুরী। এখানে মরতে পড়ে আছো কেন?

সমস্ত শরীর বিষণ্ণ হয়ে এলেও সৌম্য কণ্ঠস্বরে উত্তাপ নিয়ে এলো : তুমি আমার কথাটা যে একেবারে উলটো বুঝলে। এমনি তোমার রাগ! আমি কী বললুম আর কী শুনলে!

—না, রাগ হবে না! সুখে আমি ধেই-ধেই করে নাচবো। ছাড়া পাবার জন্যে শিপ্রা আবার কতোগুলি ঢেউ তুললো : আমি মুখ্যুখু মানুষ, তোমাদের উলটো-সোজা কথার আমি কী বুঝবো? যে বোঝে তার কাছেই যাও না। সে তোমার জন্যে যে বসে আছে। যাতে তুমি এলেই তোমাকে পাঠিয়ে দিই আমাকে বারে-বারে তার দিব্যি দিয়ে গেছে।

সৌম্য হেসে উঠলো, হেসে না ওঠার চেয়ে আর কিছু সে ভাবতে পারলে না। শিপ্রার নুয়ে-পড়া পিঠের উপর আস্তে-আস্তে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে,—কী যে তুমি বলো ছেলেমানুষের মতো, কোথায় কী-একটা মিটিংয়ে যাওয়ার চেয়ে তোমার জন্যে ডাক্তারের বাড়ি যাওয়াটা বেশি জরুরী নয়? এই সামান্য, সোজা কথাটা তুমি বুঝলে না? বুঝলে না কে আমার বেশি ভালো, কে আমার বেশি আপনার?

এতোতেও শিপ্রা নরম হলো না। নিজেকে শিথিল করে নিয়ে দূরে সরে বসলো, এক ধারে। বললে,—তবে কেন ও আসে?

—বললুম যে অ্যালবার্ট-হল-এ আজ সন্ধ্যের সময় একটা মিটিং ছিলো, সেখানে বনানী দেবী যেতে চেয়েছিলেন।

—চেয়েছিলেন! শিপ্রা মুখ বেঁকিয়ে উঠলো : কেন তার নিজের দুটো হাত-পা নেই? তোমার কাঁধে চড়ে যাবার কী হয়েছে?

সৌম্য খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলো না। নীরবে তার চেয়ারে এসে বসলো। বললে,—তা তোমার বনানী-দিকেই জিগ্গেস করলে পারো। আমি তো আর যাইনি। দেখলে তো, আমি গিয়েছিলুম ডাক্তারের ওখানে।

—সে তো শুধু আজকের কথা হলো। কিন্তু আর কোনো-দিনও হয়নি এমুখো? আর কোনোদিন যাওনি ওর সঙ্গে শহর বেড়াতে?

—ছি, শিপ্রা, সৌম্য দুঃখে ঘৃণায় আপাদমস্তক বিমর্ষ হয়ে উঠলো : এ তোমার কী কুৎসিত ব্যবহার!

—আর তোমাদের ব্যবহারে পৃথিবী একেবারে পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। শিপ্রা

আবার ছিটকে মেঝের উপর ছুটে এলো, প্রখর গলায় বললে,—কেন, কেন ও আসবে ? আমি বাড়ি নেই জেনেও ওর আসা চাই কেন ?

—বা, তুমি তো বাড়ি আছোই।

—সে তো আজ হলো। অমন করে কথা ঘুরিয়ে নিতে পারবে না বলে রাখছি। আর এতোদিনের মধ্যে ও আসেনি একদিনো ?

—এলে কী হয় ?

—আর তুমিও গেছো তার বাড়িতে ?

—গিয়েছি। গেলে কী দোষ ?

নিষ্পলক, নিষ্ঠুর চোখে চেয়ে শিপ্রা বললে,—তুমি আমার গা ছুঁয়ে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলে না ?

—বা, আমি তার কী জানি ? ধরা-পড়ে-যাওয়া অপরাধী শিশুর মতো ধরা গলায় সৌম্য বললে,—ওঁর ঠাকুমা আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন, শিপ্রার বরকে দেখবার তাঁর যে কী দারুণ শখ, বলো, আমি যাবো না ? ঘরের কুনো হয়ে বসে থাকবো ? বলো—

—সে তো একদিন হলো। তারপর, তারপর আর যাওনি ?

—বা, প্রতিজ্ঞা একবার ভেঙে গেলে পরে আর যেতে দোষ কী ? সৌম্য হাসবার চেষ্টা করলো।

—তাই যাও না, যাও না তোমার সেই দেবীর কাছে, শিপ্রা হঠাৎ এগিয়ে এসে সৌম্যর গায়ে একটা ঠেলা দিলো : সেখান থেকে এখানে আর তবে ফিরে এলে কেন ? কে, কে তোমার ডাক্তার দেখাবে, কী হবে তোমার তাকে বাঁচিয়ে ? মিথ্যাবাদী কোথাকার ! উনি আবার আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন !

শিপ্রা ছুটে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লো। উঠলো ফুঁপিয়ে : আমি যাতে না বাঁচি তাই তো তুমি চাও। তাই তো তুমি আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেও তা রাখলে না।

সৌম্য চেয়ারে স্তব্ধ, নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলো। মেরুদণ্ডটা যেন অসাড় হয়ে গেছে, সমস্ত বসে-থাকার মধ্যে যেন আর এতোটুকু বশ নেই। ঘটনাটা আগাগোড়া সে স্পষ্ট আয়ত্ত করতে পারলো না : প্রবল অন্ধ একটা আকস্মিকতার মতো তার উপর ভেঙে পড়েছে। সজ্ঞানে এতোটুকু প্রস্তুত হবার পর্যন্ত সময় পায়নি। কী যে সে এখন করে, চারিদিকে সে কঠিন অন্ধকার দেখতে লাগলো। শিপ্রার মাঝে যে এতো বিষ ছিলো, ফুলের পাপড়ির তলায় সূক্ষ্ম শাণিত একটা সাপ, একথা কে কবে ভাবতে পেরেছে ? রাগে জমে-জমে সৌম্য বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। কিন্তু শিপ্রার কী দোষ ! নিজেকেই মনে হতে লাগলো অপরাধীর মতো, অপরিচ্ছন্নের মতো। কেন বনানীকে সে একান্ত একলার করে গোপন করে রাখতে পারেনি ? কেন উপেক্ষার আবরণে অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে ঢেকে রাখতে পারেনি ? ঐশ্বর্যের আবরণে উলঙ্গ উপবাসকে ? শিপ্রা কী করবে ? তার আর কে আছে ? কী বা করতে পারে সে আর ? শুয়ে আছে শিপ্রা বিছানার একধারে করুণ অস্তমিততায়, সমস্ত গায়ে তার শীর্ণতার বোঝা, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে তার পাণ্ডুর গালের দুর্বল একটুখানি আভা। দেখে, এতো রাগ এতো জ্বালা

থাকা সত্ত্বেও, সৌম্যর কেমন মায়া করতে লাগলো। অবুঝ, বোকা, একেবারে ছেলেমানুষ। মনের যা কথা, তা সে কেমন উদার অসঙ্কোচে প্রকাশ করে ফেলে, খুঁটিয়ে, আগু-পিছু ভেবে কিছুই সে বিচার করতে আসে না। একেবারে, একেবারে ছেলেমানুষ। শুয়েছে, যেন পৃথিবীতে তার মতো দুঃখী আর কেউ নেই। ফোঁপাচ্ছে, যেন কে তার হাত থেকে রঙিন একটা খেলনা নিয়েছে কেড়ে। তার দিকে চেয়ে মমতায় সৌম্য গলে যেতে লাগলো। কতোদিন পর তার সঙ্গে দেখা, কতো দূর দীর্ঘতার পর। সৌম্য আস্তে-আস্তে উঠে পড়লো। বিছানার কাছে এসে আস্তে আস্তে দুই হাতে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে অস্ফুট গলায় বললে,—ছি-ছি, তুমি তার জন্যে একেবারে কাঁদতে বসে গেলে দেখছি। বেশ তো, আমি আর সেখানে না-ই গেলুম। আমি না গেলেই যদি তুমি খুশি হও—

শিপ্রা সেই স্পর্শের দেয়ালে মাথা কুটতে লাগলো : থাক, সুখের আমার আর দরকার নেই। ছাড়ো। তোমাকে আমি খুব চিনেছি। তুমি আবার যাবে না! তোমার কথার আবার একটা দাম!

—বেশ তো, কী হয় সেখানে না গেলে? সৌম্য শিপ্রাকে খাটের বাজুর পাশে জোর করে বসিয়ে দিলো : কিন্তু আমাকে বলো, না, বলতেই হবে তোমাকে, গেলেই বা কী হয়?

—কে ধরে রাখছে, গেলেই তো পারো। শিপ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলো : সে তো তোমার সঙ্গে মিটিং-এ যাবে বলে, সেজে-গুজে বসে আছে কখন থেকে। শিপ্রা আবার তাকে একটা ঠেলা দিলো : যাও, বেরিয়ে পড়ো। মিটিং যে ভেঙে গেলো।

সৌম্য এক ইঞ্চিও সরলো না। বললে,—না, এ রকম ভাবে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে চলবে না। তুমি বলো, সেখানে গেলে কী হয়? কী হয় বলে মনে করো?

—আমি কী জানি তোমাদের কী হয়? শিপ্রা চেঁচিয়ে উঠলো : এতো যে যাওয়া-আসা, আমাকে একদিনো সে-কথা লিখেছ? একবারো লিখেছ কোথায় তুমি যাও না-যাও, কী তুমি করো না-করো? লিখেছ?

—বা, ওদের ওখানে যাই সেটা এমন আবার কী লেখবার কথা! সৌম্য হাসবার ভান করলে : তবে ভাত খেয়ে যে আমি আঁচাই, সেদিন যে আমার গলায় একটা কাঁটা ফুটেছিলো, সে-কথাও তোমাকে লিখি আর-কি।

—হ্যাঁ, ভাত খেয়ে আঁচাবার মতোই তো সে একটা নিত্যিকার খবর, তা লিখবে কেন?

—এ যে আবার মনে করে রেখে লিখতে হবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। সৌম্য আকাশ থেকে পড়বার একটা চেষ্টা করলো : কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে বলো, সেখানে যদি এক-আধদিন গিয়েই থাকি তো কী দোষ হয়েছে?

—কিন্তু কেন, কেনই বা তুমি যাবে? শিপ্রা উঠলো একেবারে লক্‌লক্‌ করে : ভূ-ভারতে তোমার আর যাবার জায়গা নেই? এতোদিন, জীবনের এতো দীর্ঘ সময়টা ও'র বিরহে তবে কী করে কাটিয়েছিলে?

সৌম্য হাসি দিয়ে রাগটাকে পিষে ফেললে। বললে,—বা, আলাপ হয়ে গেলো, তুমিই তো একদিন আলাপ করিয়ে দিলে, আমি তো বিন্দুবিসর্গ কিছু জানতুমও

না—তারপর, সৌম্য একটা ঢোক গিললো : দেখা-শোনা এক-আধটু না করলে হয় কী করে? নতুন জায়গায় একেবারে একলা আছেন।

—আহা, সেইজন্যে দুঃখে একেবারে তোমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে।, লজ্জা করে না তোমার? শিপ্রা রাগে সাদা হয়ে গেলো : তার চেয়ে স্পষ্ট বলো না কেন উনি একলা আছেন বলেই তুমি যাও?

—তা গেলুম-ই বা। সৌম্য পরিচ্ছন্ন, সাদা গলায় বললে,—দু'জনে বসে কতো কথা নিয়ে গল্প করি, গল্প করতে ভালো লাগে। তাতে কী দোষ হয়েছে? না-হয় আর না-ই গেলুম, কিন্তু আমাকে বলো, এতে অপরাধটা তুমি কোথায় দেখলে?

—না, অপরাধ কোথায়! শিপ্রা কুটিল, কুৎসিত মুখে একটা আর্ত শব্দ করে উঠলো : যাবেই তো, যাবে না, তোমার জন্যে যে সেজে-গুজে বসে থাকে।

—ছি,—ছি শিপ্রা, তুমি এতো অভদ্র হয়ে উঠেছ? নিষ্ঠুরতায় সৌম্যর দুই ভুরু স্ফীত হয়ে উঠলো : এ তোমার সেই বনানী-দি, না? তোমার নমস্যা।

—আর তোমার যে বনানী দে—বী। যাও না, যাও না, দেবীর পা দু'টো পুজো করো না বসে-বসে।

শিপ্রা আবার পড়লা বিছানায় লুটিয়ে। অসহায় অশ্রুর সজলতায়।

সৌম্য অবলম্বনহীনের মতো ভারহীন, দুর্বল পায়ে মেঝের উপর পায়চারি করতে লাগলো। চিরকাল জীবনে সে একটা সুস্থ পরিচ্ছন্নতা চেয়েছে, সমতল সহজ একটি সামঞ্জস্য, অবাধ একটি ছন্দোময়তা : এখন হঠাৎ এসে পড়েছে যেন একটা ধোঁয়াটে, আবিল আবহাওয়ার মধ্যে। এমন কি, নিশ্বাস টানতে পর্যন্ত তার কষ্ট হচ্ছে, পায়ের তলায় পাচ্ছে না যেন সমান জায়গা। মাথাটা ঘুরছে, গলার কাছে এসে কাঁপছে হৃৎপিণ্ড। সে যেন আর আগের সেই সৌম্য নেই, নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত, উদাসীন। একটা প্রকাণ্ড ছন্দোভঙ্গ হঠাৎ তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেছে। কী যে সে করবে, বা, কী যে সে করবে না, কিছুই তার মাথায় এলো না। শূন্য, নিশ্চিহ্ন একটা শুভ্রতার মতো সে দাঁড়িয়ে রইলো।

মনে হলো শিপ্রা যেন কেউ নয়, তাকে নিয়ে কোনো দায়িত্ব কোনো কর্তব্য তার নেই। যেন বানের জলে ভেসে-আসা অশুচি আবর্জনা। রুগ্ন, কুৎসিত, কলঙ্কিত। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে, ভাবতে চেষ্টা করল তাকে সে দেখেছে কিনা, ছুঁয়েছে কিনা নির্জন অন্তরঙ্গতায়!

আবার শিপ্রার শরীরময় সেই বিধুর শীর্ণতা, কান্নায় বুকের একটা পাশ তার কাঁপছে, সেই তার চিবুকের ডোলে কোমলতার ছোট্ট একটি ঢেউ। আবার সৌম্যর শরীর মমতায় নরম হয়ে এলো, তার রোগা, শুকনো মুখে সে অসীম একটি সমর্পণের ছবি দেখলে। তার আর কে আছে! কী আর করবার আছে তার! তাকে ফের দু'হাতে কুড়িয়ে নিতে-নিতে সে বললে,—যাবো না বাপু, আর যাবো না। এতে একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে দেখ! ওঠো, ওঠো, আর কোনদিন না গেলেই তো হলো!

আদরে শিপ্রা আস্তে আস্তে আবার জুড়িয়ে এলো। তার জন্যে, তার খোকার জন্যে নতুন গয়নার কী-কী অর্ডার যাবে, সৌম্য তারো একটা ফর্দ দিলে। শিপ্রার

শরীর একটু সারলেই যে তাকে সে চেঞ্জে নিয়ে যাবে, গোপালপুর বা পুরী—হাতে তার কিছু ছুটি জমেছে এতে আর কোন সন্দেহ নেই। মা হয়েছে বলেই শিপ্রার এই সাজসজ্জা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য কেন, তার রঙিন শাড়ি নেই, সে-কথা সৌম্যকে সে তো বললেই পারে। কাবেরি, গোদাবরি, নর্মদা—যা সে চায়। অনেক—অনেক সে তাকে আদর করলে, অনেক রঙিন প্রতিশ্রুতি ; কিন্তু সব যেন সে মুখস্থ বলে যাচ্ছে, মন পড়েছে তার ঘুমিয়ে। দুই হাতে তার অনেক প্রশ্রয়, কিন্তু নেই যেন সেই পুরোনো অজস্রতা।

এক সময়, হঠাৎ শিপ্রার কানের কাছে মুখ এনে সৌম্য চুপি-চুপি বললে,—আচ্ছা, আমি তো যাবো না, কিন্তু ধরো, উনি যদি একদিন এসে পড়েন ?

—কেন, সে আসতে যাবে কেন ? শিপ্রা ঝাঁজিয়ে উঠলো : তুমি যদি না যাও, তার এখানে আসবার কী দায় পড়েছে ?

—বলা যায় না তো, যদি এসেই পড়েন একদিন ?

—এলে আসবে. আমার সঙ্গে দু'টো গল্প করে, না-হয় এক পেয়ালা চা খেয়ে বাড়ি চলে যাবে।

সৌম্য উঁচু গলায় হেসে উঠলো : কিন্তু আমার সঙ্গে যদি দেখা করতে চান ?

শিপ্রা এক নিমেষে আবার গম্ভীর হয়ে গেলো : তোমার ঘরে তক্ষুণি পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শেকল টেনে দেবো।

সৌম্যর হাসিটা এবার জমলো না।

শিপ্রা খাট থেকে নেমে এলো, দাঁড়ালো তার অধিকারের প্রচণ্ড স্পর্ধমানতায়। বললে,—এবার এমুখো হলে সটান ঐ সিঁড়ি দেখিয়ে দেবো। আসুক দেখি না আরেক বার।

—সে কী কথা ? সৌম্য স্তব্ধতায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালো : এলে ওঁকে তাড়িয়ে দেবে নাকি ?

—নিশ্চয়ই দেবো। আমার বাড়ি, আমার ঘর, শিপ্রা আবার একটা ঢেউ তুললো : যাকে খুশি আমার তাড়িয়ে দেবো। আজো তো দিয়েছি তাড়িয়ে। নইলে কি আর তোমার জন্যে দু'ঘণ্টা বসিয়ে রাখতে পারতুম না ?

—বলো কী ? সৌম্য অসহায় নিষ্ঠুরতায় ছট্‌ফট্‌ করে উঠলো : অন্যায়, অভদ্র কথা তাঁকে কিছু বলেছ নাকি ?

ঠোঁট দুটো কুঁচকে, চিবুকের উপর কুটিল রেখা ফেলে শিপ্রা বললে,—ইস্‌, বড্ড মায়া দেখছি যে। যাও না, পায়ে ধরে দেবীর মান ভাঙাও গে। এখানে আর বসে আছো কেন ? যাও, তাঁকে এবার মাথায় করে নিয়ে এসো। অন্যায়, অন্যায় করে যে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

শিপ্রাকে বুকে আঁকড়ে ধরে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে বটে, কিন্তু সৌম্যর মন বেড়িয়ে পড়েছে, সঙ্গীহারা শীতের রিক্ততায়।

॥ তেরো ॥

আপিস থেকে বেরিয়েই সৌম্য সোজা বাড়ির দিকে ছোটে, পথে এক সেকেণ্ড-কোথাও দেরি করে না। তবু তার নিস্তার নেই, উপরে উঠতেই শিপ্রা চোখের কোণে বাঁকা, ধারালো একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। বলে: কী, এতো দেরি হলো কেন? কোথায় গেছিলে শুনি?

সৌম্য হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বলে: বা, কই দেরি হলো? ট্রাম কতোক্ষণে আসে কিছু হিসেব আছে?

—এখন এ-সব ওজর তো দেখাবেই। শিপ্রা ঘাড় দোলাতে-দোলাতে বলে: কোনোদিন বা শুনবো, গাড়ি মাঝপথে ভেঙে পড়েছিলো, পথে বেধেছিলো দাঙ্গা, বেরিয়েছিল বিয়ের মিছিল,—কতো কী!

অসম্ভব। শিপ্রার ও একটা ব্যাধির মতো হয়েছে! বাঘ যেমন রক্ত শুঁকে বেড়ায়, শিপ্রাও তেমনি সব সময়ে সন্দেহ শুঁকছে। দেরি সত্যি না হলেই এই, আর দেরি হলে তো সর্বনাশ। যুক্তির কথা ছেড়ে দিই, শিপ্রার সামান্য একটা সহানুভূতি পর্যন্ত নেই। খেতে-শুতে, চলতে-বসতে, একটু ফাঁক পেলেই তার এই কথা, এ যেন তার হাতের শুধু একটা খেলনা, একটা অস্ত্র। সব সময় আর সহ্য করা যায় না। হয়তো রাতে আজ আর সৌম্যর খিদে নেই, ব্যস, অমনিই শিপ্রা চোখ নাচিয়ে বললে: ও, খাইয়ে দিয়েছে বুঝি? হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে বসে আছে, কোলের উপর বইর নামে বই রয়েছে পড়ে, শিপ্রা অমনি পিছন থেকে এসে চিমটি কাটবে: আনমনে বসে কার কথা ভাবা হচ্ছে? হয়তো-বা নিচু হয়ে টেবুলে বসে কিছু লিখছে, অমনি তীরের মতো একটা প্রশ্ন এসে তাকে বিদ্ধ করলো: কাকে চিঠি লিখছো দেখি?

সৌম্য ক্লান্তিতে জীর্ণ হতে লাগলো। একেক সময় সহ্য করা তার অসম্ভব হয়ে ওঠে, মনে হয় দুষ্কর, দুঃসহ একটা-কিছু সে করে বসে, আর-কিছু না পারে, সোজা বনানীর ওখানেই চলে যায়, তার নির্মল, উজ্জ্বল উন্মুক্ততায়; কিন্তু সত্যি করে কিছুই সে শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারে না, শিপ্রাকে, অবোধ, অবুঝ শিপ্রাকে, দুঃখ দিতে তার ভীষণ মায়া করে। জ্বরটা তার কিছুতেই যাচ্ছে না, এই জ্বর নিয়েই ঘর-দোরের সে তদারক করে, ছেলেকে নিয়ে উৎসব: জ্বর নিয়েই তার তোলা-পাড়া, ওঠা-নামা,—ডাক্তারের কথায় কে কান দেয়। বিছানা একবার নিলেই তো সংসার গেলো উচ্ছন্নে। কয়েক মাস ঠেকায় পড়ে একটু বাপের বাড়ি গিয়েছিলো বলেই তো এই অরাজকতা! এখন তাকে বিছানায় ঠেলে দিতে পারলেই তো সৌম্যর সুবিধে—শিপ্রা কি আর তা বোঝে না, না, তার বোঝবার বয়েস নেই? যা হবার হবে—সৌম্য সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছে তার সমস্ত অসম্পূর্ণতা। শিপ্রার জন্যে যে তার মায়া করে—তারো নাকি একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে। অতএব কিছুই আর সে বলে না, বলবার তার স্বভাবো নয়। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, জীবন্মত্ততার চেয়ে এই জীবন্মৃততা। পাছে

শিপ্রা আঘাতে জর্জর হয়ে ওঠে, চার পাশের ঘুমন্ত হাওয়া ওঠে ঘুলিয়ে, দেহমনের এই মৃত স্তব্ধতা যায় টুকরো-টুকরো হয়ে—সৌম্য ঘরের বাইরে এক পা-ও কোথায় বেরোয় না ; ঘরের অন্ধকারে, কখনো বা আলো জ্বালিয়ে চুপ করে বসে থাকে। সব চেয়ে ভয় করে সে সাংসারিক অশান্তি, সাংসারিক সামঞ্জস্যহীনতা—একটা কলুষিত ক্লেদের মতো তা যেন তাকে শরীরে-মনে পীড়িত, বিমর্ষ করে তোলে। শিপ্রা তার জন্যে এতো ত্যাগ, এতো দুঃখ স্বীকার করতে পারলো, আর বিনিময়ে সে-ই বা না-হয় নিজেকে খানিক অস্বীকার করলো, রাখলোই না-হয় নিজেকে একটু ছোট করে, রুদ্ধ করে, কী এমন স্বর্গ থেকে সে বঞ্চিত করবে নিজেকে ? নিজেকে একটু কেটে ও কমিয়ে না আনতে পারলে শিপ্রার সঙ্গে সে একটা সহজ সমতা পাবে কী করে। শিপ্রা, যে-শিপ্রা তার জন্যে নিজেকে করলো এতো ক্ষয়, ভরে উঠলো আবার এতো পূর্ণতায় ! শিপ্রার জন্যে সমস্ত শরীর তার স্নেহে গলে যায়, প্রজাপতির পাখার মতো এতো সে লঘু যে আঙুল দিয়ে ছুলে পর্যন্ত যেন তার সইবে না। ঘন, ভারি সেই তার চুল উঠে যাচ্ছে পাৎলা হয়ে, শঙ্খের সাদা, নিটোল গলাটি সরু লম্বা হয়ে এসেছে, আঙুলগুলি কেমন সিটোনো, ফাঁক-ফাঁক, মুঠিটি হাল্কা, ঝুলে পড়েছে সেই পুরন্ত ঢলোঢলো দু'টি কাঁধ। আগে সমস্ত শরীরে ঝিরঝির করে ঝরে যেতো একটি কৃশতা, এখন যেন পাকিয়ে হয়েছে একটা দড়ি, হাড় ক'খানা এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে আছে। এর পর আর তার মনে কষ্ট দিতে মন ওঠে না।, মানুষে শান্তির জন্যে কতো-কিছু সহ্য করে, কতো-কিছু করে ক্ষমা, সে-ও না হয় নিজেকে নামিয়ে আনলো এই শীতল নমনীয়তায়, তার আকাঙ্ক্ষার দানবিকতাকে হ্রস্ব করে সহজ, দৈনন্দিন সাধারণত্বে। সৌম্য তাই আজকাল আর বাড়ি থেকে বেরোয় না, শিপ্রার দু'-একটা খেলো সাংসারিক কাজে সে সাহায্য করে। হয়তো খোকা কাঁদছে, শিপ্রা পাতবে বিছানা, সৌম্য ছেলেকে কোলে করে রাখে। কখনো-বা মশারি খাটিয়ে দেয়, ধুলো ঝেড়ে বই গুছিয়ে রাখে, কখনো বা শিপ্রাকে দেখিয়ে তার ছেলেকে আদর করে। তাদের চার পাশে নিয়ে আসে একটি লঘুতার সুর।

কেন, কেন সে শান্তি চাইবে, চাইবে ক্ষীণজীবী ভদ্রতা ? কেন সে উত্তালতার আস্বাদ নেবে না জীবনের তরঙ্গের বিক্ষোভে ? সে কি অল্পপ্রাণ, অল্পতনু ? তার ভদ্রতার গুহার বাইরে নিজেকে একবার দেখবে না সে রুদ্ররূপে ?

কিন্তু সেদিন আপিস থেকে ফিরে সৌম্যর মন অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো। যথারীতি হাত-মুখ ধুয়ে জল-খাবার খেয়ে সে তার বসবার ঘরে এসে বসেছে, অন্ধকারের নতুন উষ্ণতায়, দিনের স্মৃতিগুলি যখন একে-একে ছায়ায় যাচ্ছে মিলিয়ে। পাশের ঘরে শোনা যাচ্ছে, দোলনায় খোকাকে শুইয়ে শিপ্রা তার উপরে নিজেকে দিয়েছে ঢেলে, দূর থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাদের বিছানার একটা আভাস, নিশ্চিন্ত নিভাঁজ বিছানা, দেখা যাচ্ছে র‍্যাকে তার আপিসের পোশাক, এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে টেবুল-চেয়ার, দেয়াল ঘেঁষে বিশালকায় ক'টা আলমারি,—তবু এতো সব আরাম-আভরণের মাঝেও সৌম্যর নিজেকে ভারি একা, ভারি নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগলো। ইচ্ছে করেই হাত বাড়িয়ে আলোটা আর জ্বালালো না। দূরে-দূরে আকাশের নিচে বিশাল কলকাতা কালো হয়ে

আসছে, সমস্তটা শহর এখন কেমন একটা নির্জন গুহার মতো ভয়াবহ। কোথাও যেন কারুর আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই, এমন একটা ধূসর হতাশা পড়েছে ছড়িয়ে। সৌম্যরো মন কেমন ভারি, অবসন্ন হয়ে এলো। এ সে এখানে বসে করছে কী, এই ঘনায়মান কালিমায়, এই ক্লান্তিকর নিশ্চিহ্নতায়? মধ্যরাত্রে ঘুমভাঙা শিশুর মতো সৌম্যর আত্মা আর্তনাদ করে উঠলো। সে যেন আর কোথাও যেতে চায়, কোন বহু দূরে সমুদ্রের গহনে, যেখানে তার সমস্ত জীবন প্রকাশের উদগ্র প্রেরণায় উত্তাল, উলঙ্গ হয়ে উঠেছে: আর কোনো বৃহত্তর আকাশে যেখানে তার সমস্ত জীবন গভীরতায় প্রশান্ত, পরিপ্লুত। এখানে সে বসে আছে কেন, এই তার পরিচয়ের খর্বতায়, দেয়ালের এই কোটরীভূত অন্ধকারে এই তার জীবনের খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন একটা পরিচ্ছেদে। তার মাঝে আছে আরো বড়ো পরিচয়, আরো অনেক অন্ধকার। সৌম্যর সমস্ত স্নায়ু-শিরা সদ্যছিন্ন তারের মতো হাহাকার করে উঠলো। কী যেন তার বাড়বার ছিলো, বাড়তে পায়নি, কী যেন তার জানবার ছিলো তা হয়নি এখনো জানা। তার জীবনের সেই অগঠিত অংশটা তাকে যেন সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। সেই অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে ছাড়া পাবার জন্যে সৌম্য চেতনায় হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। কী যেন তার পাবার ছিলো, তার পিপাসাটা সে সর্বাঙ্গে একটা তীব্র যন্ত্রণার মতো অনুভব করলো। তা পাবার তারো ছিলো স্নায়ু, তারো ছিলো সময়, তারো ছিলো অধিকার। এখানে বসে সে করছে কী, এই পৃথিবীর অন্ধকারে। সে প্রকাশ করবে নিজেকে নিজের অন্ধকারে, গভীরতর ঐশ্বর্যে। তার কিসের দুঃখ, কিসের ভয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে এক কণা ঘাস আছে, তার কিসের লজ্জা, সে বাঁচবে আপন পূর্ণতায়, আপন একাকীত্বে।

কে তার শিপ্রা? কেউ নয়। তার জীবনের ভ্রান্তি, পদচ্যুতি। একটা কদর্য অভ্যাস, ক্ষয়ময় বিবর্ণতা। যৌবনের অস্বীকৃতি, সাধনার অন্তরায়। সমস্ত ভবিষ্যতের হন্তা।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো।

শিপ্রা, তার কোলে ছেলে, আস্তে-আস্তে কাছে এসে বললে,—ও কী, অন্ধকারে চুপ করে বসে আছো কেন?

আলোয় সৌম্যর মুখ গেছে শুকিয়ে। ধরা গলায় বললে,—শরীরটা কেমন ভালো নেই।

স্বরের ক্লান্তি শিপ্রার অন্তরতম স্নেহমূলে এসে যেন স্পর্শ করলো। আরো একটু এগিয়ে এসে বললে,—হ্যাঁ, তোমার যেন কী হয়েছে। তোমার মনের আর সেই স্ফূর্তি নেই। সন্ধ্যেবেলাটা বাড়ি বসে আছো কেন? একটু কোথাও বেড়িয়ে এলেই তো পারো।

বিরক্ত মুখে সৌম্য বললে, - থাক্।

—কেন, থাক্ কেন? শরীরটা ভালো নেই, ঘরের মধ্যে বসে আছো কী? হাওয়ায় একটু বেরোলেই সেরে যাবে দেখো। নাও, ওঠো, দিন-রাত বাড়ির মধ্যে বসে থাকতে দেখলে আমারো কেমন ভালো লাগে না।

—হয়েছে। সৌম্য গভীরতরো বিরক্তিতে বলে উঠলো: আমি কোথাও যাই,

আর তুমি অমনি আমাকে খোঁটা দিতে শুরু করো। তোমাকে আমি চিনি না? থাক্, ঢের হয়েছে—দরকার নেই কোথাও গিয়ে, এই আমি বেশ আছি।

শিপ্রা হালকা করে একটু হাসলো ; বললে,—আমাকে তুমি ঠকাতে পারবে না ; না, তুমি যাও। তুমি কোথায় গেছ না-গেছ ফিরে এলে তোমার চেহারা দেখেই ঠিক বলে দিতে পারবো। শিপ্রা তার গা ঘেঁষে এগিয়ে এলো : একটা কথা একদিন কী বলেছি বলে একদম আর বেরোতেই হবে না। আগে তো কতো বেরোতে।

না, হতাশ মুখে সৌম্য বললে,—না, যাবার আমার কোথাও জায়গা নেই।

—কেন, তোমার সেই আড্ডা কী হলো ?

—সে ভেঙে গেছে।

—তবে আর কোনো বন্ধুর বাড়ি, বায়স্কোপ, খেলার মাঠ—

—ও-সব আমার কিছু ভালো লাগে না।

শিপ্রা এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। পরে বিবশ, গাঢ় গলায় বললে,—এমন আর কোনো জায়গা নেই যেখানে যেতে তোমার ভালো লাগে ?

সৌম্য অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো। এই সে বেশ আছে, এমনি সমর্পণে আস্তে-আস্তে তার একখানি হাত ধরলে।

মমতায় মলিন, বিষণ্ণ মুখে শিপ্রা বললে,—বেশ তো, তার কাছেই যাও না, যদি সত্যিই তোমার ভালো লাগে। যা ভালো লাগে তা করবে না কেন? মিছিমিছি মন ভার করে বসে থেকে লাভ কী ?

—কী যে তুমি বলো। সৌম্য সন্ত্রস্ত হয়ে শিপ্রাকে সেই ধরাহাতে নিজের কাছে আকর্ষণ করলে : এই তো আমি চমৎকার আছি। কোথায় আবার আমি যাবো, সংসারে আমার জায়গার কী ভাবনা ? সৌম্য হঠাৎ হাত বাড়িয়ে খোকাকে আদর করতে শুরু করলো।

—দেখ. দেখ, যাবার জন্যে কী রকম হাত বাড়িয়েছে! শিপ্রা খুশি হয়ে বললে,—তোমাকে এরি মধ্যে কী ভীষণ যে চিনেছে!

দুই হাতে খোকাকে সৌম্য বুকে তুলে নিলো।

শিপ্রা ঝিলিক দিয়ে উঠলো : একটুখানি বোসো, আমি ওর খাবারটা তৈরি করে আনছি।

মাকে ছেড়ে দিতে খোকার বেশি মত দেখা গেলো না। তাকে কাঁধে করে সৌম্য হাঁটতে শুরু করলো, তবু ওর সমস্ত মন পড়ে আছে মার কোলের উপর। সৌম্যকে সে চায় না, চেনে না ; তার কাছে সৌম্য একান্ত অবান্তর, একান্ত নিঃসম্পর্ক। সে তার মায়ের জন্যে, মা-ও শুধু তাকে নিয়েই ভরে উঠেছে। তাদের দুয়ের মাঝে একটি দুর্ভেদ্য সম্পূর্ণতা, সেখানে আর কারুর নেই প্রবেশের অধিকার। সৌম্য খোকাকে নিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো। নরম একতাল মাংস—তাকে চুপ করাবার না জানে সে কায়দা, তাকে নিয়ে নিজে চুপ করে থাকবার না-বা আছে তার ধৈর্য। এই একটা জীবাণুর মাঝে শিপ্রা কী পেলো কে জানে, সৌম্য শরীরের প্রতি তন্তুতে ছট্‌ফট করে উঠলো। এক কণা এই প্রাণের স্ফুলিঙ্গে শিপ্রা ক্ষয় করে দিয়েছে তার সমস্ত দীপনা, ভরে উঠেছে সে অফুরন্ত ঐশ্বর্যে।

খোকার শরীরে ঢেলে দিয়েছে তার সমস্ত লাবণ্য, তাকে সাজাতে খসিয়ে ফেলেছে তার সমস্ত আভরণ। কিন্তু, হায়, খোকা শুধু শিপ্রার একার সৃষ্টি ছিলো না, তার মাঝে সৌম্যরো ছিলো অমর অভীপ্সা, নতুন দেহে নবতন বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, তবু তাকে নিয়ে নেই তার তৃপ্তি, নেই তার শেষ। তার মতো, শিশুও তার কাছে উদ্বৃত্ত, অবান্তর, তার মাঝে তার পরিচয় আছে, কিন্তু পরিণতি নেই। শিপ্রা পৌঁছে গেছে তার সন্তানের মধ্যে, সহজে, অনায়াসে ; কিন্তু সৌম্যর মনে হলো, তার এখনো যেন চলাই শুরু হয়নি।

ছেলের কান্না শুনে শিপ্রা এলো ছুটে।

—দাও বাবা দাও, একটুখানি রাখতে বলেছি তো বাড়িময় একটা লঙ্কাকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।

ছেলেকে তার মাঁর কোলে ছেড়ে দিতে-দিতে সৌম্য বললে,—বাঁচলুম।

একটা পিচ্ছিল অপরিচ্ছন্নতা থেকে যেন সে দুই হাত মুক্ত করে আনলো। তার শরীর থেকে নেমে গেলো যেন একটা ক্লান্তির বোঝা।

খোকা নিমেষে গেলো জল হয়ে। গায় পেয়েছে মার কোমলতা, মুখে দুধের বোতল। সমস্ত ছবিটি সুষমায় কী সুসমঞ্জ, শিপ্রা ও তার ছেলেতে মিলে কী একটি সুভঙ্গ সম্পূর্ণতা। শিপ্রা যেন এখন দাঁড়িয়েছে তার নিজের জায়গায়, নিজের সত্যে, নিজের মহিমায় : কিছু আর তার চাইবার নেই, পাবার নেই, পেয়ে গেছে সে তার পরম পরিসমাপ্তি। দুধের বোতল মুখে পুরে খোকার মুখে তৃপ্তির যে উচ্ছলতা, তার ছায়া পড়েছে শিপ্রার দুই চোখের দীর্ঘ, মন্থর দৃষ্টিতে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত সুষমায় এসেছে আদ্র হয়ে। তার শরীরের কৃশতাটি যেন তার মাতৃস্নেহেরই একটা সুর। দেখে সৌম্যর হিংসা করতে লাগলো। শিপ্রা কেমন ভরে উঠেছে তার প্রাপ্তির পূর্ণতায়, তার সমর্পণের শান্তিতে। সেখানে সৌম্যকেও তার প্রয়োজন নেই, সৌম্য আছে দূরে, সৃষ্টির নির্জন নির্বাসনে।

সৌম্য হঠাৎ দুই লোলুপ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে,—এবার দাও দিকি আমার কোলে।

শিপ্রা বললে,—না, মিছিমিছি কাঁদিয়ে লাভ কী।

তবু সৌম্য জোর করে ছেলেকে ছিনিয়ে নিলো। যেন ছেলের মাঝে সে কাঁদছে, তার রক্ত তার মাংস, তার বাঁচবার তার বাড়বার পিপাসা। কী যন্ত্রণা এই বাঁচবার দায়িত্ব হাতে নেয়া, নিজের জীবনের বিরাট জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে যাওয়া! কী যন্ত্রণা সকলের মাঝ থেকে এই এক হওয়া, একা হওয়া! সৌম্য এই শিশুর কান্নার মাঝে শুনতে পেলো যেন তার নিজের প্রার্থনা, নিজের প্রশ্ন।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি আবার ছেলেকে কেড়ে নিলো। হায়, সে শুধু তার ছেলেকেই শান্ত করতে পারে।

দুধ খেতে-খেতে খোকা পড়েছে ঘুমিয়ে। তাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে শিপ্রা আবার ফিরে এলো।

আশ্চর্য, সেই শিপ্রা আর নেই।

ধূসর অবসাদের সুরে শিপ্রা বললে,—এ কী, তুমি এমনি চুপ করে বসে থাকবে নাকি?

—বা, এই তো দিব্যি চুপচাপ বসে আছি। সৌম্য ক্লান্ত একটু হাসলো : কোথায় আর যাবো ?

—আহা, তোমাকে যেন কোথাও যাবার জন্যে আমি ঠেলে দিচ্ছি। শিপ্রাও হাসবার চেষ্টা করলো : বসে আছো তো বসেই আছো। আর যেন তোমার কিছু করবার নেই।

আলগোছে টেবিল থেকে একটা বই কুড়িয়ে নিয়ে সৌম্য বললে,—না, এই বইটার অনেক পৃষ্ঠা এখনো বাকি আছে।

—কেন, কালকেই তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে নাকি? শিপ্রা নিজেরই অজানতে সৌম্যর সোফার দিকে এগিয়ে এলো : আপিস থেকে ফিরে তক্ষুণি কে কবে আবার বই নিয়ে বসে শুনি ?

—বা, সৌম্য অবাক হয়ে গেলো : তবে আর কী করা যায় ?

—তা তো বটেই, শিপ্রা আচ্ছন্ন গলায় বললে,—বইয়ের অক্ষরগুলো যে আজ রাতেই সব উবে যাচ্ছে। মুখস্থ করে না রাখলে চলে কী করে? আমি কী, আমার চেয়ে বইয়ের পৃষ্ঠাটা যে তোমার অনেক দামী।

শিপ্রা পিছুলে চলে যাচ্ছিলো, সৌম্য তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেললে। কথাটা যে এমন ভাবে আসতে পারে সে ভাবতেই পারেনি। এখন কী করা যায় তারই সে একটা সভ্যতর দৃষ্টান্ত দেবার চেষ্টা করছিলো মাত্র, কিন্তু সব ছেড়ে একান্তে বসে শিপ্রার সঙ্গেও যে আলাপ করা যেতে পারে, আশ্চর্য, এ কথাটাই তার মনে হয়নি।

দুই হাতে মৃদু-মৃদু বাধা দিতে-দিতে শিপ্রা বললে,—ছাড়ো, আমার সঙ্গে কথা বলে নতুন কিছু তো আর শিখতে পাবে না—

—আমরা যেন কেবল শেখবার জন্যেই জন্মেছি। সৌম্য শিপ্রাকে তার পাশে বসতে দিলে।

বললে,—ওষুধটা খেয়ে আজকে কেমন আছো ?

—বাবাঃ, তোমার আর কথা নেই? শিপ্রা মলিন মুখে বললে,—অসুখের কথা শুনে-শুনে কান দুটো আমার পচে গেলো। ভীষণ, ভীষণ ভালো আছি। ঐ বাবা এসেছেন বুঝি, ওঁর কাছে একটু বসি গে।

শিপ্রা তবু উঠে পড়তে গা করলে না। সৌম্য তার নীরবতায় তাকে আচ্ছন্ন করে ধরলো। কী কথা যে বলা যায়, কী নতুন কথা, তাই যেন সে অনুভূতির অন্ধকারে লাগলো হাতড়াতে। কথার কী-ই বা দরকার, এই সে বেশ আছে স্তব্ধতার শীতল আশ্রয়ে, শিপ্রার এই সামীপ্যের স্নিগ্ধতায়। শিপ্রার শুকিয়ে-আসা নরম আঙুল ক'টি নিয়ে সৌম্য খেলা করতে লাগলো, দুর্বল, অসহায় ক'টি আঙুল। এই ক'টি আঙুলে সে যেন তার সমস্ত জীবন ঢেলে দিয়েছে, সমস্ত কামনা। কোথাও এতোটুকু উদ্ধত অহঙ্কার নেই, আঙুলগুলি যেন করুণার ক'টি ধারা। গায়ের শীর্ণতাটি যেন এই করুণায় ভিজে আছে। সরলতায় সিঞ্চিত মুখখানিতে, দুটি অলস আকুল চোখে একটি কোমল নির্ভর, সমস্ত ভঙ্গিটিতে একটি সহায়হীন সমর্পণের ক্লান্তি। শিপ্রার জন্যে সৌম্যর কেমন হঠাৎ ব্যথা করে উঠলো। তার বসে থাকবার এই নির্বাক প্রতীক্ষাটি দেখে মনে হয় সংসারে তার

যেন কেউ নেই, কোথা থেকে যেন সে কোথায় চলে এসেছে। ভাগ্যিস, সে সৌম্যর কাছে এসে পড়েছিলো, নইলে কেউ কোনোদিন তার দুঃখ বুঝতো না, কেউ দিতো না তাকে এই স্নেহ, এতো কৃতজ্ঞতা। আর কোনো ঘরে চলে গেলে কতো কষ্টে সে পড়তো না জানি, কে বা তখন তাকে দেখতো, কে বা করতো সেবা। তার উপর কতো অবিচার না-জানি হতো, কতো অমর্যাদা। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন। সৌম্য শিপ্রার মুখখানি নিজের কাঁধের কাছে নামিয়ে আনলো। পিঠের উপর হাত বুলুতে-বুলুতে বললে,—না, তুমি শরীরের ওপর একটুও যত্ন নিচ্ছো না, শিপ্রা। এ ভালো নয়।

হাসির ঢেউয়ে শিপ্রা উঠে পড়লো। বললে,—বাবাঃ, এতোক্ষণ চুপ করে থেকে এই বুঝি তুমি কথা বলতে পারলে?

—না, এ ছাড়া আর কোনো কথা নেই। সৌম্য জোর গলায় বললে,—তুমি কাল থেকে বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকবে, এক পা ওঠা-নামা করতে পারবে না। তুমি আমার কথার একটুও বাধ্য হও না কেন?

—বেশ, সে-কথা বললেই তো হয়। শিপ্রা ঝাপটা মেরে উঠে পড়লো।

—সে কী, চললে কোথায়?

—তোমার কথার বাধ্য হতে, বিছানায়, চিরকাল বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকতে! শিপ্রা গেলো দরজার দিকে এগিয়ে: এর চেয়ে মানুষ আর কী স্পষ্ট করে বলতে পারে?

সৌম্য প্রমাদ গুনলে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলো তাকে ফিরিয়ে আনতে, তাকে ফিরিয়ে আনতে খানিক আগেকার সেই অনির্বচনীয় নিঃশব্দতায়, সেই তাদের মাঝেকার সমাসীন প্রশান্তিতে।

শিপ্রা উঠলো ধমকে: যাও, আগে আমার কথার বাধ্য হও। বসে-বসে বই পড়ো গে যাও। নেবো, বিছানা নেবো, তোমার ভাবনা নেই।

শিপ্রা তরতরিয়ে নিচে নেমে গেলো।

।চৌদ্দ।

টিপি-টিপি বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে। আকাশহীন দিন, ধূসর একটি অবসাদ দিয়ে তৈরি। দেয়াল দিয়ে ঘেরা, ছোট, ঘন এই ঘরটির বাইরে সৌম্যর জগতে আর কোনো পৃথিবী নেই, সব গেছে মুছে, একাকার হয়ে। আর্দ্র, নিরানন্দ একটি আলস্যের অন্ধকারে সৌম্য সমস্ত শরীরে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে ছিলো—ক'টা বেজেছে কে জানে, ঘড়ির দিকে তাকাবার পর্যন্ত তার উৎসাহ নেই। ছুটির দিনটা কাটছে তার একটা ভারাক্রান্ত স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে। কিছুই করার নেই, সেও যেন বৃষ্টিতে অস্পষ্ট, অবান্তর হয়ে এসেছে, তার সমস্ত চেতনা, সমস্ত দৈহিকতা। ভালো কী মন্দ, না তার মাঝামাঝি একটা অবস্থা, কিছুই যেন তার

বোধ নেই, সে ডুবে আছে বিশাল এক বিস্মৃতির কুয়াশায়। বৃষ্টি তার চারধারে এনে দিয়েছে একটি অপরিচয়ের রহস্য।

এখান থেকে পাশের ঘরে শুনতে পাচ্ছে সে শিপ্রার টুকরো-টুকরো চঞ্চলতা। সময়টা যে বিকেলের কাছাকাছি তা ধরা পড়ছে তার ঘুম-ভাঙা ছেলেকে নিয়ে সাজাবার ব্যস্ততায়, চায়ের ভূমিকার আড়ম্বরে। সহসা প্রখর হয়ে উঠেছে তার উপস্থিতি, চঞ্চলতায় এখানে-ওখানে সে ছিটিয়ে পড়ছে। ভাসমান মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের চকিত আবির্ভাবের মতো মাঝে-মাঝে উদ্ঘাটিত হচ্ছে তার শরীরের জ্যোৎস্না, আপন পূর্ণতায় সে স্থির; কিন্তু বৃষ্টি, একটানা জলের দীর্ঘ, বিলম্বিত একটি ছায়া সৌম্যর অনুভূতিতে এনে দিয়েছে বিষণ্ণ অস্পষ্টতা—শিপ্রাকেও তার মনে হলো এই অপরিচয়েরই একটা সুর। মনে হলো তাকে সে চেনে না, তার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সংলগ্নতা নেই। বৃষ্টির আকাশে তারা দুই দিগন্তরেখার মতো উদাসীন। খোকাটা কাঁদছে, যেন জলের সেই অবিশ্রান্ততারই একটা ছোঁয়া। সৌম্য তার আপন একাকীত্বে ভাসছে, মূলহীন বিচ্ছিন্নতায়, তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন মৃত্যুর মাধুরীতে আছে ভিজে, কিছু-না-করার কিছু-না-হওয়ার অসীম মৃত্যুতে। সত্যি, বাঁচা কী কঠিন, কী কঠিন এই বাঁচবার দায়িত্ব হাতে নেয়া, তার চেয়ে অনেক কামনীয় এই বৃষ্টিস্নিগ্ধ অপরিচয়ের আকাশে মুছে যাওয়া, মুছে যাওয়া এই ভারহীন অশরীরিকতায়।

হঠাৎ সিঁড়ির উপর থেকে কে কথা কয়ে উঠলো, নীল একটুকরো আকাশের মতো তার স্বর—সৌম্যর সারা শরীর রুপোলী রোদে ঝলমল করে উঠলো। হঠাৎ উঠে পড়ে সে আলো জ্বালালে।

শিপ্রাকে দেখতে পেয়ে বনানী তাদের শোবার ঘরেই আগে ঢুকলো। গা থেকে রঙিন রেইন-কোটটা খুলে নিতে-নিতে বললে—সৌম্যবাবু বাড়ি আছেন?

—দেখতে পাচ্ছো না, শিপ্রা শুকনো, কর্কশ গলায় বললে,—তোমার সাড়া পেয়েই পাশের ঘরে কেমন আলো জ্বলে উঠেছে?

—ও! এতোক্ষণ উনি অন্ধকারে বসে ছিলেন নাকি? বনানী হাসলো।

—আগাগোড়াই তো অন্ধকারে বসে আছেন। শিপ্রা সারা শরীরে একটা দ্রুততার চমক এনে ঘর থেকে সরে গেলো।

সরে গেলো মানে বনানীকে পাশের ঘরে যাবার জন্যে সে জায়গা দিলে। বনানী চলে যেতেই সে আবার তার ঘরের মধ্যে ফিরে এলো। দিলো বাইরে থেকে বসবার ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে, এতো আস্তে যে প্রথম প্রার্থিত অভ্যর্থনার আকস্মিকতায় কেউ তা লক্ষ্য করলে না।

সৌম্য দীপ্ত কণ্ঠে বললে,—আসুন। এই বৃষ্টিতে?

জানলার কাঠের উপর বনানী রেইন-কোটটা মেলে রাখলো। বললে,—বৃষ্টি বলেই তো বেরিয়ে পড়লুম। ভাবলুম বাড়িতে নিশ্চয় আজ আপনাকে পাওয়া যাবে। ভালোমানুষের মতো ঘরের মধ্যে নিশ্চয় বসে আছেন।

—হ্যাঁ, কী আর করি বলুন।

—হ্যাঁ, আমিও আর কোনো কাজ খুঁজে পেলুম না। বনানী গা থেকে

জলের গ‍ুঁড়োগ‍ুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে-দিতে বললে,—কিছ‍ুতেই মন টি‍ঁকছিলো না ঘরের চাপা, ঠাণ্ডা গ‍ুমোটের মধ্যে। ভাবল‍ুম আপনার ওখানে চলে যাই।

—তা বেশ করেছেন। সৌম্য অভ্যর্থনায় অবারিত হয়ে উঠলো: আমিও ভাবছিল‍ুম আপনার ওখানে যাবো। বসুন, দিনটা কী বিশ্রী করে যে এসেছে।

—ছাই যাবেন। বনানী তার বিসর্পিত আলস্যের বিলাসে সোফার উপর এসে বসলো, হাসি-ম‍ুখে বললে,—কতো দিন এর মধ্যে সুন্দর করে এসে গেছে হয়তো, চোখেই পড়েনি আপনার। সেদিন ট্র্যামে দেখা হলো, কতো করে কথা দিলেন, অথচ এ-পথটুকু আর পেরোতে পারলেন না। কী আপনার এতো কাজ তা-ও তো কই দেখতে পাই না।

—না, সত্যি আমি আজ যেতুম, সৌম্য অনাবশ্যক দৃঢ়তার সঙ্গে হঠাৎ বলে উঠলো: আপনি না এসে পড়লে দেখতে পেতেন আমিই এতোক্ষণে আপনার ওখানে চলে গেছি।

বনানী হেসে উঠলো: ভাগ্যিস ব‍ৃষ্টিটা এসেছিলো।

—হ‍্যাঁ, আপনার মনে হয় না, ব‍ৃষ্টিতে কেমন নিজের কাছেই আমরা অচেনা হয়ে উঠি, আমাদের থেকে কেমন আস্তে-আস্তে যাই ম‍ুছে। সৌম্য ম‍ুখোম‍ুখি আরেকটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো: কী যে চাই কিছ‍ু ব‍ুঝি না, কী যে কোথায় আছে তারো কোনো নির্দেশ নেই—চমৎকার একটা অস্পষ্টতা।

—তবে দিনটা ভারি বিশ্রী করে এসেছে বলছিলেন কেন?

—এখন এই আলো জ্ব‍ালিয়ে তা দেখতে পেল‍ুম। আমাকে আবার ঘিরে দাঁড়ালো আমার র‍ূঢ় দৈনন্দিনতা। সৌম্যকে যেন ভারি ক্লান্ত শোনালো: আবার বাঁধা পড়ে গেল‍ুম খর্বিত একটা সুস্পষ্টতার মধ্যে।

বনানী বললে—এতোক্ষণ অন্ধকারে বসে ছিলেন ব‍ুঝি?

সৌম্য হাসলে: হ‍্যাঁ, নিজের অনাবিষ্কৃতির অন্ধকারে।

—তা হলে আলো জ্ব‍ালিয়ে সব মাটি করে দিল‍ুম বল‍ুন?

—না, না, আলোটা বেশি উজ্জ্ব‍ল হয়ে জ্ব‍ললো না এই যা দ‍ুঃখ। সৌম্য হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে জিগ‍্গেস করলে: ব‍ৃষ্টিটা এখন ধরে গেছে বলতে পারেন?

—কেন বল‍ুন তো, কোথাও বের‍ুবেন?

—হ‍্যাঁ, কোথাও বের‍ুতুম। চল‍ুন না, কোথাও যাবেন? সৌম্যর আপাদমস্তক শিহরিত হয়ে উঠলো: কী ছাই ঘরের মধ্যে বসে আছি। আশ্চর্য, কথাটা আমার এতোক্ষণ মনেই পড়েনি।

বনানী সৌম্যর মুখের দিকে দীর্ঘ চোখে তাকিয়ে রইলো: আমার বের‍ুবার জন্যে ব‍ৃষ্টিকে কখনো থামতে হয় না, দেখতেই তো পাচ্ছেন চোখের উপর। গেলে কোথায় যাবেন?

—সত্যি তো, কোথায়ই বা যাবো? সৌম্য হেসে উঠলো: আপনিই তো এসেছেন। আশ্চর্য, আপনি যে এসেছেন তা-ই আমি ভুলে গেছি।

তারপর অনেকক্ষণ তাদের মধ্যে কোনো কথা নেই—তাদের উপর নেমে এসেছে কথা-ধোয়া স্তব্ধতার আকাশ। দ‍ু'জন কেউ কাউকে দেখছে না, শ‍ুনছে না, স্পর্শ করছে না; অথচ দ‍ু'জনের মাঝে একটি অনন‍ুভূত সান্নিধ্যের গভীরতা।

যখন কেউ কাউকে দেখলো, তখন একই সময় দু'জন দু'জনকেই দেখলো।

তার বিশাল স্তব্ধতায় সৌম্যকে যেন একটা অমানবিক আবির্ভাবের মতো দেখাচ্ছে। তার বিস্তৃত পেশলতায় সে ভয়াবহ, তার স্তম্ভিত বলিষ্ঠতায় সে সুন্দর। বনানী মুগ্ধ হয়ে গেলো, তার সমস্ত অস্তিত্ব অকিঞ্চিৎকরতায় এলো সংকুচিত হয়ে। একপিণ্ড আগুনের মতো তার হৃদয় পুড়তে লাগলো তার বুকের মধ্যে, মনে হলো এক মুহূর্তে নিজেকে যেন সে উৎসর্গ করে দিতে পারে অমিতবল আকাঙ্ক্ষার কাছে, অপ্রতিরোধ্য দস্যুতার কাছে। যজ্ঞাগ্নির কাছে অরণির মতো। হারণ কাঁচলি ভারণু হার—সেও নিমেষে বিসর্জন করতে পারে সর্বস্ব। পারে? বনানী হাসলো নিজের চিন্তার রমনীয়তায়।

সৌম্য দেখলো তার আকাশে হঠাৎ আজ এসেছে একটি নীল দিন, অপার-পরিধি সমুদ্রের উন্মুক্ততা। বনানী বাইরে থেকে নিয়ে এসেছে বাইরে যাবার সুর। শূন্যতা থেকে নিয়ে এসেছে মুক্তি। সৌম্য নিরাবেশ, নির্মল চোখে বনানীর দিকে তাকিয়ে রইলো। চুলে ও শাড়িতে ছোট-ছোট বৃষ্টির দাগ লেগে আছে, সমস্ত শরীরে ঘুমিয়ে আছে যেন এই বৃষ্টির উষ্ণতা। কতো দিন পরে আবার সে তাকে দেখলো, অথচ কতো সহজে, কোথাও এতোটুকু তপস্যা না করে। এই বৃষ্টির পর সূর্যোদয় যেন তবু অসম্ভব, কিন্তু বনানীর এই আবির্ভাবে, যেন একবিন্দু অলৌকিকতা নেই। বনানীর উপস্থিতিটি যেন আপন প্রাচুর্যে একটি ফুলের মতো ফুটে আছে। সৌম্যর মনে হলো, সেই ফুল যেন একদিন তারই জন্যে ফুটে ছিলো। সেদিন অনায়াসে সে তা ছিঁড়ে আনতে পারতো। আনতে পারতো বটে, কিন্তু কে জানে, হয়ে থাকতো হয়তো এখনি ফুলদানির জিনিস। শুকনো, বিকৃত, অভ্যাসম্লান। না, তার জন্যে মূল্য দিতে হবে। প্রেমের জন্যে প্রাণহীন কর্তব্যের মূল্য। আরম্ভের জন্যে অভ্যাসের মূল্য। কঠিনের সাধনা করতে হবে নিষ্ঠুর নিষ্ঠার সঙ্গে। তাই সে ফুল আজ সাদা ফুল নয়, লাল ফুল, যাতে কামনার সঙ্গে আছে বিপ্লবের বন্ধুতা।

অসহ্য হয়ে উঠলো এই স্তব্ধতার প্রখরতা, কারো কথা কয়ে ওঠা দরকার।

সৌম্যর হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে গেলো পাশের ঘরের কোলাহলে। খোকা হঠাৎ তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে, শিপ্রার হাত থেকে খসে পড়েছে কী-সব বাসন-পত্র। গিরধারী কী কাজে যেন উপরে উঠে এসেছিলো, তার মুখের উপর ছিটকে পড়লো কতোগুলি ধমকের চাবুক। সাংসারিকতার দৌরাত্ম্যে সমস্ত বাড়ি ঘর যেন ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে।

সেই কোলাহলটা সৌম্যকে কথা বলতে সাহায্য করলো। সৌম্য বললে,—এখন একটু চা খেলে মন্দ হয় না।

বনানীও টের পেয়েছে শিপ্রার অনুপস্থিতির তীক্ষ্মতা। টের পেয়েছে তার নিজের এই নির্জনতার ভার। সেও একটা আশ্রয় পাবার জন্যে গলায় কথা খুঁজলে। বললে,—বসুন, আমি শিপ্রাকে ডেকে আনছি।

বনানী পাশের ঘরে চলে গেলো। সৌম্য রইলো কান পেতে।

বনানী ঘরের বিশৃঙ্খলাটা বিশেষ লক্ষ্য করলে না। শিপ্রা খাটের ধারে চুপ

করে বসে ছিলো, তার ছেলে দুলছে দোলনায়,—বনানী বন্ধুতায় এক হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে,—এখানে একা বসে আছো কেন ? ও-ঘরে চলো ।

—তোমরা থাকো গে। পায়ের কাছে একটা চাদর পড়ে ছিলো সেটা তাড়াতাড়ি গায়ের উপর কুড়িয়ে নিয়ে শিপ্রা বললে,—আমার ভীষণ জ্বর এসেছে ।

—বলো কী ? বনানী তার গায়ে হাত দিতে গেলো ।

বিছানার এক পাশে সরে গিয়ে চাদরে মুখ ঢেকে শিপ্রা বললে, —থাক্ !

বনানী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বললে,—তোমার ছেলে যে কেঁদে খুন হচ্ছে, শিপ্রা ।

শিপ্রা তেমনি নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততায় বললে.—কাঁদুক গে ।

—সে কী, ওকে একটু কোলে নাও। কাঁদতে-কাঁদতে যে টাক ধরে যাচ্ছে ! বনানী নিজেই গেলো দোলনার কাছে এগিয়ে ।

শিপ্রা উঠলো খেঁকিয়ে : থাক্, ওকে আর তোমার ধরতে হবে না। কাঁদুক, কাঁদুক ওর যত খুশি ।

গোলমালটা আরো বেড়ে গেলো দেখে সৌম্য আর বসে থাকতে পারলো না ।

ভীত, বিরক্ত গলায় বললে,—কী হয়েছে ?

—শিপ্রার হঠাৎ জ্বর এসে গেলো। বনানী বললে ।

ঘর-দোরের নির্লজ্জ নিঃসহায় অবস্থা দেখে সৌম্যর সারা গা রি-রি করে উঠলো। ট্রাঙ্ক-বাক্সগুলোর ডালা খোলা, মেঝের উপর টাল করে ফেলা বিছানাটা, ড্রেসিং-টেবলটা ছত্রখান। ঘরের মধ্যে অকারণে পাখা ঘুরছে। কুঁজোর জল পড়েছে গড়িয়ে, আলনার কাপড়গুলো এলোমেলো। এমন-কি টেবলের উপর ছোট টাইম-পিসটা পর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অথচ সমস্ত দিন ধরে শিপ্রা কোমরে আঁচল জড়িয়ে এই ঘর-দোর ফিটফাট করেছে, বৃষ্টি এনে দিয়েছিলো তার মনে এই ঘর-সাজাবার সুর। মুহূর্তে কী যে কাণ্ডটা ঘটে গেলো সৌম্যর জানতে আর কিছু বাকি রইলো না ।

বিরক্তিতে সৌম্য উঠলো ঝাঁজিয়ে। দোলনায় খোকার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে,—কিন্তু ও—ও কাঁদছে কেন ? ওকে শান্ত করাও না. ও-বেচারা কী দোষ করলো ?

শোয়া থেকে শিপ্রা হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো। সমস্ত মুখ-চোখ তার ফোলা, নাকের ডগাটা লাল, শরীরের শীর্ণতাটা ছুরির ফলার মতো ধারালো। কিছু যে তার একটা অসুখ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। ঈগলের মতো সে ছোঁ দিয়ে পড়লো দোলনার উপর, ছেলেকে বুকের মধ্যে ছিনিয়ে নিয়ে এঁদো, দমকা একটা হাওয়ার মতো ঘর থেকে গেলো বেরিয়ে। যেতে-যেতে বললে,—ও কাঁদলে যদি তোমাদের গল্পের অসুবিধে হয়, তবে আমি নিয়ে যাচ্ছি ওকে ।

বনানী ব্যাপারটা যেন কিছু তলিয়ে বুঝতে পারলো না ! সৌম্যর মুখের দিকে ভাসা-ভাসা চোখে চেয়ে থেকে শুধোলে : ওর কী হয়েছে ?

—এই জ্বর-জারি, অম্বলের অসুখ, সৌম্য তরল নির্লিপ্ততায় বললে,—কিছু হজম হচ্ছে না, দেখছেন না, মেজাজ কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে ।

—কিন্তু জ্বর নিয়ে এখন ও গেলো কোথায় ঠাণ্ডায় ?

—ওর জ্বর কখন আসে, কখন যায়, দেবতারাও জানতে পারে না। গেছে হয়তো নিচে, রান্নাঘরে। সৌম্য বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে এলো : চায়ের জোগাড় করতে হয় এখন, কী বলেন ? বলেই সে হাঁক দিলে : গিরধারী ! আমাদের চা কই ?

মুখ কাঁচুমাচু করে গিরধারী এসে হাজির ! কাঁদ-কাঁদ গলায় বললে,—আমি কী করবো বাবু, এবার আমাকে মাপ করুন—

—কেন, তুই আবার কী করেছিস ?

—আমি মা'র আর আপনার জন্যে ঠিক দু'পেয়ালা চা করে আনছিলুম, মা হঠাৎ সেই পেয়ালা দুটো ট্রে থেকে তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন।

সৌম্য গলা ছেড়ে হেসে উঠলো, হেসে উঠলো তার অসহনীয় রাগ ও লজ্জা ঢেকে ফেলতে। হাসতে-হাসতে বললে,—মা শুনতে পেলে আর তোকে আস্ত রাখবে না, গিরধারী। নিজে ভেঙে ফেলে শেষকালে কিনা মার নামে চালাচ্ছিস। গিরধারী যেন কী প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো, সৌম্য হাসিমুখে বললে : যা, তোকে আর কষ্ট করে চা করতে হবে না, কেৎলিতে করে খানিকটা গরম জল নিয়ে আয়—দু'জনের আন্দাজ। আমরাই চা-টা করে নিতে পারবো !

বনানী বললে,—স্বচ্ছন্দে।

সৌম্য ব্যস্ত হয়ে বললে,—চলে আসুন, আমরা ও-ঘরে গিয়ে বসি।

আবার তারা দু'জনে যে যার জায়গায় গিয়ে বসলো। সৌম্য হঠাৎ কথার অবিশ্রান্ত ঝড় বইয়ে দিলে, হাল্কা খেলো খুঁটিনাটি কথা, অগুনতি অফুরন্ত কথা ! যে-সব কথার কোনো দাম নেই, শুধু বলতে পারার মধ্যেই তাদের দাম। কথার গলিত অনর্গলতায় ধুয়ে নিয়ে গেলো সে সব ঘোলাটে স্তব্ধতা, আবহাওয়াটা সে কথার কিরণে খটখটে করে তুললে। এর আগে এতো ভয়ানক সহজ করে এতো উচ্ছ্বসিত স্বাভাবিকতায় এতো সাধারণ কথা কোনোদিন সে বনানীকে বলতে পারে নি। বনানীও সেই কথার তরলতায় নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে। সহজ হওয়ার কী ভীষণ যন্ত্রণা ! তার না পাওয়া যায় সীমা, না পাওয়া যায় তল। কোথাও থাকে না আবরণের এতোটুকু আশ্রয়, নিরাপদ এতোটুকু গোপনীয়তা। অথচ ভারি সহজ সে-সব কথা, নিতান্ত আটপৌরে। তাই তাদেরকে এতো ভয়, তাদের গায়ে লেগে নেই আর ভদ্রতার মৌখিকতা, সৌজন্যের চাকচিক্য। নেই আর বিদ্যাবত্তার ছটা, মৌলিক হবার চেষ্টা। জলের মতো অবিরল, নির্মল সে-সব কথা—সেই কথার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো তারা পৃথিবী থেকে সমস্ত মানুষ, আকাশ থেকে সমস্ত তারা ; ভাসিয়ে নিয়ে গেলো শিপ্রা ও তার ছেলেকে, তাদের কালকের প্রভাতকে, তাদের ঘিরে সমস্ত দূরত্বকে। শুধু কথা আর কথা, বাজে, বোকা, ছেলেমানসি কথা—একের পর এক কথা বলতে-বলতে পরের-পর কথায় তাদের সাহস ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—কী যে কখন কে বলে ওঠে কিছুই আশ্চর্য নয়—শুধু কথার পর কথার উন্মোচন। তাদের এই কথার বাইরে পৃথিবীতে আর কোনো উপস্থিতি নেই, নেই আর কোনো প্রতীক্ষা। শুধু তারা, আর তাদের বেষ্টন করে এই কথার কুয়াশা।

কী অসহায় তারা, কী সীমানির্ণীত। শুধু অসার কথার আশ্রয়ে আত্মগোপন। মনে-মনে লজ্জায় মলিন হয়ে যাচ্ছে অথচ ফের নির্লজ্জতাকেই লজ্জা!

গিরধারী সোপকরণ চায়ের জল নিয়ে এলো। সারা শরীরে হালকা হয়ে বনানী লাগলো চা করতে। আরো একদিন সে এমনি চা করেছিলো, কিন্তু বলতে কি. সেদিন যেন সে এতো সহজ ছিলো না। খোলের ভিতরে শামুকের মতো সেদিন তার ব্যবহারে ছিলো একটি ভদ্রতা লুকিয়ে, এমন উৎসারিত একটি স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না। সেদিন ছিলো দয়া, বাধ্যতা নয়। সৌম্য মুগ্ধ হয়ে বনানীর আঙুল ক'টির নাড়া-চাড়ার দিকে চেয়ে রইলো। সমস্ত ছবিটির মধ্যে কোথাও এতোটুকু আর অবিশ্বাস্য নেই, নিষ্ঠুর অপ্রতিরোধ্যতায় তা স্বাভাবিক। এ যেন সৌম্যর প্রাত্যহিকতারই একটা পৃষ্ঠা। বনানী যেন কতোদিনের দীর্ঘ বিস্মৃতির ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

বৃষ্টি আর নেই, জোরে বইছে হাওয়া। মখমলের মতো নরম আকাশের অন্ধকার। পথে লোকজনের আনাগোনা বেড়েছে, জলে-ভেজা মোটরের শরীরগুলো দূর থেকে দেখাচ্ছে সামুদ্রিক জন্তুর মতো। ভিজা রাস্তার উপর আলোর ছায়া পড়েছে, দাঁড়ানো বাড়ির সমুখগুলো জলে ভিজে কেমন রহস্যময়।

বনানীর সঙ্গে-সঙ্গে সৌম্যও জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। রেইন-কোটটা হাতের উপর গুছোতে গুছোতে বনানী বললে,—এবার যেতে হয়।

গায়ের উপর একটা ওভারকোট চাপিয়ে সৌম্য বললে, - চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

এইবার তারা যে যাবে আর সঙ্গচ্যুত হবে না। ফিরবে না তারা আর এই পুরোনো পৃথিবীতে। এই অভ্যাসের আবাসে।

কিন্তু যাবার আগে সামান্য একটু ভদ্রতার পাঠ আছে। তাই—

বনানী গেলো শিপ্রার কাছ থেকে বিদায় নিতে। সৌম্যকেও তাই পিছে-পিছে শোবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে হলো।

খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে মেঝের উপর ছোট একটি বিছানায়, শিপ্রা বসে আছে দেয়ালে পিঠ দিয়ে মেঝেরই উপর। ঘরের হাওয়াটা একটু পড়েছে, থমথম করছে স্যাঁৎসেতে একটা নীরবতা।

বনানী এক পা এগিয়ে এসে বললে,—এ কী, এমনি চুপ করে বসে আছো কেন? তোমার না জ্বর?

শিপ্রা হঠাৎ সরে বসলো, মুখ ফিরিয়ে বললে, - আমার আবার জ্বর! কখন আসে কখন যায়, কিছুই ঠিক নেই।

তার কথা বলার ধরণ দেখে বনানী অল্প একটু না হেসে থাকতে পারলো না, সৌম্যর দিকে তাকিয়ে করুণায় গলে গিয়ে বললে—আপনাকে আর এগিয়ে দিতে হবে না, আমি একাই যেতে পারবো। বলে সমস্ত শরীরে আকস্মিক দ্রুততার একটা দীপ্তি এনে সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

পায়ের শব্দ তখনো হয়তো নিচে মিলিয়ে যায় নি. সমস্ত রাত্রি যেন ভেঙে গেলো শিপ্রার কঠিন আর্তনাদে: যাও, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কী, প্রেয়সী যে পাখা মেলে উধাও হলেন।

সৌম্য অবিচল স্তব্ধতায় পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

শিপ্রা আবার উঠলো খেঁকিয়ে: যাও, যাও আমার সুমুখ থেকে। পথ যে ফুরিয়ে গেলো এতোক্ষণে। গেলে?

সৌম্য পকেটে দুই হাত ডুবিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গম্ভীর নির্মম গলায় বললে,—যাবোই তো। তার জন্যে তোমার মত নিতে হবে নাকি? আমার বাড়ি, আমার ঘর—আমি যাই না-যাই তা আমার ইচ্ছে।

—ইস, তোমার বাড়ি? শিপ্রা ঘৃণায় মুখ কুটিল করে তুললো।

—যাকে খুশি জিগ্গেস করো। আমার ইচ্ছে মতো আমি লোক ডেকে আনবো, ইচ্ছে মতো দেবো তাড়িয়ে। তাতে কার কী বলবার আছে?

—তাই, তাই বেশ। দাও আমাদের তাড়িয়ে। শিপ্রা ছোঁ মেরে হঠাৎ ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে তুলে নিলো, উঠে দাঁড়ালো স্খলিত আঁচলে, বললে,—কে থাকতে চায় তোমার এই পাপপুরীতে?

সৌম্য নিষ্ঠুর হাতে শিপ্রার বাহুটা চেপে ধরলো: তুমি ছেলে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? ও তোমার নয়, তোমার কোনো অধিকার নেই ওর উপর। ইচ্ছে হলে তুমি একা চলে যেতে পারো।

—তাই, তাই যাবো।

কিন্তু টানাটানিতে খোকা উঠেছে কেঁদে। শিপ্রা কী করবে কিছু বুঝতে না পেরে, অগত্যা, যেন খানিকটা অভ্যাসবশতই ছেলেকে বসলো শান্ত করাতে।

তাকে এখন কী দুর্বল, কী অসহায় যে দেখাচ্ছে। সৌম্যর মন সহসা আবার নরম হয়ে এলো। বিকেলে শিপ্রা আজ আর চুল বাঁধেনি, দিনের সেই দাগ-লাগা শাড়িটা অপার একটি ব্যর্থতার মতো এখনো তার গায়ে আছে জড়িয়ে। ঠাণ্ডা, অথচ গায়ে একটা জামা দেয়নি, সমস্ত শরীরে তার শীর্ণতাটি কাতর চোখে চেয়ে আছে! খোলা চুলে তার মুখখানি একেবারে শিশুর মতো অসহায়, বসে থাকবার ভঙ্গিতে যেন একটি অতল রিক্ততা। কী যে সে করবে, বা কী যে সে করতে পারে, কিছুই বুঝতে না পেরে সে যেন শূন্যে থেমে আছে। দেখে সৌম্য আবার গলে গেলো। ইচ্ছে হলো শিপ্রাকে, শীর্ণতায় অসহায় দুর্বল শিপ্রাকে হাত বাড়িয়ে সে বুকে তুলে নেয়, কপালের উপর থেকে চুলগুলি কানের দুই ধার দিয়ে তুলে দেয়, তার ছলোছলো অভিমানী দু'টি চোখ ঠোঁটের উপর চেপে ধরে।

সৌম্য এ-দিক ও-দিক অসংলগ্ন পায়চারি করতে-করতে সুর-ফেরতায় বললে,—আমি কী করতে পারি? যদি এসেই পড়ে কেউ কারুর বাড়ি, তবে ভদ্রলোকে আর কী করতে পারে? আমি তো আর যাইনি। আমি তো আর যাইনি গায়ে পড়ে।

শিপ্রার দুই ঠোঁট ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো, কোনো কথা বললে না, চোখের পালকের ফাঁকে-ফাঁকে কণা-কণা জল আলোয় ঝিকমিক করে উঠলো।

সৌম্য তেমনি আপন মনে পদচারণা করছে। আপন মনে বলছে: ঝড় বৃষ্টি দেখে আমি তো ঘরের কোণেই বসে ছিলুম—আজকাল যে আমি আর কোথাও বেরুই না তা তো চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে,—আমার কী দোষ?

—ওদিকে ঠাট করে ট্রামে যে নিত্যি হাওয়া খাওয়া হচ্ছে! শিপ্রা বিষাক্ত জিভে একটা ছোবল মারলে।

সৌম্য থেমে গেলো। বললে,—বা, সে তো হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গিয়েছিলো। তার আমি কী করতে পারি? ট্র্যাম তো আর আমার নয় যে তাকে আমি নামিয়ে দেবো!

—কিন্তু বাড়ি তো শুনেছি তোমার, শিপ্রার মুখ রাগে কুৎসিত হয়ে উঠলো: তবে এখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে না কেন?

—তুমিই পারলে? তুমিই তো তাকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে লাঠি উঁচিয়েছিলে, তোমারই মুখ দিয়ে বেরুলো একটা কথা? পারলে, বলতে পারা যায় কখনো?

—কী করে পারবো? ডান হাতটা বিকৃত ভঙ্গিতে প্রসারিত করে দিয়ে শিপ্রা বিকৃততর মুখভঙ্গি করে বললে,—প্রাণটা যে ফেটে তা হলে একেবারে চৌচির হয়ে যাবে।

—আহা, আমার জন্যে তোমার কী মায়া! সৌম্য চাপা ঠোঁটে হেসে উঠলো।

সেই হাসিতে শিপ্রা উঠলো সর্বাঙ্গে দগ্ধ হয়ে, বললে,—আমি তাড়িয়ে দেবার কে, বরং আমারই তো বিতাড়িত হয়ে যাবার কথা। আমি আর কেন এখানে বসে আছি?

শিপ্রা ক্ষিপ্তের মতো উঠে পড়লো। কী সে করে তাই সৌম্য দেখতে লাগলো তীক্ষ্ণ চোখে। খোকাকে নিচেই একপাশে শুইয়ে দিয়ে এক-মুহূর্ত—হয়তো তারো এক অণুতম ভগ্নাংশ সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। তার সামনে ভয়াবহ বিশাল একটা ছায়ার মতো সৌম্যর স্থূল উপস্থিতিটা যেন তাকে অভিভূত, নির্জীব করে ফেললে। কোনো দিকে সে পথ খুঁজে পেলো না, শীর্ণতার তীক্ষ্ণ হাহাকারে ছিটকে পড়লো সে খাটের উপর।

সৌম্য তাকে ফের দু' হাতে কুড়োতে গেলো, বললে,—না, তোমাকে বলতেই হবে, কেন তাকে তাড়িয়ে দেবার কথা তোমার মনে আসে। না, বলো, কোথায় তোমার লাগে, কেন তুমি এমন ব্যবহার করছ। কী হয় যদি সে আসে, না, বলতেই হবে তোমাকে স্পষ্ট করে, কী হয় যদি আমরা গল্প করি, কেন তাকে চলে যেতে বলবো, কেন তার সঙ্গে আমি মিশবো না?

শরীরে যতো শক্তি ছিলো সমস্ত তার দশ আঙুলে ডেকে এনে শিপ্রা নিজেকে আঁকড়ে রইলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে আর্ত, অন্ধ একটা চীৎকার করে উঠলো: তাই যাও না, মেশো না গিয়ে প্রাণ খুলে। এখানে আবার কেন? এখানে সুবিধে না হয়, যাও না তার বাড়ি, দরজা তো তার খোলাই আছে দিন-রাত।

—যাবোই তো। সৌম্য রুখে উঠলো: তোমার মতো মন কারু অতো অশুচি নয়। নিজের মতো পৃথিবীর আর-সবাইকে তুমি অমন খারাপ মনে কোরো না। তুমিই না-হয় কিছু লেখাপড়া শেখো নি, কুৎসিত সংস্কারের একটা পচা ডোবা হয়ে আছ, তাই বলে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীও এমনি পচে গেছে মনে কোরো না। সভ্যতার তুমিই শেষ কথা নও।

সৌম্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সে-রাত্রে শিপ্রা আর নিচে নামলো না, পড়ে রইলো খাটের উপর। খাবার সময় পরমেশবাবু প্রতি পদে তাকে হারালেন। এতোক্ষণ পরে এই ঘটনার মধ্যে

পরমেশবাবুকে আমরা দেখতে পেলুম। প্রৌঢ়তায় প্রগাঢ় একটি কাঠিন্যে তাঁর সমস্ত শরীর উদ্ভাসিত। চুলের বিরলতা তাঁর মুখে এনে দিয়েছে একটি উদার গাম্ভীর্য। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে চলতে-চলতে তিনি যে সময়ের সঙ্গেও চলেছেন সেই নবীনতার পরিচয় তাঁর দুই চোখে যেন জ্বলছে।

গিরধারী বললে—মা-জির আজ ভারি জ্বর এসে গেছে, কিছুতেই উঠতে পাচ্ছেন না।

চলচলে মারাঠি চটিতে শব্দ করতে-করতে পরমেশবাবু উপরে উঠে এলেন। দরজাটা খোলা, ঘর অন্ধকারে হা-হা করছে। দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে ভারি গলায় তিনি ডাকলেন: বৌমা।

ডাক শুনে শিপ্রা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলো। সর্বনাশ,—শ্বশুরমশাই। এ সে কী ঘর-দোরের ছিরি করে রেখেছে! শিপ্রা চারদিকে অন্ধকার দেখতে লাগলো। পরমেশবাবু আবার ডাকলেন। শিপ্রা আলো জ্বালালে।

—তোমার নাকি আবার জ্বর এসেছে, বৌমা? পরমেশবাবু মুঠোর মধ্যে আলগোছে তার একখানি হাত তুলে নিলেন।

চোখ নামিয়ে শিপ্রা বললে,—শরীরটা আজ ভালো নেই।

—ডাক্তারে কিচ্ছু হবে না, পরমেশবাবুর দুই ভুরুতে কপাল যেন অন্ধকার করে এলো: কোথাও চেঞ্জেই যেতে হবে।

শিপ্রা আবদারে একটু আনুনাসিক হয়ে উঠলো: বা রে, কার সঙ্গে আবার চেঞ্জে যাবো?

—কেন, আমার সঙ্গে। ক'দিনে আর সৌম্যর কী অসুবিধে হবে? একা-একা খুব চালিয়ে নিতে পারবে দেখো।

শিপ্রা সর্বাঙ্গে ছটফট করে উঠলো: না, চেঞ্জে গিয়ে কী হবে? এমনিতেই আমি ভালো হয়ে যাবো, বাবা।

—তার তো কোনো সূচনাই দেখতে পাচ্ছি না। পরমেশবাবু তার হাতখানি আরো নিবিড় করে চেপে ধরলেন: এমন বিচ্ছিরি বাদলা, অথচ গায়ে একটা গরম জামা দাওনি। সমস্ত রাজ্যের বিছানা দেখছি খাট থেকে নিচে নামিয়ে এনেছ। ও কী, দাদুকে তুমি মেঝের ওপর শুইয়েছ নাকি?

শিপ্রা ত্রস্ত ক্ষিপ্রতায় খোকাকে বুকের মধ্যে তুলে নিলো। হালকা হবার চেষ্টা করে বললে—বিছানার ওপর যতো রাজ্যের ধুলো-বালি পড়েছিলো, তাই ওগুলো টেনে নামিয়ে এনেছিলুম। এই এক্ষুণি সব ফের গুছিয়ে ফেলছি। ওকে একটু ধরুন না।

ঘুমন্ত খোকাকে হাত বাড়িয়ে সন্তর্পণে তুলে নিতে-নিতে পরমেশবাবু বললেন, —তুমি কেন জ্বরো, রোগা শরীর নিয়ে বিছানা বইতে যাবে? তুমি গরম জামা গায়ে দাও, চুল বাঁধো—তোমরা, আজকালকার বৌরা হয়েছ কী? কপালটা একটা শুকনো মাঠ হয়ে আছে, এক ফোঁটা নেই সিঁদুর। ঘরে শাশুড়ি নেই বলে যেন একেবারে টঙে উঠে বসে আছ। নাও, লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুল-টুল বেঁধে ভদ্রলোক সাজো চট করে, আমি গিরধারীকে ডেকে দিচ্ছি।

অগত্যা, প্রায় বাধ্য হয়েই, শিপ্রাকে শাড়ি বদলে গায়ে মোটা দেখে একটা

ব্লাউজ চাপাতে হলো, বসতে হলো এসে আয়নার সামনে। তার শরীর যে অসুস্থ, ধীরে-ধীরে মুছে যাচ্ছে যে তার চামড়ার জৌলুস, শুকিয়ে যাচ্ছে যে তার লালিত্যের তরলিমা—সবাইর মুখে এ-কথা শুনতে আর তার ভালো লাগে না। কী সে হারালো তার হিসেবটাই সবাই খতিয়ে দেখছে, কী যে সে পেলো তা আর কেউ দেখছে না। তাড়াতাড়িতে তিন-গুছি করে বিনুনি পাকিয়ে কোনো রকমে সে একটা খোঁপা বাঁধলে,—হায়, বাঁধতেই হলো তাকে। কিন্তু সিঁদুরের কৌটোতে আঙুল ডুবিয়ে কিছুতেই যেন সে কপালে ছাপ তুলতে পারবে না। তার পরাজয়ের, তার বন্দীত্বের ছাপ। কিন্তু সেই মুহূর্তে পরমেশবাবু গিরধারীকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ফের এসে পড়েছেন। হাতটা শিপ্রার দুর্বলতায় কেঁপে উঠলো, কপালে, হায়, নিখুঁত উঠে গেলো সিন্দুরের সেই চিহ্ন।

পরমেশবাবু বললেন,—বাঃ লক্ষ্মী মেয়ে! এখন ধরো তোমার ছেলে। গিরধারীকে বিছানাটা এবার দেখিয়ে দাও।

গিরধারী বিছানাটা পরিপাটি করে তুললো। পরমেশবাবু ঘরের আনাচে-কানাচে এতোটুকুন বিশৃঙ্খলাও আর থাকতে দিলেন না।

বললেন,—সৌম্য কোথায়?

শিপ্রা বিছানার দেয়ালের প্রান্তে খোকাকে শুইয়ে দিয়ে বললে,—জানি না। কোথাও বেড়াতে গেছেন হয়তো!

পরমেশবাবু চমকে উঠলেন: বেড়াতে গেছে বলছো কী? এতো রাত করে—এই বিচ্ছিরি ঠাণ্ডায়?

—রাত করে ঠাণ্ডায় বেড়াতেই তো ভালো।

—ভালো আমি বার করছি। পরমেশবাবু হঠাৎ হাঁক পাড়লেন: সৌম্য!

পাশের ঘরটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে সৌম্যর উৎকণ্ঠিত শব্দ এলো: এই যে বাবা, আমি এখানে।

শিপ্রা লজ্জায় গেলো এতোটুকু হয়ে।

—এখানে আয় দিকি, শুনে যা।

সৌম্য এসে দেখলো ঘরে কে ইন্দ্রজাল বুনে দিয়েছে। পবিত্র, প্রসন্ন একটি পরিচ্ছন্নতায় সমস্ত ঘর হাসছে। শিপ্রাও পর্যন্ত তার সঙ্গে মিলিয়েছে একটি সুর, নরম, নিচু, লঘু একটি সুর। বহুদিনের পুরোনো চিঠির নতুন আবিষ্কারের মতো সুন্দর একটি বিস্ময় দিয়ে সে তৈরি। ধুয়ে গেছে সময়ের সব ধুলো, আবার তাকে, চিঠির প্রত্যেকটি অক্ষরকে সে পড়তে পারছে।

কিন্তু সৌম্যর চোখের পরিচ্ছন্নতার এই নির্বাক স্তুতি শিপ্রাকে সর্বাঙ্গে যেন প্রহার করতে লাগলো।

পরমেশবাবু বললেন,—কী করছিলি ওখানে?

—এই বই পড়ছিলুম বসে-বসে।

পরমেশবাবু না হেসে থাকতে পারলেন না: তোর এখনো পড়া! তা-ও অন্ধকারে বসে।

সৌম্য হেসে বললে,—না, শেষকালে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম যে।

—কেন, তোর আর ঘুমোবার জায়গা নেই? শেষকালে বই শিয়রে করে

চেয়ারে বসে ঘুমোতে হবে? রাত্রে কি আজ আর খেতে হবে না নাকি? যা শিগ্গির, ঠাকুর কতোক্ষণ খাবার নিয়ে বসে আছে।

সৌম্যকে নিচে পাঠিয়ে দিয়ে পরমেশবাবু শিপ্রাকে লক্ষ্য করলেন: তুমি আজ শুধু একটু দুধ খেয়ে থাকো। দুধের নামে নাক সিঁটকাতে পারবে না। আমি দিচ্ছি ঠাকুরকে পাঠিয়ে। দুধটা খেয়েই শুয়ে পড়ো। অসুখ শরীরে বেশিক্ষণ রাত জেগো না বলে দিচ্ছি।

সব গোছগাছ করে দিয়ে পরমেশবাবু তাঁর নিজের ঘরে বিদায় নিলেন। নির্জন অন্ধকারে বসে তাঁর মনে পড়তে লাগলো তাঁদের সেই মধুর দাম্পত্যকলহের অতীত নিঃশব্দতাগুলি। কতোক্ষণ চুপ করে থেকে সেই নিঃশব্দতা হঠাৎ কেমন করে আবার গলে যেতো নিঃশব্দতায়। ঝগড়াগুলি যখন অসাময়িক দেখা দিতো, তখন কেমন পারিবারিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সংঘর্ষ লেগে লেগে সেই বিচ্ছেদগুলিতে জোড়া লেগে যেতো আপনি-আপনি—আবার সেই স্বাভাবিকতার স্রোত। মনে-মনে সেই সব হারানো দিনগুলি হাতড়ে-হাতড়ে পরমেশবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঝগড়াটাই শুধু তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু কারণ পারেন নি তার কোনো আঁচ করতে। দাম্পত্যকলহের যে একটা কারণ থাকতে পারে এটা তাঁর অভিজ্ঞতায়ই কোনোদিন আসেনি।

সৌম্য আঁচিয়ে উপরে উঠে এসে দেখলো সেই দৃশ্য আবার কখন উঠে গেছে। সব আছে ঠিকঠাক, শুধু শিপ্রার গায়ে নেই সেই জামা, মুছে গেছে সেই ফর্সা শাড়িটা, খোঁপা পড়েছে খসে, কপালে আবার সেই সুতীব্র শুষ্কতা—মেঝের উপর শুকনো একটা মাদুর বিছিয়ে বিনা-বালিসে শুয়ে আছে। দুই চোখে সৌম্য বিবর্ণ হয়ে উঠলো। আবার তাকে এ নিয়ে বলতে হবে আরো অনেক কথা, করতে হবে নানা ভাবে নানারকম সাধ্যসাধনা, এখনো তাকে খানিকটা সময় চুপ করে থাকতে দেয়া হবে না—সৌম্য অসহায়ের মতো হাত কচ্লাতে লাগলো। একবার মনে হলো, থাক ও অমনি পড়ে, কী তাতে তার এসে যায়, তার জীবনের পূর্ণতার কাছে শিপ্রা কী, কতোটুকু তার দাম? কিন্তু পরক্ষণেই তার শোয়ার সেই মলিন, করুণ বঙ্কিমা দেখে সৌম্যর মন আহত একটা আর্তনাদ করে উঠলো। অসুখ করবে যে ভয়ানক। একে এই রোগা শরীর, তায় রাত ভরে এই মেঝের পড়ে থাকলে সে বাঁচবে না। সে থাকবে খাটে শুয়ে—আর নিষ্ঠুর একটা ছন্দপতনের মতো শিপ্রা থাকবে মাটিতে, সৌম্য অস্থির হয়ে উঠলো। বললে,—তুমি এইখানে এমনি শুয়ে থাকবে নাকি?

শিপ্রা কোনো কথা বললো না। আঁকাবাঁকা ভঙ্গুর কর্কশ কʼটি রেখায় নিঝুম হয়ে পড়ে রইলো।

সৌম্য ক্লান্ত, মূর্ছিত গলায় বললে,—এ কী অন্যায় কথা। বিছানায় উঠে এসো বলছি। অসুখ বেড়ে যাবে যে।

শিপ্রার তবু সাড়া নেই।

—তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখ না, সৌম্যর স্বর অনুনয়ে নেমে এলো: আমার আর করবার কী ছিলো? যা ঘটলো তাতে আমার কী হাত? আমি তো বাড়িতেই বসে ছিলুম। যদি আমার সামনে এসেই পড়ে কেউ, কী করে

বলা যায় যে আমি বাড়ি নেই ? আমার কী দোষ ? তুমিই তো তাকে ঠেলে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিলে। ওঠো, উঠে এসো বলছি।

সৌম্য নিচে নেমে বসলো তার পাশে। তার শোয়ার এই সমর্পিত বিশ্রান্তিটি তাকে, তার সবল সুমহান পৌরুষকে যেন ধ্যান করছে, তার বিশাল অস্তিত্বের আশ্রয়ে নিরাপদ, নিশ্চেতন একটি শান্তি। তার শোয়ার এই সুদূর নিঃসঙ্গতাটি দেখে সৌম্যর আবার মনে পড়লো সংসারে সে ছাড়া শিপ্রার আর কেউ নেই, তারই ছায়ার শীতল প্রসারণের নিচে ছোট একটি ঘাসের মতো সে স্তিমিত চোখে চেয়ে আছে। সৌম্য ছাড়া তার এই দুঃখ বুঝবে কে, তার এই অপ্রতিকরণীয় দুঃখ, বিশাল বিস্তীর্ণ এই নিঃসঙ্গতা। বোঝবার মতো সৌম্যর ছাড়া কার আর ছিলো সেই উদার কল্পনা ? ভাগ্যিস, শিপ্রা তারই হাতে এসে পড়েছিলো, তারই সম-মমতার পরিমণ্ডলে, নইলে কে বা করতো তাকে মায়া, কে বা করতো তাকে অনুভব ! হয়তো কতো দুঃসহ দারিদ্র্যে তাকে পুড়তে হতো, কতো নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতায় ? সে ছাড়া শিপ্রার আর কে আছে ? জলের মতো অসহায় অপ্রতিবাদে সে তার সঙ্গে মিশে গেছে, ছড়িয়ে পড়েছে রাত্রির অশরীরী অনুভূতির মতো। দেখে সৌম্যর অসহ্য মায়া করতে লাগলো, তার স্তব্ধতায় অব্যাহত এই নিঃসঙ্গতা দেখে। পাণ্ডুর দু'টি ঠোঁটের কিনারে শীর্ণ একটি কান্না আছে ঘুমিয়ে, দুইখানি নিঃসম্বল, অসহায় হাত মা-হারা সন্তানের মতো লুটিয়ে পড়েছে তার বুকের কাছে। অসম্ভব তার থেকে মুছে যাওয়া, অসম্ভব তাকে বুকের ঘনতায় উত্তপ্ত করে না তোলা। সৌম্য হাত বাড়াতে যাবে বলে সারা শরীরে মধুর একটি অবসাদ অনুভব করলো, বললো : ছি শিপ্রা, তুমি তো একবার বিচার করে দেখতে পারো। এর মাঝে কোথাও এতোটুকু অশোভন নেই, অশুচি নেই। কেন তবে তুমি—সৌম্য তার চুলের উপর ছড়িয়ে দিতে গেলো তার স্পর্শের দাক্ষিণ্য।

তারই শুধু মায়া, আর তার জন্যে শিপ্রার এতোটুকু মায়া নেই কেন ? তার মন যাতে খুশি হয় তাতে সে হাসিমুখে কেন সায় দেয় না ? সে কেন তার দুঃখ বোঝে না ? কেন শুনতে পায় না তার আত্মার দীর্ঘশ্বাস ? কেন সে এতো ছোট হয়ে থাকে, কালো হয়ে থাকে ? এতো দিতে পারে, আর এটুকু দিতে পারে না ?

শিপ্রা প্রত্যক্ষ একটা প্রতিবাদের নিষ্ঠুরতায় দেয়ালের ধারে নিজেকে ছুঁড়ে ফেললে। বললে,—খবরদার আমাকে ছুঁয়ো না। আমি অশুচি, আমি খারাপ—আমার চেয়ে পৃথিবীর আর-সবাই সতী, আর-সবাই ভালো। আর-সবাই তোমার মতো চরিত্রে একেবারে ঝলমল করছে।

শিপ্রা উচ্ছ্বসিত বেদনায় নিজেকে হঠাৎ ঢেলে দিলে। স্বামীর কাছ থেকে এমনি একটি সম্পর্শ নিমন্ত্রণ যে সে প্রত্যাশা করছিলো। না তা নয়, বরং ঘরে সে আলো রেখেছিলো জেলে যাতে তার এই প্রতীক্ষার সুরটি সৌম্য স্পষ্ট শুনতে পায়। কিন্তু তার মুখে এখনো সেই বনানীর কথা, তাকে সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না, প্রতিটি মুহূর্তে বেজে চলেছে তারই নিশ্বাসের ওঠা-পড়া। যেন সৌম্য আর শিপ্রার মাঝে আর কোনো কথা নেই, নেই আর কোনো স্তব্ধতা। শিপ্রা কান্নায় ধুয়ে যেতে লাগলো।

সৌম্য উঠে দাঁড়ালো, উড়ে গেলো সেই ক'টি মুহূর্তের সোনালী সম্মোহন।

কটু, বিষাক্ত গলায় বললে,—যতো খুশি কাঁদো না, কিছু তাতে কারুর এসে যায় না, কিন্তু বিছানায় উঠে এসো বলছি। ঠাণ্ডায় শুয়ে অসুখ করে আমার পয়সা খরচ করার তোমার অধিকার নেই।

শিপ্রা দেয়ালের সঙ্গে মিশে আছে।

—যদি না যাও তো আমি জোর করে তোমায় তুলে নিয়ে যাবো।

শিপ্রা উঠলো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে। বললে,—চ্যাঁচাবো, ভীষণ চ্যাঁচাবো কিন্তু। সমস্ত বাড়ি জাগিয়ে দেবো বলে রাখছি। যা-তা বলবো সবাইর মুখের ওপর। সরে যাও – অসহায়, অন্ধ শিপ্রা নিবুদ্ধি বিমূঢ়তায় হঠাৎ একটা গালি পেড়ে বসলো।

সৌম্য গেলো সরে, থেমে, ছোট হয়ে। পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য পশুর মতো নিষ্ফল আক্রোশে লাগলো পাইচারি করতে। একটাও কথা বললো না, আলো নিভিয়ে দিয়ে নিজেই শুতে গেলো মশারি ফেলে।

কিন্তু ঘুমের কল্পনা করাও অসম্ভব। ঘরের ভিতরটা চাপা একটা ভারের মতো যেন তাকে পিষে ফেলছে। তবু বহুক্ষণ চোখ বুজে প্রত্যাশা করতে লাগলো সেই ভারের বিমোচন, ক্ষমায় নমনীয় হয়ে শিপ্রার একটি সলজ্জ, বিস্তৃত বশ্যতা। প্রত্যাশায় ক্ষয় পেয়ে-পেয়ে ঘুমিয়েও পড়েছিলো হয়তো একটু, স্বপ্নের একটা ঢেউ লেগে সে-ঘুম গেলো ভেঙে, হাত বাড়িয়ে খুঁজতে গেলো সেই স্বপ্নকে—কিন্তু শয্যাময় প্রজ্জ্বলিত একটি অনুপস্থিতি। শিপ্রা তখনো শুয়ে আছে মাটিতে, আপন স্পর্ধিত নিঃসঙ্গতায়।

মশারি তুলে সৌম্য নিঃশব্দে পা ফেলে-ফেলে ছাদের উপর উঠে গেলো। রাত তখন অনেক, ভিজা আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ লাল হয়ে অস্ত যাচ্ছে। সমস্ত রাত্রি ছড়িয়ে পড়েছে সুতীব্র একটা নির্জনতার মতো। সেই নির্জনতায় সৌম্য বুকে সাহস পেলো, চিন্তায় পেলো তীক্ষ্ণ দুর্নিবার সুস্পষ্টতা। নিজের আত্মার সঙ্গোপন গুহা থেকে ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে পড়লো যেন সে পৃথিবীর বিপুলতায়। ধোঁয়ায় ও কুয়াশায় ফুলের প্রাণ যেমন ক্লিষ্ট হয়ে থাকে, তেমনি সে আবৃত, সংকুচিত হয়ে ছিলো তার নিশ্ছিদ্র প্রাত্যহিকতায়। আজ সে ছাড়া পেয়ে চলে এসেছে যেন বিরাট এক আরম্ভের উন্মুক্তির মধ্যে।

সত্যি, ভালোবাসতে না পারলে সে বাঁচবে না, বাঁচবে না এই তৃষ্ণাহীন অভ্যাসের অন্ধকারে বসে মৃত্যুময় মুহূর্ত গুনতে। তার চারধারে এসেছে নতুন হাওয়া, নতুন অন্ধকার, জীবনে নতুন সম্ভাবনা। সে থাকবে না আর থেমে, আপনার মাঝে কুঁকড়ে, গুটিয়ে, নিরুত্তর, নিস্পন্দ হয়ে। সে বাঁচবে, আত্মসম্পূর্ণ, আত্মসর্বস্ব হয়ে বাঁচা। অগ্নিশিখার মতো নির্ধূম, নিরাবরণ বাঁচা, বিকশিত ফুলের বিহ্বল উন্মোচনের মতো। পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়ো তাগিদ এই বাঁচায়, আত্মার নিহিত এই গহনতায়: অনন্তের অতল শান্তি বিশেষ একটি এক হওয়ায়, একক হওয়ায়। সৌম্য তেমনি এক হয়ে বাঁচবে তার এই অনুভবের একাকীত্বে। তার স্বসম্পূর্ণ স্বঅর্থক বাঁচার কাছে তুচ্ছ, তুচ্ছ আর সব বিবেচনা, বলতে গেলে, তার বাঁচার বাইরে আর কোনো বিবেচনাই নেই। সে বাঁচবে, সমস্ত শরীরে পান করবে সে এই অগ্নিময় চেতনার ধারা, সে ভালোবাসবে, নিজের জীবনে লাভ করবে সে অপরূপ

রূপান্তর। সুযোগ সে হারাবে না, নিজের মাঝে সঞ্চারিত করে দেবার এই মদির সুখস্বাদ, নিজের মাঝে উদ্ভাবন করবার এই জ্বলন্ত অন্ধকার। জ্বলে উঠেছে তার অন্ধকার, মধুর মূর্ছায় মুছে যাচ্ছে তার শরীরের সসীমতা। বনানী, বনানী, শব্দ দু'টো সৌম্যর দুই ঠোঁটের ফাঁকে ছোট একটি পাখীর মতো পাখা ঝাপটে উঠলো, মিলিয়ে গেলো অন্তর্লীন আকাশের ধূসরতায়। সমস্ত শরীরে সে বীতবর্ষণ আকাশের মতো হালকা হয়ে গেলো, খুঁজে পেয়েছে সে তার ভাষা, তার মুক্তি; ঝরিয়ে দিয়েছে সে তার যতো পরিচয়ের ভার, সময়ের সঞ্চয়। সে নতুন করে জন্মালো তার নিজের শরীরে, মনের এই উলঙ্গ শৈশবে। কী সে চায় এতোদিনে স্পষ্ট তাকে আবিষ্কার করতে পেরে সৌম্য অরণ্যচারী নির্লিপ্ত পশুর মতো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। জীবনে সে কী অসীম মুক্তি এই এক হওয়ায়, একান্ত করে এই একাকী হয়ে যাওয়ায়। সৌম্য তার কোনোদিকে ফিরে চাইবে না, সে স্পষ্ট কণ্ঠে এখন কথা বলতে পারছে, দেখতে পারছে অনাবৃত নিজেকে। আর তার ভয় নেই, লজ্জা নেই, নিজেকে মেলে ধরতে পারছে রাত্রির গভীর নিঃশব্দতার কাছে।

হ্যাঁ, বনানীকে সে ভালোবাসে, তাকে তার চাই, বনানীকে, যে একদিন অনায়াসে তার হতে পারতো, সমগ্র তার। সময় এখনো যায়নি ফুরিয়ে, সময় কোনোদিনই ফুরোয় না, আজো সে তার, একান্ত তার, একাকী তার। সে তার জীবনে নিয়ে এসেছে নতুন নির্জনতা, নতুন আয়তন, নতুন পারিপ্রেক্ষিত। নিয়ে এসেছে সমুদ্রময় নীল নিশ্চিহ্নতা, সময়হীন বিরাট বিস্তৃতি। কোনোদিন সৌম্য তার ইশারা পায়নি। তার যৌবনের অটল দুর্ভেদ্যতায়, তার অক্ষরের অন্ধকার অরণ্যে, ইশারা পায়নি প্রেমের এই দুরারোহ দূর ধূসরতার। সেই বাঁচা থেকে এতোদিন সে বঞ্চিত ছিলো, নির্বাসিত ছিলো সে তার বইয়ের কয়েদে। পরের মত কুড়িয়ে সে বেড়েছে, পরের মুখ চেয়ে সে এতোদিন বহুজনের একজন হয়েছে মাত্র, আজ আর তার নিজেকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব, আজ সে একের মাঝে অগণন। কোথায় কী হচ্ছে তাতে তার কী, নিজে সে হয়ে উঠতে পারলেই যথেষ্ট। লক্ষ জীবন, লক্ষ মৃত্যুতে কিছু এসে যায় না, চাই তার এই বাঁচবার আনন্দ, এই আনন্দের সার্থকতা। তার বাঁচবার, তার সম্পূর্ণ হবার প্রয়োজনের কাছে শিপ্রা কী, কতোটুকু;— কতোটুকু তার অস্তিত্ব, কতোটুকু তার দাম। তার মৃত্যুতেও কিছু এসে যায় না, যদি সে বাঁচে, যদি সে বাঁচে এই তার বাঁচবার প্রচুরতায়।

রাশীকৃত অন্ধকারের ভার থেকে ছাড়া পাবার জন্যে আকাশ আর্ত নিঃশব্দতায় চীৎকার করে উঠেছে—কতোক্ষণে উঠবে সূর্য। কী আশ্চর্য, কতোক্ষণে উঠবে সূর্য, আবার সূর্য উঠবে। সূর্যের পিপাসায় সৌম্যর সমস্ত রক্ত লাল হয়ে উঠলো। আবার সূর্য উঠবে, সেই সূর্যে আবার একটি দিন, জীবনকে আবার একটি সম্ভাষণ। সেই সূর্যের আলোয় সৌম্য মেলে ধরবে তার প্রেম, তার নবীন অভ্যর্থনা।

। পনেরো ।

শিপ্রা একেবারে বিছানা নিলে। শরীরে দিলো না আর উপেক্ষা করতে, পরমেশবাবু তার উপর কড়া পাহারা রাখলেন। তাঁর একটা কাজ মিলে গেলো, সেই তৎপরতাকে এড়িয়ে যাবার শিপ্রা আর কোনো পথ দেখলে না। দিনে-দিনে, শেষকালে, বাধ্য হয়েই তাকে মিশে যেতে হলো বিছানায়।

সৌম্য এ ক'দিন মাড়ায় নি এ ঘরের চৌকাঠ। দরকারো ছিলো না কিছু, বাবাই যথাবিধি সব ব্যবস্থা করছেন। চিকিৎসার কোনোই সে ত্রুটি রাখেনি, বিছিয়ে দিয়েছে আরামের রমণীয়তা। ছেলের জন্যে রেখে দিয়েছে একটা আয়া, সেবার জন্যে আনিয়েছে তার এক বিধবা কাকীমাকে। প্রায় বড়োলোকের ঘরের বউ, অসুখ করেছে, তার সামাজিক মর্যাদাটা সে বোঝে। পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজন যারা সব একটা করবার মতো কাজ পেয়ে তাকে দেখতে আসে, তারা যেন সেই সঙ্গে দেখে যেতে পারে সৌম্যর অটুট কর্তব্যবোধ, তার সাংসারিক স্বচ্ছলতা, সে তার নিখুঁত বন্দোবস্ত করে রেখেছে। স্বয়ং শিপ্রারো কিছু অভিযোগ করবার থাকতে পারে না—রোগী হিসেবে। এবং. বলতে গেলে, এখন তো সে রোগীই। রোগী বলে তার ঘরে প্রায় সব সময়েই একজন না-একজন লোক, সৌম্য সেখানে অবান্তর। সে ও-সব কিছু বোঝেও না, রোগীর খেজমৎ, কখন কী লাগবে ফর্দ দাও, দাম দিচ্ছি। বিছানাটা পর্যন্ত সে পাশের ছোট ঘরটায় সরিয়ে এনেছে—রোগীর নিশ্চিন্ততাকে সে আহত করিতে চায় না। রাতের জন্যে একটা নার্স রেখে দেবে না হয়—যতো লাগে। সারা দিনে শিপ্রার সঙ্গে তার চোখাচোখি একটি-বারো দেখা হয় না, টুকরো-টুকরো খবর বাবার মুখেই সে শুনতে পায়। শুধু শুতে যাবার আগে, ঘুমে হারিয়ে যাবার আগে, অজানতে মন আবার তার অন্ধকারে ঠাণ্ডা হয়ে আসে, শিপ্রাকে আবার একটু কাছাকাছি পেতে ইচ্ছা করে! ঘর কখন ফাঁকা হয় তারই জন্যে খুঁজে ফেরে অবকাশ, কখন শিপ্রার শোয়ার ঘুমিয়ে থাকে একটি কাতর প্রতীক্ষা, পা টিপে-টিপে সৌম্য তার ঘরে ঢোকে। আলোটা জ্বালায়, শিপ্রা একবার চেয়েও দেখে না। টেম্পারেচারের চার্টটা একটু নাড়াচাড়া করে, ওষুধের শিশি তুলে দেখে ক'দাগ খাওয়া হয়েছে। আরো সাহসে ভর করে তার খসখসে শুকনো কপালে একখানা হাত রাখে, সেখানে জাগে না কোনো প্রত্যাশা। হয়তো জিগ্‌গেস করে: এখন কেমন আছো? মেলে না কোন প্রতিধ্বনি। ধীরে-ধীরে ঘর থেকে ফের চলে যায় তার জ্বলন্ত অন্ধকারে।

আশ্চর্য, তবু সে শিপ্রাকে ভুলতে পারে না, মুছে ফেলতে পারে না হাত দিয়ে, মলিন মুমূর্ষু একটি আভার মতো লেগে থাকে। কেন, কেন তার জন্যে এই মায়া? এই পিছু-টান? কে সে সৌম্যর কাছে, সৌম্যর বৃহত্তর উন্মোচনের পৃষ্ঠায়? স্রোতের মুখে দুর্বল একটা কুটোর মতো কেন সে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারছে না, কেবল ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কে তার শিপ্রা? তার সামাজিক অবস্থার একটা মানদণ্ড, সেটাই তার আসল পরিচয় নয়; তার সাংসারিক সমৃদ্ধির একটা

উদাহরণ, সেটাই নয় তার আসল ঐশ্বর্য। শিপ্রা তার হতে পারে হোক, সে শিপ্রার নয়। শিপ্রার অতিরিক্ত তার একটা বিশাল ব্যক্তিত্ব আছে, সে প্রকাশিত হবে সেই বিশালতায়।

শিপ্রা প্রথমে আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলো, ভেবেছিলো সে আর বাঁচবে না। তার আর রুচিও নেই বাঁচবার, এই তার স্বামীর সমৃদ্ধির শুধু একটা প্রাণহীন প্রতীক হয়ে। মৃত্যু ছাড়া তার আর কোনো পরিণতিই সে দেখতে পাচ্ছিলো না, সেই যেন তার একটা কিছু করা, একটা বিশেষ কিছু হয়ে ওঠা। মরা ছাড়া আর যেন তার কোনো দাম নেই, দাবি নেই, মরাই যেন তার একমাত্র কৃতিত্ব। বাঁচবে না সে জানে, কিন্তু কবে যে মরবে তারো সে কোনো ইশারা খুঁজে পাচ্ছিলো না। আর, বেঁচে থাকতে-থাকতে লোকে সত্যি করে, সদর্থক ভাবে, মরতেই বা চায় কি করে? চাওয়াটাই বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে যখন চারদিক থেকে চিকিৎসার এতো আয়োজন শুরু হয় ও তার কাছে শিপ্রাকে করতে হয় নিঃসঙ্কোচ সমর্পণ। চিকিৎসার প্রতিটি টুকিটাকি পরমেশবাবুর হাতে, সেই হাত শিপ্রা সরিয়ে দিতে পারে না। আর, গোপন করে লাভ কী, শিপ্রা সত্যিই চায় না মরতে, চাইতেই পারে না: তার মাঝে কাঁদছে আরো অনেক প্রত্যাশা, অনেক অমরত্ব। সেদিন খোকা আয়ার কোলে কিছুতেই শান্ত হচ্ছিলো না, রোগা দুর্বল হাত মেলে, আয়াকে অনেক সাধাসাধি করে খোকাকে লুকিয়ে সে একটু কোলে নিলো। সত্যি, তার মরতে আর ইচ্ছে করলো না। খোকার ফুলো-ফুলো ছোট্ট মুখটি বুকের মধ্যে চেপে ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। যদি সে আবার ফিরে যেতে পারতো তার সেই স্বপ্নময় সোনার মুহূর্তগুলিতে, যখনো খোকা হয়নি, ঘুমিয়ে ছিলো তার শরীরের ঘন, পরিতৃপ্ত অন্ধকারে, যখনো তার দেহে নামেনি এই রোগের বর্ষা, যখনো সে নিজেতে নিজেই পূর্ণ ও অব্যাহত ছিলো তার নিষ্ঠুর একাকীত্বে। দস্যু খোকাই এসে তাকে লুট করে নিলো, তবু তার এই রিক্ততার মাঝে দিয়ে গেলো তাকে অপর্যাপ্ত অকার্পণ্য। না, সে মরবে কেন, তার কিসের শূন্যতা? মরলেই তো সে হেরে গেলো, মুছে গেলো তার সমস্ত অধিকারের সম্পদ থেকে। মরেও যে সে সেই অপমান ভুলতে পারবে না। মার কোলে উঠে খোকা কচিকচি লালচে মাড়ি দেখিয়ে হাসতে শুরু করেছে। কেন সে যাবে, কোন সুদূর সে নির্জন নিশ্চিহ্নতায়? কেন সে ছাড়বে তার দাবি, তার অবশ্যম্ভাবিতা? সে মা, কেন সে ফেলে যাবে সেই মহান দায়িত্ব, বিস্তৃততর জীবনে তার মহত্তর সম্ভাব্যতা? এখনো সময় আছে, সে ছাড়বে না, ছাড়বে না সে সূচ্যগ্র অধিকার, নেমে দাঁড়াবে না সে এক তিল নিচে। সে মরতেই শুধু শেখেনি।

আয়ার কোলে ছেলেকে দিয়ে শিপ্রা বিশুবাবুকে ডেকে পাঠালো।

বালিশে ভর দিয়ে বসে খাটো গলায় শিপ্রা বললে,—আপনাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

বিশুবাবুকে কোনোদিন শিপ্রা এর আগে মুখোমুখি কোনো হুকুম করেনি। তার মাতৃত্ব তাকে আজ একটা অপ্রতিহত শাসনের স্পর্ধা এনে দিয়েছে। কাঁচা পাকা চুলে-গোঁফে গোলগাল বোকা-বোকা মানুষটি এই বিশুবাবু পরম আপ্যায়িত হবার ভঙ্গিতে একটু ঢলে পড়ে বললেন,—নিশ্চয়। বলুন।

শিপ্রার গলা আরো নেমে গেলো : করেই দিতে হবে আপনার সে-কাজ। কিছুতেই আমি না শুনবো না। যা আপনার লাগে, যা আপনি চান, তাই আমি দেবো।

এতো কী দুঃসাধ্য কাজ বিশুবাবু ভেবে পেলেন না। তাঁকে এতোই বা অনুরোধ করতে হবে কেন? শিপ্রার, বলতে গেলে বাড়ির কর্ত্রীর, কোন কাজটা তিনি মুখের কথায় না করে ফেলতে পারেন?

—না, আপনি বলুন, একটা কাজ করে দেবো তাতে অতো কেন সঙ্কোচ করছেন? আমি তো আপনাদের চাকর।

বালিশের তলা থেকে দুমড়ানো একটা নোট বার করে শিপ্রা বললে,—তবু নিন আপনি এই দশটা টাকা, কখন কি খরচ করতে হয় তার ঠিক নেই।

সর্বাঙ্গ ছি-ছি করে উঠে বিশুবাবু বলেন,—সে কী কথা, বৌমা? টাকা—টাকা দিয়ে কী হবে? কী-একটা সামান্য কাজ করে দিতে হবে, তাতে টাকা লাগবে কিসের? আমি কি এমনি নেমকহারাম হয়ে গেছি নাকি?

—বড়ো কঠিন কাজ যে।

—হোক না যতো কঠিন, সংসারে বিশু সরকার পারে না কী? বিশুবাবু শরীরে একটা বলদৃপ্ত ভঙ্গি আনলেন : বলুন।

শিপ্রা ফিসফিসিয়ে বললে,—কাজটা বলতে গেলে খুবই সোজা। আপনাকে রোজ সন্ধ্যেবেলা লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে এসে আমাকে বলতে হবে আপনার দাদাবাবু কোথায় যান, কার সঙ্গে। যেখানেই যান আপনাকেও যেতে হবে সেখানে—সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, যতোদূর সম্ভব, জেনে আসতে হবে। পরে আমার কাছে এসে সব রিপোর্ট দেবেন। কী, পারবেন না?

বিশুবাবু চারদিকে যেন নিরবয়ব প্রেতচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছেন তেমনি সাতঙ্ক বিবর্ণতায় বললেন,—এ কী মা, নোংরা কাজ!

—যে-রকমই কাজ হোক, পারবেন কিনা বলুন। শিপ্রা যেন জ্বলে উঠলো।

—কিন্তু দাদাবাবু যদি জানতে পারেন?

—তিনি জানতে পারবেন কী করে? তিনি যাতে বিন্দুবিসর্গও না জানতে পান তাই তো আপনাকে দেখতে হবে। কী, চুপ করে রইলেন কেন?

বিশুবাবু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। পীড়িত মুখে বললেন,—এ কাজ কেন করতে বলছেন?

—কেনর ব্যাখ্যা জেনে আপনার কী হবে? শিপ্রা ধমকে উঠলো : আপনি পারবেন কিনা বলুন? নিজে না পারেন অন্তত বিশ্বাসী আর কাউকে দিয়ে। এমন লোক পেলে ভালো হয়, যিনি আপনার দাদাবাবুকে চেনেন, অথচ তাঁকে তিনি চেনেন না। যতো—যতো টাকা লাগে আমি দেবো। আপনার হাতে নেই এমন কোনো লোক?

বিশুবাবু হেঁট হয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন : টাকার কথা হচ্ছে না—

—যদি না পারেন—

গলার স্বরে বিশুবাবু চমকে উঠলো।

শিপ্রার মুখ অস্বাভাবিক তপ্ত হয়ে উঠছে, দুই গভীর গহ্বর থেকে বেরিয়ে

আসছে যেন আগুনের দু'টো পিণ্ড : যদি না পারেন আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবো। ঠিক আত্মহত্যা করবো। আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো, আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, শিপ্রা হঠাৎ শিথিল দ্রুততায় বিছানার ধারে সরে এলো : ঠিক আত্মহত্যা করবো। আমাকে যদি বাঁচাতে চান, শিপ্রার চোখে জল দাঁড়িয়ে গেছে : আপনাকে করতেই হবে আমার এটুকু কাজ। আমি আপনার কাছে আর বেশি কিছু চাইছি না।

বিশুবাবুকে শিপ্রা বশীভূত করে ফেললো।

শুতে যাবার আগে নিষ্প্রাণ অভ্যাসবশতই সৌম্য এসে পড়েছিলো শিপ্রার ঘরে, তার শিয়রের কাছে, দিনব্যাপী পরিচর্যার তালিকা নিতে। ঘর মিঠে অন্ধকার, জলের উপর তারার ঝিকিমিকির মতো শিপ্রা শুয়ে আছে, তার অস্পষ্ট-করে-দেখা শরীরের লঘিমাটি যেন অস্ফুটমান একটি ফুলের মতো বিষণ্ণ। শিপ্রা হয়তো এখন ঘুমিয়ে পড়েছে, ঝড়ের রাতে ছোট্ট একটি পাখির মতো ঘুমিয়ে – ঘরে আর তাই লোকজন নেই, ছড়িয়ে আছে একটি নিরাশ অবসন্নতা, নিরবয়ব একটা অনুভূতির মতো। আলো জ্বালাতে সৌম্যর ভয় করতে লাগলো। কতোদিন পরে ভালো লাগলো আবার তার এই শরীরের নরম নিরাভতা, ক্লান্তির এই একটি গভীর আস্বাদ। সৌম্যর ভারি ইচ্ছা করলো আবার সে চুপি-চুপি শিপ্রার কাছে গিয়ে বসে, তার ঘুমের জলস্রোতের মধ্যে মিশিয়ে দেয় তার স্পর্শের একটি শীতলতা। অন্ধকারে তার সেই ঘুমে-মলিন, নির্বাপিত, নিঃশেষ-ন্যস্ত মুখখানি দেখবার জন্যে কেঁদে উঠলো তার চোখ। চোখ বুজে ভাবতে গেলো সেই মুখ, সেই শিপ্রা—নেই, গেছে তা হারিয়ে চোখের অতল তমিস্রতায়। লেগে আছে দু' একটা ক্ষণিক, তরলিত ছায়া। তার স্মৃতি যেন সূর্যোদয়ের রৌদ্রজ্জ্বল ক'টি মুহূর্তের স্মৃতি, তার সেই মুখ যেন ছাই-রঙের দীর্ঘ ধূসর দিনের একটি রঙের ভোরবেলা।

ফুলের উপর প্রজাপতির প্রসারিত, নিশ্চল প্রতীক্ষার মতো সৌম্যর দুই চোখ শিপ্রার মুখের উপর নেমে এলো। অন্ধকারে কে যেন উঠলো হেসে। কে যেন ব্যঙ্গতিক্ত, ধারালো গলায় একটা হাহাকার করে উঠলো : বায়স্কোপ কেমন দেখলে ?

প্রবল একটা ধাক্কা পেয়ে সৌম্য দূরে ছিটকে দাঁড়ালো। কে হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো জানবার জন্যে ভয় পেয়ে সে আলো জ্বালালে।

শিপ্রা বাঁকা-চোরা ভেঙে-ভেঙে-পড়া স্খলিত, দুর্বল কতোগুলি রেখায় বিছানার উপর উঠে বসেছে। রুক্ষতায় ভীষণ একটা চেহারা, সারা গায়ে ক্ষুধার্ত শীর্ণতা। পিচ্ছল, তির্যক কতোগুলি সরীসৃপের মতো তার গায়ের রেখাগুলি যেন কিলবিল করে উঠেছে। বিদ্রূপে গলিত দুই চোখে সে জিগ্গেস করলে : বায়স্কোপ কেমন জমলো সন্ধ্যেবেলা ? আমরা তো আর দেখতে পেলুম না, গল্পটাই না-হয় একটু শুনলুম।

গলার কাছে সৌম্যর হৃৎ-পিণ্ড এসে ধুকধুক করতে লাগলো, হাত-পাগুলি আর তার নিজের বলে মনে হলো না। ধরা-পড়া, স্তিমিত, শুকনো গলায় বললে, —বায়স্কোপ, বায়স্কোপ আবার গেলুম কখন ?

—যাওনি ? শিপ্রার দীর্ঘ, দ্রুত একটি দৃষ্টি বিষাক্ত তীক্ষ্ণতায় তাকে বিদ্ধ করলে।

—ককখনো না। কে বললে তোমাকে ?

—যাওনি ? তুমি আমার গা ছুঁয়ে—শিপ্রা নিজেকে সংশোধন করে নিলো : ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারো, তুমি যাওনি ?

—যাইনি তো যাইনি, সৌম্য স্পর্ধিত একটা ভঙ্গি আনবার চেষ্টা করলো : শপথ করতে যাবো কেন ? তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো না ? অসুখে ভুগে এ-সব তুমি কী দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছ ?

—ঠিক বুঝেছ, দুঃস্বপ্নই বটে। রোগা, পাঁশুটে দাঁতে শিপ্রা হেসে উঠলো : তোমাকে বিশ্বাস করবো না ! তুমি যে আমার স্বামী, ইষ্টদেবতা। কিন্তু ট্যাক্সির নম্বরটাও যে আমি দেখে ফেলেছি।

—ট্যাক্সি, ট্যাক্সির নম্বর—কী বলছ তুমি যা-তা ?

—গ্রে-রঙের একটা ট্যাক্সি, টি-১৭৪৯, সিডান-বডি—বেশ ঘেরা, ঢাকাঢুকি-দেয়া, চলে গেলে তোমরা দু'জন সোজা গ্লোব-এ। বনানীদির পরনে সাদা, পাড়-ছাড়া, হালকা একটা গরদের শাড়ি, তুমি তোমার আপিসের স্যুট পরে। ছবির নামটাও আমি বলে দিতে পারি একটু চিন্তা করলে। কী, শিপ্রা বিষময়, বিলোল একটা কটাক্ষ করলো : কী, বলো, মিলছে না হুবহু ? তারপর ছবি ভেঙে গেলো, গেলে তোমরা মার্কেটে, বড়ো-বড়ো ডাঁটওলা সাদা কী বিলিতি ফুল কিনলে, হাসতে-হাসতে ওজন নিলে দু'জন, ফেরবার সময় ফিরলে বাস-এ, বাস-এর খোলা মাথায়। 'কক্‌খনো, কক্‌খনো যাইনি !' বলবার কী ঢঙ্‌ ! শিপ্রার জিভ লক্‌-লক্‌ করে উঠলো : তোমাকে বিশ্বাস করবো না ! তোমাকে বিশ্বাস না করে পারি ?

সৌম্য ছটফট করে উঠলো : তুমি—তুমি কী করে জানলে ? কে তোমাকে বললে এ-কথা ?

—আমি যে গুনতে জানি, আমারো যে একজন ঈশ্বর আছেন। কী, তুমি বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতে পারো ? বলিনি ঠিক মোটরের নম্বর ? বলিনি ঠিক শাড়ির রঙ ? কেনোনি তোমরা ফুল ? যাওনি—যাওনি গ্লোব-এ ?

—গেলে গেছি, সৌম্যর মুখের উপর কে যেন একটা হিংস্র বলিষ্ঠ থাবা মেরে-ছিলো, সেটা দুই হাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে মূঢ়, অন্ধ উন্মত্ততায় বলে উঠলো : গেলে গেছি, তাতে তোমার কী, কার কি এসে যায় ?

—কারু কিছু এসে যায় না ? প্রেতায়িত, নীরেখ একটা ছায়ার মতো শিপ্রা হেসে উঠলো : কারু কিছু এসে যায় না তো মিথ্যে কথা বলতে গেলে কেন ? সোজা, সাদা সত্য কথা বলতে তোমার কী হয়েছিলো ? মিথ্যাবাদী কোথাকার।

সৌম্যর সেই মুহূর্তে ইচ্ছে হলো ভারি একটা-কিছু জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে শিপ্রার মুখের উপর ছুঁড়ে মারে, তার কুঞ্চিত, কুৎসিত মুখের উপর। মারাত্মক ইচ্ছে হলো দুই নির্দয়, নিশ্চেতন হাতে ধীরে-ধীরে তার গলাটা টিপে ধরে, রোগা, লম্বা, শুকনো সেই গলা। খাটের কাছে সে ভয়ঙ্কর স্তব্ধতায় এগিয়ে এলো, রেলিঙটা হাতের তেলোতে চেপে ধরে কর্কশ গলায় বললে,—তোমাকে কে দিলে এত সব

খবর ? তুমি আমাকে স্পাইং করতে শুরু করেছ নাকি ? পেছনে চর লাগিয়েছ নাকি ? বলো, কী করে তুমি জানলে ? সৌম্য ধমকে উঠলো : বলো বলছি, কে সে লোক ?

—বলবো না। তুমি কী করতে পারো ?

সৌম্য যে সেই মুহূর্তে কী করতে পারে তার সে কোনো কূলকিনারা পেলো না। কিছু না করাটাই সে পরম প্রতিশোধ বলে মনে করলে। ফিরে গেলো, সরে এলো তার বন্য বিচ্ছিন্নতায়। বললে,—যাবো, একশোবার যাবো। আমার খুশি আমি গিয়েছিলুম, আমার খুশি আমি আবার যাবো। তুমিই বা কী করতে পারো ?

—কেন, কেন তুমি যাবে ? শিপ্রা তার মুখের উপর তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার ছুঁড়ে মারলে।

—আমার খুশি। আমার খুশির ওপরে কারু কোনো হাত নেই। সৌম্য উদভ্রান্তের মতো ঘরের মধ্যে পাইচারি শুরু করলে : শেষকালে তুমি আমার পেছনে চর লাগিয়েছ ? কিন্তু তোমার চর কতোটুকু– কতোটুকু দেখতে পেয়েছে ? মোটরের রঙ, বিলিতি সাদা ফুল,—এই, এই পর্যন্ত। সৌম্য হঠাৎ চাপা গলায় কুটিল করে হেসে উঠলো : যাবোই তো, আমার মন যেখানে যেতে চায়, যেখানে গেলে আমার ভালো লাগে।

—ভালো লাগে তো মরতে আবার ফিরে আসো কেন এখানে ? শিপ্রা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেলো : সেখানে থাকলেই তো পারো চিরকাল।

—ইচ্ছে হলে থাকবোই তো সেখানে। কে তোমার এখানে আসতে চায়, তোমার এই রোদ-হাওয়া-হীন এঁদো, রোগা ঘরে ? সেখানেই তো থাকবো চিরকাল —চিরকাল। সৌম্য একমুহূর্তও আটকালো না : সম্ভব হলে তাকে আমি বিয়ে করবো, হ্যাঁ, তাকে—বনানীকে।

—বিয়ে করবে ? কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে শিপ্রা যেন উবে গেলো একেবারে।

—হ্যাঁ করবো, কেন করবো না ? সৌম্য কথার একটা ঝড় তুলে দিয়েছে : যে-বিয়েতে আমি পূর্ণ হবো, সার্থক হবো, বিশাল হবো—তা থেকে আমি নিজেকে ভয়ে লজ্জায় আত্মার দীনতায় কেন বঞ্চিত করতে যাবো ? আমার কিসের বাধা, কিসের কী ?

শিপ্রা নয়, যেন দেয়ালের কোণের খানিকটা মরা অন্ধকার কথা কইলে : কোনোই বাধা নেই ?

—এক তিল নয়। সৌম্যর কথাগুলি যেন পাথরে-খোদা নিষ্ঠুর নির্বিকার কতোগুলি রেখা : সমস্ত আইন আমার পক্ষে, আমার পক্ষে আমার প্রেম, আমার মনুষ্যত্ব। প্রাণহীন একটা কর্তব্যের ভার বয়ে-বয়ে আমি আর আমাকে সঙ্কুচিত, খর্ব করে রাখতে পারবো না, আমি যাবো—আমি যাবো আমার বিপুলতর সম্ভাবনার খোঁজে। তার কাছে তুমি কে, কতোটুকু ?

শিপ্রা আর ধরে রাখতে পারলো না শরীরের এই শীর্ণতার ভার, উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়লো বিছানার উপর, রাশি-রাশি ব্যর্থতার মতো। সমস্ত ঘর তার

ভয়ঙ্কর শূন্য কণ্ঠে যেন হাহাকার করে উঠলো : সত্যি, সত্যি তোমার কোনোই বাধা নেই ?

—কিসের বাধা ? একদিন বিয়ে তো হতেই পারতো অনায়াসে, সেদিন আমি যদি বিয়ে করতুম। সে-বিয়ের লগ্ন আজো বয়ে যায়নি। সেদিন আমি খুঁজে আনিনি পাত্রী, আমি জানতুম না আমার সার্থকতা। সেদিন আমাদের পরিবার বিয়ে করেছিলো, আমাদের সমাজ—আমি নয়।

—করো না, করো না বিয়ে, এক্ষুণি, এই মুহূর্তে। মুখ তুলে শিপ্রা বন্য পশুর মতো সজল দুই জ্বলন্ত চোখে তার উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো : এখানে তবে দাঁড়িয়ে আছো কেন ? যাও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।

—তার জন্যে তোমার মত নিতে হবে না। সৌম্য দরজার কাছে সরে এলো : তোমার মুখ চেয়ে আমি এখানে বসে নেই।

—আচ্ছা, দেখা যাবে।

—আচ্ছা। সৌম্য নিষ্ঠুর হেসে উঠলো।

দুজনের মাঝে উত্তপ্ত, অনুচ্চারিত শত্রুতা।

॥ ষোলো ॥

সবুজ সন্ধ্যায় ভরে-যাওয়া ঘন, শান্ত ঘরে বনানী তার দীর্ঘায়িত, তন্দ্রাবিজড়িত শরীরে পুঞ্জ-পুঞ্জ আলস্য নিয়ে বসে ছিলো। দেয়ালে-মেঝেয় সন্ধ্যার নতুন ছায়া পড়েছে, ঈষৎ কম্পান্বিত, সঞ্চরমান, প্রেতায়িত কতোগুলি দীর্ঘশ্বাস। তারায় ফেটে পড়বার জন্যে আকাশ অন্ধকারে যাচ্ছে ডুবে, দূরে কাঁপছে একটা গাছ, ধূসরতার দীর্ঘ একটা শিখা। সব অস্পষ্ট, অস্পৃশনীয়—আকাশ গেছে মুছে, পৃথিবী গেছে হারিয়ে। শুধু বনানীই ধরা পড়ে গেছে নিজের মধ্যে, শুধু তার মাঝেই প্রখর, জাগ্রত একটা স্পষ্টতার দাহ। এতো তীব্রতা যেন সে সহ্য করতে পারছে না, সংজ্ঞাবদ্ধ, স্পষ্ট একটা সীমার মধ্যে এই তার জ্বলন্ত উন্মোচন, এই তার নিরঙ্কুশ, নিরাবরণ স্বাভাবিকতায় নেমে-আসা। সে চিরকাল বাস করে এসেছে তার অর্ধসুপ্ত, প্রচ্ছন্ন অবচেতন্যে, তার অনুর্মিল, নির্মল অশারীরিকতায় : আজ তার সমস্ত অস্তিত্বচেতনা অপ্রতিহত সূর্যোদয়ের মতো প্রত্যক্ষ রক্তে এসে দেখা দিয়েছে, তার কল্পনার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বিশাল একটা শরীরের বোঝা। সে চিরকাল বাস করে এসেছে বিলীয়মান একটি গোধূলির ধূসরতায়, তার সেই মায়াময় অপরূপ মৃত্যুর উপর কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে রাশি-রাশি রৌদ্রের সমুদ্র, উতরোল জাগরণের বন্যা। অসহ্য, অসহ্য এ জাগরণ। তার এই নিষ্ঠুর নির্জনতা দিয়ে ঘেরা কঠিন দুর্ভেদ্য দেয়াল হঠাৎ তাকে বাইরে ঠেলে দিয়েছে, দিয়েছে তার বিচরণের, বিস্ফোরণের বিশাল একটা মুক্তি। অসহ্য, অসহ্য এ মুক্তি। অসহ্য এই রক্তে বেঁচে ওঠা, এই রৌদ্রে,

এই নিরন্ধকার স্পষ্টতায়। বনানী পুড়ে-পুড়ে যেন সারা হয়ে যেতে লাগলো। গভীর আত্মায় আর্তনাদ করে উঠলো এই শরীরের স্থৌল্যে, এই তার নিপীড়িত সীমাবদ্ধতায়। সে চায়নি, চায়নি এই আলো, এতো—এতো আলো, এতো উজ্জ্বল, উদগ্র অজস্রতা। বাঁচতে চায়নি সে এই ভয়ংকর স্পষ্টতায় এতো নির্লজ্জ-উজ্জ্বল হয়ে। আনো মৃত্যুমদির অন্ধকার, বনানী সহ্য করতে পারছে না এই বাঁচবার অতিচার—সে ঠিক, ঠিক মরে যাবে, মরে যাবে শুধু তার উদ্বেলিত মুহূর্তের ভারে।

তার আরণ্য নিঃসঙ্গতায়, তার আপন গূঢ় গহনে সে ছিলো শুধু একটা বীজবিন্দু, কোন দেবতা-সূর্য তাকে হঠাৎ উত্তপ্ত, উন্নিদ্র এক ফুলে বিকশিত, উন্মোচিত করে তুলেছে, তার আর পালাবার নেই পথ। কে সে, কে সে সৌম্য? কী তার পরিচয়? বনানী তার কিছুই জানে না, জানবার সে অবকাশই পায়নি। সে, সৌম্য, শুধু অন্ধ, অন্ধকার একটা শক্তি, সূর্যের মতো অন্ধকার, অজ্ঞাত ফুলের কাছে সূর্যের মতো অন্ধকার, অজ্ঞাত। কী সে করতে পারতো সেই শক্তির সামনে নিজেকে উদ্ঘাটিত করে না দিয়ে, নিজের মাঝে এমনি অনায়াসে হয়ে-না-উঠে? সূর্যের আলোতে বিদ্ধ, আসিক্ত হয়ে ফুলের না ফুটে-ওঠা ছাড়া আর কী উপায় আছে? ফুলের সমস্ত নগ্নতা সূর্যেরই শক্তিতে ধৃত, নিহিত, সংবেদিত। কী তার পথ ছিলো নিজেকে অস্বীকার করবার লুকিয়ে রাখবার? কিন্তু ফুলের কই আর সেই আরণ্য বিলাস, কই সেই তার সুরভিত নিঃসঙ্গতা? বৃন্তচ্যুত হয়ে কোন দেবতার পূজায় উৎসর্গীকৃত হবার মৃত্যুতেই যেন তার পরিণতি!

বনানী সমস্ত শিরা-স্নায়ুতে বাণবিদ্ধ, রক্তাক্ত একটা পাখির মতো ছটফট করে উঠলো। ঘর থেকে দৈত্যকায় অন্ধকারটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে সুইচ টেনে তাড়াতাড়ি জ্বালালো সে আলো। দীর্ঘ আয়নায় তার মুখের শুভ্রায়িত একটা ছায়া পড়লো—লজ্জায় সে নিজের মুখের দিকেই তাকাতে পারছে না, নিজের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা। সরে দাঁড়ালো আয়নার উলঙ্গতার থেকে, তার অসুস্থ একটা ভয় করতে লাগলো পাছে সেই মুখে হিংস্র, ক্ষুধিত, ভয়ংকর কিছু সে একটা পড়ে ফেলে। তার সহ্যও হচ্ছে না আলো, আলোয় রূঢ়, নির্দিষ্ট এই বাস্তবতা, তার চারধারে পুঞ্জীভূত স্বাভাবিকতার এই অনুপাত। বনানী একটা আশ্রয়ের জন্যে তাড়াতাড়ি জানলায় এসে দাঁড়ালো। তার কিসের লজ্জা যতোক্ষণ আকাশে নীল তারা ফুটছে, যতোক্ষণ পৃথিবীতে একটিও আছে গাছ, উড়ছে একটিও পাখি। কিসের তার ভয় যখন অন্ধকারের এতো ঐশ্বর্য নিয়েও রাত্রি একা, জীবনের সমস্ত পূর্ণতা নিয়েও মানুষ মৃত্যুতে যখন নিঃসঙ্গ। তার লজ্জা নেই, নেই কোনো ভয়, এই তার শরীরব্যাপী জাগরণের মূর্ছায়, এই তার বিনিদ্র, বিশাল একাকীত্বে। সে থাকবে একা তার এই রশ্মিবিদ্ধ প্রখর উন্মোচনে, তার উন্মেষের সকল সৌগন্ধ নিয়ে, তার জীবন্ময় আরণ্য বৈফল্যে। বনানী বেশিক্ষণ যেন দাঁড়াতে পারছে না, আবার তার এই চেতনার স্পষ্টতায়। আবার এসে বসলো তার চেয়ারে। পথটুকু পেরিয়ে আসবার সময় আবার তার ছায়া পড়লো আয়নায়।

বনানীর মরে যেতে ইচ্ছে করলো, এই মুহূর্তে মরে যেতে ইচ্ছে করলো, মরে

যাওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু সে কল্পনা করতে পারলো না। মৃত্যু কী তা সে জানে না, মৃত্যু কী তাই যখন সে জানে না, তখন, মরলে কী হয় তা জানতে যাওয়াও তার বিড়ম্বনা; তবু, বনানীর মনে হলো, মৃত্যু বুঝি এমনি একটা অনুভূতির অনতিপরবর্তী অবস্থা। না জানুক, তবু সে মরতে চায়, মন থেকে মুছে যেতে, শরীর থেকে মুছে যেতে। মুছে যেতে মনোহীন, কায়াহীন, কাকুতিহীন অপার এক নীরন্ধ্রতায়। মৃত্যু—মৃত্যু তার জীবনের উন্নয়ন, তার চরম ফুলহীনতায় ফুটে-ওঠা। যথেষ্ট হয়েছে জীবনের উচ্চারণ, এবার আসুক নেমে বনানীর অনুভূতিহীন, গভীর অন্ধকার। মরতে তার কোনো দুঃখ নেই, কোনো অপমান নেই তার মুছে যেতে, জানার থেকে বড়ো যে সেই অজানা, জীবনের থেকে বড়ো যে সেই ঊর্ধ্বজীবন, বনানী তারই উদ্দেশে নিজেকে উৎসর্গ করবে। কোলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বনানী হঠাৎ মানুষের স্বরে কেঁদে উঠলো।

কেন সে আসে না সেই স্থিরীকৃত মৃত্যুর মতো? যাকে ফেরানো যায় না, বসিয়ে রাখা যায় না, বুঝিয়ে বলা যায় না। সেই নিশ্চিত, প্রবল, মহান সর্বনাশের মতো? কেন তার সাহস নেই, উজ্জ্বল নির্লজ্জতা নেই? কেন সে সেই মহান আগুন জ্বালে না যা সমস্ত অসত্য ও অসারকে ভস্ম করে রচনা করবে প্রাণের কৃতার্থতা, প্রেমের দীপ্ত কীর্তি! কেন সে অভ্যাসকে বর্জন করতে পারে না নবীনারম্ভের সম্ভাবনায়? তেজস্বী সত্যের শান্তিতে কেন সে চূর্ণ করে দিতে পারে না মীমাংসার কৃত্রিমতাকে? যেখানে তার আহ্বান সেখানে তার আহুতি নেই কেন? যেখানে তার পূর্ণতা সেখানে সে কেন অকিঞ্চন?

ঠাকুমা যে কখন ঘরে ঢুকেছেন বনানীর তা খেয়াল নেই। নোয়ানো পিঠের উপর শুকনো অথচ কোমল একটি স্পর্শ পেয়ে সে চমকে উঠলো। ঠাকুমা,—ঠাকুমাকে চিনতে পেরে ভঙিটা সে খরতর করবার চেষ্টা করলে না।

ঠাকুমা শুধোলেন: অমন মাথা গুঁজে বসে আছিস কেন?

—কিছু ভালো লাগছে না, ঠাকুমা। বনানী মন্থর বিশ্রান্তিতে উঠে বসলো।

—কেন, কী হয়েছে? ঠাকুমা ব্যস্ত হয়ে তার কপালে-গলায় হাত দিলেন!

—আমি এ-চাকরি ছেড়ে দেবো। ঘরের স্তব্ধতার জলে বনানী শব্দের একটা ঢিল ছুঁড়লে।

—কেন? এমন কথা যেন ঠাকুমার অধিগম্যতার বাইরে: সে আবার কী কথা?

—এমনি, এমনি ছেড়ে দেবো। বনানী উঠে পড়লো তার ক্লিশ্যমান শরীরের দীর্ঘতায়, টেবিলের উপর থেকে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে: চিরকাল আমাকে এই চাকরি করতে হবে, ঈশ্বরের সঙ্গে এমন কোনো চুক্তি করে আসিনি, ঠাকুমা।

ঠাকুমা, তাঁর ছোট-ছোট জ্বলজ্বলে চোখে বনানীর দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন, দ্বিতীয় শৈশবের সবিস্ময় সরলতায় বললেন,—কথা তো ঠিকই, মেয়ে হয়ে কে আবার চাকরি করতে যায়, নিজে সেধে কে যায় জোয়াল টানতে? আমরা পরের ঘাড়ে মানুষ, চিরকাল আমাদের জন্যেই পুরুষ ফেলেছে ঘাম। ঠাকুমা প্রসন্ন সখীত্বের গোপনতায় বনানীর কাছে সরে এলেন, একটু নুয়ে পড়ে ফিস্-

ফিসিয়ে প্রশ্ন করলেন : বিয়ে করবি ঠিক করলি ? এতোদিনে কাউকে পছন্দ হলো ?

বনানী তার অন্তর্নিহিত নিঃশব্দতায় হেসে উঠলো ; বললে,—নিজেকেই, নিজেকেই ঠাকুমা, পছন্দ হচ্ছে না। পৃথিবীতে আর সবই ঠিক আছে, যে যার নিজের জায়গায়, শুধু আমিই এখানে অনুপস্থিত। না, না, বনানী হঠাৎ মাতৃহীন আর্ত শিশুর মতো ছটফট করে উঠলো : আমি এখান থেকে চলে যাবো, চলে যাব এখান থেকে।

—কোথায় ? ঠাকুমা ভীত একটা শব্দ করলেন।

—দূরে, অনেক দূরে, কোথায় আমি ঠিক জানি না। বনানী আবার একটা চেয়ারে ভেঙে পড়লো, অস্থির হয়ে চুলের গোছাগুলি বুকের উপর আনলো টেনে, ছড়িয়ে দিতে লাগলো আগুনের হলকার মতো। বললে,—খুব বড়ো একটা অজানা অন্ধকারে, যেখানে আকাশের ভার নেই এমন একটা মুক্তিতে, সে অনেক দূর, ঠাকুমা।

ঠাকুমা তেমনি জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে রইলেন : আর কোথাও চাকরি পেয়েছিস নাকি ?

—চাকরি ? আর চাকরি নয়। খোলা চুলে রাত্রির অরণ্যের মতো বনানী আবার মর্মরিত হয়ে উঠলো : নয় আর সভ্যতায় এই সংকুচিত হয়ে থাকা, নিষ্ঠুর এই যান্ত্রিকতায় রুদ্ধশ্বাস। এটা শুধু মানুষের পৃথিবী নয়, ঠাকুমা, এখানে অণুতম কীট থেকে মহামহিম পশুরা করছে বিচরণ, এখানে জাগছে গাছ, ফেটে পড়ছে ফুল, সমুদ্রের নিচে সংগ্রাম করছে অসংখ্যেয় প্রাণ। আমি যাবো, তাদের কাছে যাবো, তাদেরই একজন হয়ে। জীবন আমাদের যাই হোক ঠাকুমা, মৃত্যুতে আমরা সবাই এক—সেই আমাদের পরম কিছু-না-হওয়ায়।

শিশু যেমন ভয় পেয়ে মা-কে আঁকড়ে ধরে, তেমনি সমর্পিত বিশ্বাসে ঠাকুমা বনানীর ডান হাতটা চেপে ধরলেন : কোথায়, কোথায় যাবি তুই ?

ঠাকুমার ভয় দেখে বনানী ছোট মেয়ের মতো খিলখিল করে হেসে উঠলো, তাঁর মুখটা বুকের একপাশে জড়িয়ে ধরে কুঁকড়েপড়া ছোট্ট মাথাটিতে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে,—কোথায় আবার যাবো ? ইচ্ছে করে কোথায়—কতোদূরে বা আমরা যেতে পারি ? এই কয়েকদিনের জন্যে এখানে-ওখানে একটু ঘুরে আসতে যাবো, ঠাকুমা।

—চাকরি ছেড়ে দিবি ?

—হ্যাঁ, চাকরি করে আমার কী হবে ? কী হবে এই নিজেকে এমনি রুটিনে বেঁধে রেখে, দিনের এই মলিন দিনানুগতিতে ? না, চাকরি আমি আর করবো না, তুমি অতো ভয় পাচ্ছ কেন, আমি এমনি শুধু একটু ঘুরে বেড়াবো আমার নিজেকে ছেড়ে, আমার বিশালতর একটা নির্জনতার দেশে। আমি ঠিক করে ফেলেছি, ঠাকুমা।

ঠাকুমা বিস্ময়ে একেবারে ছিঁড়ে পড়ছেন। এই দুর্দাম মেয়েটিকে কিছুতেই তিনি মেপে উঠতে পারলেন না তাঁর জীবনভোর অভিজ্ঞতার তোলে। সারাজীবন তাই সে করে এসেছে যা আকস্মিকতায় অসাধারণ। নিজের ইচ্ছার অধিকারে যে

চিরকালে এসেছে বেঁচে। তার এই ইচ্ছার প্রতাপে চিরকাল যে পরিপার্শ্বকে লঙ্ঘন করে গেছে। তার কাছে ঠাকুমা একটি শিশু। তার কাছে তিনি আরো আশ্চর্য-রকম অসম্ভবনীয় কিছু আশা করেছিলেন। দুঃসম্পাদ্য কোনো ব্রত, দুর্দমনীয় কোনো প্রতিজ্ঞা। মন খারাপ করে এ-দিক ও-দিক একটু তুচ্ছ ঘোরা-ফেরা করার মেয়ে সে নয়, তাকে যেন ও মানায় না। এ যেন তার পক্ষে বড়ো সোজা কাজ, এ নয় যেন তার বাঁচবার একটা বিশেষণ। চাকরি সে যে-কোন মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারে, দিয়েওছে সে বহুবার ছেড়ে, কেননা চাকরিই আবার সেধে আসবে তার হাতের মুঠোয়। এ বনানী একটা এমন কী চোখ-ঝলসানো কাজ করছে? বড়ো সহজ, বড়ো বেশি সহজ বলেই ঠাকুরমার যেন কেমন ভয় করতে লাগলো। এতো সহজই যেন তার পক্ষে অস্বাভাবিক। কোনো একটা সংকল্পে তীক্ষ্ম বিদ্ধদৃষ্টি না হয়ে এমনি উচ্ছৃঙ্খল, উদ্বেল আলস্যে ছেড়ে দেয়ার এই তার শীতল তন্ময়তা দেখে ঠাকুমা যেন চোখের সামনে অন্ধকার দেখলেন। কিন্তু বনানীকে কেউ কোনোদিন প্রতিবাদ করতে শেখেনি। সে চিরকাল বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তার আত্মার ঔদ্ধত্যে। সে মরবে, তবুও তার এই জীবনের জনতাহীনতায়।

ঠাকুমা শুধু ভয়ে-ভয়ে জিগ্গেস করলেন: কবে ঠিক করলি?

—আজ, এই মুহূর্তে। ঠিক করতে আমার বেশি সময় লাগে না, ঠাকুমা।

—কেন, কিছু বলবি?

—কেন, তা আমি নিজেই কিছু স্পষ্ট জানি না। বনানী শুভ্র, প্রশান্ত গলায় বললে,—শুধু জানতেই আমার যতো সময় লাগে।

বনানী চিরকালই এমনই অন্ধকার, কিন্তু সেই অন্ধকারে যেন স্নেহ ছিল, এতো ভয় ছিলো না।

ঠাকুমা আবার জিগ্গেস করলেন: কেন যাবি জানতে পাই না?

বনানী বললে,—যতোটুকু জানি, ততোটুকুই তো আমি বলবো। ভালো লাগে না, আমার ভালো লাগছে না এখানে। বনানী চুলগুলি হাতে করে তুলে ধরে গায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে লাগলো।

—ভালো লাগে না কী বলছিস? ঠাকুমা বিস্ময়ে একেবারে শুকিয়ে এলেন: এতো বড়ো শহর কলকাতা, নিজে গায়ে পড়ে সেধে এখানে চাকরি করতে এলি কম মাইনেয়, দিব্যি সংসার পেতে বসেছিস, ছোটখাটো একটি ফুলের বাগান করে ফেলেছিস পর্যন্ত, এর মধ্যেই আবার ভালো লাগলো না?

দুই হাতের অঞ্জলিতে কতোগুলি চুল নিয়ে তার মধ্যে বনানী মুখ ঢাকলো: শহর, আর শহর নয়, ঠাকুমা, এবার কোনো সমুদ্র, যার পারে নেই কোনো মানুষের বসতি, সমস্ত শহর আর সভ্যতা যেখানে বালি হয়ে মিশে গেছে,—আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে সেই কোনো সমুদ্রের নির্জনতায়, বাঁচতে আমার আরেক কোনো ব্যক্তিত্বে, ব্যক্তিত্বহীনতায়। বুঝবে না, তুমি তা কিছু বুঝবে না, ঠাকুমা। বনানী উঠে পড়লো, খোলা চুলে, মূর্তিমতী নিশীথ-রাত্রির মতো: আমি নিজেই কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, তোমাকে বোঝাবো কী করে? বনানী হঠাৎ ঠাকুমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো, কোলে তুলে নিতে চাইলো: এমনি একটু হাওয়া বদল করে

আসতে যাচ্ছি, দেখছো না আমার চেহারা—কেমন শুকিয়ে যাচ্ছি দিন-দিন ? বাগান, ফুল, এই সব মিথ্যে ফুলের গাছ দিয়ে আমি কী করবো ? ওরা এখানে নিজের থেকে হয়ে ওঠেনি, ঠাকুমা, আমি ওদের এখানে জোর করে এনে পুঁতেছি।

ঠাকুমা অসহায়ের মতো বললেন,—তবে আমার কী হবে ?

—তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

—আমাকে নিয়ে যাবি কোথায় ?

—অন্তত কাশী পর্যন্ত। হিন্দু বিধবার এক কাশী।

—কাশী ! ঠাকুমা আহ্লাদে প্রায় ফেটে পড়লেন। তাঁকে কাশী রেখে বনানী যে তার পর কোথায় যাবে সে-কথা জিগ্‌গেস করবার কথা তাঁর আর মনেই রইলো না।

দরজার উপরে মৃদু দুটো টোকা শোনা গেলো।

ঠাকুমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে চুলটা হাত-প্যাঁচ করে বাঁধতে-বাঁধতে বনানী চাপা, দ্রুত গলায় বললে,—পালাও, শিগ্‌গির পালাও। কে যেন এসে পড়েছে। চুপ করে শুয়ে পড়ো গে বিছানায়।

ঠাকুমা সরে গেলেন।

কে এসেছে বনানী তা জানে। কিন্তু তার সামনে এতো উন্মুক্ততা নিয়ে সে যে কী করে দাঁড়াবে, কিছুতেই তা সে ভেবে উঠতে পারলো না। তার চুল থেকে পায়ের নখে সমস্ত শরীর যেন আজ বড়ো বেশি কথা কইছে, পরনের শাড়িটাতে পর্যন্ত কথার সেই আভা, কথার সেই সৌগন্ধ্য। বনানী কী করে মুছে ফেলবে তার শরীর। তার এই ব্যক্তিত্বের উচ্চারণ। যদি সে এই মুহূর্তে মরে যেতে পারতো। যদি ভুলতে পারতো, সে এতো সুন্দর নয়; তার হঠাৎ এতো সৌন্দর্যে বিদারিত হয়ে যাবার অসহ্য চেতনা যদি সে পারতো ভুলতে। যদি সে হারিয়ে যেতে পারতো আকাশের সুদূরে তারাহীনতায়, ঘরের প্রেতায়িত এই অনুপস্থিতিতে। বনানী চট করে আয়নাতে একবার মুখটা দেখে নিলো, চেয়ারে পিছলে গেলো তার ভারহীন শ্লথতায়, ঢলে-পড়া দিগন্তের আকাশের মতো, তাড়াতাড়ি টেবল থেকে টেনে নিলো একটা বই, যে-কোনো একটা পৃষ্ঠা খুলে বসলো কোলের উপর। দরজায় আবার বাজলো কার হাত, বনানীর বুকের মধ্যে যেন সেই শব্দ—বনানী নির্বাপিত, অন্ধকার গলায় বললে,—আসুন, দরজাটা খোলাই আছে।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো সৌম্য—যেন এক দৈবত আবির্ভাব। বনানী যজ্ঞের আহিত অগ্নির মতো শিখায়িত হয়ে উঠলো। এক মুহূর্ত, ক্ষীণতম, আগ্নেয়তম একটি মুহূর্ত। তার পর রাশি-রাশি বিস্মৃতির ভস্ম ছড়িয়ে দিতে লাগলো সেই আগুনের উপর।

—এ কী, আপনার শরীর ভালো নেই নাকি ? সৌম্যর স্বর যেন একটা বাতাসের মতো তাকে স্পর্শ করলে।

—ভালো আছে কি নেই ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি না। বনানী হাসি ও না-হাসির মাঝখানে নিচের ঠোঁট সূক্ষ্ম রেখায় প্রসারিত করলো : বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

সৌম্য নিলো আরেকটা চেয়ার, একটু দূরে, জানলার কাছে, বনানীর ঠিক মুখোমুখি নয়।

কোনো কথা নেই।

বনানী তবু যেন ধরা পড়ে গেছে তার এই দীর্ঘায়িত আলস্যে, তার এই দুর্লক্ষ্যচিহ্নতায়। ঘরময় বিচ্ছুরিত হয়ে উঠছে যে বিদ্যুৎমান স্তব্ধতা, সে যেন তারই একটা উন্মেষচ্ছটা। সমস্ত ঘরের ছড়ানো-ছিটোনেতে যেন তারই টুকরো-টুকুরো কান্না, সাদা দেয়ালগুলোতে যেন তারই ঘুমের প্রেতচ্ছায়া। বনানী সদ্যধৃত শৃঙ্খলায়িত একটা পশুর মতো তার বিশাল-বিচরণীয় অরণ্যের পিপাসায় ছটফট করে উঠলো। কী শাস্তি, কী শাস্তি এই তার আত্ম-দৈত্যের হাত থেকে ছাড়া না পাওয়ায়, নিজের কাছে নিজের এই অপ্রতিরোধ্যতায়। বনানী খুঁজে বেড়াতে লাগলো সাধারণত একটি দিন, হাওয়ায় ভেসে-আসা ঝিরঝিরে ক'টি দিনের শিশির-কণা, শরীরহীন রাত্রির ক'টি ঘুম, আকাশ থেকে ঝরে পড়া রাত্রির ক'টি পাপড়ি। খুঁজে বেড়াতে লাগলো সেই তার স্বাভাবিকতার সুর, হায় তার স্বাভাবিকতা। আজ কিনা তাকে চেষ্টা করে 'স্বাভাবিক' হতে হচ্ছে।

বনানী মন্থর নিবিড়তায় দুই চোখ তুলে সৌম্যর দিকে তাকালো। দীপ্তিতে দৃঢ়তায় অঘাতনীয় সে কেমন যেন ক্লান্তিতে রয়েছে ঘুমিয়ে, বেশে-বাসে কেমন একটা নিশ্চেতন ঔদাস্য। যেন সে শিরার সমস্ত শিখায় চঞ্চল হয়ে তার ঘরে ঢুকেছিলো, কিন্তু বনানীর আবহাওয়ায় এসে সে-ও পড়েছে থেমে, অনুত্তপ্ত নৈর্ব্যক্তিকতায় গেছে হারিয়ে। যেন তারো মাঝে রোগা, বন্দী একটা ঘর করছে হাহাকার, তারো মাঝে।

কথা, কিন্তু কী কথা কে বলবে? যতোক্ষণ তারা কথা কইছে না, ততোক্ষণ এ ঘরের বাইরে, অপরিচেয় নীল অন্ধকারে তারা ফুটছে প্রার্থনার ভাষার মতো, ফুটছে কোথায় ফুল মৃত্যুর মদির পরিপূর্ণতায়, কোথাও কোন বিস্তীর্যমান নিঃশব্দ আকাশের নিচে নীল হয়ে উঠেছে সমুদ্র। এখনো, যতোক্ষণ তারা ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে আছে, এখনো সেই সমুদ্র উঠেছে স্তনিত হয়ে। তার নেই বিরতি, তার নেই বিরলতা, তাদের ঘুমের মধ্যেও তার ঢেউ, সেই ধূসরায়মান সমুদ্রের। যতোক্ষণ তারা নেই, তখনো স্বপ্নের মতো ফেটে পড়ছে তারা, মৃত্যুর মতো জাগছে ফুল, ঘন বিস্মৃতির মতো ছড়িয়ে পড়ছে সমুদ্র। শুধু তারাই নয়—তাদের দু'জনকে নিয়েই নয় পৃথিবী। তাদের দু'জনের পৃথিবীর বাইরেও আরো অনেক জায়গা আছে, অনেক আশাহীনতা, অনেক মৃত্যু।

না, এইভাবে আর চলতে পারে না। যখন সে তাকে টেনে নেবে না তখন বনানীই এগিয়ে যাবে। ঢেউ যেমন তীরের দিকে এগিয়ে যায়। যদি জাগাতে পারে বন্যা, ভাসাতে পারে তটরেখা, করতে পারে দিকপরিপ্লাবী। হ্যাঁ, সে-ই ঝাঁপিয়ে পড়বে অন্ধকারে—সে-ই প্রথম হাত বাড়াবে। দুই ব্যাকুল হাত। 'হারণু কাঁচলি ভারণু হার।' সেই উন্মাদ বন্যতার স্রোতে ভেসে যাবে তুচ্ছ-তুচ্ছ-কর্তব্যের আবর্জনা, সমাজের কুটো-কাঁটা, ভদ্রতার ধুলো-মাটি। যত কিছু লজ্জা আর রুগ্নতা, দ্বিধা আর দৈন্য! শরীরের শঙ্খে বাজবে জীবনের জয়ধ্বনি! সেই ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিমান হবে সৌম্য।

তারপর ?

তারপর কে জানে—

বনানী হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো, অন্ধকারের আত্মার মতো : জানেন, আমি শিগগিরই এখান থেকে চলে যাবো।

—কোথায় যাবেন ? সৌম্য জানলার থেকে চোখ সরিয়ে আনলো।

—তা এখনো ঠিক করিনি।

—আমিও যাবো, আগুনের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অন্ধকারের মতো সৌম্য বলে উঠলো : আমিও যাবো আপনার সঙ্গে।

—আপনি কোথায় যাবেন ? বনানী উঠলো হেসে।

—জানি না, জায়গা আমরা খুঁজে নেবো। সৌম্য দৃঢ়তায় হঠাৎ উচ্চারিত হয়ে উঠলো : অনেক, অনেক জায়গা পৃথিবীতে। এমন একটা জায়গা যেখানে আমাদের আগে পৃথিবীর আর কেউ কোনোদিন যায়নি, যেখানে নেই এই জনতার কোলাহল, নেই এই একটা সমষ্টিকৃত মানবতা। পার থেকে বিশাল একটা সামুদ্রিক মুক্তিতে।

বনানী আচ্ছন্ন, ধূসর গলায় বললে,—আমাদের আত্মার নিভৃতি ছাড়া তেমন জায়গা আর কোথায় আছে ?

—আছে, আছে, আপনিও জানেন না, আমিও জানি না, তবু আছে, থাকা উচিত, ঈশ্বরের পৃথিবীতে থাকা উচিত। চলুন, চলতে-চলতে একদিন সে-জায়গা আমরা পেয়ে যাবো। সৌম্য চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। এইবার নিশ্চয় সে বনানীর হাত ধরবে, আকর্ষণ করবে সামনের দিকে। বুকে এসে লীন হবে বনানী। ঈশ্বরের পৃথিবীতে পেয়ে যাবে তার জায়গা, তার নিজের জায়গা।

সৌম্য নড়লো না। সৌজন্যে স্নিগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনানী মৃদু ভীরু গলায়, বিচ্ছিন্ন একটি তারার মতো বললে—আমার অন্য জায়গায় ভালো একটা চাকরি পাবার সম্ভাবনা হয়েছে মাত্র, সেইখানেই যাবার কথা আপনাকে বলছিলুম। বসুন, ভেতরে চা-র কথা বলে দিয়ে আসি। বলে বনানী তাড়াতাড়ি চলে গেলো, নিবে গেলো। যেন এ-ঘর থেকে লণ্ঠনটা কে নিয়ে গেলো ও-ঘরে।

চা-টা বনানী নিজেই তৈরি করলে। কাটতে দিলো খানিকটা সময়। যাতে সে ফিরে গিয়ে অন্য কথা পাড়তে পারে। অন্তত চায়ের রঙ ও স্বাদ নিয়ে একটু হালকা গবেষণা। দিন-কাল নিয়ে কথা। যা ঘটে গেছে সেই সব নিশ্চিন্ত বিষয়। কিন্তু চা হাতে করে ঘরে ঢুকেই তাকে বলতে হলো : আপনি কোথায় যাবেন আমার সঙ্গে ?

সৌম্য হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নিতে-নিতে বললে,—আপনিই বা কোথায় যাবেন ? আপনাকে যেতে দিলে তো ? শুনি, কোথায় আপনার চাকরি হয়েছে ?

বনানী শব্দ করে হেসে উঠলো : সেই জায়গাটার নামই তো এতোক্ষণ ধরে ভাবছিলুম। দাঁড়ান, আমি আসছি আমারটা নিয়ে। দুজনে পরামর্শ করে একটা জায়গা বার করতে পারবো নিশ্চয়। যা আপনি বলেছেন, অনেক, অনেক জায়গা। বনানীর গলা সিল্কের একটা ফিতের মতো যেন হালকা হয়ে গেলো :

চাকরি হোক বা না হোক, কিছু আসে যায় না, যাওয়া তো যাবে। কী বলেন, জীবিকা বড়ো, না জীবন বড়ো ?

সৌম্য বললে,—কিন্তু যেতেই বা হবে কেন ?

—যেতেই বা হবে কেন ? বনানী আবার অদ্ভুত করে হেসে উঠলো : যেতে হলে যে আপনার আবার এই চাকরিটা থাকে না। দাঁড়ান, চা-টা নিয়ে আসি।

বনানী প্রায় ভিতরে যাবার পরদাটা ছুঁয়েছে, দরজার উপর দ্রুত ঠুক-ঠুক শোনা গেলো। সৌম্য কী-একটা কথা বলবার জন্যে উঠেছিলো উদ্দীপ্ত হয়ে, গেলো জুড়িয়ে। কথা আর শেষ হতে সময় পেলো না।

বনানী দরজাকে লক্ষ্য করে বললে,—Come in.

তবু দরজার সঙ্কোচ গেলো না।

সৌম্য বিরক্ত হয়ে বললে,—দরজা খোলা আছে, ধাক্কা দিন।

দরজাটা প্রাণপণে দু'-ফাঁক হয়ে গেলো।

—এ কী, আপনি এখানে কোত্থেকে ? সৌম্য চেয়ারের হেলানো পিঠ থেকে ঋজুতায় ছিটকে পড়লো।

বিশুবাবু হাঁপ নেবার জন্যেও এক সেকেন্ড থামলেন না, রুদ্ধশ্বাস ব্যাকুলতায় বলে উঠলেন : শিগ্‌গির বাড়ি চলুন, বৌ-মার অবস্থা খুব খারাপ।

চেয়ারের চওড়া হাতলটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে সৌম্য জিগ্‌গেস করলো : কী করে জানলেন আমি এখানে আছি ?

বিশুবাবু সে-প্রশ্নের ধার দিয়েও গেলেন না। ব্যাকুলতায় ছিঁড়ে পড়ছেন এমনি সকাতরে তিনি বললেন,—হঠাৎ নাড়ী ছেড়ে গেছে, বাড়িতে একটাও এখন ডাক্তার নেই। শিগ্‌গির চলুন। বিশুবাবু প্রায় ডুকরে কেঁদে ওঠবার জোগাড়।

সৌম্য চেয়ারের পিঠে ফের ঢলে পড়লো। বললে,—ডাক্তারের বাড়ি না গিয়ে সোজা এখানে চলে এলেন কী বলে ?

—শুনলুম আপনিই নাকি ডাক্তারের কাছে গেছেন।

—যাইনি তাই বা জানলেন কী করে ? খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন সেখানে ?

—সময় ছিলো না, একদম সময় নেই আর। বিশুবাবু যন্ত্রণায় পাংশু হয়ে গেলেন : এখন ডাক্তারের চেয়ে আপনাকেই বেশি দরকার। আপনাকে একটিবার দেখবার জন্যে বৌমা চারদিকে চেয়ে আছেন।

—চারদিকে যখন স্পষ্ট চেয়ে আছেন, এবং যখন তা স্পষ্ট আমারই জন্যে, তখন কোনো ভয় নেই। সৌম্য ঝুঁকে পড়ে চেয়ারের হাতলে রাখা চায়ের বাটিতে ছোট্ট একটি চুমুক দিয়ে বললে,—যান, আমি যাচ্ছি।

বিশুবাবু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

—যান, দাঁড়িয়ে রইলেন কী হাঁ করে ? সৌম্য নৃশংস কণ্ঠে বললে—আমি যে এখানে আছি এটা কারুর জানবার কথা নয়। আপনি যে কী করে জানলেন পরে আমি এর জবাবদিহি নেবো। আমার এখন ডাক্তারের বাড়িতে থাকবার কথা, বাড়িশুদ্ধ সবাই তা জানে। ডাক্তারের বাড়ি থেকে এতো শিগ্‌গির ফেরবারো আমার কথা নয়। যান, এখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে, আপনার কী হচ্ছে ?

বিশুবাবু দরজাটা খোলা রেখেই চলে যাচ্ছিলেন, সৌম্য উঠে দরজাটা দু'হাতে বন্ধ করে দিলে। বন্ধ করে দিলে সমস্ত পৃথিবী।

বিশুবাবু তখুনি ছুটলেন ডাক্তারের বাড়ি, তাঁর মনে হলো সৌম্য এখানে নেই, সৌম্য ডাক্তারের বাড়িতেই বসে আছে।

পরদার পাশে বনানী এক মুঠো ছাইয়ের মতো সাদা, হালকা হয়ে গেছে। যেন জোরে একটা বাতাস দিলে সে উড়ে যাবে। শরীরে নেই এক ফোঁটা প্রাণ, যেন পরদারই একটা অংশ।

—ও কী, যান, আপনার চা-টা নিয়ে আসুন। জুড়িয়ে জল হয়ে গেলো যে।

সৌম্য পায়ে-পায়ে জুতোর গোড়ালি দুটো দুমড়াতে-দুমড়াতে ফের চেয়ারে এসে বসলো।

পরদাটা উঠলো দুলে। বনানী নিশ্চিন্ত, নীরব পদক্ষেপে সৌম্যর সামনে এসে দাঁড়ালো। বরফের মতো ঠাণ্ডা, জমানো চোখে বললে,—কী, এখনো বসে আছেন নাকি?

চায়ে ঠোঁট ডুবিয়ে সৌম্য বললে,—হ্যাঁ, দাঁড়ান, চা-টা আগে শেষ করি। চুমুকটা টেনে সৌম্য সোজা হয়ে একটু হাসলো: আপনারটা ফেলেছেন বলে আমি তো ফেলতে পারি না।

বনানী একটা চেয়ার ধরে ফেলে শরীরে কাঠিন্য আনলে। বললে,—ডাক্তারের ওখানে যাবার নাম করে এ-বাড়ি এসে বসে আছেন?

—তা ছাড়া আবার কী। সৌম্য আপন মনে উন্মত্ত হেসে উঠলো: একজনে মরতে বসেছে বলে আমিও তো আর মরতে পারি না। কার ডাক্তার—কোথায় ডাক্তারের বাড়ি! সৌম্য চায়ে আবার একটা দীর্ঘ চুমুক দিল।

বনানী তার তীব্র সচেতনতায় বহু কষ্টে একটা চীৎকার নির্গত করলে: না, আপনি যান।

—কোথায় যাবো? শুনলেন তো বিশুবাবুর মুখে। সেখানে গিয়ে আমি কী করবো? আমার কী কাজ?

—না, আপনি যান। অসহায় আর্ততায় বনানী আবার চেঁচিয়ে উঠলো: আপনাকে কিছুতেই আমি এখানে বসে থাকতে দেবো না। সৌম্যর মূঢ়, আচ্ছন্ন দৃষ্টির উপর বনানীর উপস্থিতিটি বিশাল একটা ছায়ার মতো যেন ঝুলতে লাগলো: না, কক্‌খনো নয়। এটা আমার বাড়ি, এখনো এটা আমার বাড়ি, আপনাকে যেতেই হবে।

সৌম্য ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালো। প্রস্তরীভূত গলায় বললে—কিন্তু সব এতোক্ষণে হয়তো শেষ হয়ে গেছে।

—হোক শেষ। শেষ হওয়াই তো আমি চাই। বনানী হাতের একটা নিষ্ঠুর ইশারা করলে: আপনি যান।

যন্ত্রচালিতের মতো সৌম্য দরজার বাইরে ছোট রোয়াকটুকুর উপর এসে দাঁড়ালো। বললে,—যাচ্ছি, কিন্তু ফিরে সেখানেই যে যাবো তার কী মানে আছে?

—তা আমি জানি না, তা আমি জানি না। বনানী সৌম্যর পিঠের উপর দরজাটা সজোরে বন্ধ করে দিলে। হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি আলোটা দিলে

নির্ভয়ে এবং চতুর্দিকের সেই অন্ধকারে কোথায় যে সে যাবে কিছু পথ না পেয়ে সামনের চেয়ারের মধ্যে বসে পড়লো।

আলো নেভানোটুকু পর্যন্ত সৌম্য দেখলো, দেখলো তাকে বিস্তীর্ণ একটা ইশারার মতো, আশার মতো। যন্ত্রের মতো চালিয়ে নিয়ে চললো তার শরীর, রাস্তা দিয়ে, কোথায় যে কখন বাড়ির দিকে বেঁকতে হবে শেষ পর্যন্ত কিছু খেয়াল করলো না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

আসুক মৃত্যু, সমুদ্র থেকে হাওয়া, আসুক বনানীর ঘরের মতো পরিপূর্ণ অন্ধকারের মুক্তি।

॥ সতেরো ॥

এবার—সত্যি এবার আর কী করা যায়? হাতে এখনো অনেক সময়।

মাঝে তিনটে দিন কেটে গেছে, বনানী শিপ্রার আর কোনোই খবর পায়নি, সৌম্যও আর আসছে না। সেই থেকে কী যে সত্যি হলো, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে যে সে দাঁড়ালো, বনানী কিছু বুঝতে পারলো না।

বনানী আজ আর স্কুলে যায়নি, যাবার আর দরকারো ছিলো না—সারা দিন কুলি লাগিয়ে জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাঁদা করেছে। ট্রেন সেই রাত সাড়ে দশটারো পর। কাজকর্ম সব এরি মধ্যেই গেছে ফুরিয়ে এখন কেবল কতোগুলি ছেঁড়া-ছেঁড়া সময়ের কুয়াশা, অস্পষ্ট কতোগুলি চেতনার সুর।

বিকেলের আলো ম্রিয়মাণতায় গাঢ় হয়ে আসছে, আকাশকে দেখাচ্ছে স্নিগ্ধ একটি মার্জনার মতো। অন্ধকারের শীতল সম্ভাবনায় আকাশ থরথর করে কাঁপছে—আদিম, আদিম সেই অন্ধকার—তারপর আবার, বনানী আবেগের তীব্রতায় দুই চোখ বন্ধ করলো—তারপর আবার উদার, উলঙ্গ সূর্যোদয়, সেই দৈবত আবির্ভাব। কালকের সেই অজায়মান সূর্যের জন্যে বনানীর সমস্ত অস্তিত্ব মৃত্তিকার মতো পিপাসু হয়ে উঠলো।

ঠাকুমা পিছনে এসে দাঁড়ালেন। খুশিতে তরলায়িত তাঁর শরীর: কাশী কখন পেঁছুবে বললি?

—কাশী? বনানী চমকে উঠলো: যাওয়া আমাদের একেবারে না-ও হতে পারে, ঠাকুমা।

—সে কী কথা? বাঁধা-ছাঁদা ঠিকঠাক, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এলি, বাড়িভাড়া দিলি চুকিয়ে - এখন আবার যাবি নে কী বলছিস?

বনানী খিলখিল করে হেসে উঠলো: বাঁধা-ছাঁদা আবার খুলে ফেলতে কতোক্ষণ? চাকরি সংসারে কেবল একটাই নেই, ঠাকুমা, বাড়িভাড়াটা না-হয় আবার চুকিয়ে দেয়া যাবে।

—না, তোকে নিয়ে আর পারি না। আমি বলে—ঠাকুমা প্রায় ছোট খুকির মতো ঠোঁট ফুলোলেন।

বাৎসল্যের অজস্রতায় বনানী তাঁকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। তাঁর ছোট-ছোট পাকা চুলে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে,—তোমার কাশী যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না, আমাকে এখানে থাকতে হলেও তোমাকে কাশী পাঠানো আমি ঠিক করে ফেলেছি। তোমার মতো আমারো তো একটা তীর্থ থাকতে পারে, ঠাকুমা।

ঠাকুমা সজল চোখ তুলে বললেন,—সে কবে?

বনানী শিথিল হয়ে এলো: একটু দাঁড়াও, ঠাকুমা। আমি একটু ঘুরে আসি।

বনানী সামান্যতম একটু সাজগোজ করবারো চেষ্টা করলো না, শরীরের সেই এলোমেলো উড়ো হাওয়ায় ঘর থেকে গেলো বেরিয়ে।

কখন কী ঘটে যেতে পারে, তার উপরে বনানীর কোনো শাসন নেই। হয়তো তাকে সেদিন তেমন করে তাড়িয়ে দেবার জন্যেই সৌম্য আর আসছে না, এই সন্ধ্যার অভিমানে মন ভার করে আছে, নইলে হয়তো, হয়তো তার পথ পড়ে আছে খোলা, চারধারে তার এখন এই সমাপ্তহীন অন্ধকারের মুক্তি। বনানী তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগলো। কতোটুকু বা দূর, পায়ে-পায়ে পথ যাচ্ছে কেবল বেড়ে। সত্যি, কতোটুকুই বা দূর, পায়ে-পায়েই পথ সে একসময় ক্ষয় করে ফেলবে। কে জানে কী ঘটে যেতে পারে এক মুহূর্তে, সেই পথের অবারিত বিরতিতে।

ঠান্ডা, ঘুমন্ত বাড়ি। মৃত্যু দিয়ে মাখানো, প্রতীক্ষায় নিমজ্জিত। সমস্ত বাড়ির উপর বিশাল একটা ছায়া যেন পাখা মেলে আছে, মৃত্যুর ছায়া, বনানীর প্রত্যাসন্ন আবির্ভাবের ছায়া। বনানী যেন সর্বাঙ্গে মৃত্যুর মৌনময় মমতা নিয়ে এসেছে।

নিচে বনানী কাউকে কোথাও দেখতে পেলো না। সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে উপরে উঠতে লাগলো। মৃত্যুর মতো অজানা, অপরূপ অন্ধকার। তার ঘ্রাণে ও ছোঁয়ায় বনানীর সমস্ত চেতনায় যেন মধুর মুহ্যমানতার একটা নেশা ধরে গেছে। অন্ধকারের ঊর্ধ্বে, উত্তপ্ত উত্তরে, অপশোক সূর্য আছে দাঁড়িয়ে।

উপরটাও আশ্চর্য রকম ফাঁকা। যেন একটা ভূতে-পাওয়া ছাড়া বাড়ি! বনানীর ভয় করতে লাগলো—আনন্দেরই মতো অসহ্য সে ভয়। হাতের কাছেই শিপ্রার ঘর, দরজাটা বন্ধ, তার সেই নিরুত্তর ইঙ্গিত বনানীকে সহসা দিগন্তলীন দূরে সমুদ্ররেখার মতো অস্পষ্ট ডাক দিয়ে উঠলো। যেন উত্তরঙ্গ জলের একটা বাঁধ, বাঁধনটা খুলে দিলেই রাশি-রাশি অন্ধকার জলে সে তার সমস্ত সৃষ্টি নিয়ে ভেসে যাবে, ভেসে যাবে সে কোন বিরল, বিশাল নির্জনতায়।

দুই হাতে আক্রমণের বন্যতা এনে বনানী দরজায় ধাক্কা দিলে। দরজাটা ভিতর থেকে ভেজানো ছিলো মাত্র, খুলে গেলো। গায়ে এসে লাগলো মৃত্যুময় স্তব্ধতার স্পর্শ। নরম, নীল অন্ধকার। বাতাসে শিকারীর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কিনা এমনি তীক্ষ্ণাগ্র চেতনায় বনানী চৌকাঠ পেরিয়ে আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকলো। সব অন্ধকার, নিভৃত, নিরাপদ, নিশ্চিন্ত একটি গুহার আশ্রয়। নিবিড় একটি উষ্ণতা।

ঘরের মধ্যে থেকে অন্ধকার হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো : কে ?

বনানী তখুনি হয়তো পালিয়ে যেতো, কিন্তু স্বরটা সে মনের মধ্যে শুনলো কি না, ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। জানলাগুলো হাওয়ায় হা-হা করছে, হয়তো তারই একটা জিজ্ঞাসা। বনানী এগিয়ে গেলো খাটের দিকে।

দিব্যি বিছানা পাতা, তাতে শিপ্রা—শিপ্রা শুয়ে!

কে ?

বনানী না বলে পারলো না : আমি।

—কে, বনানী-দি ? শান্ত জলের উপর অশরীরী ছায়ার মতো শিপ্রা কেঁপে উঠলো : এসো, এসো, তোমার কথাই ভাবছিলুম। ভাবছিলুম তোমাকে একটা খবর পাঠাই। কতোদিন তুমি আসোনি।

বনানী তার কপালের উপর হাত রাখলো। বললে,—এখন কেমন আছ ?

—ভালো নয়, আর ভালো লাগে না এমনি ভুগতে। মৃত্যুর একেকটা ঢেউ আসে, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে না পার থেকে, শুধু ভিজিয়ে দিয়ে চলে যায়। রোগ একটা অপমান, শরীর পারছে না আর এ অপমান বইতে। ঝরা পাতার স্তূপে শিথিল একমুঠো বাতাসের মতো শিপ্রা চঞ্চল হয়ে উঠলো : খোকাকে নিয়ে আয়াটা গেলো কোথায় ? ঘর-দোর যে ভীষণ অন্ধকার। আলোটা জ্বালাও, বনানী-দি। ঐ যে, আমার মাথার কাছেই সুইচ।

বনানী আলো জ্বালালো। রূঢ়, অনাবৃত বাস্তবতায় সমস্ত ঘর যেন নিমেষে শূন্য হয়ে গেলো।

বনানী আলোয় এসে দাঁড়ালো শিপ্রার খাটের কাছে।

—তুমি কী সুন্দর, বনানী-দি ! মুগ্ধতায় পরিব্যাপ্ত দুই চোখে শিপ্রা হেসে উঠলো।

—সুন্দর ?

—হ্যাঁ, ভীষণ সুন্দর। বনানীর অবশ একখানি হাত শিপ্রা তার বিশীর্ণ, গ্রন্থিল ক'টি আঙুলের মধ্যে তুলে নিলো : যেন মধ্যরাত্রির অন্ধকারে ফোটা সাদা একটা ফুল। কী তীব্র তোমার শুভ্রতা। ভাদ্রের নদীর মতো তুমি জীবনে উঠেছ ভরে, চৈত্রের আকাশের মতো ধারালো নীলিমায়। আমিও সুন্দর হবো, আমিও একদিন সুন্দর হবো, বনানী-দি।

তার মুখে এতো কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। বনানী অবাক হয়ে গেলো। তার আঙুলের উপর স্নেহে একটু চাপ দিয়ে বললে,—ভালো হয়ে উঠলেই আবার শরীরে তোমার সেই পুরোনো পূর্ণতা ফিরে আসবে।

—না, আমি সুন্দর হবো মৃত্যুতে, প্রশান্ত একটি মৃত্যুতে। আমার মধ্যে আর এককণা পবিত্রতা নেই, নেই বাঁচবার এতোটুকু দীপ্তি। মরলেই বরং কিছু একটা আমি হবো। করে যেতে পারবো কিছু জীবনে। ও কী, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো, বোসো, আমার পাশে এসে বোসো। ভয় নেই, রোগটা আমার ছোঁয়াচে নয়। ও'র ফিরে আসতে এখনো দেরি আছে

বনানীকে বসতে হলো। বললে,—কেন, আমি কি তোমার কাছে আসতে পারি না নাকি ?

— আমার কাছে এসেছ ? শুনে খুব খুশি হলুম—আমার কাছে কেউ আবার আসে। কেউ আসে না। হাতে তার একগাছিও গয়না নেই, হাড়ময় গরম একখানি হাত বনানীর কোলের উপর মেলে দিয়ে শিপ্রা বললে,—তোমার সঙ্গে আমার কতো কথা আছে। শিপ্রার বুকটা দুলতে লাগলো : কতো কথা। তোমাদের বিয়ে কবে হচ্ছে, বনানী-দি ?

—বিয়ে ? বনানী যেন দু'খণ্ড হয়ে গেলো : আমি আবার কবে বিয়ে করতে গেলুম !

—করা তো উচিত। আমার জন্যে তোমরা অপেক্ষা কোরো না। আমি মরি-বাঁচি, তোমাদের মাঝে আমি কেউ নই, আমি বেসুর, অবান্তর। হারাতে দিয়ো না এই সোনার মুহূর্তগুলো। শিপ্রা চোখ বুজে গভীর অন্ধকারে জীবনের সঙ্গে তার শেষ সম্পর্কটুকু যেন প্রাণপণে ছিন্ন করতে চাইলো : আমি অনেক ভেবে দেখেছি, বনানী-দি, সত্যি আমি কেউ নই, তোমাদের জীবনের পরিপূর্ণতার কাছে আমি কতোটুকু। সমস্ত সৌরমণ্ডলের তুলনায় এই পৃথিবীর চেয়েও তুচ্ছ।

—তুমি এ-সব কী বলছ, শিপ্রা ?

—জীবনে চাই মহৎ নিষ্ঠুরতা, শিপ্রার মধ্যে থেকে মৃত্যু যেন কথা বলতে লাগলো : বাঁচবার জন্যে আমাদের অনেক কিছু বর্জন করতে হয়। আমরা মীমাংসা করে বাঁচি না, বাঁচি নিষ্ঠুর হয়ে। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, বনানী-দি ; আমার আর কোনো ক্ষোভ নেই, অতৃপ্তি নেই, আমি মিছিমিছি আগে মারামারি করতে গিয়েছিলুম—ভেবে দেখলুম সংসারে আমার সুখটাই বড়ো নয়, তার চেয়ে আরো অনেক বড়ো সুখ আছে, আরো অনেক পূর্ণতা, তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমার জন্যে তো মৃত্যুই আছে, তাও আমি কল্পনা করতে পারতুম নাকি ? শিপ্রা কাকুতিতে শীর্ণতরো হয়ে এলো : মিছিমিছি তোমরা আর দেরি কোরো না।

কঠিন না হয়ে বনানীর উপায় ছিলো না, সেটা তার সভ্যতার অস্ত্র তার আত্মরক্ষার অধিকার।

—তোমার স্বামীর নামে শুধু-শুধু এই অপবাদ দিচ্ছ কেন ? কেন নিজেকে অশান্ত করে তুলছ ?

—অপবাদ ! তুমি এ বলছ কী, বনানী-দি ? শিপ্রা উঠে বসতে চেষ্টা করলো, পারলো না, বালিশের উপর পিঠ পড়লো ভেঙে। বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়ে বললে,—গভীর, গভীর সত্য কথা। আমি জানি, আমাকে তিনি না বললেও আমি বুঝতে পেতুম। সত্যি আমি কে, আমাকে তিনি এমনি পেয়ে গেছেন মাত্র, কিন্তু তোমাকে করেছেন নির্বাচন, করেছেন সৃষ্টি। আমি জানি, আমি জানি, বনানী-দি। নির্বাচনটা সেদিনো অনায়াসে হতে পারতো, কিন্তু মাঝখানে ছিলো আমার ভাগ্য। শিপ্রা হেসে উঠলো : আমি আবার একটা বাধা হতে গিয়েছিলুম !

বনানী তার মুঠো থেকে হাত সরিয়ে নিলো। বললে,—তুমি জানতে পারো, তাতে আমার কী ! তুমি জানলেই তো আর হবে না।

—কেন তুমি কিছুই জানো না নাকি ? তোমাকে এতো বুদ্ধিমতী বলে এতোদিন পুজো করে এসেছি, আর এই সামান্য কথাটা তুমি বুঝতে পারলে না ?

শিপ্রা আবার হেসে উঠলো : আমি যে তোমাকেও জানি, বনানী-দি। আমার কাছে তুমি কোনোদিন কিছু লুকোও নি, আজো পারবে বলে মনে কোরো না।

—কী, কী জানো তুমি? বনানী খাট থেকে নেমে পড়লো।

—নিজে মেয়ে হয়ে বুঝতে পারি না এই মেয়ের মন? কখন, কিসে তারা আগুনের মতো সুন্দর হয়ে ওঠে, মধ্যরাত্রে ফোটা সাদা ফুলের মতো সুন্দর? শিপ্রার মধ্যে থেকে মৃত্যু উঠলো হেসে : আমিও যে একদিন তেমনি করে সুন্দর হয়েছিলুম আমার সেই বিয়ের রাতে। আমি যে তা জানি বনানী-দি।

কর্কশতায় বনানীকে ভারি করুণ শোনালো : আমাকে আজ তুমি এমনি অপমান করবে নাকি?

—অপমান, তোমাকে অপমান! তোমার এই স্বাস্থ্য, এই রূপ, এই পবিত্রতা—তাকে আমি অপমান করবো? অসুস্থ শিশু যেমন তার রোগ বোঝাতে পারে না, কেবল ছলছল করে চেয়ে থাকে, তেমনি অগাধ চোখে শিপ্রা চেয়ে রইলো : এতে কোনো অপমান নেই, কোনো লজ্জা নেই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, বনানী-দি, নেই একতিল নিন্দার অবকাশ। ভীষণ সোজা, যা কিছু সত্য তাই অত্যন্ত সহজ! আর যা সহজ নয়, তাই জানবে ভয়ানক মিথ্যে, ভয়ানক মিথ্যে। শিপ্রা আবার সেই অশরীরী হেসে উঠলো : আমি আবার জোর দেখিয়ে বাধা হতে গিয়েছিলুম —মিথ্যের কী জোর? কুৎসিত, পাপী, নির্লজ্জ মিথ্যে।

বনানী কী বলবে কিছু ভেবে পেলো না, চলে যাবার জন্যে শরীরে একটা চঞ্চলতা আনলে।

—ও কী, তুমি চলে যাচ্ছ নাকি? যেয়ো না, যেয়ো না, তোমার সঙ্গে আরো অনেক কথা আছে যে। কেনই বা তুমি যাবে, কিসের ভয়ে? শিপ্রার চোখ-মুখ, সমস্ত শরীর জ্বলে উঠলো : কাউকে তুমি কোনোদিন ভয় করোনি, লোকনিন্দা তুমি দু'-পায়ে মাড়িয়ে গেছ, যা তোমার চাই তা-ই নিয়েছ জোর করে কেড়ে— তুমি ছাড়বে কেন তোমার সত্য, তোমার বাঁচবার অধিকার? আমার মতো তুমিই বা কেন হেরে যাবে? শিপ্রা আবার উঠে বসতে চাইলো বিছানার উপর, আবার গেলো ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে : কথা কও, কথা কও বনানী-দি, চুপ করে গেলে কেন?

বনানী খাটের কাছে সরে এলো; নিচু হয়ে মমতায় আর্দ্র, অন্ধকার মুখের ছায়া তার মুখের উপর ছড়িয়ে দিলো। বললে,—তুমি ভালো হয়ে ওঠো, শুধু তুমি ভালো হয়ে ওঠো, শিপ্রা!

—ভালো আমি সত্যিই হচ্ছি না। একবার ডুবছি আর ভেসে উঠছি। চিরন্তন তলিয়ে যেতে পারছি না। শিপ্রা আবার অস্থির হয়ে উঠলো : তুমি চলে যেয়ো না, বনানী-দি। উনি এক্ষুণি এসে পড়বেন। আপিস থেকে ফিরতে তাঁর আজকাল এমনিই দেরি হয়। এখানে ভালো না লাগে, পাশের ঘরে গিয়ে একটু বোসো। আলোটা কাউকে জ্বেলে দিতে বলো। আমি আর পারছি না।

বনানী সামনের পাথরের বাটি থেকে আঙুলে করে খানিকটা জল নিয়ে শিপ্রার উত্তপ্ত কপালের উপর বুলিয়ে দিতে লাগলো। বললে,—তুমি এখন একটু ঘুমোও, আমি বসছি।

—আ, সত্যি আমার এখন ঘুমিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। শিপ্রা শুকনো, দীর্ঘ পালকগুলি বিছিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে চোখ বুজলো : আমি দেহে-মনে ভীষণ রোগা হয়ে গেছি, ভীষণ আখুখুটে। না, আর কথা বলবো না। কথা বলার আর কী দরকার! তুমি বসে আছ দেখলে উনি কতো যে খুশি হবেন, বনানী-দি। আমাকে জাগিয়ো না, উনি এলেও আমাকে জাগিয়ো না, আমি তখনো ঘুমিয়ে থাকবো। খানিক পরে নার্স হয়তো এসে পড়বে, আমাকে তার হাতে সঁপে দিয়ে তোমরা কোথাও বেড়িয়ে এসো, কেমন?

—আচ্ছা, তুমি এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘুমোও। বনানী বললে।

কাটতে দিলো খানিকটা স্তব্ধতা। শিপ্রা সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা আস্তে-আস্তে তার পরীক্ষা করলো। আস্তে-আস্তে আঙুল ক'টি নিলো তুলে, সান্নিধ্য আনলো শুথ করে! পা টিপে-টিপে উঠে গেলো সুইচ-বোর্ডের কাছে—টুক্ করে সমস্ত ঘর অন্ধকার করে দিলে।

নরম, নীল অন্ধকার।

বনানী পা টিপে-টিপে আবার, আরেকবার, একা ঘরে শিপ্রার বিছানার কাছে ঝুঁকে দাঁড়ালো। শুনতে চেষ্টা করলো তার নিশ্বাস। গা ছুঁয়ে লোভ হলো দেখতে। ইচ্ছে হলো সে-ই প্রথম চীৎকার করে ওঠে।

ভীত, তাড়িত একটা পশুর মতো বনানী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

আপিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে সৌম্য তার বসবার ঘরের অন্ধকারে শূন্যোপস্থিতিতে মিশে যাচ্ছিলো তার পরিপার্শ্বের সঙ্গে, শুনতে পেলো পাশের ঘরে শিপ্রা ঘুম ভেঙে হঠাৎ ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কাকে যেন ডাকছে, কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সৌম্য সন্ত্রস্ত, সচকিত হয়ে ঘরে ঢুকলো। ডাক শুনে আয়া আগেই দিয়েছে আলো করে।

সৌম্য ঘরে ঢুকতেই তার চোখের উপর বুভুক্ষু, তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিপ্রা চেঁচিয়ে উঠলো : বনানী-দি কোথায় গেলো?

বিরক্ত, ঝাঁজালো গলায় সৌম্য বললে,—কে?

—বনানী-দি। এতোক্ষণ এইখানে, আমার পাশেই যে বসে ছিলো। দেখ, তোমার বসবার ঘরে কিনা, যাও দেখে এসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও।

—তুমি কী বলছ যা-তা? সৌম্য তার পাশে বসে পড়লো, আয়াকে চলে যাবার সময় দিয়ে টেনে নিলো তাকে বুকের মধ্যে। বললে,—কী না কী একটা স্বপ্ন দেখছিলে।

—স্বপ্ন নয়, সত্যি সে এসেছিলো, তার শাড়ির কী রঙ, আজো তা আমি স্পষ্ট বলতে পারবো, শাড়ির প্রতিটি ভাঁজ পর্যন্ত। তুমি যেখানে বসেছ না, সেইখানেই সে বসেছিলো। ওঠো, ওঠো, খুঁজে দেখ কোথায় গেলো। শিপ্রা সৌম্যর বাহুর মধ্যে ছটফট করে উঠলো : তোমার ঘরেই তো যাবার কথা, নিশ্চয় সেখানে, আমাকে তুমি বলছ না, কিন্তু আমাকে লুকিয়ে আর কী হবে? সে

তো নিজেই আমার কাছে সব স্বীকার করে গেছে। যাও, এখানে বসে আছো কী, ও-ঘরে যাও। তোমাদের না এখন বেড়াতে যাবার কথা ?

সৌম্য বললে, –জ্বরটা তোমার বিকেলের দিকে আজ বেড়ে গেছে দেখছি।

—বাড়ুক-গে জ্বর। তুমি ডেকে আনো বনানী-দিকে।

—কোথায় কে ? সৌম্য ধমকে উঠলো।

—কেন, বনানী-দি ও-ঘরে নেই ?

—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ? আমি বলে এতোক্ষণ অন্ধকারে চুপ করে বসে ছিলুম ও-ঘরে।

—আলো জেলে একবার তুমি খুঁজে এসো, অন্ধকারে তুমি তাকে এতোক্ষণ দেখতে পাওনি। হয়তো কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে। যাও। ওঠো।

– তুমি কি আমাকে এমনি করে মেরে ফেলবে নাকি শিপ্রা ?

—না গো না, মেরে ফেলবো না, আমি সে-শিপ্রা আর নেই। শিপ্রা নিজেকে অতল দুর্বলতায় ছেড়ে দিলো : সত্যি তুমি তাকে কোথাও দেখতে পেলে না ?

—বা রে, কাকে দেখতে পাবো ?

—বনানী-দি আজ এসেছিলো যে। আমি কাকে সাক্ষী মানবো ? আশ্চর্য, আমি ছাড়া আর কেউ যে তাকে দেখেনি। আমি তার কী করবো বলো ? তুমি যে আমাকে আর বিশ্বাস করো না—আমি এতো অপবিত্র হয়ে গেছি।

—এসেছিলো তো এসেছিলো, আবার চলে গেছে। তুমি এখন ঘুমোও।

—চলে গেছে ? শিপ্রা দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছাড়লো : কিন্তু যাবার জন্যে তো সে আজ আসেনি।

—তবে আবার কী জন্যে আসবে ?

—এসেছিলো তার দাবি জানাতে, জানাতে তার সত্য, তার বাঁচবার অধিকার। সে কী সুন্দর, আগুনের মতো সুন্দর তার শরীর, যজ্ঞের আগুনের মতো সুন্দর। তুমি যদি একবার তা দেখতে। সৌম্যর স্পর্শের মাঝে শিপ্রা ভোরের আগেকার অন্ধকারের মতো থরথর করে উঠলো : বনানী-দিকে এতো সুন্দর আমি কোনোদিন দেখিনি। মধ্যরাত্রে ফোটা সাদা মস্ত একটা ফুলের মতো। স্পর্শ নেই, গন্ধ নেই, তবু চমৎকার, মস্ত একটা ফুল।

তার ম্লান, করুণ মুখের দিকে চেয়ে সৌম্য বললে, তুমি তাকে তক্ষুণি চলে যেতে বললে না কেন ?

—পাগল ! চলে যেতে বলবো কী ? শিপ্রা ভয়ে যেন একবার চোখ বুজলো। সে-শক্তি, সত্যের সেই শক্তির সামনে আমি দাঁড়াই কোথায় ? আমি মুছে গেলুম, নিবে গেলুম, তাকে জায়গা ছেড়ে দিলুম অনন্ত। বললুম : বোসো গিয়ে ও-ঘরে, উনি এখুনিই আপিস থেকে এসে পড়বেন।

সৌম্য হেসে উঠলো : বসে আছেন উনি !

—সত্যি, কোথায় গেলো বলো তো ? শিপ্রা অসন্দিগ্ধ, সরল দু'টি চোখ সৌম্যর মুখের উপর তুলে ধরলো : বনানী-দি আমার কাছে কিছু লুকোয় নি, তুমিও কিছু গোপন কোরো না। সমস্ত আকাশের আবরণ দিয়েও সূর্যকে আড়াল করা যায় না। মিছিমিছি কী হবে গোপন করে ? যা সত্য, তাকে ভয়

কিসের ? শিপ্রা একটা ঢোক গিলবার চেষ্টা করলো : সত্যি, বনানী-দির সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি আজ ?

—না। কী তুমি ফের পাগলামি শুধু করলে বলো দিকি ?

—এর চেয়ে আমি কোনোদিন কখনো সুস্থ বোধ করিনি। শিপ্রা আস্তে-আস্তে বালিশে ঢলে পড়লো : হয়তো এমনি কোথায় একটু গেছে, কিংবা বাড়িতে। তুমি যাও, শিপ্রা সৌম্যর গায়ে মৃদু-মৃদু ঠেলা দিতে লাগলো : তাকে নিয়ে এসো। অন্ধকার ঘরে বসে বেচারী আর কতোক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে ?

সৌম্য আবার হেসে উঠলো : আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।

—নেই-ই তো। শিপ্রা আবার তাকে মৃদু, কাতর একটি ধাক্কা দিলো : এই তো তোমার আসল কাজ—প্রত্যেকের জীবনে সুখী হওয়া। যাতে মানুষ সত্যি সুখী হয়, পরিপূর্ণ হয়, পেরে তা না-করাটা ভীষণ পাপ—আত্মহত্যার মতো। সত্যের কাছে লজ্জা কী ? না, তুমি যাও। আমার একার তুচ্ছ সুখের তুলনায় তোমাদের দু-জনের সুখ কতো বেশি। তা ছাড়া, জানো না, আমিও এতে সুখী হবো যে। আমাকে এতোটুকু তুমি সুখী করতে পারো না ?

সৌম্য সর্বাঙ্গে বিমর্ষ হয়ে উঠলো, চেয়ে রইলো জানলার বাইরে পুঞ্জিত অন্ধকারের দিকে।

—না, না, তুমি যাও, আমি মরছি মরি, তুমিও আর নিজেকে মেরো না।

তাকে দুই বলিষ্ঠ হাতে সৌম্য আবার কুড়িয়ে নিলো : তুমি চুপ করবে কিনা বলো, নইলে আমি বিষ খাবো, ঠিক বিষ খাবো বলে রাখছি !

শিপ্রার মুখে সূক্ষ্ম একটা হাসি উঠলো ফুটে : বিষ খাবার কোনো দরকার নেই। আমি পর্যন্ত খেলুম না। যদি না ও মরি, ভাগ্যের কৌশলে যদি বেঁচেও উঠি ফের, তবুও আমার কোনো ভাবনা নেই। খোকাকে শুধু আমায় দিয়ো—খোকাকে, শিপ্রা আবার তৃপ্তিতে পড়লো ঢলে : আমি আর কিছু চাই না। তুমি যাও, পরের মন-গড়া সুখের দিকে চেয়ে নিজেকে এতো বড়ো একটা উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত কোরো না।

ক্লেদাক্ততায় সৌম্যর নিশ্বাস আটকে আসছে, এমন সময় চঞ্চল বাতাসের মতো ঘরের মধ্যে নার্সের আবির্ভাব হলো। শিপ্রাকে বালিশে ভালো করে শুইয়ে দিয়ে সৌম্য উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি : নার্স এসেছে।

তারপর নার্সের সঙ্গে চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে দুয়েকটা সে শুকনো আলাপ করলে। প্রাঞ্জল,সহজ গলায় কথা বলতে পেয়ে সে যেন একটা গভীর আরাম পাচ্ছে।

রাত তখনো খুব বেশি হয়নি, আধো-জাগা আধো-ঘুমের মধ্যে থেকে সৌম্য ধড়মড় করে হঠাৎ উঠে বসলো। অসহ্য, মর্মান্তিক অসহ্য সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলো বুঝি। সৌম্য তার একা বিছানায় আর মশারি খাটিয়ে শুতো না, খাট থেকে এক লাফে নেমে পড়ে, তাড়াতাড়ি সে আলো জ্বালালে। স্বপ্ন দেখছিলো, তারো যেন ভীষণ একটা কী দুরূহ, দুরারোগ্য অসুখ করেছে, ঘর-বাড়ি আকাশ-হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও হয়ে গিয়েছে রোগা, বিশীর্ণ, তার চামড়া পড়েছে কুঁকড়ে, ঝুলে, জায়গায়-জায়গায় হাড় উঠেছে ঠেলে শক্ত হয়ে, চোখ দু'টো ড্যালা পাকিয়ে

বাইরে আসছে ছুটে। নামহীন, নিরবয়ব, নিষ্ঠুর একটা ভীতি। দেয়ালের গায়ে সামনেই ছিলো একটা দাঁড়া-আয়না, নিজের মুখ দেখতে পর্যন্ত সৌম্যর সাহস হলো না। পাছে তার নিজেকে সে আর দেখতে না পায়। রোগা, রোগা হয়ে গেছে সমস্ত ঘর, ঘরের সমস্ত আবহাওয়া। অন্ধকারে পর্যন্ত সে-দীপ্তি নেই, সেই ঘনতা। এঁদো, ভেজা, বিশ্রী কতোগুলি কালিমা। দেয়ালগুলোও রোগা হয়ে গেছে, ছ্যাঁতা ধরেছে সমস্ত গায়, ছুঁতে ভয় করে। টেবিল, চেয়ার, ঘরের সমস্ত আসবাব, কেমন যেন কতোগুলি শ্রীহীন বস্তুপুঞ্জ, মরা, শুকনো কতোগুলি কাঠের প্রেতমূর্তি। সৌম্য ভীত, ভূতগ্রস্ত অশরীরী একটা ছায়ার মতো ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যেখানে হাত রাখছে, তা-ই উঠছে গুঙিয়ে, প্রতিবাদ করে। নিশ্বাসে পাচ্ছে ওষুধের ঝাঁজ, বুকের উপর চাপা একটা গুমোটের ভার। আলোটা পর্যন্ত বিবর্ণ, মৃতের ঘোলাটে, ভারি চোখের মতো। ঘরময় কিলবিল করছে যতো সব রোগা কলুষিত কথা, ক্লেদাক্ত, অপরিচ্ছন্ন। অবধারিত একটা মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো অসুস্থ, কুৎসিত একটা স্তব্ধতা পায়ের ভারে মেঝেটা অবধি ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। রোগা, রোগা, দিনানুদিন শীর্ণায়মানতার শ্রান্তি। সৌম্যও যেন ক্ষয় পেতে পেতে, রুগ্ন হতে হতে, অসুস্থতার একটা বিজ্ঞাপন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারো শরীর যাচ্ছে দড়ির মতো পাকিয়ে, তারো মনে নেই আর সেই দক্ষিণ থেকে হাওয়া। শ্বাসরোধী একটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকূপ। জলের তলাকার অন্ধকার।

এই অন্ধকার দেয়াল সে দুই হাতে ঠেলে ফেলে দেবে, তার আত্মার জন্যে, তার মনুষ্যত্বের জন্যে।

বনানী আজ এসেছিলো। শিপ্রার অনেকানেক ঠাট্টার মধ্যে এটা না-ও হতে পারে।

সৌম্য পা টিপে-টিপে চোরের মতো নিচে নামলো। সদরটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে নেমে গেলো রাস্তায়। মধ্যরাত্রে সেটা আর তখন কলকাতার রাস্তা নয়, জনহীন স্বপ্নের পথ।

গ্রীষ্মের নীল মধ্যরাত্রি। নিশি-পাওয়ার মতো সৌম্য যেন স্বপ্নে হেঁটে চলেছে। এই মধ্যরাত্রে কোথায় একটা সাদা ফুল ফুটেছে, কোন অপরিচেয় অন্ধকারে, সাদা মস্ত একটা ফুল—তাতে স্পর্শ নেই, গন্ধ নেই—চিরন্তন একটা ফুল হয়ে ফুটে থাকা।

সেই বৃন্তের অন্ধকার তাকে ডাকছে—সেই অপরিচেয় অন্ধকার।

আর সৌম্য ভুল করবে না। সেই সাদা ফুলকে সে লাল করবে। কামনায়, বিপ্লবে, প্রাণচ্ছটার প্রাচুর্যে। সে আর ফিরবে না অভ্যাস আর অস্বীকৃতির কাছে, মায়া আর স্নেহচ্ছায়ার দুয়ারে। সে জানে কোথায় জ্বলছে তার শোকহীন শুকতারা। তার প্রত্যূষের প্রতিজ্ঞা।

বাড়ির সামনেকার ছোট রোয়াকটুকুতে পথাশ্রয়ী কয়েকটা লোক শুয়ে ছিল। রাস্তার গ্যাসের আলো ততোদূর এসে পৌঁছয় নি। অন্ধকারে সৌম্য কার বুঝি-বা পা মাড়িয়ে দিলে।

লোকটা ঘুমের মধ্যে শব্দ করে উঠলো।

—এরা কোথায় ? যারা এ-বাড়িতে ছিলো ? সৌম্য আর্তকণ্ঠে জিগগেস করলে।

ঘুম-ভাঙো-ভাঙো অবস্থায় লোকটা বললে,—তারা কেউ নেই।

—নেই কী ?

—দেখছেন না, জানলা-দরজা সব বন্ধ, দরজায় তালা লাগানো।

—কবে গেছে এখান থেকে ?

—তা কে জানে ? লোকটা ঘুমের আরামে পাশ ফিরলো : অনেক দিন হলো। কাল সকালে আসবেন খোঁজ নিতে।

সৌম্য তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালালো। সর্বনাশ, সে এ করেছে কী ? এতো রাত্রে বাড়ির সদরটা যে সে খুলে রেখে এসেছে।

— — —

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

দশম খণ্ড

তথ্যপঞ্জী
ও
গ্রন্থ-পরিচয়

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

সম্পাদিত

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

দশম খণ্ড

ইতিপূর্বে অচিন্ত্যকুমার রচনাবলীর নয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম চারটি খণ্ডে অচিন্ত্যকুমার রচিত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং সাহিত্য বিষয়ক রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রাহক ও পাঠকবর্গের অনুরোধে প্রকাশকগণ পরবর্তী চারটি খণ্ডে, অর্থাৎ পঞ্চম থেকে অষ্টম খণ্ডে, অচিন্ত্যকুমারের অমৃতলেখনী প্রসূত নিম্নলিখিত জীবনী গ্রন্থ সকল সন্নিবেশিত করেছেন—

পঞ্চম খণ্ড । পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

ষষ্ঠ খণ্ড । পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

সপ্তম খণ্ড । ভক্ত বিবেকানন্দ
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (প্রথম খণ্ড)
রত্নাকর গিরিশচন্দ্র

অষ্টম খণ্ড ॥ বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

ইতিমধ্যে সৌভাগ্যবশত 'উদ্যতখড়্গ' সুভাষ গ্রন্থটির শেষ, অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি অনেক অনুসন্ধানের পর পাওয়া গেল। উক্ত গ্রন্থটির প্রকাশিত দুটি খণ্ডে সুভাষচন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবনী ছিল না। তৃতীয় খণ্ডে সুভাষচন্দ্রের নেতাজীতে উত্তরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের বিচিত্র জীবনালেখ্য অনেক গ্রন্থেই বিবৃত হয়েছে। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার আজন্ম বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বোধিত সুভাষের আদর্শ, জীবনদর্শন ও কর্মযজ্ঞের ইতিহাস-ভিত্তিক আনুপূর্বিক ঘটনাবলী অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। প্রকাশকগণ তাই আগ্রহী হয়ে ইতিমধ্যে উক্ত গ্রন্থের তিন খণ্ডই একত্রিত করে 'উদ্যতখড়্গ সুভাষ' নামে প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটি শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনই নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রামাণ্য দলিল।

অচিন্ত্যকুমারের বিচিত্র কিশোর সাহিত্য নিয়ে নবম খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এখন আবার তাঁর কাব্য সাহিত্য এবং বিবিধ রচনা সম্বলিত কয়েকটি খণ্ড প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমান দশম খণ্ডে নিম্নলিখিত গ্রন্থসকল সন্নিবেশিত হয়েছে—

১। **নীল আকাশ। কাব্যগ্রন্থ। ১—৫২ পৃষ্ঠা**

এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশক সংস্থা পূর্বাশা লিমিটেডের পক্ষে (১৩, গণেশ চন্দ্র এভেনিউ, কলকাতা) সত্যপ্রসন্ন দত্ত, ১৩৫৬ সনে প্রথম প্রকাশ করেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+৬৯। দাম দেড় টাকা। উৎসর্গ—'সঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রীতিভাজনেষু।' এই সংস্করণে মোট বত্রিশটি কবিতা ছিল।

পরবর্তী নূতন সংস্করণ ৭ই চৈত্র, ১৮৮০ শকাব্দে (১৩৬৪ সনে) প্রকাশক-সংস্থা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা. লি.-পক্ষে (৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা) জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০+৬৮। ১/৮ ডিমাই। এই সংস্করণে পূর্ববর্তী সংস্করণের বত্রিশটি কবিতাই রয়েছে।

ইতিমধ্যে বর্তমান প্রকাশকগণ অচিন্ত্যকুমারের 'সমগ্র কবিতা' প্রকাশ করেছিলেন। (প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৮১ —সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্তী। প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্তী)। বর্তমানে উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। উক্ত 'সমগ্র কবিতা' প্রকাশের সময়ে অচিন্ত্যকুমার জীবিত ছিলেন। 'নীল আকাশ'-এর কবিতাসকল ১৩৪৯ থেকে ১৩৫৫ সালের মধ্যে লিখিত। 'সমগ্র কবিতা' প্রকাশের সময়ে তাঁরই নির্দেশ মতো নিম্নলিখিত ১৪ টি কবিতা এই গ্রন্থভুক্ত করা হয়।

ধারাবহ। কল্য। প্রচ্ছদ। রোমাঞ্চ। (১)। রোমাঞ্চ। (৩)। বসন্ত। সংগ্রাম। জলধর সেন। সব যাওয়াই এগিয়ে যাওয়া। পিপাসা। জনগণ। দৃষ্টিকোণ। দিক। পথ পথ আলো আলো।

অচিন্ত্যকুমার রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে তিনটি কবিতা লেখেন। তার মধ্যে একটি কবিতা ('আমি তো ছিলাম ঘুমে') তাঁরই নির্দেশ মতো 'পূর্ববর্তী কবিতা'—পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় (রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। সেই জন্য এখান থেকে ঐ কবিতাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এখন 'নীল আকাশ' কাব্যগ্রন্থে মোট ৪৫টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। প্রিয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে দুটি এবং তৎকালীন মাসিক পত্রিকা 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক জলধর সেনের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে রয়েছে।

১। **আজন্ম সুরভি। কাব্যগ্রন্থ। ৫৩—৯৪ পৃষ্ঠা**

এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশন সংস্থা এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সনস্ প্রা. লি. (১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা)-পক্ষে সুপ্রিয় সরকার কর্তৃক শ্রাবণ ১৩৭২ (জুলাই, ১৯৬৫) সালে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০+৫৩। ১/৮ ডিমাই সাইজ।

দাম-তিন টাকা। উৎসর্গ পত্রে—'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিয়বরেষু'। মোট কবিতা সংখ্যা চৌত্রিশ।
অচিন্ত্যকুমারের 'সমগ্র কবিতা' প্রকাশের সময়ে তাঁরই নির্দেশ মতো নিম্নলিখিত ছয়টি কবিতা এই গ্রন্থভুক্ত হয়—

মাপ। মিষ্টত্ব। প্রত্যয়। মন্ত্র। অঙ্কুর। পৌঁছখবর।

'জীবনানন্দ' কবিতাটি কবিবন্ধু জীবনানন্দ দাশের স্মরণে রচিত।
'রবীন্দ্র জন্মদিনে' কবিতাটি ১৩৪৫ (১৯৩৮ সনে) ঐ উপলক্ষে লিখিত।

৩। **পূর্ব-পশ্চিম। কাব্যগ্রন্থ। ৯৫—১৪০ পৃষ্ঠা।**

এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশক সংস্থা আনন্দধারা প্রকাশন (৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা)-এর পক্ষে মনোরঞ্জন মজুমদার কর্তৃক পৌষ, ১৩৭৬ (১৯৬৯) সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। উৎসর্গপত্রে নাম উল্লেখ নেই, শুধু মুদ্রিত—'তোমাকে'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+৬৪। কবিতা সংখ্যা পঁচিশ।

বর্তমান সংকলনে ঐ কাব্যগ্রন্থভুক্ত পঁচিশটি কবিতাই সংযোজিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের 'নজরুল ইসলাম' কবিতাটি গ্রামোফোন কোম্পানি রেকর্ড করেছে। সেই সময়ে অচিন্ত্যকুমার কয়েকটি পঙক্তি এই কবিতায় সংযুক্ত করেছেন। পরিবর্ধিত কবিতাটি বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত হলো। কবিতাটির পরিবর্ধিত অংশ পঁয়ত্রিশ হতে ছাপ্পান্ন ছত্র পর্যন্ত। এই গ্রন্থের 'ছন্নছাড়া' ও 'উদ্বাস্তু' কবিতা দুটিও রেকর্ড করা হয়েছে। 'একক' কবিতাটি এবং পূর্ববর্তী কবিতা পর্বের 'রবীন্দ্রনাথ' (রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) কবিতাটি কবিকণ্ঠে গ্রামোফোন কোম্পানি রেকর্ড করেছে।
বি. দ্র.—উপরোক্ত তিনটি কবিতার বইই সম্প্রতি প্রকাশকগণ একক কাব্যগ্রন্থরূপে প্রকাশ করেছেন।

৪। **অনন্যা। উপন্যাস। ১৪৩—২৫৪ পৃষ্ঠা।**

এই উপন্যাসের একটি সংস্করণ ক্যালকাটা পাবলিশার্স-এর পক্ষে (১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২) মলয়েন্দ্র কুমার সেন প্রকাশ করেন। অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮। মূল্য আড়াই টাকা। এই সংস্করণের পাঠই রচনাবলীতে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ সালে প্রকাশ করেছিলেন প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন সিগনেট প্রেস, কলকাতা। উক্ত দুটি সংস্করণের বই পাওয়া যায় নি।

৫। উর্ণনাভ। উপন্যাস। ২৫৫—৩৪৮ পৃষ্ঠা

এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণটি পৌষ, ১৩৪১ সালে প্রকাশ করেন ডি. এম. লাইব্রেরী (কলকাতা)। এই সংস্করণের বইটি পাওয়া যায় নি। পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করেছেন তুলি-কলম (১, কলেজ রো, কলকাতা) প্রকাশক সংস্থার পক্ষে কল্যাণব্রত দত্ত, মাঘ, ১৩৬৯ (জানুয়ারী, ১৯৬৩) সালে। এই সংস্করণের পাঠই রচনাবলীতে গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। আসমুদ্র। উপন্যাস। ৩৬৯—৪৯৪পৃষ্ঠা

এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ সালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স (কলকাতা) প্রথম প্রকাশ করেন। এই সংস্করণের বইটি পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৭২ সালে প্রকাশ করেছেন সুনীল দাশগুপ্ত নবভারতী (কলকাতা) প্রকাশন সংস্থার পক্ষে। এই সংস্করণের পাঠই রচনাবলীতে গ্রহণ করা হয়েছে।

রচনাবলীর এই খণ্ডটি প্রকাশে যাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশ্রী সঞ্জীবন চক্রবর্তী, আনন্দরূপ চক্রবর্তী, দুলাল পর্বত, বিপুল সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

সম্পাদক